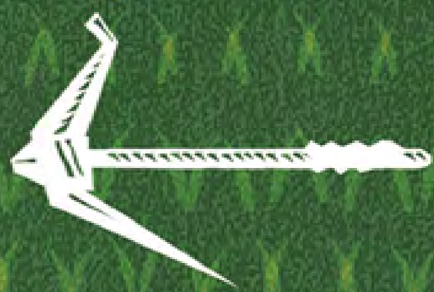


অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়

ভারতের কৃষি



একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ভারতের কৃষি

একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়



প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০২১
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২১

ISBN 9789354250194 (print)
ISBN 9789354250835 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় অর্থনীতি বিষয়ে বই লেখার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিষয়ভিত্তিক নানা ইংরাজি শব্দের যথাযথ প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া। লেখায় ব্যবহৃত যে-কোনও প্রতিশব্দ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন আস্থায় থিতু হওয়ার জন্য ভাষার ওপর নিজের দখলদারি নিয়ে যে-আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, ততটা আমার সত্যিই নেই। তাই প্রথমেই এই দুঃসাহসের জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ভারতের কৃষি-অর্থনীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক অর্থনীতিবিদই অতি উচ্চস্তরের গবেষণাভিত্তিক কাজ করেছেন, অনেকে এই বিষয়ে বইও লিখেছেন। যেমন, এঁদের মধ্যে বাংলায় বই রচনা করেছেন আমার গবেষণা-শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় প্রয়াত অধ্যাপক অশোক রুদ্র। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ৩৫ বছর আগে। ১৯৮৫ সাল অবধি ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির প্রকৃতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে সেই আলোচনার মূল কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যটি মার্কসীয় পদ্ধতির অনুসারী ছিল, যেমনটি আছে এই গ্রন্থেও। কিন্তু উল্লেখ্য হল, দু'টি আলোচনার অন্তর্বর্তী বিষয়বস্তুগুলি পুরোপুরি এক নয়, সাদৃশ্য যেখানে আছে, সেখানেও তুলনামূলক গুরুত্ব, বিস্তার ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির দিক থেকে সেগুলি আমূল ভিন্ন।

পুঁজিবাদ বিকাশের ধ্রুপদী প্রক্রিয়াটি কী তা বোঝার জন্য আমরা যেমন ইউরোপের ভূমিব্যবস্থায় বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যকে বোঝার চেষ্টা করেছি, তেমনই বুঝতে চেয়েছি জাপানের বিশেষ অবস্থায় ক্ষুদ্র জোত মারফত পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়াকে। অন্যদিকে বিপ্লব-পরবর্তী চিন ও রাশিয়ায় ভূমিসংস্কারের সাহায্যে জমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ছোট জোত গঠন দিয়ে শুরু করে ক্রমশ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধীর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সমবায় ও যৌথ চাষের ভিত্তিতে বড় জোতভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তোলার সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিও বোঝার চেষ্টা করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য কৃষি-অর্থনীতির বিকাশে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্কের অবসানের বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি অনুধাবন করে আমাদের দেশের ভূমিসংস্কারের প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাগুলি বোঝা। অশোক রুদ্র ব্রিটিশ যুগের অবস্থার সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের তুলনা করে দেখিয়েছিলেন উৎপাদন-সম্পর্ক কোথায় কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা সমস্যার প্রকৃতিকে অনুসন্ধানের জন্য আরও পিছিয়ে মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে এর স্বরূপ ও মূলের সন্ধান করেছি ও এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে মুঘল আমলের সামন্ততন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যের কোথায় কতটা পরিবর্তন হয়েছিল, এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের ভূমিসংস্কার কি সত্যিই উৎপাদন-সম্পর্কের পিছিয়ে-

পড়া মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন প্রগতিশীল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ’৮০-র দশকের মাঝামাঝি অবধি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে আপাত শান্তির পরিবেশ বজায় ছিল সেই অবস্থায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সঙ্গে এ দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রাধান্য পেয়েছিল পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য ও পুঁজি বিনিয়োগের কর্মসূচি। স্বাধীনতার পর আমেরিকার পরামর্শ ও নানাপ্রকার আর্থিক সমর্থনে সরকারি উদ্যোগে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। অশোক রুদ্রের রচনায় কৃষি উন্নয়নের তৎকালীন ধরনটির খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা এই কালপর্বকে অবশ্যই বাদ দিইনি, কিন্তু তাঁর কাজের পর এই বিষয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হওয়ায় এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। ভূমিসংস্কারের আলোচনায় আমরা বিস্তৃতভাবে ক্ষুদ্র জোতের মাধ্যমে পুঁজিবাদ বিকাশের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেছি। অন্যদিকে সবুজ বিপ্লবের আলোচনায় এই নতুন প্রযুক্তি কোন রাজ্যে কতটা গৃহীত হয়েছে এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের অবদান কতটা তা আমরা নতুন ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। একদিকে যেমন ভারতের সব রাজ্যকে বিবেচনায় এনে রাজ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অন্যদিকে সারা ভারতের জন্য গম ছাড়াও নানা শস্যের পরিসংখ্যান-গত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

১৯৮৫ সালের পরবর্তী সময়ে ভারতের কৃষি-অর্থনীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনগুলি ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার নানা দিককে নতুন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির সমস্যাকে আমরা দেখেছি উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে টিকে থাকা বিভিন্ন পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতার ফল হিসেবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পিছিয়ে-পড়া উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির সম্পর্কের প্রকৃতির দ্বারা এবং সেই প্রকৃতি পরিবর্তনের নানা পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমস্যাগুলি নিত্য নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। এর প্রভাব কীভাবে আমাদের কৃষি-অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে, কৃষি-অর্থনীতির ঐতিহাসিকভাবে টিকে থাকা অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি এইসব পরিবর্তনের ফলে আজ কোন নতুন রূপ নিচ্ছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে এই আলোচনায়।

সপ্তম অধ্যায়ের পর থেকে কৃষি-উৎপাদনের বাজার-ব্যবস্থায় এই পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যগুলিই কীভাবে আবার নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর পর পর অধ্যায়গুলিতে বাজার-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনে বাধা দিয়ে কৃষির উন্নয়ন বিঘ্নিত করেছে এবং একই সঙ্গে কৃষকের জীবনযাত্রায় সংকট ডেকে এনেছে, তাকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে গেছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ও শেষে ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে নতুনভাবে দেখা দেওয়া কিছু কিছু সাধারণ সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

বইটি যখন প্রস্তুতিপর্বের প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখন কৃষি-উৎপাদনের বাজার সংক্রান্ত তিনটি বিল পার্লামেন্টের স্বীকৃতি পেয়ে আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছে (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)। নতুন আইনগুলি নিয়ে

একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিশিষ্ট আকারে সংযুক্ত করা হল বইয়ের শেষে। কৃষি-বাজার সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন গবেষক-পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ থেকে চলতি বাজার-ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুন আইনগুলি সেইসব অভিপ্রেত প্রয়োজন আদৌ মেটাতে পারছে কি না তা দেখা অত্যন্ত জরুরি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

এই গ্রন্থে ভারতের কৃষি-অর্থনীতির ওপর আমার বিভিন্ন সময়ের গবেষণা এবং তৃণমূল স্তরের সমীক্ষাগুলি থেকে পাওয়া বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কাজে লাগানো হয়েছে। তৃণমূল স্তরের সমীক্ষাগুলিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র কালীশংকর চট্টোপাধ্যায় ও প্রয়াত ফজলুল রহমান। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গবেষণা-সহায়ক হিসেবে সুব্রত, শৌনক, শুভদীপ, মিঠুন, রুনা, প্রীতিকণা, দীপান্বিতা, অনুকা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য গ্রামবাসীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার নিজস্ব গবেষণা ছাড়াও আমার তত্ত্বাবধানে দেবজিৎ রায়ের গবেষণা থেকে পাওয়া কিছু পর্যবেক্ষণ আমি ব্যবহার করেছি। ভারতের কৃষির উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য আমি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেছি।

ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা সম্পর্কে ধারণা গঠনে আমার শিক্ষক প্রয়াত অধ্যাপক অশোক রুদ্রের অবদানের জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা ও বিতর্ক আমাকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এছাড়া এই বিষয়ে যাঁদের সঙ্গে নানা সময়ে আলোচনা করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক রতন খাসনবিশ, আলোক মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন ঘোষ। অধ্যাপক সৌম্য চক্রবর্তীর সঙ্গে এ বিষয়ে নানা আলোচনা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। বিশেষত গবেষণা ও লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমি বীরেন ও সৌম্যের কাছে নানা দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য পেয়েছি। রমেন মণ্ডল আমার পরিসংখ্যান বিষয়ক কাজে সহায়তা করে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। আমার কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য ছিল অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। এঁদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ কৃতজ্ঞতা আনন্দ পাবলিশার্সের কমিশনিং এডিটর মলয় ভট্টাচার্যের প্রতি, তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য।

এই বইটি আমার শিক্ষক প্রয়াত অধ্যাপক অশোক রুদ্রর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাসহ উৎসর্গ করলাম।

অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়
অক্টোবর ২০২০, শান্তিনিকেতন

প্রথম অধ্যায়

উন্নয়নের ইতিহাস ও কৃষি

একটি প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা

এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য, ভারতের কৃষি-অর্থনীতিকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করা এবং তার বর্তমান সংকটের কারণগুলি নির্দেশ করা। ভারতের কৃষির দীর্ঘমেয়াদি গতিহীনতা বা স্থবিরত্বের কিছু গভীর ও আশু কারণ অবশ্যই আছে। সেগুলি ছাড়াও এর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত এমন কিছু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে, আজকের এই স্থবিরতার পিছনে যেগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে উদ্ভূত এক বিশেষ পরিস্থিতির সূত্রে ভারতের কৃষিতে যে-সংকট উদ্ভূত হয়েছে তার পিছনে রয়েছে এই উভয় কারণ।

ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেই ষোড়শ শতক থেকে আজ অবধি, বিশ্ব-পুঁজিবাদ গঠনের নানা স্তরে, এর গতিপ্রকৃতি কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছে পুঁজিবাদের সঙ্গে নানা প্রকার সংযোগের ফলে। বিশ্বের প্রথম পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ব্রিটেনের উন্নয়নের নানা স্তরে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় কৃষির সংযোগ ঘটেছিল, তার ফলে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির চরিত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয়। ব্রিটেনে শিল্প-পুঁজি বিকাশের আদি পর্বে যখন বাণিজ্যিক পুঁজির প্রাধান্য ছিল, তখন ভারতে চলেছিল বৈদেশিক বাণিজ্যিক পুঁজির কর্তৃত্ব। পরে ব্রিটেনে বাণিজ্যিক পুঁজির জায়গায় শিল্প-পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংযোগ মূলত নির্ধারিত হচ্ছিল ব্রিটেনে 'পুঁজির বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া' বিকাশের স্বার্থে শিল্প-কাঁচামাল হিসেবে এদেশের কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে এবং প্রস্তুত পণ্য এদেশের বাজারে রফতানি করার মাধ্যমে। এর ফলে শুধু যে আমাদের সনাতন হস্তশিল্পগুলিরই ক্ষতি হল তা নয়, সাধারণভাবে শিল্পের বিকাশেও বাধা সৃষ্টি হল। যেমন, বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতশিল্প সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার অবাধ সুযোগ হারাল, তার বাজারের ক্ষতি হল, উপরন্তু আমাদের সদ্যবিকশিত মিল-এ প্রস্তুত সুতি ও সুতি বস্ত্র অসম প্রতিযোগিতার সামনে পড়ল। ফলে সুতি বস্ত্রশিল্পের স্বাধীন বিকাশ বাধা পায়। ১৯৪৭ সালের পর ব্রিটিশ পুঁজির সরাসরি নিয়ন্ত্রণের যুগ শেষ হলে, বা বলা চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর, বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতৃত্বে ব্রিটেনের জায়গায় আমেরিকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বাজার ও কাঁচামালের জন্য বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে নিজ নিজ প্রভাবে আনার রক্তক্ষয়ী প্রতিযোগিতার আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তখন পুঁজিবাদের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিকল্প সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে, ফলে আপাত শান্তির পরিস্থিতিতে বিশ্বের জনগণের সমর্থন ধরে রাখাটাও একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে

দেখা দেয়। একই সঙ্গে ‘পুঁজিবাদ বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া’র সমস্যার জায়গায় জন্ম নেয় অতিরিক্ত পুঁজি-সঞ্চয়নের সমস্যা, ফলে তারা লাভজনক বিনিয়োগ-ক্ষেত্রের সন্ধানে নামে। এই লক্ষ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তারা একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন, অন্যদিকে অনুন্নত দুনিয়ার উন্নয়ন— এ দু'টিকে বেছে নেয়। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং ‘শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ সম্মতি’ বা সংক্ষেপে ‘গ্যাট’— এই তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই সময় থেকে আশির দশকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ভারতের মতো দেশগুলির সঙ্গে বিশ্ব-পুঁজিবাদের সম্পর্কে প্রাধান্য পেত পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য ও পুঁজি বিনিয়োগের কর্মসূচি। স্বাধীনতার পর আমেরিকার পরামর্শে ও নানাপ্রকার আর্থিক সমর্থন পেয়ে, ভারত সরকার গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। এরও অনেক পরে দেশে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিলে আমেরিকার পি এল ৪৮০-র গম এদেশে সাহায্য হিসেবে আসতে থাকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পরামর্শে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি নেওয়া হয়। পরে যখন বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংকট নতুন চেহারা নিতে থাকে তখন ভারতের মতো দেশগুলির উন্নয়ন-প্রক্রিয়াকে আরও সরাসরি বিশ্ব-অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে বিশ্বায়নের নীতির অধীনে আনা হয় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশ মেনে। ভারতের কৃষি-অর্থনীতি ও তার উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের পিছনে একযোগে কাজ করেছিল বিশ্বায়ন নীতির সঙ্গে ‘শুল্ক-বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ সম্মতি সংস্থা’র পরিবর্তিত রূপ ও বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার জারি করা একগুচ্ছ নিয়ম।

আগেই বলেছি, ভারতীয় কৃষির স্থবিরতার ও তার বর্তমান সংকটের মূল ঐতিহাসিক কারণগুলো অনুসন্ধান করতে গেলে এর বিবর্তনের সানুপুঙ্খ আলোচনা দরকার। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে নেমে পণ্ডিতেরা এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সাধারণভাবে যেসব নিয়ম অনুসরণ করে সেগুলোকে খুঁজে দেখেছেন এবং সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। অনেক বিশ্লেষকের মতে, এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ঠিক কোন স্তরে বর্তমান ভারত অবস্থান করছে সেটা জানা বিশেষ জরুরি। সেটা না বুঝলে সমস্যার প্রকৃতি ও তার সমাধানের উপায় সংক্রান্ত কোনও ধারণায় আসা সম্ভব নয়। ভারতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি-অর্থনীতি নিয়ে নানা আলোচনার অনেকটা অংশই দখল করে আছে এসব বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চালু অজস্র বিতর্ক। আলোচনায় প্রায়শ যাঁর নাম উঠে আসে তিনি হচ্ছেন দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস। ভারতীয় কৃষির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার সময় অনেক ইতিহাসবিদ ও অর্থনীতিবিদ মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের সাহায্য নেন এবং সেগুলির প্রয়োগযোগ্যতা তাঁদের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসে। পণ্ডিতরা অবশ্যই সব বিষয়ে একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, ভারতীয় কৃষিসমাজের বিবর্তন এযাবৎ কালের সর্বোচ্চ স্তরটিতে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের স্তরে, পৌঁছে গেছে। যদিও এই পুঁজিবাদ হল পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদ, ভারতের মূল সমস্যা এর উৎপাদিকা শক্তির ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলের যথাযথ বিকাশে পিছিয়ে থাকা। সেই সমস্যাগুলো আবার, কারও কারও মতে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ভারতের উৎপাদন-কাঠামোয় ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে থেকে যাওয়া কয়েকটি প্রাক-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং বলা চলে, আজকের ভারতীয় কৃষি-সংকটের মূল রয়েছে তার উৎপাদন-কাঠামো ও উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে ভারতীয় কৃষিকে মুক্ত করতে না পারলে তাকে একটি গতিশীল উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নীত করা যাবে না। সচরাচর ভারতীয় কৃষি সংক্রান্ত আলোচনাগুলো কেবল যেসব প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কৃষির

সামগ্রিক উৎপাদন-কাঠামোর অঙ্গ হিসেবে এই কাঠামোকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে, সেগুলির তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু উন্নত পুঁজিবাদী দেশের কৃষির সাপেক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলির বৈশিষ্ট্য কী ও সেগুলো কেন ভিন্ন তা আলোচনায় আসে না। আবার কেউ কেউ এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনও কোনও বৈশিষ্ট্যকে দাসব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এইসব বিভিন্ন বিচারপদ্ধতির সহাবস্থান ঘটায় ভারতীয় কৃষির আলোচনা বেশ জটিল ও বিতর্কপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের আলোচনাগুলোর কথা মাথায় রেখেই আমরা ভারতীয় কৃষির উৎপাদন-কাঠামোর বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সমাজ ও অর্থনীতির বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী উপাদানগুলিকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার, এই উপাদানগুলির প্রভাবে কীভাবে ভারতীয় কৃষির অগ্রগতির পথ প্রভাবিত হয়েছে ও ভারতীয় কৃষি কীভাবে তার আজকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেটা বুঝতে গেলে বহুচর্চিত কিছু বিষয়ের পুনরালোচনাও প্রয়োজন। কারণ এসব বিষয়ে প্রচলিত ধারণাগুলো নানা বিভ্রান্তিতে ভরা। যেমন একটি প্রশ্ন, ভারতে কৃষির অবস্থান কি পুঁজিবাদী, নাকি সামন্ত্রতান্ত্রিক? নাকি সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় উৎপাদন-সম্পর্কের বিবিধ লক্ষণ নিয়েই এদেশের কৃষি-অর্থনীতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে? এই আলোচনাগুলো জরুরি। এটি বাদ দিয়ে কৃষি-সমস্যার মূল অনুসন্ধান করতে নামলে সাধারণ দিকনির্দেশ পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে, সঠিক দিশা স্থির করার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভারতের কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অনেকেই মনে করেছেন পুঁজিতান্ত্রিক, কিন্তু ভারতীয় কৃষির এই পুঁজিতান্ত্রিকতা পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় এখনও অনেকটাই পিছিয়ে পড়া বা কম উন্নত। কিন্তু ভারতের কৃষি-অর্থনীতির যথাযথ তথ্য বিচার করলে দেখা যায় এখানে এখনও অনেক বেশি করে প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে এবং সেগুলোই প্রভাবিত করছে এই অর্থনীতির গতিপ্রকৃতিকে। তাই বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তর, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ উন্নতির স্তরে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা, নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশের কৃষির অবস্থান – এই সমস্ত কিছুর পর্যালোচনাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজটি গড়ে উঠেছিল ইউরোপে, তার ভিত্তি ছিল দাসব্যবস্থা। দাসব্যবস্থায় যারা সরাসরি উৎপাদনে অংশ নিত তাদের সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের কোনও সংযোগ ছিল না। উৎপাদনের উপকরণ থেকে, উৎপাদিত সামগ্রী থেকে, তারা ছিল সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন। উপরন্তু তারা নিজেরাই ছিল উৎপাদন-উপকরণের মালিকের কর্তৃত্বাধীন, বাজারে বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য সম্পত্তি। উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকত উৎপাদনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী প্রকৃত উৎপাদকদের। তারা, বাজার-বহির্ভূত বা অর্থনীতি-বহির্ভূত ব্যক্তিগত ক্ষমতার জোরে এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের স্বার্থে, এইসব দাস শ্রমিকদের বাধ্য করত উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে। এই দাস সমাজব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে বিকশিত হয়েছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ রোমান, স্পার্টান ও গ্রিক সভ্যতা। এই ব্যবস্থায় আপামর সাধারণ মানুষ তাদের শ্রমশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারত না। তার শরীর ও কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে মালিক-শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিনোদনের স্বার্থে ব্যবহৃত হত। সমাজের যা-কিছু সম্পদ, তা এর মাধ্যমেই তৈরি হত। সামাজিক জীবনযাত্রায় শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে দাসব্যবস্থার পতনের পর নবম-দশম বা একাদশ শতাব্দী থেকেই ম্যানর-সামন্ততন্ত্র বা সিনিওর সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায়, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা বহুক্ষেত্রেই ছিলেন প্রাক্তন দাস-মালিক। সামন্তযুগে তাঁরাই হলেন সমাজের সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং ভিন্ন প্রক্রিয়ায় পূর্বতন দাসদের উদ্বৃত্ত শ্রমের শোষক। সামন্তযুগে মালিক তার অধিকারে থাকা জমির কিছুটা অংশ প্রকৃত উৎপাদক চাষি বা শ্রমিকের ভরণ-পোষণের জন্য তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। বাকি অংশ নিজের হেফাজতে রাখে। পরিণামে প্রকৃত উৎপাদক চাষি বা শ্রমিক, পূর্বতন দাসদের তুলনায় কিছুটা বেশি স্বাধীনতার বিনিময়ে বিনা পারিশ্রমিকে মালিকের জমিতে বেগার খাটতে বাধ্য থাকে। এছাড়াও মালিকের চাপানো নানা প্রকার শ্রম ও ফসলের অংশ সে মালিককে দিতে বাধ্য ছিল। এইভাবে তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামগ্রী তৈরিতে যেটুকু শ্রম লাগত তা বাদে তার সমস্ত উদ্বৃত্ত শ্রম সরাসরি, অথবা ফসল আদায় করে, বা কখনও কখনও মূল্য ধরে দেওয়া খাজনার মাধ্যমে, মালিক পুরোপুরি শোষণ করত। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদকরা তাদের জমি চাষ না করে ফেলে রাখতে পারত না কিংবা জমি বা মালিককে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার অধিকারও থাকত না। অর্থাৎ এই নতুন ভূমিদাস প্রথায় মালিকের অধীনে উৎপাদনের যেটা প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ জমি, তার দু'টি ভাগ—একটি ভাগ থাকত সরাসরি মালিকের তত্ত্বাবধানে এবং অন্য ভাগটি যেত পূর্বতন দাস শ্রমিকের হাতে, যারা সদ্য স্বাধীন হয়েছে এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য স্বাধীনভাবে একখণ্ড জমি চাষের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণিটি মালিকের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটতে বাধ্য থাকত, বাধ্য থাকত মালিকের স্বার্থে অন্যবিধ শ্রম দিতেও। রাষ্ট্রের চাপানো নিয়ম অনুযায়ী সে এই জমি ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। পূর্বতন দাসব্যবস্থার তুলনায় এই প্রথাটা ভূমিদাসদের, অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদকদের, কিছুটা বেশি স্বাধীনতা দিত, কারণ নিজের হেফাজতে থাকা জমিতে চাষের পদ্ধতি, শস্য বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার ছিল। পূর্বতন দাসব্যবস্থায় শ্রমিকের সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদিত দ্রব্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এই নতুন ভূমিদাস ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদকের সঙ্গে উৎপাদন-উপকরণের একটি অংশের সরাসরি ও অবিচ্ছিন্ন যোগ ঘটল, যার ফলে চাষের উন্নতি ও অধিক ফলনের জন্য তার উদ্যোগ নেওয়ার অবস্থাও তৈরি হতে পারল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দিক থেকে এই ব্যবস্থা পূর্বতন দাস ব্যবস্থার তুলনায় নিশ্চিত একটি উন্নততর ব্যবস্থা। কিন্তু ভূমিদাস প্রথার উৎপাদন-সম্পর্কে দাস উৎপাদন-সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা থাকল। সেটা হল, শ্রম দানকারী দাস ও ভূমিদাস উভয়ের সঙ্গেই মালিকের সম্পর্কটা বাঁধা থাকত অর্থনীতি-বহির্ভূত ও বাজার-বহির্ভূত চাপের দ্বারা। এই দুই ব্যবস্থাতেই মালিক অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, শুধু মালিকানার জোরেই নানাভাবে প্রকৃত উৎপাদকের উদ্বৃত্ত সরাসরি আহরণ করতে পারত। এই প্রাক্‌পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় তখনও শ্রম, জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মুক্ত বাজার চালু হয়নি, ফলে শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ সর্বোচ্চ দক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারত না। উৎপাদনের উপকরণের মালিকের মধ্যেও তার নিজের আহরিত উদ্বৃত্ত ব্যবহার করে উৎপাদনকে আরও বিস্তৃত করার— এবং এইভাবে পর্যায়ক্রমে মুনাফা বৃদ্ধি ও মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্রমাগত একটি দীর্ঘায়ত লাভজনক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে যাওয়ারও, কোনও তাগিদ থাকত না। মালিকের দিক থেকে উৎপাদনের ও তার মালিকানায় থাকা প্রকৃত শ্রমদায়ী শ্রেণির উদ্বৃত্ত আহরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজের ভোগবিলাসিতাকে

সর্বাধিক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখা। দাস সমাজে মালিকের অধীনে থাকা দাসের সংখ্যা যেমন তার প্রভাব-প্রতিপত্তির নির্ণায়ক বলে গণ্য হত, সামন্ততন্ত্রে তেমনই সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা ও পরাক্রম নির্ধারণ করত তার মালিকানায় থাকা জমির পরিমাণ ও ভূমিদাসের সংখ্যা। এখানে মালিকের উৎপাদনকে দক্ষ করে তোলার ও এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটানোর কোনও লক্ষ্য থাকে না। ফলে এ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা পুরাতন জড়ত্বের মধ্যে পড়ে থাকে।

দাস সমাজের মতো ধনতন্ত্রেও প্রকৃত উৎপাদকরা উৎপাদনের উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জমি ও যে-উপকরণ দিয়ে তারা চাষ করে, বা যে-শিল্পদ্রব্য তারা উৎপাদন করে, সেসবের সঙ্গে বা উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। এর সবকিছুই থাকে মালিকের হাতে, এবং এসবের ব্যবহার সম্পূর্ণত মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা মালিকের কাছে বাজার-নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে। বাজার-ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে মালিক শ্রমিকদের মজুরি বেঁধে রাখে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন, সেই স্তরে। ফলে এই তথাকথিত মুক্ত শ্রমিকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটাই তারা শোষণ করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা এবং এই প্রক্রিয়ার ওপর মালিকের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দাস ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে। কিন্তু দাস ব্যবস্থা বা ভূমিদাস ব্যবস্থার সঙ্গে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অমিলটি রয়ে গেছে মালিক ও শ্রমদায়ী শ্রেণির পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সম্পর্কের ভেতর বাজার-বহির্ভূত চাপের কোনও ভূমিকা থাকে না। বরং এই সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বাজারের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। স্বাধীন শ্রমের বাজারে শ্রমের চাহিদা ও জোগানের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে যে-মজুরি নির্ধারিত হয়, সেই মূল্যেই শ্রমিক মালিকের কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। বাজারের নিয়মে এই মজুরি শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য যা ন্যূনতম প্রয়োজন, তার বেশি হয় না। এর পরেও শ্রমিক যতটা উৎপাদন করে সেই অংশটির বাজার-মূল্য উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে মালিকের হাতে আসে। এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী স্তরে এই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিকের হাতে পুঁজির রূপ নেয় এবং তা উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে মালিক আরও বেশি করে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে ও আরও বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির ক্রমসঞ্চয়ন প্রক্রিয়া এইভাবে অতি দ্রুত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়। যে-শ্রেণিটি উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তারা শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা দ্রুত বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশলের উদ্ভাবন ঘটায়। এর মাধ্যমে তারা উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী শ্রমিককে শোষণ করার মাত্রা যেমন বাড়াতে পারে, তেমনই পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকেও আরও গতিশীল করে তোলে। অশেষ মুনাফা আহরণ এবং সেইসঙ্গে পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে সীমাহীন করে তোলার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা দরকার। সেই প্রয়োজন মেটানোর উপায় হিসেবে নিয়ন্ত্রক বুর্জোয়া শ্রেণি এই সমাজের পরিচালক রূপে অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে আসে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থা, অস্ত্রধারী সৈনিক এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতি ও দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার যেসব মাধ্যম রয়েছে, সেগুলিকে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেই এ পর্যন্ত টিকে থাকা সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়। এই উৎপাদন-সম্পর্কের অগ্রগতির সূচক হল উৎপাদিকা শক্তির বাধাহীন বিকাশ, আর তার উৎস হল ক্রমাগত পুঁজি পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে

পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার বাধাহীন বৃদ্ধি। মনে করা হয়, ধনতন্ত্রই এতাবৎ টিকে থাকা সমস্ত ধরনের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল।

দাসব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্র পর্যন্ত যেসব শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটেছে তার সবক'টিতেই সামাজিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী মালিক শ্রেণিটি তাদের শোষণ প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত রাখতে চেয়েছে এবং সেই প্রয়োজনে তারা গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা— তার আইন, বিচারব্যবস্থা ও আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার জন্য জরুরি অস্ত্রধারী পুলিস সমেত। এই ব্যবস্থা মানুষ যাতে সহজে মেনে নেয় তার জন্য তারা উপযুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করে, এবং সেটা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। উৎপাদনের পরবর্তী উন্নততর স্তর হিসেবে ধরা হয় সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজকে। ধনতন্ত্রে যেখানে কোনও প্রকৃত উৎপাদক শ্রমিকের সঙ্গে তার নিজের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণের সর্বাত্মক বিচ্ছিন্নতাকেই স্বাভাবিক ধরা হয়, সমাজতন্ত্রে তার অবসান ঘটে। সেখানে এই উপকরণগুলির ব্যবহার-প্রক্রিয়ার ওপর শ্রমিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্র হল এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং সাম্যবাদ হল এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরের অবস্থা। সেখানে সমাজ শ্রেণিহীন। ফলে একশ্রেণির মানুষের দ্বারা অন্য শ্রেণির মানুষের শ্রমশক্তি শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যে-সমাজব্যবস্থা, কিংবা সেই শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য জন্ম নেয় যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার অবসান ঘটে সেখানে। এখানে বিষয়টি নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের পূর্বশর্ত নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কিন্তু অপরিহার্য।

সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট দীর্ঘ। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত হল শ্রমের বাজার গঠন এবং সেই বাজারে জমি, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ও শ্রমশক্তির বিক্রেতা হিসেবে স্বাধীন শ্রমিকের উপস্থিতি। এর জন্য প্রকৃত উৎপাদক চাষি কিংবা ছোট কারিগর-হস্তশিল্পীকে তাদের পূর্বতন জীবিকাক্ষেত্র থেকে প্রথমে উচ্ছিন্ন হতে হবে এবং স্বাধীন শ্রমের বাজারে তাদের হাজির হতে হবে শ্রমশক্তির জোগানদার হিসেবে। যে-প্রক্রিয়ায় ছোট উৎপাদককে তার উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করা হয় সেটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। গোটা পশ্চিম ইউরোপে সুদীর্ঘ কয়েক শতক ধরে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলেছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটার আবশ্যিক পূর্বশর্ত যে-আদিম পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়া, ইংল্যান্ডে তা চলেছিল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে। তার ইতিহাস আমাদের দেখায় কীভাবে এই আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার উল্টো পিঠে ছোট উৎপাদকরা উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে স্বাধীন শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে জমির বাজার গঠনের প্রক্রিয়া। এইরকম উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আদিম পুঁজিসঞ্চয়ন ও সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ ইংল্যান্ড। এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার দু'টি পূর্বশর্তকে অত্যন্ত জরুরি গণ্য করা যেতে পারে। এক, আগেই বলেছি, জমি ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছোট উৎপাদকরা জমি ও নিজস্ব ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন শ্রমের বাজারে শ্রমের বিক্রেতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং উৎপাদনের উপকরণ কেনাবেচার স্বাধীন ব্যবস্থায় এই ছোট উৎপাদকরা জমি ও সমস্ত উপকরণ সহ অবাধে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্যে পরিণত হবে। দুই, বিনিয়োগযোগ্য স্বাধীন পুঁজির সঞ্চয়ন। এটা প্রথমে বিনিয়োগে ইচ্ছুক মানুষের হাতে বাণিজ্য-মুনাফা, মহাজনি সুদ ইত্যাদির সূত্রে আর্থিক পুঁজি হিসেবে জমা হয়। পরবর্তী

স্তরে তাকে মুক্ত বাজারে বিনিময় করা হয় শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে, এবং এইভাবে উৎপাদনশীল পুঁজি হিসেবে এর উত্তরণ ঘটে। পূর্বসঞ্চিত এই পুঁজির বিনিয়োগ মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকভিত্তিক এক নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদন-কাঠামো গড়ে তোলে।

তবে, ছোট উৎপাদকদের যদি পূর্বতন উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করে স্বাধীন শ্রমের বাজার গঠন করার অবস্থায় আনতে হয়, তাহলে প্রথম প্রয়োজন বড় বড় সামন্ততান্ত্রিক খামারগুলি ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট উৎপাদন-ক্ষেত্রের প্রাধান্য বাড়ানো। এই উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলি সরল পণ্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিয়মে চলে। অর্থাৎ উৎপাদক তার নিজের বা তার পরিবারের শ্রমের মাধ্যমে যে-পণ্য উৎপাদন করে, তার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। বাজারে শ্রম কেনাবেচার মাধ্যমে উৎপাদক তার নিজের ভোগের জন্য নানা পণ্য সংগ্রহ করে। এই ছোট উৎপাদককে উচ্ছেদ করেই স্বাধীন উপকরণের বাজার গঠিত হয়-যা, আগেই বলেছি, পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার একটি পূর্বশর্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর অধীন বড় কৃষি-খামারের মালিকও প্রথমে বাণিজ্য-মহাজনি কাজে যুক্ত হতে পারে এবং পরে বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ বাজার নির্মিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন শুরু করতে পারে। অর্থাৎ এভাবেও পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রাশিয়ান পদ্ধতি নামে পরিচিত, প্রথমটি পরিচিত তুলনামূলক প্রগতিশীল আমেরিকান পদ্ধতি[১] নামে। অবশ্য কোনও পদ্ধতিতেই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য শুধু মুক্ত উপকরণ ও শ্রমের মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা গঠন যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় একটি শর্ত হল বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির সংস্থান। আগেই বলেছি, উন্নত দেশে এই পুঁজি প্রথমে ব্যবসা ও মহাজনি কারবার থেকে ব্যবসায়ী/ মহাজনদের হাতে জমা হয় আর্থিক পুঁজি রূপে। পরে, উৎপাদন ক্ষেত্রে, বাজার থেকে কেনা শ্রমশক্তি ও উপকরণ সহযোগে তা উৎপাদনশীল পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরটি দু'ভাবে ঘটতে পারে। হয় ব্যবসায়ী মহাজন নিজে উদ্যোগী হয়ে উৎপাদন ক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে, অথবা ছোট-বড় স্বাধীন উৎপাদকরা তাদের নিজ নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাধীন শ্রমশক্তি ও বাজারে কেনা উপকরণ সহযোগে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ক্ষেত্র গড়ে তোলে। দু'টি ক্ষেত্রেই স্বাধীন শ্রমের বাজারে শ্রমশক্তি কেনাবেচার ব্যবস্থা থেকে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন-ক্ষেত্র একটি লাভজনক উৎপাদন-ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, এবং তার পক্ষে পুঁজি পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয়। আবার, ভিন্ন পরিবেশে, শ্রম ও উপকরণের একটি বড় অংশ যখন প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আবদ্ধ, তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনি পুঁজি যথেষ্ট অপ্রগতিশীল ভূমিকাও নিতে পারে। সমগ্র অর্থনীতির নিরিখে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের স্তরটির অবস্থান অত্যন্ত নীচে। তাই সদ্য সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া ছোট উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলি স্বাধীন উৎপাদন-ক্ষেত্র হিসেবে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও ব্যবসায়ী ও মহাজনি পুঁজি এদের প্রতিদিন তীব্র শোষণ করে দুঃস্থ, ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় নিয়ে যায়। উৎপাদনের বদলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনি কাজকর্মই অর্থনীতিতে প্রাধান্য পায়। এই অবস্থা বিশেষ করে দেখা যায় বিদেশি বাণিজ্যিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে থাকা উপনিবেশগুলিতে। বাইরে থেকে আসা বাণিজ্যিক পুঁজি উপনিবেশের ছোট উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলি থেকে পণ্য নিয়ে যায় বিদেশের বাজারে। এবং বাণিজ্যের এই প্রক্রিয়া উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির উপর অসম বাণিজ্যের বোঝা চাপায়, ফলে উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রগতিশীল রূপান্তরের রাস্তা বন্ধ হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতি, এই পরিণতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইউরোপে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার ইতিহাসটি আমরা আরও স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি পরবর্তী অধ্যায়ে। সামগ্রিক উন্নয়নের ইতিহাসে কৃষির ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছি আজকের কয়েকটি উন্নত দেশের উদাহরণ দিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে, ভারতে কৃষির ঐতিহাসিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও এখানকার সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা উন্নত দেশের অনুরূপ পরিস্থিতিগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু আজকের পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলিই নয়, এমনকী জাপানের মতো এশিয়ার দেশেও এই প্রক্রিয়া পৃথক। জাপানে কৃষি-অর্থনীতির সাম্প্রতিক ইতিহাসও আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা জাপান ও ইউরোপের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি, আজকের এই উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বশর্ত পূরণের জন্য ভূমিসম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত। আমরা দেখিয়েছি, সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৫০–৬০-এর দশকে ব্যাপক ভূমিসংস্কার কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কার আইনগুলির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্ট আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ছিল। যার ফলে এই ভূমিসংস্কার কৃষি-জমি ও কৃষি-আয়ের যথাযথ পুনর্বণ্টন করে প্রকৃত উৎপাদক ছোট চাষিদের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে দুর্বল করে রেখেছে।

তবে, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে পর পর যেসব ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে থাকে সেগুলি পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই পরম্পরায় ঘটেনি। ইউরোপীয় দেশগুলিতে আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী প্রথম শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ হিসেবে এসেছে দাস সমাজ। তার পর পর্যায়ক্রমে এসেছে ভূমিদাস প্রথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সামন্ত সমাজব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, প্রাচ্যে সমাজবিকাশের এই পরম্পরা পাশ্চাত্য পরম্পরা থেকে আলাদা। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজের রূপটি কেমন ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। মার্কস এবং বিভিন্ন মার্কসিস্ট পণ্ডিতদের[২] পর্যবেক্ষণ থেকে যে-মতটি বেরিয়ে আসে তা হল, আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠী-ব্যবস্থার অবসানের পর পৃথিবীর সর্বত্র একইরকম সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। এশিয়ার মতো প্রাচ্য মহাদেশে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার অবসান এবং পরে তা থেকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উত্তরণ, এই দু'টি অবস্থার মধ্যবর্তী আরও একটি সমাজব্যবস্থার কথা মার্কস বলেছেন, তিনি এটিকে এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা নামে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাসবিদদের বিবরণ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে অনুমান করা যায়, ভারতের মতো প্রাচ্যের অনেক দেশেই এই এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। অনুমান করা যেতে পারে, খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার শতকে, প্রাচ্যের প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম দু'টি নগরী মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা ও তৎলগ্ন গ্রামাঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাটি ছিল মার্কস-বর্ণিত এশিয়াটিক সমাজেরই[৩] প্রতিরূপ। জোড়া নগরীর চারপাশের কৃষি ও তার সঙ্গে সংযুক্ত হস্তশিল্পের ওপর গড়ে ওঠা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত ছিল। কাজেই এ থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, পাশ্চাত্যে আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠী-সমাজের পরবর্তী ধাপে যে-শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা ছিল তা থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য এর গতিহীনতা। এ ছাড়াও শ্রেণিদ্বন্দ্ব এখানে অনুপস্থিত, জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাও অনুপস্থিত। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সরল পণ্য

উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদকদের মধ্যে উদ্বৃত্তের উৎপাদনশীল ব্যবহারের উদ্যোগও সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত। এই কারণে এই ব্যবস্থা সবচেয়ে স্থবির অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিস ও রোমের মতো পাশ্চাত্য দেশের প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজটি দাসব্যবস্থার ওপর গড়ে উঠেছিল। তবে প্রাচ্যের গ্রামীণ গোষ্ঠী-সমাজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এশিয়াটিক সমাজ এর পরবর্তী স্তরে দাসসমাজে উন্নীত হয়েছিল কি না, এবং যদি তা দাস সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে তবে সেখানে কৃষি-অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি সেই সমাজের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে কতটা সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল, তা আলোচনার দাবি রাখে। পাশ্চাত্যের দেশগুলির ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, পুরনো সমাজের তুলনায় দাসসমাজ উন্নত ছিল, এই সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। এবং এই বিকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার তাগিদে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সমেত গোটা ইউরোপে পুরনো সমাজকাঠামোকে অপসারিত করে এক নতুন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পত্তন অবধারিত হয়ে উঠেছিল। সেই একই প্রক্রিয়ায় ও একই কারণে, গোটা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে উৎখাত করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবধারিত হয়ে ওঠে। এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-কাঠামো সর্বাধুনিক। এবং এর আগে অবধি মানবজাতি যত ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এখানে অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ। পাশ্চাত্য সমাজের এই ক্রমান্বিত উত্তরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা এই উত্তরণ প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করব।

ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখব, ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে পুরনো সমাজের প্রগতিবিরোধী উপাদানগুলি কতটা ক্রিয়াশীল ছিল এবং সেসব থেকে কোন কোন প্রগতিশীল বা প্রগতিবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সূচনা ঘটেছে।

আমাদের আলোচনায় সমাজবিকাশ সংক্রান্ত সর্বজনবিদিত ও বহুচর্চিত তাত্ত্বিক অনুসিদ্ধান্তের বিশ্লেষণকে স্থান দেওয়ার কারণ হল, ভারতীয় কৃষির অন্তর্নিহিত চরিত্রের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা ও তাকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা। ভারতীয় কৃষির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে প্রগতিবিরোধী ও প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য একটি মানদণ্ড সামনে রাখা প্রয়োজন। এই মানদণ্ড কাজে লাগিয়ে আমরা এই দুই উপাদানের ক্রিয়ায় ভারতীয় কৃষি নতুন যে-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারব। আমাদের বিচার্য হবে এইগুলি: ভারতীয় কৃষিতে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের কোনও বিশেষ স্তরে ভারতীয় কৃষি ধ্রুপদী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়মগুলি কতটা আত্মীকরণ করতে পেরেছে এবং কতটা ধনতান্ত্রিক প্রগতিশীলতা অর্জন করতে পেরেছে। এই বিশ্লেষণ ভারতীয় কৃষির সামাজিক গঠনের মধ্যে থাকা দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করবে। এর ভিত্তিতেই আমরা ভারতীয় কৃষির দীর্ঘকালীন স্থবিরতাকে বুঝব এবং বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলার চেষ্টায় ভারতীয় কৃষির ভূমিকা বিশ্লেষণ করব। সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে যে-সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকৃতি ও কারণগুলি আমরা জানতে চেষ্টা করব। পরিশেষে আমরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোয় ভারতীয় কৃষির অবস্থান নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

আগেই বলেছি, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উন্নত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিত থেকে ভারতীয় কৃষি-বিবর্তনের ইতিহাসকে বিচার করা দরকার। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু'-একটি উন্নত দেশে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তন-ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হবে।

তথ্যসূত্র

১. Lenin, V. I., (1964). *The Development of Capitalism in Russia, Collected Works,* vol-3, 4th Edition. Moscow: Progress Publishers.

২. Marx, K. Grundrisse. 1973. *Foundation of the Critique of Political Economy.* Penguin.

৩. Chakraborty, A. 1983. "The Social Formation of the Indus Society." *Economic and Political Weekly.* vol 18, no. 50. (Dec 10, 1983).

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপান, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চিন ও ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তন

একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

আজকের উন্নত ইউরোপের সমাজব্যবস্থা যে-বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার বিশ্লেষণ থাকবে এই অধ্যায়ে। তার পাশে প্রথমত রাখা হয়েছে আজকের এশিয়ার উন্নত দেশ জাপানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে। এশীয় দেশ চিন ও একটি পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, উন্নয়নের একটি স্তরে এসে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র নামক একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বিপ্লবের আগে অবধি বিশেষভাবে অনুন্নত থাকা কয়েকটি দেশকে এক চমকপ্রদ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় উন্নীত করেছিল। বিশ্বের চোখে তা ধরা পড়েছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে। ভারতের মতো অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশের পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া, কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া, কোনওটিকেই পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভারতের সমাজব্যবস্থা ও কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা, আমাদের পর্যবেক্ষণকে বাস্তবের আলোয় পরীক্ষা করা এবং এই ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করা।

ইউরোপের কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তন

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক: ইউরোপে দাস সমাজব্যবস্থা থেকে সামন্তব্যবস্থায় উত্তরণ

ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে দাসব্যবস্থা চালু ছিল। একসময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্র ও সমাজ তার গতি ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। দাসব্যবস্থার অবসান ঘটে, ভূমিদাস ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসে এই ভূমিদাস ব্যবস্থার হাত ধরে। দাসব্যবস্থায় কৃষক ছিল জমির মালিকের দাস। যে-জমি সে চাষ করছে, যে-উপকরণ ব্যবহার করছে, যে-ফসল সে নিজের শ্রমে তৈরি করছে, তার কোনও কিছুর ওপরই তার কোনও অধিকার ছিল না। শুধু তাই

নয়, তার নিজের শরীরের ওপরও তার কোনও অধিকার ছিল না। সে নিজেই মালিকের সম্পত্তি ছিল। তার খাওয়া থাকা বাঁচা-মরা সবই ছিল মালিকের হাতে। তাকে মালিক ইচ্ছেমতো কেনাবেচা বা হস্তান্তর করতে পারত। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেই দাসব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে এর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। দাসমালিকদের পক্ষে বিপুলসংখ্যক দাসের ভরণপোষণ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রথমত জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পায়, দ্বিতীয়ত, দাসদের ওপর বিরাট পরিশ্রমের বোঝা, তাদের ওপর সামাজিক অত্যাচার, তাদের স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগের সম্পূর্ণ অভাব ইত্যাদি ও তাদের ওপর দাসমালিকদের নানা প্রকার চাপ তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। দাস-বিদ্রোহ ও দাসদের পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণে এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে কৃষিকাজ চালানো, তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত আহরণ করে নিজেদের বিলাসবহুল জীবন কাটানো দুষ্কর ছিল। ফলত দাসব্যবস্থাকে চালু রাখাও তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ২৭ সালে রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। খ্রিস্টের জন্মের সময় থেকেই ১, ২ শতাব্দী জুড়ে ক্রীতদাস প্রথা থেকে ভূমিদাস প্রথায় উত্তরণ ঘটতে থাকে। যখনই কোনও নতুন বসতি গড়ে ওঠে, তখনই সেখানে নতুন তৈরি হওয়া কৃষি-জমিতে দাস-চাষিদের প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ওপর চাষের দায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে। এই চাষিরা চাষের অধিকার পেত তাদের মালিককে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল অথবা ফসলের নির্ধারিত অংশ ও অন্যান্য নানাপ্রকার কর দেওয়ার শর্তে। এর পরেও এই অধিকারের বিনিময়ে তাদের মালিকের নিজস্ব আওতাভুক্ত জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করতে হত, মালিকের হুকুমমাফিক নানা ধরনের বেগার শ্রম দিতে বাধ্য থাকত তারা। এরা এদের মোট শ্রম-সময়ের খানিকটা অংশ মালিকের হেফাজতে থাকা জমিতে বেগার খাটত, তার বিনিময়ে শ্রম-সময়ের বাকি অংশে নিজেদের হেফাজতে থাকা জমি চাষ করার অধিকার পেত, এবং সেটাও নির্দিষ্ট ভূমি খাজনার বিনিময়ে। অর্থাৎ খানিকটা জমি তারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চাষ করার অধিকার পেলেও তাদের ওপর বেগার শ্রম ও খানিকটা সময়ের জন্য মালিকের হুকুমের দাস হয়ে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকে। পূর্বতন ইউরোপে একটা দীর্ঘসময় অবধি এই বেগার শ্রমের ভূমিদাস প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। বেগার শ্রম ছাড়াও এই উৎপাদন-সম্পর্কের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, বেগার শ্রম সুনিশ্চিত করার উপায় হিসেবে চাষিদের অর্থনীতি-বহির্ভূত নানাপ্রকার চাপের মধ্যে রেখে দেওয়া হত। দ্বিতীয়ত, খাজনার বিনিময়ে চাষের জন্য চাষিকে যে-জমি ও উৎপাদনের উপকরণ দেওয়া হয় তার সঙ্গে চাষিকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখা হত। মালিকের দেওয়া জমিতে তার ভরণপোষণ চলত। এর বিনিময়ে মালিককে শুধু খাজনা দিতে হত তাই নয়, মালিকের আদেশে যে-কোনও কাজ করতে সে বাধ্য থাকত, ভূমি-খাজনা ছাড়াও নানা ধরনের কর দিতে হত। ইউরোপে চতুর্দশ শতক অবধি ভূমিদাস ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধান উৎপাদন-সম্পর্ক হিসেবে চালু থাকে। তা সত্ত্বেও চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ শতক অবধি বা তার পরেও দাসপ্রথার অবশেষ[১] টিকে ছিল। ভূমিদাস প্রথায় কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গেই হস্তশিল্প বা কারিগরির মতো অ-কৃষি উৎপাদনক্ষেত্রগুলি গিল্ড-মাস্টারদের অধীনে নির্ভরশীল হস্তশিল্পী ও কারিগরদের শ্রমে গঠিত হত। সামন্তপ্রভুরা, ইংলন্ডে যাদের বলা হত ম্যানরপ্রধান, ও ফ্রান্সে বলা হত সিনিওরপ্রধান তারাই একই সঙ্গে ভূমিদাস ও দাসদের ওপর কর্তৃত্ব করত ও এদের উদ্বৃত্ত শ্রম নানাভাবে শোষণ করত।

প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ: ইউরোপে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া

ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণটি ছিল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ, এই তিন শতাব্দীব্যাপী এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ভূমিদাস প্রথার শেষ পর্যায়ে এই পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের চাপানো নানা প্রকার কর ইত্যাদির সীমাহীন চাপের ফলে ভূমিদাসদের মধ্যে বিদ্রোহ বাড়ে, পালানোর প্রবণতা দেখা দেয়, সেইসঙ্গে জমির উর্বরতা শক্তিও কমে আসছিল, বাড়ছিল জনসংখ্যা। এইরকম নানা কারণে জমি থেকে উদ্বৃত্ত আহরণের মাত্রা কমতে থাকে। সামন্তপ্রভুদের পক্ষে ভূমিদাসদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর আদায় করা ও বেগার শ্রম করতে বাধ্য কষ্টকর হয়ে উঠছিল। বেগার শ্রমের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাটা সামন্তপ্রভু ও চাষিদের মধ্যেকার যে-সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তা ছিল সম্পূর্ণভাবে বাজার-বহির্ভূত কর্তৃত্ব ও বশ্যতার সম্পর্ক। চাষিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পালানোর প্রবণতা সামন্তপ্রভুদের এই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের জোর কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বতন ভূমিদাসরা এই কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে স্বাধীন ছোট চাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় বিদ্রোহী ভূমিদাসদের নিজস্ব উদ্যোগে, অথবা সামন্তপ্রভুদের উদ্যোগে জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন জায়গায় কৃষিকাজের বিস্তার ঘটে। এই নতুন তৈরি হওয়া কৃষিক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত চাষ শুরু হতে থাকে সামন্তপ্রভুকে নির্দিষ্ট শস্য-খাজনা দেওয়ার শর্তে। একই ভাবে বাধানিষেধ ও নিয়মকানুনের চাপে পিষ্ট কারিগররাও গিল্ডগুলির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। তারা নিজেদের হাতের ছোট যন্ত্রপাতি নিয়ে স্বাধীন উৎপাদকে পরিণত হতে থাকে, সামন্তপ্রভুকে নির্দিষ্ট কর দেওয়ার শর্ত মেনে গড়ে উঠতে থাকে স্বাধীন হস্তশিল্প ও কারিগরি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সামন্তপ্রভুদের সরাসরি কর্তৃত্বের বাইরে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন প্রকার খাজনা দেওয়ার শর্তে বিভিন্ন অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন বসতি।

ইউরোপে ভূমিদাসরা যেভাবে সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্বের বাইরে এসে ছোট কৃষি উৎপাদকে পরিণত হল, কারিগররাও যেভাবে গিল্ড মাস্টারের শাসনের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাধীন উৎপাদক হিসেবে দেখা দিল, উদ্ভব ঘটল ব্যক্তিগত ছোট চাষি ও ছোট স্বাধীন অ-কৃষি উৎপাদকের— এ সমস্তই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশেষ অবস্থা তৈরি না হলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হত না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত হিসেবে একদিকে যেমন মুক্ত শ্রমের প্রয়োজন, তেমনই উৎপাদনের জন্য জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণের স্বাধীন বাজার গড়ে ওঠা প্রয়োজন। আর তারই জন্য জমির সঙ্গে আবদ্ধ ভূমিদাসদের ভূমিহীন হওয়া প্রয়োজন। এরই প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ভূমিদাস সামন্তদায় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চাষিতে পরিণত হল ও গিল্ডের শাসনভুক্ত কারিগর স্বাধীন ছোট উৎপাদকে পরিণত হল। দ্বিতীয় ধাপে এই স্বাধীন ছোট চাষি তার সম্বল একখণ্ড জমি হারিয়ে পরিণত হল ভূমিহীন সর্বহারায়। ছোট চাষি ও ছোট উৎপাদকের সর্বহারায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি এক দীর্ঘ কষ্টকর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার উল্টোপিঠ হল আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া; এই প্রক্রিয়াটি পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যিক[২] পূর্বশর্ত।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকব্যাপী প্রায় তিনশো বছর আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পুঁজি সঞ্চয়ন-কেন্দ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা

দেয় পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে এর সংঘাত। এইসব দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এবং প্রায় একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুল্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাসেও। তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলিতে শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার নিয়মের সূচনা হলে একদিকে সস্তায় কাঁচামাল ও শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপকরণগুলির সহজ উৎসের সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, অন্যদিকে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য উপযুক্ত দামে বিক্রি করার মতো বিস্তীর্ণ ও ক্রমবর্ধমান বাজার খুঁজে নেওয়ার আবশ্যিকতা তীব্রতর হয়ে উঠল। এই আবশ্যিকতা থেকেই শিল্পোৎপাদনে এগিয়ে থাকা দেশগুলি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পিছিয়ে থাকা প্রাচ্যের দেশগুলিকে নিজেদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসে।

শিল্পোন্নত দেশে পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বাণিজ্যিক পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটলেও প্রাথমিকভাবে যতদিন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনে ছোট ও অতি ছোট চাষিদের প্রাধান্য থাকে ততদিন অবধি বণিকশ্রেণি কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি থেকে যে-মুনাফা পাওয়া যায় তার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আত্মসাৎ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট চাষিকে ফসল ওঠার আগে চাষের ন্যূনতম ব্যয় ও চাষি পরিবারের জীবনযাপনের ব্যয় বহনের জন্য মহাজন বা ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভর করতে হয়, ততদিন মহাজন ও ব্যবসায়ী সুদের হার অত্যন্ত বেশি রেখে বা ফসলের দামে সুবিধামতো পরিবর্তন করে তাদের মুনাফার হার সর্বোচ্চ রাখতে চেষ্টা করে। তারা এভাবে এমনকী ছোট উৎপাদকের উৎপাদিত উদ্বৃত্তের সম্পূর্ণ অংশ, তার জীবনধারণের মতো ন্যূনতম আয়ের একটি অংশকেও বাণিজ্যিক মুনাফায় পরিণত করে আত্মসাৎ করতে পারে। ছোট চাষি ক্রমশ আরও দুর্দশাগ্রস্ত ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৃষি উৎপাদন থেকে তার ন্যূনতম জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়লে কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে সে শহরাঞ্চলে সদ্য শুরু হওয়া শিল্পক্ষেত্রে মজুরি-ভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য পাড়ি দেয়, অর্থাৎ শ্রমের বাজারে শ্রমের জোগানদার হিসেবে উপস্থিত হয়। সেইসঙ্গে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলি নতুন গড়ে উঠতে থাকা শহরের বাজারগুলিতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে হাজির হয় পুঁজিনির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহারের জন্য। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি তুলনায় বড় উৎপাদকরা কৃষিপণ্যের দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ নেয়।

ইউরোপের ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে মার্কস দেখেছিলেন যে, সামন্ততন্ত্র থেকে উত্তরণের দু'টি বিকল্প প্রক্রিয়া ছিল।[৩] কোনও কোনও ক্ষেত্রে বণিক তার বাজার ও কাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। দাদনে ঋণ দিয়ে সমগ্র ছোট উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর সে তার এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এই পদ্ধতি পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছুটা পরিবর্তিত করতে সাহায্য করলেও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পুরোপুরি উচ্ছেদ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বরং পুরনো ব্যবস্থাকে জোরদার করে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক লাভের অনুকূল ব্যবস্থা কায়েম রাখে। যদিও এই ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদক কালক্রমে

তার উৎপাদনক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে মজুরির বিনিময়ে ভূমিহীন চাষি বা মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়, তবুও উৎপাদন-সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিভিন্ন লক্ষণ বজায় থাকার দরুন এই ব্যবস্থার নিজস্ব গতি কখনোই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অবসান ঘটায় না। অবস্থাবিশেষে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করতে পারে। এর বিপরীতে আছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ, মার্কসের মতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী পথ। সেখানে অপেক্ষাকৃত বড় চাষি বা বড় হস্তশিল্পী বা শিল্প-উৎপাদক নিজেরাই বণিক ও মহাজনদের চাপানো বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রাধান্য বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের অপেক্ষাকৃত বড় অংশ নিজেদের হাতে রাখে ও উৎপাদনের স্বার্থে বিনিয়োগ করে। এইভাবে তুলনামূলক বড় সংস্থাগুলির উদ্ভব ও বৃদ্ধিই হল উচ্ছেদ হওয়া ছোট উৎপাদকদের শ্রমের বাজারে যোগদানের অবস্থা তৈরি হওয়ার পূর্বশর্ত। কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে শিল্প-উৎপাদনেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলে। শহরে সদ্য শুরু হওয়া নতুন শিল্প উৎপাদনক্ষেত্রগুলি পুঁজি সঞ্চয়ন নিয়মের অধীনে আসার প্রাক্কালে ক্রমশ আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় উৎপাদনক্ষেত্রে পরিণত হতে থাকে। এই উৎপাদনক্ষেত্র ক্রমশ বাণিজ্যিক, মহাজনি বা অন্য কোনও উপায়ে সঞ্চিত আর্থিক পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উচ্ছিন্ন সর্বস্বান্ত শ্রমজীবী মানুষের শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে নতুনভাবে মজুরিশ্রম-নির্ভর উৎপাদনক্ষেত্র গড়ে তোলে। এইভাবে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরনো মালিকের স্ব-শ্রমনির্ভর কৃষি বা অ-কৃষি ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি অবলুপ্ত হয়। একদিকে ছোট কৃষক বা হস্তশিল্পী পূর্বতন জীবিকার উৎস থেকে উচ্ছেদ হয়ে সর্বস্বান্ত শ্রমিকে পরিণত হয়, অন্যদিকে এইসব উচ্ছেদ হওয়া কৃষক ও হস্তশিল্পীর শ্রম ও এদের হাতে থাকা জমি এবং অন্যান্য উপকরণগুলি বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। এগুলি কাজে লাগিয়ে গড়ে ওঠে নতুন উৎপাদন-ক্ষেত্র। এইভাবে কৃষি ও ছোট হস্তশিল্পগুলি আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, জমি ও অন্যান্য উপকরণের উৎস হিসেবে কাজ করে। কৃষি ও হস্তশিল্পে উৎপাদিত মূল্য বাণিজ্যিক ও মহাজনি ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বণিক, মহাজন ও বিনিয়োগে ইচ্ছুক উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং উচ্ছেদ হওয়া সর্বস্বান্ত শ্রমিকের শ্রমশক্তি, জমি ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে বিনিময়সূত্রে উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিণত হয়। পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার এই স্তরে একইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড় চাষি কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সঞ্চিত আর্থিক পুঁজির একটি অংশে নিজেদের অধিকার কায়েম করে ও তার সাহায্যে কৃষিতে আদিম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া চালু করে। ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া-কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি চালু হওয়ার পূর্বশর্ত হল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মূল পরিবর্তনের সূচনা— কৃষি থেকে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্তি, ছোট চাষি-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির উদ্ভব, ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ।

ইংল্যান্ডে এনক্লোসার আন্দোলন এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে অবধি ছোট চাষির সঙ্গে তার জমির, ও ছোট শিল্প-উৎপাদকের সঙ্গে তার ব্যবহৃত ছোট যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সংযুক্তি ছিল। তারা যে-গোচারণ ভূমি ব্যবহার করত তা ছিল গ্রামের সকলের ব্যবহারের সাধারণ সম্পত্তি। সেগুলির ওপর ছিল সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত অধিকার। নতুন এনক্লোসার আইন প্রবর্তন করে ব্যবসায়ী

শ্রেণি ম্যানরদের সহায়তায় জমিগুলিকে নানা অংশে ভাগ করে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় নিয়ে আসে। সম্পন্ন উল ব্যবসায়ীরা সেই জমি কিনে ভেড়া চরানোর ব্যবস্থা করে। উলের ব্যবসা প্রসারিত হলে ভেড়া পালন ও উল তৈরি একটি বাণিজ্যিক কাজ হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পূর্বতন ছোট ছোট মেষপালক চাষিরা তাদের গোচারণ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শ্রমের বাজারে স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে উপস্থিত হয়। জমি ও অন্যান্য উপকরণগুলির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে। কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল। নতুন মালিকদের হাতে থাকা জমি খাজনার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে মজুরি-শ্রমিক নির্ভর লাভজনক উৎপাদন-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পূর্বতন ছোট চাষি ও ছোট হস্তশিল্পী মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়। ব্যবসায়ী ও ম্যানরপ্রভুদের হাতে জমে থাকা আর্থিক পুঁজি এইভাবে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিবর্তিত হতে থাকলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থায় কয়েকটা নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। যেমন, প্রথমত, শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের মুক্ত বাজার গড়ে ওঠে ও মজুরির বিনিময়ে কেনা শ্রমশক্তি ও বাজার-নির্ধারিত দামে কেনা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সহযোগে মুনাফার জন্য বড় মাপে উৎপাদন হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ক্রমান্বয়ে জমে ওঠা মুনাফার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ও পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটে। উৎপাদন-ব্যবস্থা এইভাবে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী চরিত্র গ্রহণ করার পর আরও একটি নিয়ম চালু হয়। তা হল: উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার পর প্রাপ্ত মুনাফার হার সর্বাধিক করার প্রয়োজনে উৎপাদনকে আরও পুঁজিঘন করে তোলা। উল্টোদিকে যেসব উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমের একক-পিছু পুঁজির পরিমাণ তুলনায় বেশি দরকার, সেইসব ক্ষেত্রে বাজার থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার বেশি হওয়ার কারণে এগুলিকেই বিনিয়োগক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার এই প্রবণতার কারণে ক্রমশ বড় পুঁজিঘন বা প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের তুলনায় কৃষির ওপর কম গুরুত্ব পড়তে থাকে। কৃষিকে তখন ক্রমশ শিল্পোন্নয়নের সহযোগী কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহের উৎস হিসেবে দেখা হয়। অবশ্য একই সঙ্গে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ জনসমষ্টির অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তখন স্বীকৃতি পায়। কৃষি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তখন ব্যবহৃত হয় শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে যুক্ত মানুষের আয় যদি যথেষ্ট না বাড়ে তবে শিল্পজাত পণ্যের বিক্রি অব্যাহত রাখা দুষ্কর। যতদিন পর্যন্ত না বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ততদিন দেশের অভ্যন্তরে শিল্প ও কৃষির মধ্যে উন্নয়নের মাত্রা এবং ধরনে ভারসাম্য থাকা জরুরি। এই কারণে উন্নয়নের ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিল্পে অগ্রণী দেশগুলি শিল্পে পিছিয়ে পড়া কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে একদিকে যেমন তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের উৎস হিসেবে দেখতে চায়, তেমনই ওই দেশগুলি তাদের চোখে হয়ে ওঠে নিজেদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রির অবাধ বাজার। এই তাগিদে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন তখন কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, প্রয়োজন পড়ে এই দেশগুলিকে রাজনৈতিক ভাবে অধীনস্থ রাখার। যেমনটা বহুদিন অবধি দেখা গেছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন দেশে। এই দেশগুলি কৃষি উৎপাদনে বেশি গুরুত্ব দেয় ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য আমদানির ওপর নির্ভর করে। ক্রমে বহির্বাণিজ্য বিস্তার পায়। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি তখন শিল্পে পিছিয়ে-পড়া কৃষিপ্রধান দেশ থেকে সস্তায় প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে শিল্পে অতিরিক্ত মূল্য সঞ্চয়ন ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া চালু রাখে। কিন্তু এই সামগ্রীগুলি পেতে গেলে বিনিময়ে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য জোগান দিতে হয়।

এই অবস্থায় শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্যের জোগান ও সারা পৃথিবীতে সেই পণ্যের বিক্রি সুনিশ্চিত রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্বাধিক মাত্রায় মুনাফা তোলা এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে সেটা আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

এই পরিবর্তনের গোটা প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সমর্থন ছাড়া গড়ে উঠতে পারেনি। পুরনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণি সহজে এই পরিবর্তনের প্রবণতাকে মেনে নেয়নি। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থায় উৎসাহীদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল। এই সমগ্র ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে। তাই এই প্রক্রিয়ার সূচনাপর্বের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা জরুরি।

আমরা দেখেছি, ইংলন্ডে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সূচনা ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে।[৪] জমিবন্টনের নিরিখে দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন সামন্তপ্রভুর নীচে ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ক্ষমতার বিপুল সংখ্যক ব্যারন, ডিউক ইত্যাদি মানুষ। সমস্ত জমিদারি তাদের মধ্যেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্যারন, ডিউক প্রভৃতি নিম্নতর ক্ষমতার অধিকারী সামন্ত্রপ্রভুদের অধিকৃত নির্দিষ্ট জমিগুলো অসংখ্য ছোট ছোট কৃষি-জমিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে চাষবাস করত অসংখ্য ছোট চাষি। ছোট আয়তনে এরকম চাষের পাশাপাশি ছিল কোথাও কোথাও মজুরি-শ্রমিক দিয়ে চাষ করা বড় সিনিওরাল এস্টেট। ব্যারন, ডিউক প্রভৃতির সংখ্যা যেমন ছিল উচ্চতর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার ভিত্তি ও আয়ের উৎস, তেমনই ব্যারন-ডিউকদের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি ও আয়ের উৎস ছিল অসংখ্য ছোট উৎপাদক। ইংলন্ডে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে যে-ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল, চতুর্দশ শতকের শেষ থেকেই তার অবসান ঘটতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস স্বাধীন চাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরাই নিজেদের চাষের জমিতে তৈরি করে নিত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ছিল, তখন জমির ওপর এদের অধিকারের প্রকৃতি নির্ভর করত সামন্তপ্রভুর ওপর। তারা সামন্তপ্রভুকে নানা প্রকার খাজনা ও ভূমিকর দিত। এছাড়া একটি মজুরি-শ্রমিক শ্রেণিরও অস্তিত্ব ছিল। এই মজুরি-শ্রমিকদের একটি অংশ ছিল আসলে ছোট চাষি, যারা নিজেদের অধিকারের জমি চাষ করার পরে অবসর সময়ে বড় এস্টেটে মজুরি-শ্রমিকের কাজ করত। মজুরি-শ্রমিকদের আর-একটি খুব ছোট অংশ ছিল, যারা বিশেষ ধরনের স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক, তারা বড় এস্টেটে কাজ করত। কিন্তু এরাও পুরোপুরি জমির বন্ধনমুক্ত স্বাধীন শ্রমিক ছিল না, কারণ এদের চাষের জন্য সাধারণত চার-পাঁচ একর জমি দেওয়া থাকত, বসবাসের জন্য থাকত একটি করে কুঁড়েঘর। তাছাড়া নির্দিষ্ট জমিদারি এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারের যে-বিশাল গোচারণ ভূমি ছিল, সেখানেও এরা গোচারণ করতে পারত।[৫]

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা সূচিত হবার জন্য যেসব পূর্বশর্তের উল্লেখ করা হল, সেগুলো মেটানোর প্রক্রিয়া নিরঙ্কুশ রাখতে অনুকূল আইনি সমর্থন থাকা জরুরি। আর সে জন্য দরকার উপযুক্ত পুলিশি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কাজেই সামন্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থা পত্তন করার আবশ্যিকতা দেখা দিল। নতুন একগুচ্ছ আইনি-পুলিশি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অবশ্যই বাণিজ্যে ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহী শ্রেণিটির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর। ইংল্যান্ডের মতো

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন এক শ্রেণির প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা বর্তায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকূলে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, ফলে আইন ও শাসন ব্যবস্থাও পুঁজিবাদী বিকাশের অনুকূল হয়ে ওঠে।

দু'ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর মধ্যে যুদ্ধের আকারে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল। ইতিমধ্যেই অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে উৎপাদন-ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছিল— ছোট জমিতে জমির বন্ধন থেকে আধা-মুক্ত আধা-স্বাধীন চাষির উদ্ভব, মজুরি-শ্রমের সূচনা ও লাভজনক বিনিয়োগে উৎসাহী একদল মালিকের হাতে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির বিপুল সঞ্চয়ন ইত্যাদি। এবার রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নতুন শাসকশ্রেণিটি নিজেদের অধিকার নিরঙ্কুশ রাখতে চেয়ে ক্ষমতার জোরে প্রথমে নিম্নতর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারভোগী শ্রেণিটিকে তাদের পুরনো কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। পুরনো অভিজাত শ্রেণিটি এবার নতুন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিভূ রাজা ও পার্লামেন্টের সঙ্গে লড়াইয়ের মুখে পড়ে এবং তার জেরে অসংখ্য ছোট চাষিকে— যারা ছিল এদের জমিদারি ক্ষমতার ও আয়ের উৎস, তাদের অধিকৃত ছোট চাষ-ব্যবস্থা থেকে উচ্ছেদ করে। গ্রামবাসীদের সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য যে-গোচারণ ভূমি ছিল, কোনও অঞ্চলের চাষি ও মজুরি-শ্রমিকরা যা যৌথভাবে ব্যবহার করত, সেখান থেকে বলপূর্বক তাদের উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সাধারণ গোচারণের ভূমিগুলি থেকে ছোট চাষিদের উচ্ছেদ করে এই জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এইসব জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার আইনি স্বীকৃতি পায় এবং সেখানে শুরু হয় বাণিজ্যিক পণ্যের চাষ। উলের ব্যবসা ও উলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়মাপে পুঁজিবাদী বিনিয়োগে উৎসাহী কৃষকদের মধ্যেও নতুন আগ্রহ জাগে। তারা শস্য উৎপাদনের জমিগুলিকে গোচারণ ভূমিতে পরিবর্তিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, সর্বোচ্চ মুনাফার আশায় উল ইত্যাদি বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। ষোড়শ শতকে এই উচ্ছেদের প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে জোরদার হয়ে উঠেছিল। এইসময়ে ক্যাথলিক চার্চ তার অধীনস্থ বিশাল জমিতে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ভোগ করত। সংস্কার আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক চার্চের অধীন এই বিশাল জমিতে যেসব ছোট চাষিরা চাষ করত তাদের উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণ করা হল। বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নামমাত্র দামে বিভিন্ন লোকের কাছে এই জমি বিক্রি করা হয়েছিল। ১৬৮৮-৮৯ সালে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্টদের নেতৃত্বে যে-'গৌরবময় বিপ্লব' সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল ধর্মীয় যুদ্ধের আবরণে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক লড়াই। এখানে ক্যাথলিকদের প্রতিপক্ষ ছিল নতুন পুঁজিবাদী বিনিয়োগে উৎসাহী মানুষেরা, পুঁজিবাদী ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণার সমর্থকরা, যারা নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করত। রাষ্ট্রীয় জমি, যৌথভাবে সাধারণ্যে ব্যবহারের ভূমি ও চার্চের জমি ব্যাপকভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে এইসব জমির ওপর নির্ভরশীল ছোট উৎপাদকদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে জন্ম নিল জমির বন্ধন থেকে মুক্ত এক বিশাল সর্বহারা শ্রেণি। এর পাশাপাশি ছোট হস্তশিল্পগুলিতেও একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছোট শিল্পগুলি গিল্ডের শাসন মুক্ত হয়ে ইতিমধ্যেই স্বাধীন উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় এরা এদের উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উন্মূল হয়ে স্বাধীন সর্বহারায় পরিণত হয়। একই সঙ্গে জমি ও অন্যান্য উপকরণগুলি বাজারে বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি পূরিত হল। 'গৌরবময়

বিপ্লব'[৬] ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে (১৬৮৮-৮৯) পুরনো সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের জায়গায় বুর্জোয়া শোষকদের ক্ষমতাসীন করেছিল, যা অবাধে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করল। এই ভাবে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইংল্যান্ডে কৃষি এবং শিল্পে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্র থেকে উন্মূল হয়ে পূর্বতন উৎপাদকরা নতুন গড়ে ওঠা মজুরি-শ্রমিকনির্ভর বড় বড় পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-খামার ও বিশাল শ্রমিকবাহিনীর শ্রমনির্ভর বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে নিযুক্ত হল। অনুরূপ বিপ্লব জার্মানি ও ফ্রান্সেও ঘটেছিল যথাক্রমে ১৮৪০ ও ১৭৯৯ সালে। এই প্রক্রিয়া সারা ইউরোপে এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবাধ বিকাশ সম্ভব করে তুলল।

জাপানে কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তন

ষোড়শ শতাব্দীর আগে অবধি জাপানে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রায়িত সামন্ত শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জাপানে প্রথমে হায়দ্যোশি ও পরে টকুগাওয়া শগানেটের অধীনে কেন্দ্রীভূত সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে কৃষির মালিকানা ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে। সমস্ত কৃষিজমির এক-চতুর্থাংশ আসে টকুগাওয়ার নিজস্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার অধীনে, বাকি জমি ৩০০ জন সামন্তপ্রভু, যাদের ডায়ামো বলে অভিহিত করা হত, সরাসরি তাদের আওতায় আসে। আঞ্চলিক শাসনভার কেন্দ্রীভূত ছিল এইসব সামন্তপ্রভুর হাতে। তারা সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। টকুগাওয়া শাসনকর্তা সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা জমিদাররা তাদের নিজস্ব অঞ্চলে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করত, কিন্তু এদের ওপর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা জারি রাখত শগানেট শাসনকর্তারা। ডায়ামোরা বছরে একবার কয়েক মাস ধরে টোকিয়োতে শগানেটের বাসভূমিতে কাটাতে বাধ্য থাকত। নিজের এলাকায় ফেরার সময় তাদের সৈন্যসামন্তদের একটি অংশকে (সামুরাই) সরাসরি শগানেটের শাসনাধীন অঞ্চলে রেখে আসতে হত। সামুরাইরা ছিল সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে এলেও কালক্রমে এদের আবাস হয়ে ওঠে জমিদারদের বাসস্থান দুর্গ-নগরীগুলি। সেখানে তারা তাদের পরিবার ও বংশানুক্রমিক ভৃত্যদের নিয়ে বার্ষিক ভাতার বিনিময়ে বাস করত। সামুরাইদের মধ্যেও ক্ষমতার তফাত ছিল— আর্থিক ও সামরিক, উভয়ত। ফলে জমিদারদের অঞ্চলগুলিতে তারা মূল শাসন কর্তা হিসেবে কাজ করত, তবে অধিকাংশ সামুরাই ছিল অতিসাধারণ সৈনিক মাত্র। টকুগাওয়া রাজত্বকালে দীর্ঘসময় কোনও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেনি, শান্তির পরিবেশ বজায় ছিল। ফলে চিরাচরিত যোদ্ধা হিসেবে সামুরাইদের কোনও কাজ ছিল না। ক্রমশ তারা কর্মহীন পরজীবীতে পরিণত হয়ে জাপানি সমাজের ওপর একটা বিরাট বোঝা হয়ে ওঠে। সামুরাইদের সংখ্যা ছিল বিশাল, জনসংখ্যার প্রায় শতকরা সাত ভাগ। ফলে এই বিপুল সংখ্যক পরজীবীর— এবং তাদের পরিবারবর্গ ও বংশানুক্রমিক ভৃত্যাদির ভরণপোষণ অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ ফেলতে থাকল।

অন্যান্য কম সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে ছিল চাষি সম্প্রদায়। টকুগাওয়া রাজত্বের শেষদিকে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ ছিল চাষি। সামন্তযুগীয় ইউরোপের ভূমিদাসদের মতো নানারকম বিধিনিষেধে আবদ্ধ ছিল তারা। জমি ছেড়ে শহরে চলে যাওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। সবক্ষেত্রেই কৃষক পরিবারগুলি

জমির সঙ্গে আইনত যুক্ত ছিল। নিজ আয়ত্তাধীন জমির ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হত ভূমি-কর। কৃষক পরিবারকে জমির করদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থা চালু হয়। পরিবার-পিছু জমির স্বত্ব অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় চাষির জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার ছিল না, অর্থাৎ জমির ওপর চাষির পুরোপুরি মালিকানা স্বত্ব ছিল না। চাষি ইচ্ছে করলে তার জমি বিক্রি বা দান করতে পারত না। সে জন্য নির্দিষ্ট জমির ওপর কর দিতে সে বাধ্য থাকত। কৃষকের পছন্দের ফসল ফলানোর কোনও অধিকার ছিল না। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। এখানে প্রকৃত উৎপাদক অর্থাৎ কৃষক, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে যুক্ত, যদিও সে জমির মালিক নয়। তাকে জমির ওপর রায়তি স্বত্ব পাওয়ার জন্য জমিদারকে বা শাসনকর্তাকে কর দিতে হত। টকুগাওয়া আইন মারফত কৃষককে জমির সঙ্গে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থাকে নিয়মানুবর্তী ও জোরদার করা হয়েছিল। চাষবাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চাষির অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করত খাদ্যে আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতার চাহিদা। গ্রামের স্থানীয় কৃষকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা হত ওপর থেকে চাপানো টকুগাওয়া আইন মারফত। শুধু তাই নয়, কৃষকরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য যে-স্থানীয় কৃষক সম্মেলন গড়ে তুলেছিল, তার ওপরেও চাপানো হয়েছিল নিয়মকানুন। এক-একটি গ্রাম কৃষকদের এই সম্মিলিত সংগঠনের একক হিসেবে কাজ করত। গ্রামের সব সদস্যের ওপর চাপানো কর একত্রে দেওয়ার দায় বর্তাত এই গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলির ওপর, সেইসঙ্গে ছিল সমগ্র গ্রামের চাষবাস যথাযথভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব। অনেক সময়েই কৃষকরা চাষের পাশাপাশি ছোট ছোট পরিবারভিত্তিক হস্তশিল্প, বিশেষ করে তাঁতশিল্পে যুক্ত থাকত। সামন্তশ্রেণির বাসস্থান দুর্গ-শহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পও গড়ে উঠেছিল।

টকুগাওয়া শাসক ও স্থানীয় জমিদারদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কৃষকরা। কৃষকদের দেয় বাৎসরিক ভূমিকরই ছিল সবথেকে বড় আয়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হারে ভূমিকর নেওয়া হত, তবে সচরাচর তার পরিমাণ ছিল ধানজমির মোট উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ অংশ। চাষিদের ওপর চাপানো এই বিরাট করের বোঝা, সেইসঙ্গে অন্যান্য নানারকম কর ও বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমের বাধ্যবাধকতা তদের ক্রমশ নিঃস্ব চাষিতে পরিণত করছিল। এই নিঃস্ব চাষিরা শুধু নয়, স্থানীয় মিলিটারি জমিদাররাও বিশাল খরচের বোঝা বহন করতে না পেরে প্রায়ই ঋণের ওপর নির্ভর করত।

কৃষক সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-অর্থনীতির পাশাপাশি অন্যদিকে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটছিল। স্থানীয় জমিদারদের আবাস দুর্গ-শহরগুলিতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান অব্যাহত রাখার সূত্রে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। টকুগাওয়া সরকারের চাপানো নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বাণিজ্য প্রসারিত হয়। এই বণিক শ্রেণিটি স্থানীয় জমিদার শ্রেণিটিকে ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দিতে থাকে ও ক্রমশ বাণিজ্যিক পুঁজি ও মহাজনি পুঁজি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তারা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালকের অবস্থানে চলে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টকুগাওয়া রাজত্বের অবসান ঘটে। তার পিছনে নানাপ্রকার কারণ ছিল। অনেকে মনে করেন বহির্জগতের সঙ্গে জাপানের দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতার অবসান, ইউরোপীয় দেশগুলির ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা ও প্রসার এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কিন্তু জাপানের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা লক্ষ করলে দেখা যায়, এই পরিবর্তনের পিছনে বাইরে থেকে ঘটা

বিষয়গুলি ছাড়াও অন্তর্দেশীয় অর্থনৈতিক ঘটনাবলির গুরুত্ব কম ছিল না। এই ব্যবস্থার মধ্য থেকেই সামন্ত-সম্পর্কে পরিবর্তন আসতে থাকে ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিশেষ ভূমিকা ছিল। টকুগাওয়া শাসনকালেই কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হয়।

আগেই বলেছি, টকুগাওয়া শাসনব্যবস্থায় ভূমিকরের হার ছিল অত্যন্ত বেশি, এটিই ছিল শাসকশ্রেণির আয়ের বড় উৎস। বিভিন্ন সময়ে কর চাপিয়ে মাধ্যমে কৃষি উদ্বৃত্ত আহরণের মাত্রা বাড়ানো হত। এই সময়ে চাষিরা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষি বা ব্যবসায়ীর কাছে ঋণ করতে বাধ্য হত। চড়া সুদের কারণে ঋণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকত, চাষির সামনে তখন ঋণ ও অতিরিক্ত জমা সুদের দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জমি বন্ধক রাখা ছাড়া উপায় থাকত না। এইভাবে টকুগাওয়া ব্যবস্থার মধ্যেই অতিরিক্ত খাজনার চাপে পিষ্ট চাষির ঋণগ্রস্ততা ধীরে ধীরে জমি-বন্ধকি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। জমি-বন্ধকি আইনত সিদ্ধ হওয়ার পর জমির সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদক চাষির বিচ্ছেদ ঘটার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে চাষির হাত থেকে জমি যেত ঋণদাতা বড় চাষি বা পণ্য ব্যবসায়ীর হাতে। ঋণগ্রস্ত চাষিরা ক্রমশ ভাড়াটে চাষি, আবদ্ধ ঠিকা-চাষি বা ভাগ-চাষিতে পরিণত হচ্ছিল। এর পাশাপাশি সম্পন্ন চাষি ও ব্যবসায়ীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে সেই জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়ায় অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে। নতুন চাষের আওতায় আনা জমির উন্নতির জন্য এরা নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে, সেখানে সেচের ব্যবস্থা করে। এরা তখন হয়ে ওঠে এইসব জমির মালিক। এইসব জমি ও জঙ্গলের ফলমূল এবং অন্যান্য সামগ্রী আহরণ করে যারা আগে বেঁচে থাকত, তারা নতুন চাষের আওতায় আসা এইসব জমিতে ভাড়াটে চাষি, ঠিকা চাষি বা ভাগ-চাষিতে পরিণত হল। অর্থাৎ কৃষিতে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের প্রভাব খর্ব হলেও সেইসময়ে ছোট ছোট জোতে মহাজনি পুঁজির দাপট বাড়ে, ছোট চাষিরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে ভাগচাষের প্রাধান্য বাড়ে। জাপানের ভূমিব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে প্রেক্ষাপটে রেখে এল মেজি সংস্কার।[৭]

১৮৬৮ সালে মেজি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই শাসনব্যবস্থা জাপানে সামরিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক শাসনের গোড়া পত্তন করে। পুরনো শাসকদের সঙ্গে হিংসাত্মক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শাসনব্যবস্থার এই পরিবর্তন সূচিত হয়। মেজি শাসন জাপানের কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল। পুরনো সামরিক সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর উচ্ছেদ ঘটল, নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা হল সমস্ত ক্ষেত্রে। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের অনুকূল নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হল। সামন্ত-ব্যবস্থার অবশেষ হিসেবে যেটুকু টিকে ছিল— যেমন যাতায়াত এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর চাপানো বাধানিষেধ, সে সমস্তই তুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর সমস্ত বাধানিষেধ তুলে দিয়ে নতুন বিস্তৃত আইন প্রবর্তন করা হল। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমানভাবে যে-কোনও কাজ গ্রহণ করার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেনা-বেচার আইনসম্মত অধিকার পেল।

সারণি ২.১ ধান ও গমের বাৎসরিক গড় উৎপাদন (হাজার ককু)

শস্য	১৮৭৯–৮৩	১৮৮৯–৯৩	১৮৯৯–০৩	১৯০৩–১৩	১৮৮৩–১৯১৩ (% বৃদ্ধি)
ধান	৩০৮৭৪	৩৮৫৪৯	৪২২৬৮	৫০২৪২	৬৩%
গম	২২১৯	৩১০২	৩৭০০	৪৯০১	১১৬%

১ ককু = ১৮০.৪১ কিলোগ্রাম

Source: Allen, G. C. (1963). *A Short Economic History of Modern* Japan. London: Unwin University Books. 6^{th} impression

নিরপেক্ষ ভূমি-খাজনা ও মহাজনি শোষণের প্রচণ্ড দাপট থেকে কৃষকের মুক্ত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল এর পর। কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী-মহাজনদের প্রভাব ও তাদের মারফত কৃষি-উদ্বৃত্তের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য কৃষিপণ্যের সংগঠিত বাজার, সংগঠিত ঋণের বাজার-ব্যবস্থা ও এসবের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। কিন্তু কৃষিতে এইসব আধুনিক চাষের পদ্ধতির সূত্রপাতের পরও জাপানে জোতের মাপ ছিল খুবই ছোট। হোক্কাইডো ব্যতীত গোটা জাপানেই পাহাড়ি উঁচু-নিচু জমি থাকার দরুন ধানচাষ সেচের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত বেশি শ্রমসাধ্য। তাই উত্তর জাপানের হোক্কাইডো ছাড়া সর্বত্র ধান চাষের জোতগুলো ছিল ছোট। আরও একটি কারণ ছিল এর। শ্রম ছিল সহজলভ্য, চাষযোগ্য জমি ছিল দুষ্প্রাপ্য। ১৯১০ সালে জাপানের কৃষিতে মোট অঞ্চলের শতকরা ১৫ ভাগেরও কম ছিল কর্ষণযোগ্য জমি। ফলে জাপানের চাষিরা ছোট জোতে নিবিড় চাষে অভ্যস্ত ছিল। ১৯১০ সালে শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি জমিতে জোতের মাপ ছিল ০.৫ চো (১ চো = ১ হেক্টর প্রায়) এবং শতকরা ৬৬ ভাগ জমিতে জোতের মাপ ছিল ১ চো বা তার চেয়েও কম। মেজি যুগে উত্তর জাপানের হোক্কাইডোতে জমিকে চাষের আওতায় আনা হয় ও এই অঞ্চলে বড় জোতে চাষ হতে থাকে। হোক্কাইডো বাদ দিলে তখনকার জাপানে ক্ষুদ্র জোতে চাষই সেখানকার কৃষির বৈশিষ্ট্য ছিল এমনটা ধরা যেতে পারে।[৮]

মেজি সংস্কারের ফলে ভূমিব্যবস্থায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এই সংস্কার যে-ভূমিব্যবস্থার জন্ম দেয় তার দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এক, ব্যাপক ঠিকা-বর্গা ব্যবস্থা, যা নির্দিষ্ট আর্থিক খাজনা অথবা পণ্য খাজনার ওপর নির্ভরশীল। মেজি ব্যবস্থা শুরুর সময়ে ঠিকা- বা বর্গা-চাষের আওতায় জমি ছিল মোট কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ২০ ভাগ। জমি হস্তান্তর ও কেনা-বেচার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় বর্গা-চাষ আরও বিস্তৃত হয়। ১৮৮৭ সালে এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪০, ১৯১০ সালে হয় শতকরা ৪৫। এই সময় মোট কৃষকের শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল ভাগ-চাষি, শতকরা ৪০ ভাগ ছিল ছোট চাষি, যারা নিজেদের জমিতে চাষ করত। বাকি ২৭ ভাগ ছিল আংশিক ভাগ-চাষি ও আংশিক ছোট নিজ জমির চাষি।[৯] ফলে ভাগ-চাষ ও ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি, এই দুই ধরনের ব্যবস্থার ব্যাপক প্রাধান্য ছিল জাপানের ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এর পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে সমস্ত জমির মালিকদের শতকরা ৭৪.১ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র জোতের মালিক, যাদের জোতের গড় পরিমাণ ছিল ১ চো এবং সমস্ত জমির শতকরা ৩১.৮ ভাগ ছিল এদের মালিকানায়। অন্যদিকে শতকরা ৭.৪ ভাগ মালিকের জোতের আয়তন ছিল ৩ চো-র ওপর, এরা ছিল মোট জমির শতকরা ৪৩.৪৫ ভাগের মালিক। ব্যবহারিক জোতের ক্ষেত্রে ৬৫.৬ ভাগ চাষি ১ চো-র কম আয়তনের জোত চাষ করত ও এদের চাষের আওতায় ছিল শতকরা ৩০.৭ ভাগ জমি। অপরদিকে শতকরা ৯.৬ ভাগ চাষি ৩ চো-র থেকে

বড় মাপের জোত চাষ করত, এদের আওতায় ছিল শতকরা ৩৩.৬ ভাগ জমি। মোট জমির শতকরা ৪৬ ভাগ ছিল নির্দিষ্ট খাজনার বর্গা-চাষের অধীন।[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান সহ অক্ষশক্তির দেশগুলি পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিশ্ব-রাজনীতিতে আমেরিকা একটি শক্তিশালী ক্ষমতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেয়। ১৯৪৬ সালে আমেরিকান অকুপেশন অথরিটি সরাসরি এই পুনর্গঠনের দায়িত্বে ছিল।

১৯৪৬ সালের অকুপেশন অথরিটির সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ ম্যাকআর্থারের নির্দেশে জাপানে ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম নেওয়া হয়। এই ভূমিসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিকভাবে মাঝারি মাপের জোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষব্যবস্থা চালু করা। ভাবা হয়েছিল, এর মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথে বাধাগুলি দূর করা গেলে কৃষিতে সর্বাত্মক উন্নয়নের পথ পরিষ্কার হবে। ফলে ভূমিসংস্কারের আশু উদ্দেশ্য ছিল দু'টি: প্রথমত, ঠিকা-চাষের বা বর্গা-চাষের অবসান ঘটানো। দ্বিতীয়ত, মাঝারি মাপের জোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দক্ষ চাষব্যবস্থার প্রতিকূল সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বাধার অবশেষ নির্মূল করা। ভূমিসংস্কার[১১] কর্মসূচির প্রধান দিকগুলি ছিল:

ক) মালিকানাভিত্তিক চাষব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা: এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল অনুপস্থিত জমিদারদের হাত থেকে জমি নিয়ে ভাগ-চাষিদের সম্মতিক্রমে তাদের হাতেই তার মালিকানা অর্পণ নিশ্চিত করা। অবশ্য গ্রামে উপস্থিত জমিদারদের ৫ চো পর্যন্ত জমি ভাগ-চাষে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, পরবর্তীতে গ্রামে উপস্থিত জমিদারদের ক্ষেত্রে ভাগ-চাষে জমি রাখার সীমা ৫ চো থেকে কমিয়ে ১ চো-তে নিয়ে আসা হয়।

সরকার প্রথমে ভাগচাষিদের সম্মতি ছাড়াই অনুপস্থিত জমিদারদের সমস্ত জমি কিনে নিয়েছিল। বাৎসরিক শতকরা ৩.৬৫ হার সুদে জোত-জমি বন্ডের মাধ্যমে বাইশ বছরে শোধ দেওয়ার শর্তে মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। এই জমি বিক্রি করা হয় ভাগ-চাষিদের কাছে, বাৎসরিক ৩.২ হার সুদ সমেত সেই জমির দাম চব্বিশ বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে, এই শর্তে।

ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার রীতি অবলুপ্ত করে সবক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে খাজনা দেওয়ার রীতি চালু করা হয়।

খ) জোতের মাপের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে, ঊর্ধ্বসীমার ওপরে থাকা জমি কিনে নিয়ে এবং তা বিক্রির মারফত পুনর্বণ্টন করে মাঝারি মাপের জোত তৈরি করা: জোতের পরিমাপের ঊর্ধ্বসীমা ৩ চো (৩ হেক্টর)-র মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়।

জমির পুনর্বণ্টন বিষয়ে যে-আইন চালু হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন কৃষিজোত তৈরি করা যা খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত খুব ছোট (৩ ট্যানের কম মাপের: ১০ ট্যান = ১ চো) জোতের মালিক ও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের ভূমি পুনর্বণ্টন আইনের বাইরে রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত আইন করা হয় যে, জমি হস্তান্তরের পর একজন জোতের মালিকের হাতে তার নিজের চাষ করা বা ভাড়া খাটানো জমির মোট পরিমাণ সাধারণ ক্ষেত্রে ৩ চো-র বেশি হতে পারবে না।

জাপানে ভূমিসংস্কার আইনের অত্যন্ত দক্ষ ও নিখুঁত প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল। ভূমিসংস্কারের ফলে ১৯৪১ সাল থেকে '৫৫ সালের মধ্যে ঠিকা- ও বর্গা-চাষের আওতায় জমির অনুপাত শতকরা ৪৬ ভাগ থেকে

শতকরা ১০ ভাগে নেমে আসে। জোতের আয়তনেও পরিবর্তন দেখা যায়। ১ চো-র চেয়ে ছোট আকারের জোতের অধীন জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালে শতকরা ৬৫.৩ ভাগ থেকে ১৯৫৪ সালে শতকরা ৭২.৩ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ওই সময়ের মধ্যে ৩ চো-র বেশি আয়তনের জোতের আওতায় জমির অনুপাত শতকরা ৩.৫ থেকে শতকরা ২.৩ ভাগে নেমে আসে। এর সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনের পদ্ধতিতে গুণগত উন্নতি ঘটে। ভাগ- বা ঠিকা-চাষিদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জমি চাষ করতে পারার অধিকার সুনিশ্চিত হয়। খাজনার পরিমাণ কমে। সবমিলিয়ে এই পরিস্থিতি তাদের চাষে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী করে তোলে। পুরনো ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসান ঘটলে ও বড় ভূস্বামীদের দাপট কমে গেলে, মাঝারি চাষি স্বাভাবিকভাবেই জমিতে সার, বীজ ও সেচের ব্যবহারে উৎসাহী হয়।

জাপানে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষি-উৎপাদনে ও কৃষি-আয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ১৯৩৩-৩৫ সালকে ভিত্তি হিসেবে ধরে কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৯৫৫ সালে ১২০ থেকে ১৯৬০ সালে ১৪৬-এ এসে দাঁড়ায়। কৃষি-উৎপাদনের গ্রস মূল্যের সূচক ১৯৫৫ সালের ১৪৩ থেকে ১৯৬০ সালে দাঁড়ায় ১৬১, ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৫৬১০০ মিলিয়ন ইয়েন থেকে বেড়ে ১৯১২০০ মিলিয়ন ইয়েনে দাঁড়ায়।[১২] সামগ্রিকভাবে এর ফলে কৃষিতে একদিকে উন্নত প্রকৌশলের প্রয়োগ সম্ভব হয়, অন্যদিকে কৃষিতে যুক্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ১৯৫০-এর পরে জাপানে খনি ও বড় প্রস্তুতপণ্য (manufacturing) শিল্পের বিরাট উন্নতি ঘটে। শহর থেকে গ্রামে মানুষের বহির্গমনের মাত্রা বাড়তে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রসার ঘটার ফলে শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা ও খাদ্যদ্রব্য হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম, ও সেইসঙ্গে জমির দামও, বাড়ে; কৃষিতে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে। কৃষিজ পণ্যের বাজারের প্রসার ও মূল্যবৃদ্ধি, এই উভয় কারণে কৃষি-উৎপাদন লাভজনক হয়ে ওঠে। কৃষকদের মধ্যে বাজারের বেশি অংশ অধিকারে আনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দেখা যায়, বড় চাষিরা এই প্রতিযোগিতায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। বড় জোতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট জোতগুলোতে লাভের হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় কম ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, লাভের হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় জোতের আয়তন বাড়ার সঙ্গে বাড়ে। নীচের সারণি থেকে এই তথ্যটি পরিষ্কার হবে:

সারণি ২.২ কৃষি-উৎপাদনে মুনাফার হার ও বিনিয়োগের ওপর আয় (শতকরা)

	জাতীয় গড় (হোক্কাইডো বাদে)	<৩ ট্যান*	৩–৫ ট্যান	৫ ট্যান–১ চো*	১.০–১.৫ চো	১.৫–২ চো	>৫ চো
উৎপাদনে মুনাফার হার	৩.৫	০.১	১.৬	২.৪	৩.৮	৪.৭	৫.৪
বিনিয়োগের ওপর আয়	—	৩.০	৪.০	৫.৩	৬.৯	৮.০	৮.৫

*১ চো = ১ হেক্টর প্রায়; ১০ ট্যান = ১ চো

Source: Kajita, M. (1962). *Land Reform in Japan.*

Agriculture Development Series. Agriculture Policy Research Committee.

সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, বড় জোতের পক্ষে তাদের আয়তন আরও বাড়ানোর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বেশি। সেখানে ছোট জোতের পক্ষে এই ক্ষমতা বা সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় ছোট চাষিদের পক্ষে বড় চাষিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ওপর জীবনযাত্রার মানের ক্রমশ উন্নতি, শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার যোগাযোগ বৃদ্ধি ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে দুর্বলতর চাষিদের পক্ষে কৃষির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষির গঠনে দু'টি প্রবণতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, অনেক কৃষক গ্রাম থেকে শহরে বিকল্প কাজের সন্ধানে বহির্গমন করে, ফলে কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমে। এবং দ্বিতীয়ত, ক্রমশ ছোট জোতের চাষির সংখ্যা কমতে থাকে ও বড় জোতের চাষে নিযুক্ত চাষির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬২, এই পর্বের তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৫০ সালের পর থেকে ০.৫ চো-র নীচে যাদের জোতের আয়তন ছিল সেই সব চাষিদের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে। ০.৫ চো-র বেশি কিন্তু ১ চো-র কম মাপের জোত যারা চাষ করত তাদের সংখ্যা '৫০ থেকে '৫৫ সালের মধ্যে বাড়ে, কিন্তু তারপর থেকে কমতে থাকে। ১ চো থেকে ১.৫ চো-র মধ্যে যাদের জোতের মাপ তাদের সংখ্যা ১৯৫০ সাল থেকে '৬০ সাল অবধি ক্রমাগত বাড়ে কিন্তু '৬০ সালের পর কমে। ১.৫ চো-র চেয়ে বেশি মাপের সব জোতের চাষির সংখ্যা ১৯৫০ সালের পর থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

সারণি ২.৩ জোতের মাপ অনুযায়ী চাষি পরিবারের সংখ্যা এবং বৃদ্ধি/হ্রাস (হাজারে)

জোতের মাপ	কৃষি পরিবারের সংখ্যা				বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ		
	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬২	'৫০–'৫৫	'৫৫–'৬০	'৬০–'৬২
<০.৫ ট্যান	১৪২৮	১২৬৮	১২৬৬	১১৫০	–১৬০	–২	–১১৬
০.৫ ট্যান–০.৫ চো	১০৩২	১০০৬	৯৯২	৯৬৯	–২৬	–১৪	–২৫
০.৫–১.০ চো	১৯৫২	১৯৫৫	১৯০৭	১৮৬২	+৩	–৪৮	–৪৫
১.০ চো–১.৫ চো	৯৪৫	৯৮২	১০০১	৯৯৪	+৩৭	+১৯	–৭
১.৫ চো–২.০ চো	৩৬৩	৩৭৬	৪০৪	৪২৪	+১৫	+২৮	+২০
২.০ চো-র বেশি	২০৩	২০৯	২৩৭	২৫৫	+৬	+২৮	+১৮
সর্ব মোট	৫৯৩০	৫৭৯৬	৫৮২৫	৫৬৫৫	–১৩৪	+২৭	–১৬৮

Source: Kajita, M. (1962). *Land Reform in Japan*, Agriculture Development Series. Agriculture Policy Research Committee.

জাপানের কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের ইতিহাস দেখায় যে, জাপানে ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে কৃষিতে স্থির পুঁজির ঘনত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ফলে ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির অধীন কৃষিতে স্থির পুঁজির অভূতপূর্ব সমাহার ঘটে। কিন্তু খোলা-বাজার অর্থনীতির নিজস্ব গতির মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি-নির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রতিবন্ধকতাহীন সরল পথে অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রমশ বড় জোতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধাগুলি ধরা পড়তে থাকে ও অপেক্ষাকৃত ছোট জোতের চাষির পক্ষে মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় নিজেকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে একদিকে ছোট জোতের উচ্ছেদ ও অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বড় জোত বর্ধিত পুনরুৎপাদন মারফত ক্রমশ আরও বড় চাষের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যান্য উপকরণের ওপর ব্যয়ের মতো জমির ওপর ব্যয় ও স্থির পুঁজি গঠনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে দেখা দেয় ক্রমাগত বৃদ্ধি। জাপানে কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের এই প্রক্রিয়ার পূর্বশর্তগুলি হল: ক) সংস্কার মারফত পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের আমূল উচ্ছেদ, খ) শিল্প পুঁজিবাদ গঠন, গ) শ্রম ও জমি সহ সমস্ত কৃষি-উপকরণের বাজার গঠন, ঘ) দ্রুত শিল্পবিকাশের ফলে কৃষিপণ্য ও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি।

এই পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে ১৯৪৬ সালের ভূমিসংস্কার আইন জমির যে-ঊর্ধ্বসীমা (৩ চো) ধার্য করেছিল সেটা বৃহদায়তন উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয় এবং ১৯৬২ সালে নতুন ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়। তার মূল কথা ছিল: ১) কৃষিজমির মালিকানার ওপর ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করা, ২) ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির হস্তান্তর বাধাহীন করা ও কৃষি-সমবায়ের হাতে জমি-ট্রাস্ট গঠনের অধিকার দেওয়া, ৩) কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে চাষের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবায়ের হাতে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া। সেইসঙ্গে সংগঠিত কৃষি-ঋণের বাজার ও কৃষি-উপকরণের বাজারের বাধাহীন অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

এইভাবে জাপানে পুঁজিবাদী পথে অপেক্ষাকৃত বড় জোত-নির্ভর কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। এই অগ্রগতির পিছনে ছিল তিনটি শর্তের কার্যকারিতা। প্রথমত শিল্প-পুঁজির বিকাশ, তার মাধ্যমে শ্রমের ও কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ানো। গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের শহরের উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই কৃষিতে ১৮৬৮ সালের মেজি সংস্কার দেশে সামরিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল, কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সূচনা ও বিকাশের পথের বাধাগুলি দূর করা হয়েছিল। দেশের ঋণ ও পণ্যের বাজারকে ব্যবসায়ী-মহাজনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের আবশ্যিক শর্ত পূরিত হয়। তবুও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের অবশেষ হিসেবে তখনও টিকে থাকা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে কৃষিকে মুক্ত করার তাগিদে জাপানে আবার আমূল ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত হয়। নিখুঁতভাবে।

গণ প্রজাতান্ত্রিক চিন

বিপ্লব-পরবর্তী চিন, সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকায় নেমে তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ‘নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিপ্লবী কৃষক শ্রমিকদের কমিটিগুলি পুরনো জমিদার ও বড়

বড় খামারের মালিকদের হাত থেকে তাদের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকা বিশাল বিশাল কৃষি খামারগুলি অধিগ্রহণ করে। জমির মালিকানার ওপর ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয় ও সীমা-বহির্ভূত সমস্ত জমিই অধিগ্রহণ করা হয়। এই সীমাটি এমন হিসেব করে ধার্য হয়েছিল যাতে জমি পুনর্বণ্টন হলে সব কৃষক পরিবারই, এমনকী পূর্বতন জোতদার-জমিদার শ্রেণিভুক্ত মানুষরাও, ছোট একখণ্ড জোতে নিজস্ব শ্রমে চাষ করে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পায়। এর পরের স্তরে সমস্ত অধিকৃত জমি পুনর্বণ্টন করা হয়। ছোট আয়তনের জমিতে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষি-জোতনির্ভর চাষ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারত। তবে এই প্রক্রিয়ায় 'ধনী চাষি' নামক শ্রেণিটিকে অধিগ্রহণের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়। কারণ, 'ধনী চাষি' হিসেবে তাদেরই চিহ্নিত করা হয়েছিল যারা বড় জোতের মালিক কিন্তু চাষবাসের কাজ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করে থাকে। এর জন্য তারা নিজেরা শ্রম দিত, এবং চাষবাসের উন্নতিতে নানাপ্রকার উৎপাদনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করত। অর্থাৎ এই চাষিরা সামন্ততান্ত্রিক ভাগ-চাষের মতো পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে দূরে ছিল। তারা প্রগতিশীল কৃষি উৎপাদন-সম্পর্ক চালু রাখার চেষ্টা করত এবং এর জন্য তারা নিজেরাও চাষের কাজ দেখাশোনা করত ও সেইসঙ্গে নানাধরনের চাষ-সম্পর্কিত কাজে কায়িক পরিশ্রম করত। এই ধরনের কৃষকদের জোত অধিগ্রহণের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়।

অবশ্য, চিনে শেষপর্যন্ত একটি ছোট পারিবারিক চাষ-নির্ভর কৃষিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই এই কৃষি-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল না। চিন সরকারের কৃষি-সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল চিনে একটি যৌথ খামারভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা। তার আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বিভিন্ন উৎক্রমণকালীন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যেমন, চাষিদের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক চাষব্যবস্থার সুফলগুলি জানানো হচ্ছিল, একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থার অসাম্য ও কুফলগুলি সম্বন্ধে ধারণা ও বোধের সঞ্চার করা হচ্ছিল। এই কারণে জমি পুনর্বণ্টন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই গ্রামের প্রতি পাঁচজন কৃষক পরিবারকে নিয়ে একটি করে উৎপাদন-দল তৈরি করা হয়, গড়ে তোলা হয় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা। জমি ছাড়াও চাষের কাজে মূলধনি উপকরণ ও শ্রম ইত্যাদি অন্যান্য যেসব উপকরণ লাগে, সেসবের পারস্পরিক বিনিময়ের সূচনা ঘটানো হয়েছিল প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে। এই নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল চাষিদের মধ্যে যৌথ চাষ সম্বন্ধে উৎসাহ গড়ে তোলা। গরিব চাষিদের মধ্যে এইভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে চাষের ফলে মোট শস্য উৎপাদন বেড়েছিল, কিন্তু উৎপাদিত শস্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে ভাগ হতে থাকে। এর পরবর্তী স্তরে যে-নিম্নস্তরের সমবায় ব্যবস্থা এসেছিল সেখানে প্রায় সম্পূর্ণত গ্রামের কৃষকদের নিয়ে সমবায় সংগঠিত করা হয় এবং একইভাবে চাষিদের সমবায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। সমবায়গুলিতে ছিল কয়েকটি করে উৎপাদক দলের সমাহার। নিজেরাই যাতে এই অপেক্ষাকৃত বড় সংগঠনগুলিকে পরিচালনা করতে পারে, তার শিক্ষা নেয় চাষিরা। তাদের মধ্যে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ ভাগ করে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সভ্যদের অভ্যস্ত করে তোলা ছিল এই সংগঠনগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সংগঠনে উৎপাদিত শস্য সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার একটি নতুন নীতি চালু হয়েছিল। মোট শস্য থেকে প্রথমে রাষ্ট্রের কর ও উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়া হত। অবশিষ্ট অংশ থেকে সরিয়ে রাখা হত অসময়ের জন্য সঞ্চয় ও চাষিদের চিকিৎসাব্যয়ের তুল্য মূল্যের শস্য। এর পর যে শস্য থাকত তা চাষিদের মধ্যে ভাগ হত। ভাগ করার ভিত্তি

হিসেবে শুধু তাদের পূর্বতন জমির ভাগ নয়, চাষবাস ও পরিচালনার কাজের জন্য চাষিদের নিজ নিজ ব্যয়িত শ্রমসময়কেও হিসেবে আনা হত। এই স্তরটি কয়েক বছর ধরে চালু রাখার পর উচ্চস্তরের সমবায়ের দিকে যাওয়া হয়। এই উচ্চস্তরের সমবায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। উৎপাদিত শস্য থেকে উৎপাদন-ব্যয় ছাড়াও আগের মতোই সমস্ত দেয় ও প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বাদ রেখে অবশিষ্ট শস্য চাষিদের নিজ নিজ ব্যয়িত শ্রমের ভিত্তিতেই শুধু চাষিদের মধ্যে ভাগ করা হত, জমি তখন সব চাষি-সভ্যদের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, কোন জমিটি কার তার আলাদা কোনও গুরুত্ব ছিল না। প্রত্যেক চাষির সর্বপ্রকার শ্রমের সময় ও জটিলতা অনুযায়ী শ্রমের ওপর 'পয়েন্ট' নির্দিষ্ট করা হত, সেটাই ছিল চাষি-সভ্যদের শ্রমের গুণগত মান ও পরিমাণের একক। শ্রমের ভিত্তিতে শস্য ভাগ করার হিসেবে করা হত এই 'পয়েন্ট' ধরে।

এর পরে বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক-একটি কমিউন গঠিত হয়। কমিউনগুলি আসলে বিকেন্দ্রায়িত রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে। কমিউনগুলি শুধু কৃষিতেই নয়, স্থানীয় ভিত্তিতে ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার কাজে এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগান দেওয়ার প্রয়োজনে ছোট শিল্প পরিচালনা করার কাজেও দায়বদ্ধ ছিল। কমিউনের কাজ ছিল পরিকল্পনা কমিশনের কাছে স্থানীয় স্তরে জমি, শ্রমিক ও মূলধনি পণ্য বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা। পরিকল্পনা কমিশন তার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের পরিকল্পনা করার সময় আঞ্চলিক সম্পদ, আঞ্চলিক অভাব ও প্রয়োজনের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকত। পরিকল্পনামাফিক নির্দেশ রূপায়ণের সময় স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন উপকরণের সুলভতা অনুযায়ী বিকল্প উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এইসব উপকরণ বণ্টনের অনুপাত স্থির করা হত। এককথায়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় পরিকল্পনা যুক্ত ছিল কাঠামোর গোড়া থেকেই। কেন্দ্রীয় উন্নয়নের কর্মসূচিকে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য কমিউনকে একটি উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা ছিল এই শেষ স্তরের যৌথ গ্রামীণ উৎপাদন-কাঠামোর অন্যতম উদ্দেশ্য। স্থানীয় আর্থিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যম ছিল এই কমিউনগুলি। এদের মাধ্যমেই সরকারি কর ও সরকারি স্তরে কৃষিপণ্য সংগ্রহের কর্মসূচি রূপায়িত হত, সরকার-নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের দাম সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি এবং কৃষি ও ছোট শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি নীতি রূপায়ণের সহজ মাধ্যম ছিল এগুলি।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হওয়ার পর বলশেভিক পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রথমেই ঘোষিত হয় জমি সংক্রান্ত ও শান্তি সংক্রান্ত নীতি। সমস্ত জমি সর্বহারা রাষ্ট্রের অধীন বলে ঘোষিত হয়। শ্রমিক-কৃষকের কমিটিগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে উর্বরতা অনুযায়ী জমির পরিমাণ নিরূপণ করে, বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন প্রকারের জমির মালিকদের চিহ্নিত করার কাজটি সম্পন্ন হলে ভূমিহীন ও অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ জমির মালিকদের সংখ্যা জেনে নেওয়া হয়। নিরূপিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও দরিদ্র অতি ক্ষুদ্র মালিকদের সংখ্যা। প্রত্যেক চাষি পরিবারের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ জমি নির্ধারিত হয়। প্রাথমিকভাবে চাষে উদ্যোগী কুলাকদের শর্তাধীনে জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচির আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। বাকি সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বড় চাষির হাত থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এক-একটা অঞ্চলের চাষিদের মাথাপিছু জমির গড় পরিমাণ নির্দিষ্ট করে

জমি পুনর্বন্টনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অসংখ্য ছোট ছোট জোতে জমি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোই চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শহরের জন্য খাদ্যের জোগান ও যুদ্ধক্ষেত্রে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য পণ্যের কেনা-বেচা, বিনিময় ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই অবস্থা চলেছিল জমিতে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে অবধি। কুলাকদের ও মাঝারি মাপের জমির চাষিদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফসল ভিন্ন শহরাঞ্চলে সরবরাহ করার ফলে কৃষি উদ্বৃত্তের খুব বেশি উৎস তখন ছিল না, কারণ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টন কর্মসূচির রূপায়ণের পর অধিকাংশ জমি ছোট পারিবারিক জোতের অধীনে চলে আসে। কিন্তু কুলাকরা তাদের জমানো উদ্বৃত্ত ফসল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার হাতে তুলে দিতে রাজি ছিল না। কুলাকদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের বৃদ্ধির দ্বার বন্ধ করে যেসব বাধা-নিষেধ তখন জারি করা হয়েছিল কুলাকরা তা মানতে রাজি ছিল না। ফলে যখন ছোট ছোট পারিবারিক জোতগুলি সমেত সমস্ত জোত যৌথ কৃষিব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার উদ্যোগ শুরু হয়, তখন কুলাকরা এই কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা ক্রমে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। কিন্তু অনেক বিরোধিতার মধ্যেও শেষপর্যন্ত চালু হয় যৌথ মালিকানা ও যৌথ চাষব্যবস্থা। যৌথ খামারগুলিও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মসূচি গঠন ও রূপায়ণের স্তর থেকে এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষিতে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে কৃষি-উৎপাদনে কিছুটা প্রত্যাশিত গতি আসার পরই পরিকল্পিত উন্নয়নের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। শিল্পায়ন কর্মসূচি রূপায়ণের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের উৎস হিসেবে কৃষি-উদ্বৃত্ত ব্যবহার করার পরামর্শ দেন প্রিয়োব্রাজেনেস্কি। ফেল্ডমান-কৃত শিল্পায়ন পরিকল্পনা নীতি অনুসরণ করে ভারী মৌলিক শিল্পগুলি গড়ে ওঠে। সারাদেশে বিদ্যুৎব্যবস্থার জাল বিস্তার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অচিরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিভিন্ন দেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উন্নয়নের পথে উৎক্রমণের প্রাথমিক স্তরে বড় জোতকে যে-কোনও প্রকারে ভেঙে ছোট ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কৃষি জোত-ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। ইংলন্ডের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক সূচনার প্রাক্কালে বড় সামন্ততান্ত্রিক জোতের আগল থেকে মুক্ত হয়ে ছোট জোতের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরে এদের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মুক্ত শ্রম, জমি ও কৃষি-উপকরণের বাজার তৈরি হয়। জাপানেও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ভাগ-চাষ ও ভাড়াটে চাষের প্রথা বিলোপের কর্মসূচি নেওয়া হয়, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বড় জোতগুলি ভেঙে দিয়ে মাঝারি মাপের জোতে চাষের প্রসার ঘটানো হয়। কিন্তু এই জোতের বিন্যাসে যে-অসমতা ছিল তার সূত্র ধরে অনিয়ন্ত্রিত খোলা-বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় বাজার দখলের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত দক্ষ জোতের মালিকদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে ছোট জোতের মালিকদের। পরিণামে জাপানের চাষবাস ধীরে ধীরে তুলনামূলক বড় জোতে সংগঠিত হতে থাকে। ফলে ১৯৬১ সালে, ১৯৪৬-এর ভূমিসংস্কার আইনকে সংশোধন করে বড় জোতে চাষকে উৎসাহিত করার নীতি নেওয়া হয়। ছোট জোতগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় আকারের চাষ সূচিত করা হয়েছিল। চিন ও রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর ভূমিসংস্কারেও প্রাথমিকভাবে বড় সামন্ততান্ত্রিক ধরনের জোতগুলি ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট পারিবারিক জোতে

জমি পুনর্গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে, এই ভূমিসংস্কারের দূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল জমিতে যৌথ মালিকানার মাধ্যমে বড় জোত-ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা।

ভারতের কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্কের বিবর্তন

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও কৃষি

ভারতে সিন্ধু সভ্যতা ও গ্রামসমাজ

যে-কোনও অর্থনীতিতেই কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। একেবারে পুরনো যুগে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কৃষির বিরাট পশ্চাদভূমির উপর। হরপ্পা নগরে যে-শস্যাগার পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে যে, ওই সময়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হত ও সেই উদ্বৃত্ত শহরের শস্যাগারে জমা হত। এই কৃষি-উদ্বৃত্ত নগরসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের তুলনামূলক গুরুত্বের লক্ষণীয় তফাত ঘটেছে। পশু শিকার, পশুচারণ ও পশু পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব কাজকর্ম ছিল জীবনধারণের মূল উপায়। কিন্তু এইসব মূল কাজের পাশাপাশি জীবনযাত্রায় অপরিহার্য বিভিন্ন সহায়ক কাজকর্মেরও সূচনা হয়। প্রথমে মাটির পাত্র, পাথরের অস্ত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহারের উপকরণ প্রস্তুত হতে থাকে। পরে যখন বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়, তখন সেসবে নির্মিত অস্ত্র ও ব্যবহার্য পাত্র, গহনা ইত্যাদির উৎপাদন কেন্দ্র করে হস্তশিল্প গড়ে ওঠে। এরপর, মানুষ কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং তার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই জঙ্গল কেটে সাফ করে বসতি গড়ে তোলে ও চাষবাস শুরু করে। কারণ, চাষবাসের জন্য প্রয়োজন ছিল স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা। মানুষ তার প্রয়োজনের অন্যান্য সামগ্রীও একই সঙ্গে তৈরি করত। এক-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এক-জায়গায় পাশাপাশি থেকে কারিগরি ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি কৃষিকর্ম চালাত। প্রথমে শ্রমবিভাজন তত স্পষ্ট ছিল না। শ্রম বিভাজন এসেছে অনেক পরে, কারিগরি ও নানাপ্রকার হস্তশিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়ার ও প্রসার লাভ করার পর।

পৃথিবীর যে-কোনও দেশেই অকৃষি উৎপাদনক্ষেত্রের সূচনা এবং অকৃষি উৎপাদনক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল কৃষিক্ষেত্র থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য। তার পাশাপাশি চাই মানুষের আবশ্যিক শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামাল। এই দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর শহরাঞ্চলের টিকে থাকা নির্ভর করে। যতদিন অবধি কৃষি ও হস্তশিল্প, তথা কারিগরি দ্রব্য-উৎপাদন পরস্পরবিচ্ছিন্ন দু'টি প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে না ওঠে ততদিন অবধি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভোগনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি টিকে থাকে। ক্রমে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা উৎপাদনের উপকরণের উন্নতি ঘটায়। কৃষি এবং শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন-প্রক্রিয়া উন্নত হতে থাকে, উভয় ক্ষেত্রেই একদিকে উৎপাদন-কাঠামোর আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে উৎপাদনের সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন হয়। শিল্প ও কৃষি পরস্পরবিচ্ছিন্ন দু'টি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করে ভিন্ন জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে। শিল্পকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে। নগরের টিকে থাকা নির্ভর করে নগরের মানুষের কাছে খাদ্য ও শিল্পের জন্য

প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের সুলভতার ওপর। কৃষি-উদ্বৃত্তের উৎপাদন ও এই উদ্বৃত্ত বাজারজাত হওয়ার মাধ্যমে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছনো প্রয়োজন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের এই কেনাবেচার প্রয়োজন থেকে একটি ভিন্ন বাণিজ্যিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, বাণিজ্যিক কাজকর্ম একটি ভিন্ন পেশা হিসেবে প্রসার পায়।

কারিগরি ও হস্তশিল্প কৃষিকর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়ার আগেই একই সঙ্গে এক-এক জায়গার মানুষের বিশেষ দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এক-একটি বিশেষ শিল্প গড়ে উঠেছিল। অনেক সময় বংশানুক্রমিক দক্ষতার ভিত্তিতে গিল্ড মাস্টারের অধীনে বিভিন্ন কারিগরদের নিয়ে এক-একটি বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠে। এইসব শিল্প ও বিভিন্ন ধরনের অ-কৃষি কাজকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নগর। এই নগরগুলি ছিল জনপদের শাসনকর্তাদের বসবাসের জায়গা। সেখানে তাঁরা তাঁদের সৈন্যসামন্তদের নিয়ে বাস করতেন। আজকের পশ্চিম ইউরোপের গ্রিস ও রোমে খ্রিস্টপূর্ব ৪-৫ সনে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের অকিঞ্চিৎকর পশ্চাদভূমির ওপর গড়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল অতি শক্তিশালী নগররাষ্ট্র। যুদ্ধপটু, সম্প্রসারণবাদী, সামরিক একনায়কতন্ত্রী ও তাদের সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থল ছিল এইসব নগর এবং সেগুলি ছিল একইসঙ্গে সমরাস্ত্র ও রাজারাজড়াদের ভোগের জন্য বিলাসদ্রব্য তৈরির কেন্দ্র। তবে, এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা-নির্ভর সমাজ-জীবন ও উৎপাদন-সম্পর্কের ওপরে।

কৃষির পশ্চাদভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নগরসভ্যতার আদি রূপ সর্বত্র একই রকম ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার ইতিহাস একই রকম নয়। আবার প্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া বা ইজিপ্টের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে লক্ষণীয় অমিল আছে। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদের বিবরণ[১] দেখায় যে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার প্রাচীনতম নগরসভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক প্রাচীন সভ্যতাগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভিন্ন ছিল। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তা থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেছেন যে, যদিও এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মানুষের মধ্যে আর্থিক অসাম্য ছিল, শ্রমদাতা ও বিনা শ্রমে উদ্বৃত্ত ভোগকারী দু'টি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্বও ছিল, কিন্তু অন্যান্য সমসাময়িক সমাজের মতো এই সমাজ দাস ও দাস-মালিক এই দু'টি পরস্পর বৈর শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল না।[২] এই দু'টি নগরের কোনওটিতেই অস্ত্রশস্ত্রের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা থেকে মনে হয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অর্থনীতি-বহির্ভূত চাপ অথবা হিংসা বা লড়াইয়ের ভূমিকা ছিল গৌণ। ফলে এখানকার অধিবাসীদের বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল না বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এখানে নগরের কেন্দ্রে ছিল মন্দির। সমস্ত সমাজ মন্দিরের একচ্ছত্র ধর্মীয় আধিপত্যের অধীন ছিল। মন্দির পরিচালনা করত যে-পুরোহিত গোষ্ঠী, তার হাতেই ছিল সমস্ত সমাজের কর্তৃত্ব। ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী একসঙ্গে একই ছাঁচে বিপুল সংখ্যায় নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি হত। এইসব উৎপাদনক্ষেত্র ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া মন্দির-কেন্দ্রিক ক্ষমতার একচ্ছত্র পরিচালনার ও কর্তৃত্বের অধীন ছিল। নানা ধরনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির কাজে যুক্ত কারিগর ও হস্তশিল্পীরা ও নানাপ্রকার দৈহিক শ্রমে যুক্ত মানুষেরা তাদের উদ্বৃত্ত দ্রব্য ও উদ্বৃত্ত শ্রম সরাসরি মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিত। সেগুলো দেওয়া হত আবশ্যিক ধর্মীয় উপঢৌকন হিসেবে। বাকি অংশ তারা বেঁচে থাকার মতো আবশ্যকীয়

দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করত। বণিকশ্রেণি একদিকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যিক দ্রব্যের বিনিময় সংঘটিত করত, অন্যদিকে এরা বহির্বাণিজ্য চালাত। দৈহিক শ্রমদাতা কারিগর, হস্তশিল্পী ও সমাজের সম্পন্ন শ্রেণিগুলির সেবায় নিযুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা মন্দিরের পুরোহিতগোষ্ঠীর যৌথ কর্তৃত্বের অধীন ছিল। যতদূর জানা যায়, আলাদাভাবে হয়তো কোনও দাস-মালিক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না।[১৩] মন্দির-লাগোয়া যে-ব্যারাকের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেখানে এক বিশাল শ্রমদাতা জনগোষ্ঠী একত্রে মন্দিরের অধীন দলবদ্ধ দাসের জীবনযাপন করত। একটা মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। নগরগুলি অবশ্যই গড়ে উঠেছিল বিশাল কৃষিপণ্যের জোগানদাতা পশ্চাদভূমির ওপর।

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছিল যে-বিরাট কৃষি উৎপাদন-ভূমি, সেখানে গ্রামসমাজ বা কার্ল মার্কস বর্ণিত এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল।[১৪] নগরগুলি গ্রামে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল হলেও গ্রামগুলি ছিল সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর। গ্রামসমাজে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্প বা কারিগরি ছিল পরস্পর সংযুক্ত, কখনও অবিচ্ছিন্ন। কৃষকরা গ্রামসমাজের যৌথ কর্তৃত্বের অধীন ছিল। যে-যৌথ কর্তৃত্ব আবার মন্দিরের সার্বিক কর্তৃত্বের অধীন ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, সম্ভবত এই সব কৃষকরা কোনও দাস-মালিকের অধীন ছিল না। এদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শস্য গ্রামসমাজের নিয়মে এরা নিজেরাই গ্রামের যৌথ কল্যাণের জন্য প্রধানের কাছে জমা দিত, যার একটা অংশ গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহার হত, অপর এক অংশ সার্বভৌম ক্ষমতাশালী মন্দিরের হাতে দেয় আবশ্যিক উপঢৌকন হিসেবে চলে যেত। নির্ধারিত উপঢৌকন দিয়েই তারা গ্রামসমাজে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করত। এটা ছিল সমাজে গ্রামীণ কৃষকের বসবাসের আবশ্যিক শর্ত। এই উপঢৌকনের মাত্রা উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশি হওয়ার কারণে গ্রামের কৃষক ন্যূনতম খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হত। মন্দির-কেন্দ্রিক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সাধারণত গ্রামের সার্বিক প্রয়োজনে, যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও রাস্তাঘাট তৈরির কাজে ব্যবহার করত।

গ্রামগুলিতে কৃষি, হস্তশিল্প ও কারিগরি পরস্পর যুক্ত ছিল এবং সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষ ন্যূনতম সামগ্রী নিয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হওয়ায় গ্রামের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে শহরে উৎপাদিত পণ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। উল্টোদিকে গ্রাম থেকে শহরে কৃষিজ পণ্যের নিয়মিত জোগানের ওপর শহরের অর্থনীতি টিকে থাকত। এই গ্রামীণ উদ্বৃত্ত গ্রামসমাজের প্রধানের কাছ থেকে মন্দির-কেন্দ্রিক ওপরওয়ালার কাছে চলে যেত ও সেখান থেকে বণিকদের মাধ্যমে শহরের কারিগর ও অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে পৌঁছত বিনিময়ের মাধ্যমে। বিনিময় হত সরাসরি শিল্পজাত দ্রব্যাদি, যথা, বস্ত্র ও ধাতুনির্মিত ব্যবহার্য জিনিসপত্র। মুদ্রার ব্যবহার ছিল অপ্রতুল, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কোনও বিশেষ মুদ্রার বহুল ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ইতিহাসবিদরা অনুমান করেছেন, সেখানে সরাসরি বিনিময় প্রথা চালু ছিল। শহরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর কোনও কোনও অট্টালিকার দেওয়াল বা মেঝের নীচে থেকে বিপুল সংখ্যক দামী পাথর ও সোনা-রুপা পাওয়া গেছে।

নগরগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া হস্তশিল্প কেন্দ্রের পাশাপাশি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের অথবা বিরাট ব্যারাকের মতো হলঘরের যে-চিহ্ন পাওয়া গেছে তা একদিকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নতম

মানকেই নির্দেশ করে। অন্যদিকে একটি বিশেষ ধরনের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এর দ্বারা সূচিত হয় তারা কিছু ব্যক্তি-শ্রমিক, হয়তো তাদের নিজস্ব স্বাধীন পারিবারিক জীবন ছিল না। এরা একত্রে একজায়গায় বাস করত। এদের ওপর মন্দিরের সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল ও মন্দিরই এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করত। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে দাস দিয়ে কাজ করানোর চল না থাকলেও মন্দিরের সাধারণ তত্ত্বাবধানে দলবদ্ধ দাস রাখার ব্যবস্থা হয়তো ছিল।[৫] অন্যদিকে বিরাট বিরাট প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি ও দামী পাথর এবং ধাতব সামগ্রী বণিকশ্রেণি ও সার্বভৌম ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থানের মানুষদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকেই সূচিত করে। অনুমান করা হয়, মন্দিরের তত্ত্বাবধানে থাকা দাস-দলের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের দিয়ে ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তিরা অনুৎপাদনশীল পারিবারিক কাজও করিয়ে নিতেন।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই হয়তো সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রামসমাজ বা পরিকল্পিত নগরের চৌহদ্দি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া অসম্ভব ছিল। গ্রামের কৃষক বা সাধারণ মানুষ গ্রামপ্রধান বা মন্দিরের কর্তৃত্ব সহজেই মেনে নিত কারণ মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে গ্রামের অর্থনীতির ও জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এমন কয়েকটি বিশেষ সুবিধা সুনিশ্চিত করত যেগুলি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মদত ছাড়া তৈরি করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এই সুবিধাগুলির মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় সংস্কার ও এই সব অত্যাবশ্যক সুবিধাগুলির স্বার্থে নির্ভরতাই সাধারণ মানুষকে উচ্চতর ধর্মীয় ক্ষমতার কর্তৃত্বকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য করত। ফলে উচ্চতর ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভেতর বল প্রয়োগের কোনও স্থান ছিল না। ইউরোপীয় দাসব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

সিন্ধু সভ্যতা কেন ধ্বংস হল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে অবধিও সবচেয়ে চালু মতটি ছিল, আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কোনও সমাজব্যবস্থার চলনের প্রক্রিয়ায় অন্তর্জাত দুর্বলতা ছাড়া সেই সভ্যতা শুধুমাত্র বহিরাগত শত্রুর আগমনে একেবারে ধ্বংস হতে পারে না। আমাদের গবেষণা থেকে আমরা দেখেছি যে, সিন্ধু সভ্যতার সমাজকাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই এই সভ্যতার অন্তর্জাত দুর্বলতার কারণগুলি উপস্থিত ছিল, যা এই সভ্যতার উপরিকাঠামোকেও দুর্বল করে রেখেছিল। প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের ওপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ফলে উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদনের কৌশলে কোনও উন্নতি নিয়ে আসার জন্য প্রকৃত উৎপাদকের কোনও উৎসাহ ছিল না। উপরন্তু, মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের উৎপাদিত সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল নানাভাবে শোষণ করে নিত, যার ফলে তাদের চাষের উন্নতি সাধনের কোনও উপায় ছিল না। সার্বভৌম ধর্মীয় ক্ষমতা এই উদ্বৃত্ত সেচের সুবিধা বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় করত, তার ফলে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে সাধারণ চাষি উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে একই স্তরে বেঁধে রাখতে পারত। আসলে কৃষকদের তৈরি কারিগরি দ্রব্য ও হস্তশিল্প কৃষকদের চাহিদা পূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বাইরের কারিগরদের তৈরি জিনিসের জন্য সমাজের অভ্যন্তরে চাহিদা ছিল অতিস্বল্প। এই চাহিদা বাড়ারও কোনও উপায় ছিল না। কৃষকরা, এবং আর-একটি শ্রেণি— শহরের আধা-স্বাধীন কারিগর ও হস্তশিল্পীরা, যেটুকু উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত তার সবটাই মন্দিরের নির্দেশে মন্দিরেই জমা দিতে হত। এসব কারণে এই সভ্যতা ক্রমশ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছিল। বণিকশ্রেণিরও কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না। বণিকশ্রেণি গ্রামে উৎপাদিত

উদ্বৃত্ত খাদ্যের বিনিময়ে মন্দিরের হাতে জমে থাকা শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করত, অথবা সেগুলি নিত সরাসরি কারিগর শ্রেণির কাছ থেকে, এবং বিদেশে জোগান দিত। এর বিনিময়ে এরা বিদেশ থেকে সোনা ও দামী পাথর সংগ্রহ করত, যা উৎপাদনে কাজে লাগত না, বরং মন্দির-কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণির বিলাসে ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে মন্দির-কেন্দ্রিক সার্বভৌম ক্ষমতা এই সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ঘটাতে তেমন ইচ্ছুক ছিল না। বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো সেনাবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে ছিল না। সমসাময়িক ইজিপ্ট বা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সব চেয়ে অমিল দেখা যায় এই বিষয়ে। এই দুই সভ্যতা যেখানে সর্বদাই রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত, সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাতে কঠিন শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র, সেনাবাহিনী বা এমন কিছুর কোনও অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। অন্য অঞ্চলের জঙ্গল, জল, জমি দখল কিংবা অন্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ভেতর থেকে উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে পারবে এমন মানুষজন সংগ্রহ করা, বা নিজেদের ভৌগোলিক সীমাবিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার কোনও চেষ্টার ইঙ্গিতও তাই এখানে মেলে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও জোগান ও চাহিদার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল করার কোনও চেষ্টা দেখা যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া দ্রব্যসামগ্রী থেকে ইতিহাসবিদরা মনে করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে তেমন কোনও গুণগত উন্নতি ঘটেনি।[৬] এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সভ্যতা পরিবর্তনহীন, এই সভ্যতায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের গতি রুদ্ধ ছিল, দীর্ঘদিনের স্থবিরত্ব এই সভ্যতাকে ধীরে ধীরে ভাঙনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজস্ব কারণেই যে-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠছিল, হয়তো বহিরাগতদের আক্রমণ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সভ্যতার অনিবার্য পরিণতিকে বাস্তব করে তুলল।

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক: ভারতে মুঘল যুগের কৃষি ও গ্রামসমাজ

মুঘল যুগের কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্কের আলোচনার সূত্রপাতে সেই যুগের কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত। মুঘল যুগের রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানটির নাম সম্রাট। মুঘল সম্রাট স্থানীয় শাসন চালানোর জন্য যেসব আমলার ওপর নির্ভর করতেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের বলা হত মনসবদার। মুঘল সম্রাট স্থানীয় স্তরে শাসন চালানোর প্রয়োজনে এই সব বেতনভুক আমলাদের নিয়োগ করতেন। বেতনের পরিবর্তে তাদের জায়গির দেওয়া হত। এই জায়গিরদাররা তাদের জায়গিরের ভৌগোলিক সীমানা থেকে রাজস্ব আদায় করত। আদায় করা রাজস্বের বেশিরভাগ অংশ নিত জায়গিরদাররা, বাকি অংশ সরকারি কোষাগারে জমা হত এবং অন্যান্য বিভিন্ন আমলাদের মধ্যে ভাগ হত। জায়গিরের আয়তন ও জায়গির থেকে আয়ের পরিমাণ মনসবদারদের পদমর্যাদার সূচক ছিল। শাসনকাঠামোটি মোটামুটি ভাবে এই দ্বিস্তর ব্যবস্থায় চিহ্নিত হলেও অর্থনৈতিক কাঠামোয় আরও বিভিন্ন স্তর উপস্থিত ছিল। এই কাঠামোয় জমিদার শ্রেণিটির বিশেষ অবস্থান ও সবথেকে নীচে কৃষক নামক নানা স্তরে বিভাজিত স্তরটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জমিদার শ্রেণিটি জায়গিরদারদের মতো মুঘল সম্রাট দ্বারা নিযুক্ত বেতনভুক কর্মচারী নয়। সুলতানি আমলে বিক্ষিপ্তভাবে জমিদারদের অস্তিত্ব থাকলেও জমিদারি ব্যবস্থা

প্রধানত মুঘল আমল থেকেই পূর্ণাঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে ইতিহাসবিদদের অভিমত।[৭] আকবরের সময় থেকে 'জমিদার' কথাটির ব্যবহার ব্যাপকতা পেয়েছে ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। সাধারণত জমিদারি অধিকার বলতে তিনটি অধিকারের সমন্বয় বোঝানো হয়ে থাকে: প্রথমত, জমির ওপর জমিদারের মালিকানার অধিকার। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের দখলীকৃত জমির ওপর খাজনা আদায় সমেত ব্যাপক অধিকার। তৃতীয়ত, জমিতে উৎপন্ন সম্পদের ওপর বিশেষ ধরনের স্বত্বাধিকার। এছাড়া জমিদারি এলাকার মধ্যে নবাবের শাসন-সাপেক্ষে জমিদাররা নানা ধরনের কর্তৃত্বমূলক নিয়মকানুন চাপাতে পারত।

জমিদারের সঙ্গে জায়গিরদারদের পার্থক্য হল, প্রথমত জমিদাররা বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদারি অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু জায়গিরদারদের অধিকার বংশানুক্রমিক নয়। দ্বিতীয়ত, সম্রাট যে-কোনও জায়গিরদারকে যেখানে খুশি বদলি করতে পারে, কিন্তু জমিদারদের সম্রাট নিজের ইচ্ছেমতো স্থানান্তরিত করতে পারে না। অপর পক্ষে, জায়গিরদাররা তাদের জায়গির ইচ্ছেমতো হস্তান্তর করতে পারে না, কিন্তু জমিদাররা ইচ্ছা করলে জমিদারি অধিকার বিক্রি বা দান করার মধ্য দিয়ে হস্তান্তরিত করতে পারত। নির্দিষ্ট কোনও ত্রুটি ছাড়া কোনও আমলা বা সরকার জমিদারের জমিদারি অধিকার কেড়ে নিতে পারত না। জায়গিরদাররা হল সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসক, যারা সম্রাটের হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে অঞ্চলভিত্তিক রাজস্ব আদায় করত, যে-রাজস্ব জায়গিরদার সমেত সম্রাটের অন্যান্য আমলাদের মধ্যেও বিতরিত হত। সেইদিক থেকে জায়গিরদাররা সম্রাটের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, এই বেতনের পরিমাণ ও তাদের পদমর্যাদা তাদের আয়ত্তে ন্যস্ত অঞ্চলের আয়তনের ওপর নির্ভর করত। জায়গিরদারির অধিকার সম্পূর্ণত সম্রাটের ইচ্ছা বা বিচারবোধ সাপেক্ষে স্থির হত এবং তা নির্ভর করত সম্রাটের কাছে তাদের আনুগত্যের ওপর। জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ রায়তদের পার্থক্য হল, রায়তরা অনেক সময় জমির মালিক বলে বর্ণিত হলেও রায়তদের গ্রামের ওপর অন্য কোনওরকম অধিকার বা দাবি থাকত না। জমিদার বিভিন্ন প্রকার দাবি চাপাত অন্য রায়তদের ওপর, এবং বিভিন্ন ধরনের অধিকার তারা ভোগ করত যেগুলি সাধারণ রায়তদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক সমাজ যে-কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত ছিল তার একটি বিশেষ রূপ ছিল গ্রামসমাজ। অনেক জায়গায় রায়তরা কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে না থেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন মালিক হিসেবে জায়গিরদারের অধীনে চাষবাস করত ও অবশ্যই জায়গিরদারের ধার্য করা রাজস্ব দিত। অনেক সময় জমিদারের অধীনে রায়তরা স্বাধীনভাবে চাষ করত ও জমিদারের ধার্য করা ভূমি-খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। কিন্তু কৃষকের বিভিন্ন ধরনের অবস্থান ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের পাশাপাশি ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে কৃষক-সাধারণ ছিল গ্রাম-সমাজের সদস্য। কৃষি অর্থনীতির বিশেষ সামাজিক গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে এই গ্রামসমাজের বিশেষ ভূমিকা আছে। অবশ্য গ্রাম-সমাজের সদস্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, জমির ওপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব থাকলেও অনেকসময় উচ্চতর কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। গ্রামপ্রধান বা গ্রাম-সমাজে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমেই তারা তাদের রাজস্ব দিত।

গ্রাম-সমাজগুলি কেবল যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন কৃষি, কারিগরি ও হস্তশিল্প সমন্বিত এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদনের ইউনিট হিসেবে বিরাজ করত তা নয়।[১৫] গ্রাম থেকে শহরে বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক

অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কৃষিজাত ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের সরবরাহ হত। সেই হিসেবে মুঘল যুগে গ্রাম-সমাজগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিল না। এমন বিভিন্ন কৃষি-উৎপাদনেরও ব্যাপক প্রচলন ছিল যেগুলি বিক্রি হত দূরের বাজারে। তুলা, চিনি, তামাক ইত্যাদি গ্রামে উৎপাদিত হত ও দূরের বাজারে বিক্রি করা হত। শহরের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটাত গ্রাম-সমাজ। শুধুমাত্র কাঁচামাল নয়, অনেক সময় গ্রাম থেকে শহরে শিল্পী ও কারিগর সরবরাহ করা হত। কিন্তু গ্রাম-সমাজ মোটামুটিভাবে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিরাজ করত। বাইরে থেকে গ্রাম-সমাজে পণ্য সরবরাহ তেমন ঘটত না। গ্রামগুলি নিজেদের উৎপাদিত কৃষি ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের ওপরই নির্ভর করত। ইতিহাসবিদরা দেখেছেন, একটি গ্রাম এককভাবে সবসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও একটি বিশেষ অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম একত্রে পরস্পরের চাহিদা মেটাত। কোথাও কোথাও এক গ্রাম অন্য গ্রামের ওপর বিশেষ বিশেষ পণ্যের জন্য নির্ভর করত। কিন্তু সাধারণত শহর থেকে গ্রামে পণ্যের সরবরাহ ঘটত না। এর কারণ সম্ভবত গ্রামের মানুষের অত্যন্ত নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা। শহরে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বা দূর অঞ্চলে সরবরাহ করা হত। আসলে গ্রাম-সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা ও গ্রামীণ মানুষের অতি নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা। একদিকে নবাবের চাপানো করের বোঝা, অন্যদিকে স্থানীয় শাসকের চাপানো নানাপ্রকার দাবি কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত উদ্বৃত্ত নিঃশেষ করে শোষণ করত। তারা ন্যূনতম ভরণপোষণের বেশি আয়ের সংস্থান করতে পারত না। তাদের নিজেদের উৎপাদিত জিনিসপত্র ছাড়া বাইরের কোনও ভোগ্যপণ্য কিনে ভোগ করার মতো সংস্থান তাদের ছিল না।

মুঘল আমলের গ্রাম-সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দেহাত-ই-তালুক ও দেহাত-ই-রায়তি। দেহাত-ই-তালুক গ্রামগুলি বড় জমিদারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয় ও দেহাত-ই-রায়তি গ্রাম-সমাজের কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রকে আমলা বা গ্রামপ্রধানের মাধ্যমে রাজস্ব দেয়। গ্রামের মানুষেরা তাদের উৎপাদনের একটি অংশ একটি সাধারণ ভাণ্ডারে জমা রাখত। এই যৌথ ভাণ্ডার থেকে অনেক সময় বাকি রাজস্ব শোধ দেওয়া হত বা ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হত। 'পাটোয়ারি' নামে একজন কর্মচারী থাকত যার কাজ ছিল কৃষকদের স্বার্থের তদারকি করা এবং যৌথ ভাণ্ডারের দায়িত্ব সামলানো।

গ্রামের বনজঙ্গল বা গোচারণ-ভূমি গ্রাম-সমাজের যৌথ মালিকানায় ছিল না। যে-কোনও কৃষক জঙ্গল কেটে ব্যক্তিগত ভাবে আবাদ করতে পারত এবং সেখানেই তার দখলি স্বত্ব জন্মাত। তবে তার জন্য তাকে রাষ্ট্রকে কম হারে রাজস্ব দিতে হত। গোচারণক্ষেত্র ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক রায়তের ছিল। কিন্তু তার জন্য তাদের জমিদার বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে ফসলের কিছু ধার্য অংশ দিতে হত। একটা গ্রামে নতুন কেউ স্থায়ীভাবে ভোগদখলি স্বত্ব নিয়ে বসবাস করতে চাইলে তাকে গ্রামীণ সমাজের সমবেত সম্মতির জন্য অপেক্ষা করতে হত। অবশ্য সারা ভারতবর্ষে এইসব রীতির মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল, সর্বত্র একই ব্যবস্থা চালু ছিল না। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে গ্রামীণ সমাজের বন্ধন উত্তর ভারতের গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ছিল। যেমন, গোয়ার আশেপাশের গ্রামগুলিতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামের উচ্চতর গোষ্ঠীর যৌথ সম্মতি নিতে হত। যদি কোনও গ্রামের কৃষক গ্রামে কোনও বংশানুক্রমিক সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইত তাহলে তাকে গ্রামের মানুষের সার্বিক সম্মতি নিতে হত। গ্রামের সম্পত্তি কেনার সময়ও অনুরূপ অনুমতি নিতে হত। অর্থাৎ, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলেও জমির ওপর মালিকানা-স্বত্ব অবাধ ছিল না। গ্রাম-

সমাজের নিয়ন্ত্রণ জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্বকে নানাভাবে সীমিত রেখেছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষেত্রেও গ্রাম-সমাজের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল। কারিগররা ছিল গোটা গ্রামের সেবক, কয়েকটি পরিবারের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র নয়। তাদের বসতি স্থাপন বা অধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব ছিল সামগ্রিকভাবে গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের। সামগ্রিকভাবে গ্রামের কৃষকরা গ্রামের কারিগরদের শস্যের কিছু অংশ দিত। পঞ্জাবের ওপর গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকেও এর সমর্থন মেলে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা হয়তো কিছুটা কম ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য গ্রাম-সমাজের ওপর নির্ভর করতে দেখা গেছে।

কৃষি-অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক কাজকর্মের প্রভাব

অর্থনীতির বিবর্তনে বণিকশ্রেণির ভূমিকা

মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল কিন্তু গ্রাম অঞ্চলের মধ্যেও এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে পণ্যের আদানপ্রদান ঘটত। শহরে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আসত গ্রাম থেকে। শহরের মানুষের জন্য অন্নবস্ত্র আসত গ্রামের চাষি ও তাঁতি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। শহরে উৎপাদিত হস্তশিল্পজাত পণ্য দূরদূরান্তে রপ্তানি করা হত। আবার ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসার পর এদেশি বণিকদের একটা অংশ ইউরোপীয় বণিকদের দেশি এজেন্টের কাজ করত। ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের আলোচনায় এদেশীয় বণিকদের চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।[১৬] প্রথম, ইউরোপীয় কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং সেসব কাজে যুক্ত এদেশীয় বণিক। দ্বিতীয়, ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত এদেশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক। তৃতীয়, স্থলপথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক এবং স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক।

ইউরোপীয় কোম্পানি বা তার কর্মচারীদের নিজস্ব বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এদেশীয় বণিকদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম ভারতীয় অর্থনীতির নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুঘল আমলে তা প্রধানত শহরের তাঁত ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই আমলে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা ছিল বাইরের শক্তি। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল শেষস্তরের স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকরা। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের বণিকরাও এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের একটি অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা এই অংশের আলোচনায় বিভিন্ন ইতিহাসবিদের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিয়েছি।

প্রথমে আমরা দ্বিতীয় স্তরের বণিক, অর্থাৎ যারা এদেশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল তাদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই বণিকরা ভারত মহাসাগর দিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পূর্বে সুন্দা উপসাগর পর্যন্ত এদের বাণিজ্যিক কাজকর্মকে বিস্তৃত করে এডেন ও মালাক্কা পর্যন্ত বাণিজ্য চালাত। এই বাণিজ্যিক কাজকর্মে কালিকট (মালাবার), মাসুলিপত্তম (করমণ্ডল), সুরাট (গুজরাত), হুগলি (বাংলা) ও বালেশ্বর (ওড়িশা) বন্দর যুক্ত হত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে যুক্ত বণিকরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিলেন। গুজরাতিরা ছিল বাণিজ্যের সিংহভাগের কারবারি। ব্যবসা সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই চলত, এবং লাভই ছিল ব্যবসার

প্রধান প্রেরণা। তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্ণভেদ কোনও বাধা হত না। আধুনিক গবেষণা দেখায় যে, প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা, কোনও ক্ষেত্রেই বর্ণভেদের বিশেষ কোনও ভূমিকা ছিল না। এই বণিকরা দামী ও স্বল্প ওজনের পণ্যের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ধান ও মোটা কাপড় নিয়েও বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্যে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখারও তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সুরাটের বণিকরা বন্দরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনকারীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু সর্বত্র এই চিত্র দেখা যেত না। । বড় বড় বণিকরা অনেক সময়েই গ্রামে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তীদের ওপর নির্ভর করত। সবচেয়ে নীচের স্তরে ছিল পাইকাররা। এরা প্রাথমিক উৎপাদকদের সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহের চুক্তি করত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য পাওয়ার চুক্তিতে প্রাথমিক উৎপাদককে দাদন দিত। বছরে বছরে দাদন দিয়ে নতুন চুক্তি করা হত। চাহিদা অনুসারে দাদন ও মাল সরবরাহ কখনও বাড়ানো, কখনও কমানো হত। এই পাইকারদের ওপরে ছিল বিভিন্ন স্তরের দালাল, যাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীর কারবার চলত। ফলে এইসব সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রাথমিক উৎপাদকদের কোনও যোগাযোগ থাকত না। ব্যবসায়ের লাভ মূলধনের আকারে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হওয়ার কোনও সুযোগ থাকত না। এইসব বড় বাণিজ্যিক মূলধনের মালিকরা বা এদের সঙ্গে যুক্ত মধ্যবর্তী শ্রেণি কখনই কোনও উৎপাদককে মাল সরবরাহের জন্য নিয়োগ করত না বা সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। এই বণিকদের পাশাপাশি আঞ্চলিক বাণিজ্য চলত আর-এক শ্রেণির বণিকদের মারফত, যাদের আমরা তৃতীয় ধরনের বণিক বলে উল্লেখ করেছি। অঞ্চলবিশেষে বিশেষ পণ্যের উৎপাদন হওয়া বা না-হওয়ার কারণে বিশেষ অঞ্চলে কোনও বিশেষ ধরনের পণ্য হত সুলভ, আবার অন্য অঞ্চলে তার অমিল ঘটত। ফলে এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে সরবরাহ করার প্রয়োজনই এই বাণিজ্যের চালিকাশক্তি।

শেষ স্তরে ছিল স্থানীয় বণিকরা। এই স্থানীয় বণিকরা কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষিজাত পণ্য কিনে তারা বড় শহরের গোলদারদের কাছে বিক্রি করত এবং বড় ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে তাদের ব্যবসা চালাত। গ্রামে ধান-চালের ব্যবসায়ে অগ্রণী ছিল ব্যাপারিরা। ইতিহাসবিদদের পর্যবেক্ষণে এই ব্যাপারিদের দু'টি ভাগ দেখা গেছে: 'লাদু বলদিয়া' ও গৃহস্থ ব্যাপারি। লাদু বলদিয়ারা বলদের সাহায্যে হাট থেকে কৃষকের ধান কিনে গোলদারের গোলায় বিক্রি করত। দ্বিতীয় ধরনের ব্যাপারিরা গৃহস্থ, তারা নিজেরাই ছিল সম্পন্ন চাষি। এরা বড় মাপের মূলধন বিনিয়োগ করে ধান মজুত রাখত ও পরে বলদিয়া ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করত। এছাড়া অন্যান্য ব্যবসা, যেমন নুন, লোহা, চিনি বা রেশমি সুতোর কাপড়ের ব্যবসা চলত। কৃষকরা গৃহভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় এইসব পণ্য উৎপাদন করত। অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী মারফত তা পরপর বিভিন্ন স্তরের বড় ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে শহরে ও বিদেশে চলে যেত। ব্যাপক দাদনের ব্যবস্থা ছিল। বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাপারিরা ছোট ব্যবসায়ী মারফত কৃষকদের অগ্রিম দিয়ে রাখত। সাধারণত ফসল ওঠার অনেক আগে যখন বাজারে ফসলের দাম অত্যন্ত বেশি, তখন এই অগ্রিমের টাকায় তারা অল্পই ধান কিনতে পারত। অগ্রিমের টাকা শোধ দিতে হত ফসল ওঠার পর, যখন ধানের দাম থাকত যথেষ্ট কম। ফলে চাষিকে অনেক বেশি ধান বাজারে বিক্রি করে এই দাদন শোধ দিতে হত। এই প্রক্রিয়ায় ফসল কাটার আগের ও পরের ধানের দামের তফাত মারফত ছোট চাষিদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত, উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে

ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যেত। আবার ব্যবসায়ীরাও এই উদ্বৃত্ত মূলধনের আকারে জমিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল না। ছোট ব্যবসায়ীদের লাভের বড় অংশ চলে যেত বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। কারণ এই বড় ব্যবসায়ীরাই পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে এদেরই যোগাযোগ থাকত দূরের বাজারের সঙ্গে। এইভাবে একটি সম্পন্ন ব্যবসায়ীশ্রেণি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে বাজারের সংযোগ অথবা কৃষি-অর্থনীতিতে টাকার অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষির ধনতান্ত্রিক ধরনের রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগ ছিল না। ছোট চাষির অবস্থা একই থেকে যেত। আবার পশ্চিমা দেশের মতো বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক লাভ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, ছোট ছোট অসংখ্য উৎপাদকদের একত্রিত করে ধনতান্ত্রিক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করার ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে আকর্ষণীয় ছিল দাদন মারফত চাষির তৈরি উদ্বৃত্ত করায়ত্ত করা ও আরও বড় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা।

মুঘল যুগে বাণিজ্যের এই প্রসার সত্ত্বেও কৃষি থেকে রাজস্বের তুলনায় বাণিজ্য থেকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল খুবই কম। রাষ্ট্রের কাছে বাণিজ্যে লাভ বা ক্ষতি ছিল ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত কৃষকদের টাকার অঙ্কে দেয় রাজস্ব মেটাতে গিয়ে তাদের উৎপাদিত ফসলের প্রায় অর্ধেক বিক্রি করতে হত। সেখানে বণিকদের শুল্ক ছিল তাদের মোট লভ্যাংশের শতকরা আড়াই থেকে পাঁচ ভাগ। এ থেকে মানুষের জীবনযাত্রায় বাণিজ্যের তুলনায় কৃষির গুরুত্ব কিছুটা আঁচ করা যায়। অবশ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র টাকায় রাজস্ব দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল এমন নয়। দক্ষিণ ভারতে অনেক জায়গাতেই কোথাও কোথাও টাকা ও ফসল দু'ভাবেই রাজস্ব দেওয়া হত, জম্মু ও কাশ্মীরে পুরোপুরি ফসলেই রাজস্ব দেওয়া হত।

আমরা দেখেছি, মুঘল রাষ্ট্রের আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষি থেকে কৃষকদের উৎপাদিত উদ্বৃত্তের অংশ হিসেবে। মুঘল রাষ্ট্র সবসময় কৃষকের জমি চাষের অধিকারকে স্বীকার করে নিত। জমির ওপর কৃষকের ভোগদখল ও স্বত্বাধিকারকে মুঘল রাষ্ট্র মেনে নিয়েছিল। অপরপক্ষে কৃষকদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার বা জমি হাতবদল করার অধিকার ছিল সীমিত। রাজস্বের ঘাটতি ঠেকাতে, বা রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যও, মুঘল রাষ্ট্র সবসময় চাইত যাতে সব জমিতে আবাদ হয় ও বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন হয়। তাই নতুন অনাবাদি জমিকে কৃষির আওতায় আনলে বা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে ধার্য রাজস্বের হার কমানো হত। বীজধান বা গরু কেনার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার অন্যতম অধিকার ছিল কৃষকদের।

কিন্তু অর্থের অনুপ্রবেশ ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের প্রভাবে কৃষি-অর্থনীতির অভ্যন্তরে প্রগতিশীল উপাদানের কতটা বিকাশ ঘটেছিল তা আলোচনার দাবি রাখে। ইতিহাসবেত্তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বণিকশ্রেণি কৃষিতে উৎপাদনশীল অর্থবিনিয়োগের চেষ্টা করেনি। কৃষি-উৎপাদনের ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলিকে অথবা হস্তশিল্পের ইউনিটগুলিকে একত্রিত করে বড় উৎপাদন-ক্ষেত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে গঠনগত রূপান্তর আনার কোনও চেষ্টাও তাদের ছিল না। কৃষি-উৎপাদকদের মধ্যেও, যতদূর জানা যায়, তেমন কোনও উদ্যোগ ছিল না। অবশ্য ইতিহাসবিদরা মুঘল যুগে কৃষকদের মধ্যে স্তরভেদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কৃষকদের মধ্যে প্রথম দু'টি স্তর হল 'খুদ-কশথ' রায়ত ও 'পাহি-কশথ' রায়ত। যে-রায়ত নিজে নিজের জমি চাষ করে, তারই নাম খুদ-কশথ। এদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এরা হাল-গরু ইত্যাদি চাষের উপকরণের মালিক, এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এরা নিজেদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

দাক্ষিণাত্যে এদের মিরাসিদার বলা হয়। যদিও এদের নিজের জমি বিক্রি বা হস্তান্তরের অধিকার ছিল, তবুও সেই যুগের দলিল ইত্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ধরনের হস্তান্তরের নিদর্শন অতি বিরল। এরা এদের নিজেদের জমিতে অন্য কৃষককে ভাগ-চাষি হিসেবে নিয়োগ করতে পারত কি না, এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলা দেশে খুদ-কশথরা ফসলের সাতভাগের একভাগের বিনিময়ে ভাগ-চাষি নিয়োগ করত বলে জানা যায়। এছাড়া, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে ভাগ-চাষ প্রথার নিদর্শন পাওয়া গেছে। খুদ-কশথরা অনেক সময় সমষ্টিগতভাবে খাজনা মেটাতে বাধ্য থাকত। খুদ-কশথরা সাধারণত ছিল উচ্চবর্ণের কৃষক। কৃষকদের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য স্তর হল 'পাহি-কশথ'। 'পাহি-কশথ'রা ছিল কোনও গ্রামে বহিরাগত ভিন্ন বর্ণের চাষি। জঙ্গল কেটে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য এদের চাষের অধিকার দেওয়া হত। এরা এক গ্রামের বাসিন্দা হলেও অন্য গ্রামে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় এনে চাষ করত। চাষের হাল-বলদ ইত্যাদি উপকরণ এদের কাছে থাকতেও পারত আবার নাও থাকতে পারত। অনেক সময় চাষবাসের প্রসারের জন্য অনাবাদি জমি চাষযোগ্য করার প্রয়োজনে জমিদার-মহাজনরা এদের উৎসাহ দিত। কোথাও কোথাও এরা ভাগচাষি হিসেবেও চাষ করত। তৃতীয় ধরনের কৃষকরা 'মুজারিয়ান' নামে পরিচিত ছিল। এরা আসলে ছিল ভাড়াটে চাষি। এরা খুদ-কশথ কৃষকদের জমিতে বা জমিদারের জমিতে চাষ করত, এবং জমিদার বা উচ্চশ্রেণির কৃষককে খাজনা দিত। রাষ্ট্রের রাজস্ব দেওয়ার জন্য এরা দায়বদ্ধ ছিল না। এরা যাদের জমি চাষ করত তারাই রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিত। ভূমিহীন চাষিরা ছিল চতুর্থ ধরনের চাষি। ব্রিটিশ যুগে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মুঘল আমলে এদের উপস্থিতিরও নানা তথ্য মেলে।[৮] সাধারণত নিম্নবর্ণ বা উপজাতিদের থেকেই এই ভূমিহীন চাষিরা আসত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এদের সঙ্গে অন্য যে-কোনও ধরনের চাষিদের তফাত হল, অন্যান্য শ্রেণির কৃষকদের জমির ওপর কোনও-না-কোনও স্বত্ব ছিল, কিন্তু এদের তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রেণির চাষিরা যেখানে প্রধানত কৃষি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করত, এরা সেখানে অন্য নানাপ্রকার কাজে যুক্ত থাকত। বিশেষ করে তথাকথিত 'নিচু' কাজগুলি এদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

গ্রামীণ সমাজে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি ছিল মহাজন। মুঘল রাষ্ট্রে টাকার ব্যবহার ছিল যথেষ্ট। প্রথমত, টাকা ও দ্রব্য, এই দুই উপায়ে রাজস্ব আদায় করা হলেও বেশিরভাগ সময়ে টাকার অঙ্কে আদায়ীকৃত রাজস্বই মুঘল রাষ্ট্রের বেশি পছন্দ ছিল।[১৭] দ্বিতীয়ত, বিরাট ধান-চালের কারবার ও দেশে-বিদেশে প্রসারিত বাজারের জন্য বস্ত্রশিল্পের বিরাট প্রসার সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রামীণ অর্থনীতিতে টাকার প্রচলন বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে, বিশেষ করে টাকার প্রচলন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতিতে আরও একটি বিষয় উপস্থিত হয়। এই নতুন বিষয়টি হল চড়া সুদের ঋণ নিয়ে কারবার চালানো মহাজনদের গুরুত্ব। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায়, গ্রামগুলিতে অধিকাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত। গ্রামের মানুষের ঋণগ্রস্ততার মূল কারণ ছিল রাজস্বের অতিরিক্ত চাপ। এর সঙ্গে যুক্ত হত কর বা অন্যান্য নানা প্রকার দাবি। এছাড়া দুর্ভিক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি কারণেও কৃষকদের মহাজনদের কাছে ঋণ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। শুধুমাত্র কৃষকরাই নয়, এমনকী জমিদাররাও কখনও কখনও নিজেদের চাষের জমি আবাদ করবার জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হত।

এছাড়া জমিদাররা যখনই নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারত না, তখনই মহাজনদের ওপর তাদের নির্ভর করতে হত।[১৮]

কৃষকদের দিক থেকে মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার আর-একটি বড় কারণ ছিল, জমিতে আবাদের জন্য মূলধন সংগ্রহ। তখনকার রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুযায়ী আবাদের জন্য ঋণ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র অনেক সময় নিজে জামিনদার থেকে মহাজনের মাধ্যমে টাকা দিত। মহাজন অনেক সময় গরু, বীজধান ইত্যাদি ধার দিত এবং টাকার সমান হারেই সুদ নিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বণিক, বা চাষের পাশাপাশি পণ্য বিক্রির ব্যবসায় যুক্ত কোনও সম্পন্ন চাষি— তারাই মহাজনি কারবার চালাত।

মহাজনদের সুদের হার ছিল অত্যন্ত চড়া। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, এই হার কোথাও কোথাও বার্ষিক শতকরা দেড়শো ভাগের বেশি হয়ে যেত। কিন্তু এটা হল সরল সুদের হিসেব। সুদ বাস্তবে নেওয়া হত চক্রবৃদ্ধি হারে। এছাড়া মহাজনরা ধার দেওয়া ও ধার শোধ নেওয়ার যে-পদ্ধতি অনুসরণ করত তাতে অতিরিক্ত ঋণ ও সুদের চাপে চাষিরা নিঃস্ব হয়ে যেত। বণিকরা শস্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে দাদন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করত। দাদন ব্যবস্থায় সাধারণত শস্য ওঠার আগে চাষিদের নির্দিষ্ট হারে শস্যে ধার শোধ নেওয়া হত। ধার শোধ নেওয়ার সময় ফসল ওঠার পরপরই বাজারে তার দাম থাকত কম, কিন্তু সেই দামেই শোধ দেওয়া শস্যের পরিমাণ ঠিক হত। ফলে চাষিরা অনেক বেশি পরিমাণ শস্যের মাধ্যমে তুলনায় কম পরিমাণ ধার শোধ দিতে পারত।

কৃষকদের জমির ওপর স্বত্ব ও বিভিন্ন প্রকার অধিকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থারও যথেষ্ট ফারাক ছিল। স্বত্বাধীন জমির পরিমাণ ও মালিকানাভুক্ত বলদের সংখ্যা দিয়ে এই ফারাক মাপা হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা[১৯] থেকে দেখা গেছে, জমি ও এইসব উপকরণের মালিকানার ধরনে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য অসাম্য ছিল। সেই যুগের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি সম্পন্ন চাষি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। সেইসঙ্গে চিহ্নিত করা যায় একটি ভূমিহীন নিঃস্ব চাষিগোষ্ঠীকেও। এখন প্রশ্ন হল, উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের কাজে এরা কতটা উদ্যোগী হয়েছিল? প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, গোটা মুঘল আমলে কৃষিকাজের বিস্তার হয়েছিল, এ ব্যাপারে মুঘল শাসকরা জমিদার ও সম্পন্ন কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ ও সহায়তা দিতেন। অনেক জমিদার জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন জোত সৃষ্টি করে আবাদ শুরু করার উদ্যোগকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। সম্পন্ন কৃষক বলতে বড় জমির খুদ-কশথরা খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের জন্যও নানাবিধ শস্য উৎপাদন করত। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সম্পদশালী খুদ-কশথদের হাতে লাঙলের সংখ্যা বেশি থাকত, ফলে জঙ্গল কেটে আবাদ বিস্তৃত করে এরা চাষের প্রসার ঘটাত। কিন্তু এক্ষেত্রে আর-একটি দরকারি প্রশ্ন হল, এরা বড় আকারের জমিতে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে সংগ্রহ করা শ্রম কাজে লাগাত, শুধুমাত্র পারিবারিক শ্রম দিয়ে এই চাষ সম্ভব হত না। অনেক ক্ষেত্রে এরা যখন ঋণের দায়ে জর্জরিত চাষির জমি কিনে চাষ সম্প্রসারণের চেষ্টা করত তখন সেই জমির প্রাক্তন মালিকরা হয় ভাগ-চাষি নতুবা ভাড়াটিয়া চাষি বা মুজারিয়ানে পরিণত হত। অনেক সময় বাইরের নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে ভৃত্যের মতো নিয়োগ করে তাদের দিয়ে কৃষিকাজ ও সেই সংক্রান্ত নানাপ্রকার কাজ করিয়ে নেওয়া হত। তাদের কী ধরনের পারিশ্রমিক দেওয়া হত, বা কোন শর্তে

নিয়োগ করা হত সে সম্বন্ধে পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায়নি। গোলমরিচের মতো বাণিজ্যিক ফসলের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের যে-তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, মালাবারে গোলমরিচের চাষ করত ছোট চাষিরা। অষ্টাদশ শতকের শেষে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায়, বড় জোতে উচ্চশ্রেণির মালিকরা নিজেদের সরাসরি তদারকিতে মজুর দিয়ে গোলমরিচ চাষ করাত অথবা জমি ইজারা দিয়ে চাষ করানো হত। সবক্ষেত্রে কৃষক বা মজুররা অন্যের জমি চাষ করার জন্য ফসলের সামান্য অংশ নিজেদের থাকা-খাওয়ার জন্য পেত। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এই ধরনের চাষ করার জন্য মূলধনের সংস্থান কোথা থেকে হত সেটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অনেক সময় খুদ-কশথ কৃষকরা বণিক-মহাজনের ওপর ঋণের জন্য নির্ভর করত। এইভাবে বাণিজ্যিক মূলধন ঋণ আকারে কৃষিতে বিনিয়োগ হত। এইভাবেই কৃষিতে বাণিজ্যিক পুঁজির সাহায্যে জোত সৃষ্টি হত ও সরাসরি মালিকের তদারকিতে কৃষি-মজুর নিয়োগ করে চাষ হত। নীল চাষের ক্ষেত্রে অনেক সময় বণিক আপন উদ্যোগে ও তদারকিতে সরাসরি বাণিজ্যিক মূলধন বিনিয়োগ করে চাষ করত। কিন্তু এই ধরনের নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা মুঘল যুগের কৃষির কতটা অংশে ছিল সে সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না। কৃষি-উদ্বৃত্তের কতটা অংশই বা মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ হত সে সম্বন্ধেও কোনও তথ্য নেই। তবে অন্যান্য কিছু কিছু প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, উৎপাদনে কৃষি-উদ্বৃত্তের ব্যাপক বিনিয়োগ সম্ভবত হতে পারত না। এর প্রথম কারণ, মহাজনদের ওপর প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের জন্য নির্ভরতা। মহাজনদের চাপানো বিরাট সুদের বোঝা ও অসুবিধাজনক ধার শোধের শর্তের কারণে চাষিদের উদ্বৃত্ত মহাজনের ধার শোধ করতেই চলে যেত। গরিব ও ছোট চাষির ক্ষেত্রে ঋণ শোধের দায় মেটানোর পর খাওয়ার মতো ফসল অবশিষ্ট থাকত না। সেইসঙ্গে কৃষি-উৎপাদক ও কারিগরদের ওপর রাষ্ট্রের রাজস্বের যে-বোঝা বহাল ছিল তা যুগপৎ ছোট ও সম্পন্ন উভয় ধরনের চাষিদের, এবং কারিগরদেরও, উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পুরোপুরি অনুৎপাদক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরিয়ে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও মহাজনি মূলধনের কার্যকারিতার ফলে সম্পন্ন চাষি ও কারিগরের উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে বাণিজ্য-প্রক্রিয়া ও মহাজনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে। ফলে দুর্বলভাবে গঠিত কৃষি ও কারিগরি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ওপর একদিকে রাষ্ট্রের চাপ, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ও মহাজনি মূলধনের কর্তৃত্ব, এই উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিকে দুর্বলতর করতে থাকে।

অন্যদিকে মুঘল রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে। এর কারণ কৃষি-উৎপাদনের স্থিতাবস্থা এবং জায়গির থেকে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় না হওয়ার কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট ও এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর বিশাল সম্প্রসারণ। কৃষি-উৎপাদনের স্থিতাবস্থার কারণে মুঘল সম্রাট বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে উচ্চতর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোর খাটিয়ে মুঘল শাসকের শাসনাধীনে নিয়ে আসতে চাইছিল। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য এবং এই ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য, প্রত্যেক অঞ্চল থেকেই একাধিক প্রভাবশালী শাসককে জায়গির দিয়ে মনসবদারি অধিকার দিতে হচ্ছিল। ক্রমে মনসবদারির দাবি তোলা প্রার্থী-আমলাদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অভাব ছিল যথেষ্ট জায়গিরের। ফলে শাসকগোষ্ঠীর এই বিশাল সম্প্রসারণ আরও বেশি রাজস্বের জন্য স্থানীয় জমিদার, কৃষক ও কারিগরদের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। অথচ উপস্থিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কোনও উপায় ছিল না। কৃষক ও জমিদারদের ওপর প্রচণ্ড চাপের ফলে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটতে

দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদার বা রাজারা মুঘল শাসন অস্বীকার করে নিজেদের এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় পূর্বতন শোষিত শ্রেণির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর বা পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন কোনও ব্যবস্থার সূচনা হওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় না। এদেশের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পেলে এই অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য-সম্পর্কের ওপরে বৈদেশিক বাণিজ্য কোম্পানি এবং তাদের এদেশীয় এজেন্টদের চাপ এসে পড়ত। অপর পক্ষে সেই চাপ আরোপিত হত দেশীয় বণিকদের ওপর এবং সেইসূত্রে, পরোক্ষভাবে হলেও, তা পৌঁছাত দেশীয় চাষিদের ওপর। তবে দেশের বণিক শ্রেণির সঙ্গেই এদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক
ভারতে ব্রিটিশ যুগ: পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা

কৃষি ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য উৎপাদন-কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৌশলের মান উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-কাঠামোর পিছিয়ে পড়া চরিত্র প্রকৌশলের উন্নতিতে বাধা দেয়। অন্যদিকে উৎপাদন-কাঠামোতে প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের সূচনা হলে প্রকৌশলের উন্নতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতীয় কৃষির অনুন্নয়নের জন্য কৃষিতে প্রকৌশলগত উন্নয়নের অভাবকে দায়ী করেন, আবার অনেকে মনে করেন ভারতীয় কৃষির প্রকৌশলগত অনুন্নয়নের কারণ তার ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাদপর উৎপাদন-কাঠামো। তাই ভারতীয় কৃষির তুলনামূলক পিছিয়ে-পড়া দিকগুলি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তখন অবশ্যই কৃষির উৎপাদন-কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত জরুরি হয়ে উঠবে।

ব্রিটিশ শাসনের আগে জমির প্রকৃত মালিক ছিল রাষ্ট্র। জমিদার ছিল স্থানীয় শাসনকর্তা। জমিদার তার এলাকার চাষিদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদনের একটা অংশ কর হিসেবে আদায় করত, এই করের বেশি অংশ রাজস্ব হিসেবে সম্রাটের রাজকোষে চলে যেত। এইভাবে কৃষি-উদ্বৃত্ত কৃষির উন্নতিতে নিযুক্ত না হয়ে জমিদার ও সম্রাটের বিলাসব্যসন ও প্রজাদের শাসন করার জন্য ও যুদ্ধবিগ্রহের কাজে সেনাবাহিনী রক্ষার প্রয়োজনে ব্যয় হত। প্রকৃত উৎপাদক চাষি জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল, জমি থেকে তাকে আলাদা করা যেত না। চাষবাস, জমির উন্নতি, চাষের উন্নতি, এ সব কিছু চাষির ওপরেই নির্ভর করত। জমিদারের দাবি মেটানোর পর নিঃস্ব চাষির জমির ওপর বিনিয়োগ করার কোনও উৎসাহ বা ক্ষমতা থাকত না। এই অবস্থা কৃষিকে স্থবির করে রেখেছিল। কৃষি-উদ্বৃত্ত ক্রমে কমতে থাকে, জমি থেকে আদায় করা করের পরিমাণ কমে। কর আদায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে। মুঘল শাসন সংকটে পড়ে।

ভারতে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অতি দুর্বল উপস্থিতি, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকের অধীনে ছোট ছোট রাজনৈতিক কেন্দ্রের স্বাধীন উপস্থিতিতে বিকেন্দ্রায়িত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ও তার জায়গায় বিকেন্দ্রায়িত স্থানিক অর্থনীতি, বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশের রাস্তা সহজ করে তুলেছিল। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি এই দুর্বলতার সুযোগে কেন্দ্রীয় শক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থের পক্ষে ও দেশীয় অর্থনীতির স্বার্থবিরোধী নানা প্রকার শর্ত চাপিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দেখেছি, সেই সময়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিও প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ক্রমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

উত্তরণ-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করছিল। দেশে-বিদেশে নানাবিধ বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র সন্ধান করছিল দেশের মধ্যে। বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির শোষণমূলক প্রক্রিয়ার চাপে নিঃস্ব ছোট উৎপাদক তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি থেকে ও ছোট হস্তশিল্পগুলি থেকে উৎখাত হয়ে ক্রমে স্বাধীন শ্রমিকে পরিণত হচ্ছিল। ওদিকে বাণিজ্য ও মহাজনি ক্রিয়ার মাধ্যমে পুঞ্জীভূত আর্থিক পুঁজির বিনিয়োগ ঘটতে থাকে। সেটা কাজে লাগে ওই উচ্ছেদ হওয়া সর্বহারা শ্রেণিটির শ্রম, তাদের জমি– যে-জমি এই উচ্ছিন্ন শ্রেণিটির সঙ্গে এতাবৎকাল যুক্ত ছিল, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপকরণগুলিকে একত্রিত করতে। এইভাবে আর্থিক পুঁজির উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে ছোট পুঁজিবাদী উৎপাদন-ক্ষেত্র গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীতে গিল্ড পরিচালিত কয়েকটি ছোট হস্তশিল্পকে এককাট্টা করে গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত বড় উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এইভাবে উৎপাদনে পুঁজিবাদী উৎক্রমণ প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে মসৃণ করার উপায় এবং ক্রমসঞ্চীয়মান পুঁজির উৎপাদনশীল বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবাধ রাখার উপায় হিসেবে জরুরি ছিল প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শ্রমের জোগান সুনিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রমপ্রসারিত বাজার গড়ে তোলা। আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকার দেশগুলি এই কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের জোগান-ক্ষেত্র হিসেবে এবং নতুন উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসেবে কাজ করত। এই আর্থিক-রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দুর্বল দেশগুলিকে লক্ষ্যপূরণের কাজে বিনা বাধায় ব্যবহার করার জন্য রাজনৈতিক ভাবে তাদের অনুগত করে রাখার চেষ্টা চলে। ক্রমশ বলপূর্বক এক-একটি ছোট স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রে পূর্বতন শাসকদের উৎখাত করে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর পরিণতিতে এসব দেশের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির কিছুটা বাণিজ্যিকীকরণ হয়, এই অর্থনীতিগুলি এদের পূর্বতন আঞ্চলিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে সংযুক্ত হয়। কিন্তু এই আঞ্চলিক অর্থনীতিগুলির নিজস্ব উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদের অর্থনৈতিক নীতিগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির স্বার্থেই পরিচালিত হতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন: ভূমি-খাজনার নতুন রূপ ও পুরনো জমিদারি ব্যবস্থায় পরিবর্তন

১৭৫৮ সাল থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ঘটেছিল বলে ধরা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কর আদায় আরও সুনিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য এবং করের পরিমাণ সর্বাধিক করার জন্য ব্রিটিশ শাসক জমিব্যবস্থার সংস্কার করে। আগে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ ভূমি-খাজনা হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে জমা দিতে হত। এই ভূমি-খাজনার পরিমাণ মোট উৎপাদনের সঙ্গে ওঠানামা করত। ব্রিটিশ শাসকরা এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনল। প্রথমত ফসলের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ভূমি-খাজনা দেওয়ার রীতির অবসান ঘটল, চালু হল টাকার মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার রীতি। দ্বিতীয়ত, খাজনার পরিমাণ এখন উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভর না করে জমির পরিমাণের ওপর ধার্য হতে থাকল। ফলনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আর ভূমি-খাজনার পরিমাণের কোনও সম্পর্ক থাকল না। জমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে খাজনার বদলে ভূমি-কর

দেওয়ার রীতি চালু হয়। উত্তর ভারতে জমির ওপর ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দুই ধরনের অধিকার চালু ছিল। এই দুই ধরনের অধিকারভোগকারী রাজস্ব আদায়কারীরা ছিল প্রাথমিক জমিদার ও দ্বিতীয় স্তরের জমিদার, যাদের জমির ওপর সীমিত অধিকার ছিল। প্রাথমিক জমিদাররা প্রকৃতপক্ষে জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব ভোগ করত। প্রাথমিক জমিদারদের এই অধিকার ছিল হস্তান্তরযোগ্য, অর্থাৎ জমি বিক্রয় করার, এমনকী বন্ধকির মাধ্যমে তা হস্তান্তর করারও অধিকার ছিল তাদের। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক জমিদাররা প্রকৃত উৎপাদক চাষিদের জমি চাষের অধিকার দিতে পারত, বা তাদের স্থানান্তরিত করতে পারত। কিন্তু প্রাথমিক জমিদারির অধিকার সাধারণত একজন ব্যক্তির হাতে থাকত না। এই অধিকার সমগ্রত এক-একটি বিস্তৃত পরিবারের হাতে ছিল এবং একসঙ্গে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের ওপর সাধারণত এক-একটি পরিবারের স্থায়ী মালিকানা ন্যস্ত থাকত। এই মালিকগোষ্ঠীর হাতে শুধু যে প্রকৃত উৎপাদক চাষির সামাজিক জীবনের নানাদিকের নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল তাই নয়, তারা চাষিদের দিয়ে গ্রামের পতিত জমি সংরক্ষণ, কুয়ো খনন, বাগান তৈরি ইত্যাদিও করাত। দ্বিতীয় স্তরের জমিদারদের অধিকার শুধুমাত্র জমির খাজনা আদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এছাড়াও এরা কখনও কখনও তালুকদারদের মতো তাদের এলাকার আর্থিক আয়-ব্যয়ের দিকগুলো দেখাশোনা করত। প্রাথমিক জমিদারদের ক্ষমতা নির্ভর করত তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার পরিমাপ ও সাধারণ কৃষকদের উৎপাদনের ওপর তাদের আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণের ওপর। তাছাড়া তাদের নিজস্ব চাষের খাস জমিও থাকত, যা তারা ভাড়া করা চাষিদের দিয়ে বা ভাগ-চাষিদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিত। পরবর্তীতে পরিবারে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে বর্ধিত পরিবারের মধ্যস্থ এক-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবারের হাতে এই জমির পরিমাণ খুবই কমে আসে। এক-এক পরিবারের খাজনা আদায়ের এলাকাও আয়তনে অনেক কমে। ক্রমশ এদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এর ওপর জমির ওপর রাষ্ট্রকে দেয় খাজনার অত্যধিক চাপ শেষপর্যন্ত এইসব পুরনো প্রাথমিক জমিদারদের জমি থেকে ও তাদের জমিদারি ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রকে দেয় খাজনা টাকার অঙ্কে স্থির করে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে-নীতি প্রবর্তন করে তা এই চাপকে অস্বাভাবিক বাড়িয়ে তোলে। জমিদারের জমি, এবং তার খাজনা আদায়ের ক্ষমতা যেমন যেমন কমতে থাকে, পূর্বতন জমিদারদের জমি ও এস্টেটের ব্যাপক হস্তান্তরের ঘটনাও তেমন বাড়তে থাকে। পুরনো প্রাথমিক জমিদারদের জায়গায় স্থানীয় তালুকদার বা তহশিলদারদের হাতে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হতে থাকে। হস্তান্তরিত হতে থাকে মালিকানা, এবং গ্রামের জমিদারি অধিকারও। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জমি হস্তান্তর চলতেই থাকে। ব্রিটিশ সরকারের চাপানো অস্বাভাবিক খাজনার চাপে জমি ও এস্টেট, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে বিক্রি হতে থাকে ব্যাপক হারে।[২০]

গ্রাম-জীবন ও কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায় মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ

শুধুমাত্র ব্যাপক হারে খাজনার চাপই নয়, চাষের খরচ মেটানোর জন্যও চাষিদের ব্যবসায়ী-মহাজনদের কাছে ঋণ নিতে হত। চাষিরা কৃষি-পণ্যের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অগ্রিম নিয়ে চাষ করতে বাধ্য হত, টাকার অঙ্কে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাও ব্যবসায়ী-মহাজনদের ওপর তাদের নির্ভরতার একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা দেয়। ১৮৭১ সালে ঝাঁসির সেটেলমেন্ট অফিসারের বিবৃতি থেকে জানা যায়, এর আগে মরাঠা শাসনের

সময়েই চাষিদের ঋণ-বন্ধকি কৃতদাসে পরিণত করা হয়। চাষ শুরু হওয়ার আগে চাষিরা স্থানীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ওপর বীজ ও খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে বাধ্য হত, পরিণতিতে তারা ঋণ-বন্ধকি সূত্রে কৃতদাসে পরিণত হত। কিন্তু ১৮৬৪ সালেও চাষিদের ওই একই অবস্থার কথা জানা যায়। দেখা যায়, সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরগনাগুলিতে ১৮৭০-এর দশকের শেষভাগে মারোয়ারি ব্যবসায়ী-মহাজনরা ব্যাপক হারে চাষিদের ঋণে আবদ্ধ করে শস্যচাষ থেকে যাবতীয় লাভ আত্মসাৎ করছিল। এর পরিণামে জমি বন্ধকি ও জমি বিক্রির ঘটনা বাড়ে। চাষিদের ঋণগ্রস্ততা বাড়ার আর-একটি বড় কারণ ছিল চাষিদের ওপর বাঁধাধরা আর্থিক খাজনার বিপুল বোঝা চাপানোর সময় ফসলের বাৎসরিক উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা হিসেবে রাখা হয়নি। এই অবস্থা চাষিদের পুরোপুরি মারোয়ারি মহাজনদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে, তারা বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয়। গ্রামাঞ্চলের জমিগুলো ব্যাপক হারে শস্যের প্রকৃত উৎপাদকের হাত থেকে মারোয়ারি বহিরাগতদের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকে। প্রকৃত উৎপাদক ক্রমশ অধিকারহীন ভাড়াটে বা ভাগ-চাষিতে পরিণত হয়।[২১] ১৮০২ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে দেখা যায় বণিক-মহাজনরা ফতেপুর জেলার শতকরা ১১ ভাগ গ্রাম এবং কানপুরের শতকরা ১০ ভাগ গ্রাম তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। জব্বলপুরের কমিশনারের হিসেব অনুযায়ী, ১৮৭৪ সালে ২১১টি গ্রাম মারোয়ারি বণিক-মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সমস্ত বণিকরা, এমনকী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও, বস্ত্র, সুতা, নীল এবং চিনি উৎপাদনের জন্য দাদন হিসেবে চাষিদের টাকা দিত। বিভিন্ন স্তরে— গ্রাম থেকে শুরু করে পাইকারি বাজার অবধি— অগ্রিম হিসেবে দাদন দেওয়া হত। অত্যন্ত গরিব প্রাথমিক কৃষি উৎপাদকদের, এছাড়াও যেমন তাঁতিদের, দাদন দেওয়া হত। প্রাথমিক বিনিয়োগের জন্য তো বটেই, টাকায় খাজনা মেটানোর জন্যও। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে বণিকদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত ছিল। বণিকরা তাদের সুবিধাজনক শর্তে পণ্য কিনে নিত। ফলত লাভের বড় অংশ বণিকদের হাতেই চলে যেত।

ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন: প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের নতুন রূপ

অন্যদিকে এই প্রক্রিয়া পুরনো জমিদারদের খাজনাদাতা মালিকে পরিণত করে। ক্রমে এই মালিকদের সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায় ও এদের মালিকানায় থাকা ক্ষেত্রের পরিমাপ কমতে থাকে। এদের নীচে অসংখ্য অধস্তন খাজনাদাতা আধা-ভাড়াটে বা ভাগ-চাষির সৃষ্টি হয়। সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনা বাড়ানোর অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। খাজনা মেটানো ভাড়াটে ছোট চাষিরা এই চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের ভাড়াটে চাষির অধিকার বিক্রি করে দিয়ে অনেক সময় ভূমিহীন চাষিতে পরিণত হয়। কারও কারও জমির পরিমাণ এত কমে যায় যে, খাজনা দেওয়ার পর তাদের পরিবারের আর বেঁচে থাকার মতো সম্বল থাকে না, ফলে অনেকে কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়। তবে কৃষি-শ্রমিক দিয়ে জমিচাষ পদ্ধতি খুব বেশি প্রসার লাভ করেনি। ব্রিটিশ প্রশাসকদের ১৯১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, গোরক্ষপুরের মতো একটি অত্যন্ত জনবহুল জায়গায় কৃষিতে যুক্ত মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১১ ভাগ ছিল পুরোপুরি কৃষি-শ্রমিক। এর আগে ১৮৯১ সালের একটি প্রশাসনিক হিসাব থেকে দেখা যায়, দারিদ্র ক্ষুদ্র চাষিদের প্রায় দাসের স্তরে নিয়ে এসেছিল। বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তি ছিল খাজনাদাতা ক্ষুদ্র ভাড়াটে চাষি, বা ভাগ-

চাষি। ১৯১৯ সালে কোনও কোনও অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক চাষি ২ একরের কম জমি চাষ করত। ১৮৯৮ সালে মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, কৃষির ওপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ ছিল ভূমিহীন দরিদ্র কৃষি-শ্রমিক, এদের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ ছিল পুরোপুরি ভূমিহীন, মজুরিই ছিল তাদের একমাত্র আয়।[২২]

দক্ষিণ ভারতে কৃষি উৎপাদনের গঠনটি ছিল অত্যন্ত জটিল। ভাল সেচব্যবস্থা যুক্ত তামিল সমতলভূমি ও তেলুগু অঞ্চলের গ্রামের জমির ওপর গ্রাম-সমাজের যৌথ মালিকানা ছিল। এক-একজন সভ্যের হাতে থাকা গ্রামের মোট জমির অংশমাত্রার হিসেবে এই মালিকানার পরিমাপ হত। এই মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য ছিল। বিক্রি, বন্ধকি ও দানের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তিত হতে পারত। জমির ভাগীদারদের মধ্যে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে জমি পুনর্বণ্টন হত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন করে বড় জমির মালিক ছিল। এই ব্যবস্থাকে মিরাসিদারি ব্যবস্থা বলা হত। এদের স্থানীয়ভাবে জমিদার মনে করা হত এবং গোটা গ্রামের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এদের ছিল। সাধারণত এরা ছিল ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রধান মালিকরা গ্রাম-জীবনের বিভিন্ন দিকের নির্ণায়কের ভূমিকা নিত। সাধারণত গ্রামের যৌথ সমাজের কোনও প্রধান ছিল না। গ্রামের মিরাসিদাররা একযোগে প্রধানের দায়িত্ব পালন করত। যেমন, গ্রামের যৌথ সমাজের সভ্যদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য এরা দায়বদ্ধ ছিল। প্রধান মিরাসিদাররাই গ্রামে শ্রমিকদের যৌথ শ্রম সংগঠিত করে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সেচ ব্যবস্থা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকত। কিন্তু গ্রামের মানুষ ব্যক্তিগতভাবেই চাষবাস চালাত। অবশ্য, ব্রাহ্মণরা, ও অব্রাহ্মণ কিন্তু বড় জমির মালিকরা, লাঙল স্পর্শ করত না। এর বাইরেও এমন অনেক জমির মালিক ছিল যাদের কারও কারও হাতে জমির পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। কোনও কোনও মালিক কখনও কখনও শুধু হালবলদের মালিক ছিল এবং এগুলি থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত। কোনও চাষির নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া বেঁচে থাকার উপায় ছিল না, তারা অন্যের জমির ভাড়াটে চাষি হিসেবেও অনেক সময় জমির ওপর স্থায়ী দখলদারি স্বত্ব ভোগ করত। এই চাষিদের মধ্যে প্রধান দু'টি বিভাগ ছিল 'উলুকুদি' ও 'পারাকুদি'। উলুকুদিরা ছিল গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। এরা জমি চাষের অধিকতর নিশ্চিত অধিকার ভোগ করত, কখনও কখনও তাদের এই অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক। পারাকুদিদের জন্য মাত্র এক বছরের মেয়াদে চাষের অধিকার নিশ্চিত থাকত। এই দু'ধরনের চাষিদেরই ভাড়াটে চাষি বলা যেতে পারে, কারণ এরা মিরাসিদার বা ইনামদারদের অধীনে নিয়মিত ভূমি-খাজনা দেওয়ার বিনিময়ে এই অধিকার ভোগ করত। সব সময়েই যে এই উলুকুদি ও পারাকুদি চাষিরা মিরাসিদারের ভাড়াটে চাষি হিসেবে টিকে থাকত তা নয়, অনেক সময় এরা সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনেও চাষ করত। তখন এরা রাষ্ট্রকেই ভূমিখাজনা দিত এবং তার বিনিময়ে এই ধরনের অধিকার ভোগ করত। ভাড়াটে চাষিদের দেয় খাজনার পরিমাণ তাদের এই অধিকারের নিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণের ওপর নির্ভর করত। খাজনা কখনও কখনও টাকার অঙ্কে নির্ধারিত হত, কখনও বা ফসলের স্থির পরিমাণ হিসেবে। কিন্তু অধিকাংশ সময় ফসলের একটি অংশ খাজনা হিসেবে দেওয়া হত। মোট ফসল থেকে রাজস্ব বাদ দেওয়ার পর ফসলের উৎপাদন ব্যয় মেটানোর আগে গ্রস ফসলের পরিমাণের সাধারণত ১৮-৫০ ভাগ পর্যন্ত খাজনা হিসেবে দিতে হত। তাঞ্জোরে সবথেকে বেশি ক্ষেত্রে এই খাজনার পরিমাণ ছিল মোট গ্রস উৎপাদনের (ফসলের উৎপাদনব্যয় মেটানোর আগের পরিমাণের) চারভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ। এদের হাতে কোনও বিনিয়োগ করার

মতো পুঁজি থাকত না। সম্ভবত কৃষিকাজ পরিচালনার কোনও দায়িত্ব বা অধিকারও তারা ভোগ করত না। কৃষিকাজে ব্যাপৃত চাষিদের একটি বড় অংশ জন্মসূত্রেই দাস হয়ে জন্মাত এবং জীবনে আর তাদের তা থেকে মুক্তি জুটত না। এই শ্রেণিটি সাধারণত অস্পৃশ্য বর্ণ থেকে আসত। যেমন, কেরালার চেরুমান ও পুলায়ান গোষ্ঠী, তামিলনাড়ুর পারায়ুয়ান ও পাল্লান গোষ্ঠী, মহিশূরের হলেয়া গোষ্ঠী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মালা ও মাদিগা গোষ্ঠী। এই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ, মোট জনসংখ্যার যারা ছিল প্রায় শতকরা ১২ থেকে ২০ ভাগ, তাদের বড় অংশ সেচসেবিত অঞ্চলে বাস করত, এদের বেশির ভাগই ছিল কৃষি-শ্রমিক। বেশির ভাগ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থান ছিল দাসের মতো। এদের মলয়ালম ভাষায় বলা হত আদিমা, তামিল ভাষায় বলা হত আদিমাই। ইংরেজিতে এই শব্দগুলি অনুবাদ করে এদের ‘স্লেভ’ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে ‘স্লেভ’ শব্দটি এ ক্ষেত্রে মোটেই অপপ্রয়োগ নয়। কারণ এদের কেনাবেচা করা হত, বন্ধক দেওয়া হত, ভাড়াও দেওয়া হত। ঠিক যেভাবে জমি হস্তান্তর হত, সেভাবেই এই কৃষি-শ্রমিকরাও নানা প্রকারে হস্তান্তরিত হত, এমনকী মেয়ের বিয়ের বর পণ হিসেবে বা উপহার হিসেবেও এক হাত থেকে অন্য হাতে এদের হস্তান্তরিত করা যেত।[২৩] দেশীয় রাজা, এবং ব্রিটিশ সরকারও, এদের মালিকের সম্পত্তি বলে মনে করত। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের রাজা নিজেই দাসমালিক ছিলেন। দাসদের স্ত্রী-পুত্রদেরও দাস বলে ধরা হত। পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের কেনাবেচা সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল এবং দাম সম্বন্ধে পরিষ্কার নির্দেশ ঘোষিত হত। বিশেষ করে দক্ষিণ ও মধ্য মালাবার অঞ্চলে এই ধরনের ক্রীতদাসদের বহুল উপস্থিতি ছিল। শুধু কৃষিতেই নয়, লৌহখনিতেও এই ধরনের দাসদের দিয়ে কাজ করানো হত।[২৪]

ইংলন্ডে দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের পরিণামে ভারতেও ১৮৪৩ সালে দাসপ্রথাবিরোধী আইন প্রণীত হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যেও ১৮৫৫ সালে দাসপ্রথাবিরোধী আইন চালু হয়েছিল। এর ফলে সরকারি স্তরে দাসের ব্যবহার বন্ধ হলেও, ব্যক্তিগত স্তরে দাস ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন আসে না। ঋণবদ্ধতা ও তার থেকে উদ্ভূত দাসত্ব কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। মাদ্রাজ ও কেরালাতে বংশানুক্রমিক দাসত্ব সংক্রান্ত তথ্য আছে।[২৫] শুধুমাত্র ঋণের কারণেই যে দাসত্ব সৃষ্টি হত তা নয়, চরম দারিদ্র, জীবিকার যথেষ্ট উপায় না থাকা, ইত্যাদি কারণে ভরণপোষণ সুনিশ্চিত করার দায়ে বহু মানুষ অনেক সময় দাসত্ব বা ভূমিদাসত্ব বেছে নিত।

দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার পত্তন হয়নি। জমির মালিকের কাছ থেকে রাষ্ট্র সরাসরি রাজস্ব আদায় করত, কখনও কখনও কোথাও কোথাও পুরনো জমিদারদের মাধ্যমে অথবা রাষ্ট্রের নিয়োগ করা কর-আদায়কারীকে দিয়ে গোটা গ্রাম থেকে ভূমিকর আদায় করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে ভূমিব্যবস্থা ও কর আদায়ের ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়। করের হিসাবের নতুন পদ্ধতিতে প্রত্যেক জোতের জন্য আলাদা হিসাব করে কর আদায় আরও নিয়মমাফিক করা হয়েছিল। ১৭৯২-১৮০১ সালের মধ্যে সালেম, কোয়েম্বাটোর, কুডাপ্পা, বেল্লারি, মাদুরা, মালাবার, কানাড়া, ও কুরনুল— এইসব জেলায় রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার অনুকরণে মাদ্রাজের কিছু অঞ্চলে জমিদারি ব্যবস্থা দেখা দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে অনুপস্থিত জমিদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিছু কিছু শিল্প গড়ে উঠতে থাকলেও শহরগুলি উন্নত হয়ে ওঠার ফলে সম্পন্ন জমির মালিকদের, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ধনী ব্যক্তিদের শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এসবের পরিণামে খাজনাদাতা ভাড়াটে বা ঠিকা চাষিদের সংখ্যা ও ভাগ-চাষিদের সংখ্যা বাড়ে। ভাগ-চাষি দিয়ে চাষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, পশ্চিম ভারত, বিশেষ করে গুজরাত-মহারাষ্ট্রে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের ধরন নানা কারণে বাকি রাজ্যগুলি থেকে পৃথক ছিল। আবার বিভিন্ন দিক থেকে তা একরকম ছিল বলেও ধরা যেতে পারে। এই অঞ্চলগুলি বাণিজ্যিক ফসল, যেমন তুলা, ও একইসঙ্গে বস্ত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হওয়ার ফলে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটে, যার গভীর প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থার ওপর। অন্যদিকে শিল্পের, বিশেষ করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার, প্রসার হলে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এসে ভূমি-সম্পর্কের বিকাশের ওপর কিছুটা বিরোধী প্রভাব ফেলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বা কোনও কোনও অঞ্চলে তার আগে থেকেই, পশ্চিম ভারতের কৃষিতে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় ঘটনা ছিল এর পিছনে। প্রথমত, আমেরিকার সিভিল ওয়ার তুলার চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম ভারতে সেইসময় সরকারি উদ্যোগে রেল ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিনিয়োগ বাড়ে, ফলে তুলা ও সুতার রপ্তানি বাড়ে। তুলা ও সুতার বাজারদর বাড়তে থাকে। ১৮৬০-৬১, ১৮৬৯-৭০-এর মধ্যে তুলার দাম শতকরা ১৩২ ভাগ বাড়ে, তুলা চাষের অধীন জমির পরিমাণ বাড়ে শতকরা ৯৭ ভাগ। খাদ্যশস্যের উৎপাদনও ধীরে ধীরে বাড়ে। গমের দাম বাড়ে শতকরা ৯২ ভাগ ও দানাশস্যের উৎপাদনের অধীন জমির পরিমাণ বাড়ে শতকরা ১৬ ভাগ। প্রথম যে-গোষ্ঠীটি এই উন্নতিতে লাভবান হয়েছিল তারা হল বণিক ও মহাজন গোষ্ঠী। কিন্তু সরকারি তথ্য দেখায় যে, খুব ছোট চাষি বাদে অনেক চাষিই এই উন্নতিতে লাভবান হয়েছিল ও তাদের পুরনো ধার মিটিয়ে দিয়ে তারা স্বাধীন ও উন্নতিশীল চাষিতে পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের বিপরীতে কোনও কোনও সরকারি আধিকারিকের মত হল, মূলত, বা কেবলমাত্র, বণিকশ্রেণিই এই উন্নতি থেকে প্রায় সবটুকু লাভ আত্মসাৎ করেছিল।[২৬] পরবর্তী দশকে দেখা যায়, কৃষকদের উন্নতি বিশেষ হয়নি। একটি কারণ, ফসলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণও দ্রুত বাড়ায়। দেখা যায়, বিশেষ করে তুলা চাষের অঞ্চলগুলিতে রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ে। গোটা বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ১৮৫৬–৫৭ থেকে ১৮৭০–৭১-এর মধ্যে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ শতকরা ৩৭ ভাগ বাড়ে ও ১৮৯১ সালে আবার শতকরা ১৮ ভাগ বাড়ে। পুনার কয়েকটি তালুকে ওই সময়ে শতকরা ৫০–৬০ ভাগ রাজস্ব বাড়ে। ফলে দাম বাড়ার সুফল চাষিদের কাছে পৌঁছায় না।

ওই সময়ে পশ্চিম ভারতে, এমনকী গুজরাতেও, বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন বাড়ায় এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য আরও প্রসারিত হওয়ায়, মহাজন-বানিয়াদের প্রভাব বাড়ে, কারণ সমগ্র অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এরাই নিয়ন্ত্রণ করত। ব্রিটিশরাজ প্রণীত বিস্তৃততর নতুন আইনের সহায়তায় বণিকশ্রেণি চাষিদের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বানিয়ারা স্থানীয় আইন ও বিচার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত, তাই বানিয়ারা ঋণ সংক্রান্ত কেসগুলিতে সাধারণ অশিক্ষিত কৃষকদের নানাভাবে ঠকাবার সুযোগ পেত। ফলে চাষিদের ওপর ঋণের চাপ বাড়তেই থাকে। কিন্তু দেখা গেছে, এসব সত্ত্বেও ঋণের কারণে জমি হস্তান্তরের ঘটনা কমই ঘটেছিল।

কৃষির উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসারের সুফল বড় জমির মালিকরাই ভোগ করতে পেরেছিল, ফলে অপেক্ষাকৃত বড় চাষিদের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এরাই হতদরিদ্র ঋণগ্রস্ত চাষিদের জমি কিনে নিজেদের কলেবর বৃদ্ধির সুযোগ নেয়। এরা মহাজনদের বদলে নিজেরাই ঋণদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে এদের হাতেই বন্ধকি ও বিক্রি মারফত কৃষিজমির বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হয়।

এর পরিণামে ভূমি-সম্পর্কে দু’টি উল্লেখযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হয়। ভাগ-চাষ বা স্থির খাজনায় জমি ভাড়া দেওয়া, ও কৃষি-শ্রমিকের ব্যবহার বাড়ে। ১৮৮০ সালের পর থেকে মহারাষ্ট্রে ভাড়াটে চাষির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এরা সাধারণত ফসলে খাজনা দিত এবং জমির মালিক ভূস্বামী ভূমি-রাজস্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিলে ভাগ-চাষিদের ফসলের অর্ধেকটা খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দিতে হত। এই ভাড়াটে চাষিদের অনেকেই ছিল তাদের জমির ভূতপূর্ব মালিক-চাষি। এই ভূতপূর্ব মালিক চাষিরা বাদে অন্য ভাগ-চাষিদের কাছ থেকে ভূস্বামীরা বিনা মজুরিতে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিত। কৃষি শ্রমিকের ব্যবহার বৃদ্ধি সম্পর্কে দ্বিতীয় যে-উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি ইতিহাসবিদরা উপস্থিত করেছেন তা হল, ১৮৮১–১৯২১ সালের মধ্যে মোট শ্রমদাতা পুরুষের শতকরা ২২/২৩ ভাগ ছিল কৃষি-শ্রমিক। এদের মধ্যে গুজরাতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ কমছিল, কারণ এরা অধিকাংশই মূলত শহরে কাজের সন্ধানে বহির্গমন করত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কৃষি-শ্রমিকেরা ছিল ঋণ-আবদ্ধ শ্রমিক। অধিকাংশ সময়ে যারা ঋণ নেওয়ার সময় কোনও কিছু বন্ধকি রাখতে পারত না তারা তাদের শ্রম বন্ধক রেখে ধার নিত ও ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকি শ্রম দিতে বাধ্য থাকত। ধনী চাষিরা ছিল সাধারণত দেশমুখ বা পাতিল সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা এই ঋণ-বন্ধকি শ্রমিক, যাদের সালদার বলা হত, তাদের দিয়েই জমি চাষ করাত। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে অনেক আন্দোলন সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা বন্ধ করা যায়নি। অধিকাংশ জেলা গেজেটিয়ার থেকে যে-তথ্যটি পাওয়া যায় তা হল, ঋণ-গ্রহীতার শ্রমের ওপর ঋণদাতার এই অধিকার হস্তান্তরযোগ্য বা বংশানুক্রমিক ছিল না, যদিও বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানের শ্রম বন্ধক দিয়ে ঋণ নিতে পারবে, এমন ব্যবস্থাও চালু ছিল। অন্যদিকে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, কোনও কোনও জেলায় ঋণ শোধ না করেই যদি ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হত, তাহলে তাদের সন্তানদের দীর্ঘদিন ঋণদাতার কাছে শ্রম দিয়ে সেই ঋণ শোধ করতে হত।[২৭] সিভিল প্রসিডিওর কোড অনুসারে, ঋণ শোধ করতে অপারগ ব্যক্তিকে জেলে বন্দি করার অধিকার ছিল ঋণদাতার। সেই কারণে ঋণ পরিশোধ না করার কারণে দাস-শ্রমিকে পরিণত হওয়ার রীতিটাকেই ঋণগ্রহীতারা কম যন্ত্রণাদায়ক বলে ধরত। এইসব তথ্য

থেকে শ্রমিকের জমির সঙ্গে বাঁধা থাকার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়, শ্রমিকের সর্বহারায় পরিণত হয়ে শ্রমের বাজারে মুক্ত শ্রমিক হিসেবে উপস্থিত হওয়ার সপক্ষে বিশেষ কোনও সমর্থন মেলে না।[২৮]

পরবর্তী পরিবর্তনটি এল ১৭৯৩ সালে। সরকার ব্রিটিশ ভারতের কয়েকটি বিশেষ প্রদেশে–বাংলা, বিহার, ওড়িশা অঞ্চলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামের ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা উত্তর মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলে প্রসারিত হয়। পূর্বতন কর আদায়কারী জমিদারকে জমির সীমিত মালিকানা দেওয়া হয়। জমিদার বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে বাধ্য থাকত, তা সে বছর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও চাষিদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ যা-ই হোক না কেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ রাষ্ট্র জমিদারদের হাত থেকে জমির ওপর তাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারত।

ভারতে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষককুলের ওপর এই নতুন ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি হয়। প্রথমত, ফসলের পরিবর্তে অর্থের আকারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে হত বলে জমিদাররা ফসল ওঠার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে বাধ্য থাকত। দ্বিতীয়ত, খাজনার আকারে পাওয়া এই উদ্বৃত্ত ফসল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাজারজাত করতে হত। কর দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা রক্ষা করতে না পারলে এদের জমি নিলামে উঠিয়ে চড়া দামে অন্য কোনও উৎসাহী, অর্থবান, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত, ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত করা হত। এই পরিবর্তনের ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে। এর আগে থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, ফসল নষ্ট হওয়া, ইত্যাদি কারণে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ জমিদাররা কর মেটানোর দায়ে ব্যবসায়ী-মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত। ফলে, একদিকে চড়া সুদের মহাজনি ঋণ-ব্যবসা ও বন্ধকি বিপুলভাবে প্রসারিত হল, অন্যদিকে এই পরিবর্তনের ফলে কর দিতে ব্যর্থ পুরনো জমিদার শ্রেণির হাত থেকে জমিদারি অধিকার ব্যাপকভাবে নতুন ভূস্বামীদের হাতে হস্তান্তরিত হতে লাগল। এই নতুন ভূস্বামীরা ছিলেন বহুক্ষেত্রে পূর্বতন ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণি থেকে উদ্ভূত। পুরনো জমিদার শ্রেণি যতদিন পারা যায় তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা নিতে লাগল। কোনও কারণে ফসল নষ্ট হলেও চাষিদের খাজনা মকুব করার, বা কমানোর, অথবা খাজনা প্রদানের সময়সীমা শিথিল করার কোনও উপায় থাকত না। জমিদাররা চাষিদের কাছ থেকে তাদের শেষ সম্বল পর্যন্ত কেড়ে নিতে বাধ্য থাকত। ফলে একদিকে চাষিদের ঋণগ্রস্ততা বাড়ে, অন্যদিকে তাদের চাষের অধিকারও লুপ্ত হতে থাকে। প্রতিবাদে অনেক সময়ই নিঃস্ব চাষি চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। তখনও শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেনি। ঋণগ্রস্ত চাষি জীবিকার অন্য কোনও উপায় না দেখে ব্যবসায়ী মহাজনের কাছেই জমি বন্ধক রাখত এবং ক্রমে ঋণগ্রস্ত আবদ্ধ শ্রমিক, আবদ্ধ ভাগ-চাষি বা ভাড়াটে চাষিতে পরিণত হতে লাগল। ফলে ক্রমে কৃষি থেকে আহরিত করের পরিমাণ কমতে থাকে ও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ভূমি-রাজস্বের বদলে বাণিজ্য ও মহাজনির ওপর করের অঙ্কই ব্রিটিশ

শাসকের আয়ের বড় উৎস হয়ে দাঁড়াল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে উচ্ছেদ হওয়া ও আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত জমিদার ও জমিদারের নীচে অবস্থানকারী রায়তদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের একটি অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কৃষি উৎপাদনের তুলনায় কৃষিপণ্যের ব্যবসায় ও মহাজনিতে টাকা বিনিয়োগ করা বেশি লাভজনক। তারা তখন বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির দেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে থাকল। ভাগচাষে, অথবা স্থির খাজনার লিজ ব্যবস্থায়, ভাগ-চাষি বা ভাড়াটে চাষিকে দিয়ে এদের জমি চাষ করানোর ব্যবস্থা তখন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হল। কৃষিতে মহাজন-ব্যবসায়ী-মধ্যস্বত্বভোগী মালিকদের প্রাধান্য বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে বাড়ল আবদ্ধ শ্রমিক, ভাগ-চাষি বা ভাড়াটে চাষিদের সংখ্যা। ১৯২৮ সালের ভূমি আইন চাষিদের ভূমি হস্তান্তরের ওপর বাধানিষেধ আরও শিথিল করে। ইতিমধ্যেই ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনান্সি আইন, ও ১৯৩৮ সালে ওই আইনের সংশোধন, জমি হস্তান্তর সহজ করেছিল। ফলে ১৮৮৫ সালের পর থেকেই বিপুল সংখ্যায় জমির হস্তান্তর ঘটতে থাকে। যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায়, ১৮৮৫ থেকে ১৯১৩ অবধি সময়ে এই বিক্রির সংখ্যা শতকরা ৫০০ গুণ বাড়ে।[২৯] ১৯১৩ সালের পর বিক্রি কিছুটা কমার প্রবণতা দেখা গেলেও ১৯৩৭ সালের পর জমি হস্তান্তরের ঘটনা আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বিক্রিগুলির ক্ষেত্রে সবসময় কৃষকের পুরোপুরি উচ্ছেদ ঘটত এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ঋণের দায়ে তাদের মোট জমির একটা অংশ মাত্র বিক্রি করতে বাধ্য হত। আর-একটি অংশে তারা নিজেরা চাষের কাজ করত। ফলে এই প্রক্রিয়ায় কৃষকের উচ্ছেদ বা গ্রাম থেকে বহির্গমন সব সময় ঘটত না। কৃষক অনেক সময়েই আংশিক মালিক, আংশিক ভাগ-চাষিতে পরিণত হত। গ্রামে ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই বড় চাষির কলেবর আরও বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের জায়গায় মহাজন-ব্যবসায়ী-মালিকদের জমির পরিমাণ, সামাজিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে ও জমিদারদের প্রাধান্য কমতে থাকে। এই মহাজন-ব্যবসায়ী-মালিকদের মধ্য থেকে জোতদার নামে একটি নতুন শ্রেণির উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তারা জমি কেনায় অর্থ বিনিয়োগ করত এবং চাষিদের আবদ্ধ শ্রমিক, বা ঋণগ্রস্ত আবদ্ধ ভাগ-চাষিতে পরিণত করে নিজেদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাত। এই নতুন জোতদার শ্রেণিটির কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আসে। বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই নতুন জোতদার শ্রেণিটি গ্রামীণ জীবনে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং আবদ্ধ শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ, ভাগ-চাষের প্রচলন বাড়তে থাকে। উত্তর বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে সেই জমিতে ওই আদিবাসীদেরই ভাগ-চাষের জন্য জমি দিয়ে এই জোতদাররা নিজেদের ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত থাকত। যেসব জোতদার গ্রামেই বাস করত, তারা অনেক সময় ওই আদিবাসীদের মজুরির বিনিময়েও চাষ করাত। মজুরি নির্ধারণের নিয়ম কী ছিল তা জানা যায় না। এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেত স্থানীয় রীতি ও জোতদারের বিবেচনা।

অন্যদিকে ভাগ-চাষের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি হওয়া সত্ত্বেও ভাগ-চাষিরা জমির ওপর কোনও দখলদারি অধিকার ভোগ করত না। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকার খাজনার বিনিময়ে জমি লিজ দিয়ে ভাড়াটে চাষি দিয়ে চাষ করানোর ব্যবস্থায় সংস্কার আনার জন্য যে-আইন করেছিল, তাতে শুধুমাত্র স্থির খাজনার চাষিদের কথাই বিবেচনা করা হয়, ভাগ-চাষিদের বিষয়টি ছিল বিবেচনার বাইরে। ফলে ভাগ-চাষিদের দিক থেকে জমিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের আগ্রহ ছিল না, সামর্থ্যও না। জোতদারদেরও জমিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের

কোনও আগ্রহ ছিল না, কারণ তারা তাদের পুঁজি মূলত ব্যবসা ও অতিরিক্ত সুদে মহাজনি কারবারে বিনিয়োগ করে সহজেই মুনাফা করতে পারত। কৃষির মতো ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে তাদের প্রত্যাশিত আয় সেই তুলনায় বেশি ছিল না। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ওই সময়ে বাংলায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার ছিল অত্যন্ত কম। জর্জ ব্লিনে-র আলোচনা[৩০] থেকে আমরা যে-তথ্য পাই তা হল, ১৮৯১ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা পরিবর্তনের হার ছিল −০.৫৫, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার ছিল ০.৭৩ [উৎপাদনশীলতা পরিবর্তনের হার বলতে বোঝায়: (শেষ বছরের উৎপাদনশীলতা– প্রথম বছরের উৎপাদনশীলতা)/প্রথম বছরের উৎপাদনশীলতা। একে আবার বছরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি বছরের গড় পরিবর্তনটা বোঝা যাবে, এখানে উৎপাদনশীলতা কমছে, তাই মাইনাস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।]। নীচের সারণিটি তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের চাষ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জোগাতে পারে।

১৯৪০ সালে বাংলায় প্রচলিত চাষের বিভিন্ন ধরন

বাছাই করা কিছু জেলা	পরিবারের সদস্যদের দ্বারা (শতকরা)	ভাগ-চাষিদের দ্বারা (শতকরা)	মজুরি শ্রমিকদের দ্বারা (শতকরা)
দিনাজপুর	৭২	১৫	১৪
রংপুর	৭২	২৩	৫
জলপাইগুড়ি	৭০	২৬	৪
বগুড়া	৮১	১৬	৩
বীরভূম	৩৩	২৫	৪৩
বর্ধমান	৫৩	২৫	২২
মেদিনীপুর	৫৩	১৭	৩০
বাখরগঞ্জ	৫৫	৪৫	—
খুলনা	৪৮	৫০	২
২৪ পরগনা	৫১	২২	২৭
সমগ্র বাংলা	৬৬	২১	১৩

উৎস: Govt. of Bengal. 1940. vol-11, pg. 117–119.

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের কৃষিতে বাণিজ্যিক পুঁজির প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে, বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে উদ্ভূত ভারতীয় বণিক শ্রেণিটির প্রাধান্য কৃষি-অর্থনীতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই বণিক শ্রেণিটি ইউরোপের বণিক শ্রেণির মতো কৃষিতে

উৎপাদনশীল মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ক্রিয়া চালু করতে আগ্রহী ছিল না। মুক্ত শ্রম, ঋণ ও কৃষি উপকরণের বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুল বিকাশের কারণে এরা বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে মহাজনি পুঁজিকেও নিয়ন্ত্রণ করত এবং তার মারফত সমগ্র কৃষি-অর্থনীতির ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। বড় জোতদার চাষিরা প্রায়শই মহাজনি কারবারের সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকর্ম চালাত। তাদের বাণিজ্যিক লাভ ও মহাজনি সুদ কাজে লাগিয়ে তারা অসংখ্য ছোট ও মাঝারি চাষির উদ্বৃত্ত ফসল আত্মসাৎ করেছিল। উৎপাদন-ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্ত মূল্য তারা উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মূলধন আবদ্ধ হত মহাজনি ও ব্যবসায়িক কাজকর্মের মতো অনুৎপাদনশীল কাজে। ছোট চাষি ও ছোট হস্তশিল্পীরা ব্যবসায়ী-মহাজন শ্রেণিটির দ্বারা শোষিত হত, তাদের ক্ষয় হত। কিন্তু চাষবাস-শিল্পকর্মে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উৎপাদকরা তাদের জীবিকার এইসব সনাতন কেন্দ্র ছেড়ে শহরে যেতে পারত না। অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত, যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য কোনও বিকল্প জীবিকার উৎস শহরে ছিল না। কাজেই পূর্বতন জীবিকার সঙ্গে তাদের যুক্ত থাকতে হত। ছোট শিল্প, ছোট মাপে চাষবাস লুপ্ত হয়ে বড় পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা জন্ম নেওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি তখনও তৈরি হয়নি। পণ্য, ঋণ, শ্রম ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মুক্ত বাজার প্রক্রিয়া তখনও অনুপস্থিত, কাজেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মে চাষ চালু হতে পারেনি। পিছিয়ে পড়া উৎপাদন-সম্পর্কের কার্যকারিতা ছিল কম। সে কারণে কৃষিতে ক্রমান্বয়ে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু হতে পারেনি। তার বদলে যা ছিল তা এক স্থবির উৎপাদন প্রক্রিয়া। তার বৈশিষ্ট্যগুলি হল: প্রথমত, ক্ষুদ্র চাষিরা জমির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে জমির স্বাধীন বাজার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ছিল অতি ধীর। দ্বিতীয়ত, কৃষক সমাজ বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত। তৃতীয়ত, স্বাধীন কৃষি-শ্রমিকের বাজারের উপস্থিতি ছিল ক্ষীণ, কৃষি-ঋণের বাজারে অতিরিক্ত সুদ ও অসুবিধাজনক শর্তের অসংগঠিত ঋণের প্রাধান্য ছিল, ছিল দারিদ্র ও বেকারত্ব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিতভাবে একটি প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস দেখায় যে, বিভিন্ন সময়ে চাষিরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমত, খাজনার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতেই দুর্দশাগ্রস্ত চাষিরা জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। চাষিদের ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা বিরল ছিল না। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি বা পোকামাকড়ের উৎপাতে ফসলনাশ ইত্যাদি ঘটনা ছাড়াও নানা কারণে এই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য ব্রিটিশ-পূর্ব কৃষিতে চাষির ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ সংক্রান্ত ধারাবাহিক তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না।

কিন্তু ব্রিটিশযুগে চাষির ঋণগ্রস্ততা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষের পর সরকার যে-অনুসন্ধান চালিয়েছিল, বিশেষ করে ১৭৯৪ এবং ১৮০১-এর মধ্যে শস্যবিভাগ যে-অনুসন্ধান চালায়, সেখান থেকে এই সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে শস্য ব্যবসায়ী মহাজনের ভূমিকা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর, অনেকগুলি অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া তথ্য থেকে বিষয়টির সমর্থন মেলে। অস্বাভাবিক খাজনা বৃদ্ধির চাপ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও বাণিজ্যিক ফসলের চাষ অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। তেমনই ফসলের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণত চাষির পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, প্রান্তিক চাষি, যাদের বছরের বেশিরভাগ সময়েই নিজেদের খাওয়ার জন্য শস্য কিনতে হত বাজার থেকে, তাদের দুর্দশা বাড়ে, চাষিকে ঋণগ্রস্ত করে তোলে। চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত আইন প্রয়োগের সূচনাপর্বের সময় অবধি ঋণের জন্য জমি হস্তান্তরের ঘটনা বিরল ছিল। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনান্সি আইন যদিও সাধারণভাবে জমি হস্তান্তরের বিরোধী ছিল, কিন্তু যেখানে যেখানে স্থানীয় স্তরে জমি বিক্রি ও হস্তান্তরের রীতি প্রচলিত ছিল, সেখানে তাকে আইনসিদ্ধ করা হয়। ১৯২৮ সালের নতুন আইনে জমি বিক্রি পুরোপুরি আইনসিদ্ধ হল এই শর্তে যে, জমির ক্রেতা যে দাম দেবে তার শতকরা ২৫ ভাগ জমিদারকে দিতে হবে। এর ফলে ঋণের দায়ে জমি হস্তান্তরের ঘটনা বাড়তে থাকে। ১৯৩৮ সালে সংশোধিত বেঙ্গল টেনান্সি আইনে জমি বিক্রির ওপর সব বাধানিষেধ বিলুপ্ত করা হয়। এর পরবর্তীতে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব এবং খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জমির বাজারদর বাড়িয়ে দেয় ও একই সঙ্গে ছোট চাষির দুর্দশা বাড়ার ফলে তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিক্রির ফলে চাষিরা যে সবসময় জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হত তা নয়। প্রথমত, অধিকাংশ সময়ে চাষি শুধুমাত্র তার মোট জমির একটি অংশ বিক্রি করত। অনেক ক্ষেত্রে দেশের আর্থিক অবস্থায় স্থিতিশীলতা আসার পর চাষিরা আবার তাদের জমি ফের কিনে নিতে পারত। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নতুন মালিকের অধীনে থাকা তাদের পূর্বতন জমির বর্গাদারে পরিণত হত। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধে অক্ষম চাষি মহাজনের কাছে বন্ধকি জমির বাঁধা-শ্রমিকে পরিণত হত। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে তারা তথাকথিত স্বাধীন কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সম্পূর্ণভাবে জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হত না, তাদের নিজস্ব একখণ্ড জমির মালিকানা থেকেই যেত।

আমরা দেখেছি, উন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্বে, কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সূচনাতে, কৃষির যে-কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি ছিল, তারই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে শিল্পক্ষেত্রে পুনর্গঠন শুরু হয়। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যবসায়ী মহাজন শ্রেণি ছোট ছোট হস্তশিল্পকে একত্রিত করে বড় শিল্প গড়ে তোলে, অথবা ব্যবসায়ী মহাজন শ্রেণিটি তাদের হাতে জমা হতে থাকা বাণিজ্যিক মূলধন উৎপাদন-ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য জমি ও অন্যান্য উপকরণ বাজার থেকে কিনে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। আমাদের দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যবস্থার একটি বড় অংশ বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের বড় অংশ ইউরোপীয় কোম্পানি মারফত বিদেশে চলে যেত। অল্প অংশই বিদেশি কোম্পানির দেশি এজেন্ট অথবা দেশি বণিক মহাজন যারা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের হাতে থাকত।

এদেশে বড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট প্রাথমিক মূলধনের অভাব ছিল। এছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল চাহিদার অপ্রতুলতা। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ধরনের পুনর্গঠন না হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিশাল অংশ দারিদ্র ও দুর্দশার মধ্যে বেঁচে থাকত। ফলে অন্তর্দেশীয় চাহিদার ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এছাড়াও বড় শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগের নানাপ্রকার অসুবিধা ছিল। শ্রম বাদে অন্য সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ দুর্লভ হওয়ার সমস্যা ও চড়া দাম, সেইসঙ্গে উপযুক্ত বাজারের অভাব ও দামের অনিশ্চয়তা। ফলে বড় শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি ছিল, সর্বোপরি ঋণের এবং প্রাথমিক মূলধনের জন্য

উপযুক্ত সংগঠিত বাজার ছিল অনুপস্থিত, এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদানের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোরও অভাব ছিল। এ সব কারণের যোগফল শিল্প-উৎপাদনের সূচনা ঘটানোর পথে যথেষ্ট বড় বাধা হয়ে ওঠে।। উপরন্তু দেশের বাজারে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে লাভজনক ভাবে উৎপাদন চালানোও কঠিন ছিল। ফলে বড় শিল্প শুরু হয়েছে অনেক পরে।

১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সাল অবধি ইংলন্ড, ভারত থেকে পাওয়া সস্তা কাঁচামাল ব্যবহার করার সুবাদে, মেশিন-প্রস্তুত পাটবস্ত্রের বাণিজ্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানটি প্রায় একচেটিয়াভাবে ধরে রেখেছিল। কাঁচামাল হিসেবে পাটের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকলে ভারতে তৈরি হস্তচালিত তাঁতে তৈরি পাটবস্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র বিদেশের বাজারে নয়, যুগপৎ বিদেশে ও ভারতে, ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকলে ১৮৩০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ভারতে পাটজাত হস্তশিল্পের ক্রমশ প্রসার ঘটে। এই বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম আধুনিক বড় পাট-বয়নশিল্পের সূচনা হয়। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইংলান্ডের ডান্ডি থেকে আমদানি করে জর্জ অকল্যান্ড আধুনিক ছোট বয়ন (spinning) শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ১৮৫৫ সালে উৎপাদন শুরু হলে স্থানীয় পাট বস্ত্রবুননের হস্তশিল্পীদের কাছে বিক্রি করা হত। এরপর ১৮৬৯ সালে বোর্নিও কোম্পানি নামে একটি বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানি পাট বয়ন ও বুননের (weaving) সংযুক্ত যন্ত্রচালিত কারখানা গড়ে তোলে। ১৮৬২ সালে আরও দু'টি মিল স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালে একটি বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির কলকাতাস্থিত অংশীদাররা আরও একটি আধুনিক মিল স্থাপন করে। ১৮৭০ সালের পর ভারতীয় পাট-সামগ্রী অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পরে আমেরিকা ও ইজিপ্টের বাজারে প্রবেশ করে। শ্রম সস্তা ও সুলভ হওয়ার কারণে অচিরেই ভারতীয় জুটমিলগুলি থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর রপ্তানি ভারতকে পৃথিবীর সবথেকে বড় রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি এনে দেয়। ভারতীয় পাট-শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল, এই শিল্পগুলির সূচনা হয়েছিল সম্পূর্ণত ইউরোপিয়ানদের দ্বারা, এরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অবধি ইউরোপিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। জুটমিল শুরু করার প্রাথমিক বিনিয়োগ খুব বেশি না হলেও ভারতীয়রা কেন এই শিল্পে অগ্রণী হতে পারেনি তার প্রধান কারণ, ঋণের ও পণ্যের বাজারের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট যোগ ছিল না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পাটপণ্য উৎপাদনে অংশ নেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা। তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতি তাদের এই উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করা বা টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিম ভারতে আধুনিক সুতি বস্ত্রশিল্পের পত্তন হয়। এর আগে বিচ্ছিন্ন ভাবে ইউরোপীয় বণিকরা সুতি বস্ত্র উৎপাদনের যেসব যন্ত্রচালিত আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল সেগুলির কোনওটিই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। দু'দশক পরে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যে ইংলন্ডের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারের অবসান ঘটলে ভারতের সুতি বস্ত্রের বৈদেশিক বাণিজ্য আরও প্রসার পায়। কলকাতা বন্দর থেকে সুতি বস্ত্রের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত ইউরোপিয়ানরা নিয়ন্ত্রণ করত। বম্বে বন্দর থেকেও ব্রিটিশ বণিকরাই ইউরোপের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলত বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে, সেটা ভারতীয় বণিকরা ও ইউরোপীয় বণিকরা একত্রে নিয়ন্ত্রণ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আধুনিক সুতিবস্ত্র

উৎপাদন শিল্পের সূচনা হয়। কিন্তু পাটশিল্পের সঙ্গে আধুনিক সুতি বস্ত্রশিল্পের প্রধান পার্থক্য ছিল, এই শিল্পের সূচনা করেছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। এই শিল্প প্রধানত ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এবং এর সূচনার পরবর্তী সময় থেকে এর উন্নয়নপর্ব ক্রমে দেশি ম্যানেজার ও দেশি কারিগর দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। পৃথিবীর তৎকালীন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, সবথেকে প্রভাবশালী ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ইংলন্ডের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটেছিল।

১৮৫১ সালে সি এন দাভার নামে একজন বম্বে-বাসী ব্যবসায়ী প্রথম সুতিবস্ত্র উৎপাদনের শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রাথমিক পুঁজি জোগাড় করতে না পারায় এই চেষ্টা বেশিদূর এগোয়নি। অবশেষে ১৮৫১ সালে ৫০০,০০০ টাকার প্রাথমিক মূলধন জোগাড়ের জন্য ওই মূল্যের শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়। বম্বের ব্যবসায়ীরা প্রধানত বেশিরভাগ শেয়ার কেনে, অবশ্য অন্তত ১৩% শেয়ার কেনে ইংরেজ বিনিয়োগকারীরা। ১৮৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করে। ১৮৭০ সালের পর এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। বম্বে শহরে সুতি মিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও বম্বের অন্যত্র ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সুতি মিলের প্রসার ঘটে। কিন্তু ১৮৯৬-৯৭ সাল অবধি ভারতীয় মিলগুলি আমদানিকৃত সুতির ওপর নির্ভর করত, মাত্র ১৭-১৮% সুতা দেশীয় মিল থেকে নেওয়া হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মিলে মোট ব্যবহার্য সুতার শতকরা ৩৬-৩৭ ভাগ ছিল দেশি সুতা। ভারতে তৈরি সুতা ছিল মোটা ধরনের, সেখানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সুতা ছিল অনেক বেশি সূক্ষ্ম। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯১৩-১৪র মধ্যে ভারতে উৎপন্ন সুতি প্রধানত দেশের বাজারেই বিক্রি হত। শতকরা ১০ ভাগের বেশি রপ্তানি হত না। পরবর্তী চার দশকে, ১৯১০ সাল নাগাদ, ভারতের সুতি বস্ত্রশিল্প পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ সুতি বস্ত্রশিল্পে পরিণত হয়। ভারত হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সুতিবস্ত্র উৎপাদনকারী দেশগুলির অন্যতম। দেখা যায়, দেশের বাজারে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমদানিকৃত সুতিবস্ত্র ক্রমশ তুলনামূলক গুরুত্ব হারাচ্ছে। সুতি বস্ত্রের আমদানির মোট পরিমাণ বাড়লেও আগের তুলনায় বাজারের শতকরা ভাগ কমে।

১৮৯৬-৯৭ থেকে ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে ভারতের বাজারের শতকরা ১২.০ ভাগ মাত্র ভারতীয় মিল উৎপাদন থেকে আসত। এর দ্বিগুণেরও বেশি, শতকরা ২৫.২ ভাগ আসত হস্তচালিত তাঁত থেকে, বাকি ৬২.৮ ভাগ আসত আমদানি থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানির মোট পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকলেও আমদানির আওতায় থাকা বাজারের শতকরা ভাগ কমে। হস্তশিল্পের ভাগও কমে, সে জায়গায় দেশীয় মিল-উৎপন্ন বস্ত্রের ভাগ বাড়ে।

বিভিন্ন উৎস থেকে সুতিবস্ত্রের দেশীয় বাজারের বিভিন্ন অংশের জোগান (শতকরা)

	নিট আমদানি	ভারতীয় মিল	ভারতীয় হস্তশিল্প
	শতকরা	শতকরা	শতকরা
১৮৯৬-৯৭ থেকে ১৯০০-১৯০১	৬২.৮	১২.৮	২৫.২
১৯০৯-১০ থেকে ১৯১৩-১৯১৪	৫৬.০	২৩.২	২০.৮

Source: Dobb, M. "The Growth of Large Scale Industry". *The Cambridge Economic History of India*. vol 2. Table 7.41 (Excluding Export)

তবুও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের মিল-উৎপাদিত দ্রব্য দেশি বাজারের শতকরা ২৩.২ ভাগ মাত্র জোগান দিত। বাজারের বাকি অংশের শতকরা ২০.৮ ভাগ আসত সুতিবস্ত্রের হস্তচালিত তাঁত থেকে ও শতকরা ৫৬ ভাগ আসত আমদানি থেকে। মূলধনের অভাবে দেশি মিলে উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটানো ও প্রকৌশলগত উন্নতি ঘটানো যায়নি।

ফলে তখনও অবধি আমদানিকৃত বস্ত্রই বাজারের বেশি অংশ অধিকার করেছিল। আর-একটি শিল্প যা স্বাধীনতার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা হল লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সূচনা করেন জামসেদজি নাসেরভনজি টাটা। তিনি শুরু করেছিলেন মূলত একজন ব্যবসায়ী হিসেবেই। ইস্পাত-শিল্পে আসার আগেই তিনি সুতি বস্ত্রের শিল্পোদ্যোগে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এর আগে অবধি ইস্পাত-শিল্প নির্মাণের, ও তাকে টিকিয়ে রাখার, যে সব চেষ্টা হয়েছিল সেগুলো টেকেনি, কারণ মূলধন জোগাড়ের জন্য সরকারের কাছ থেকে ধারাবাহিক যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যেত না, ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। টাটা একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে বাজারে শেয়ার বিক্রি করে জোগাড় করা বিভিন্ন বম্বে ব্যবসায়ীর বিনিয়োজিত মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করে। ১৯১১ সালে স্টক হোলডারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০০০। এরা বেশির ভাগই ছোট বিনিয়োগকারী। এদের মধ্যে ১০০০০ বিনিয়োগকারীর প্রত্যেকের বিনিয়োগ ছিল ১৫০০ টাকার কম। মোট বিনিয়োগকারীদের শতকরা ৪ ভাগেরও কম মানুষের হাতে ছিল মোট বিনিয়োগের শতকরা ৬৪ ভাগ। এঁরা ছিলেন বম্বের মুষ্টিমেয় অত্যন্ত ধনী বিনিয়োগকারী। বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই শিল্প পুরোপুরি উৎপাদন শুরু করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত বড় শিল্পের বৃদ্ধি যথেষ্ট গতি পায়। এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪-৫ ভাগ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতের বড় উৎপাদন-শিল্প মোট জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৩.৮ ভাগ উৎপাদন করত ও মোট ফ্যাক্টরি নিয়োগ ছিল মাত্র ১০,২৩,০০০ জন, যা ছিল মোট কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ০.৮ ভাগ। পরে, বিংশ শতকের প্রথম চার দশক পেরিয়ে এসেও, ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত সমস্ত ফ্যাক্টরিতে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা দেশের মোট গড় দৈনিক নিযুক্তির শতকরা ২ ভাগেরও কম ছিল।

ভারতের শিল্প-উন্নয়নের এই চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, কৃষি থেকে দলে দলে কৃষক উৎখাত হয়ে শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে এমন অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে তৈরি হয়নি। কৃষিতে উৎপাদন-কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে মজুরি-শ্রমিকনির্ভর পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক চালু হচ্ছে, তার ফলে উৎখাত হচ্ছে ছোট শিল্প বা হস্তশিল্প, বড় শিল্প গঠন হচ্ছে, শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে বিপুল হারে, কৃষি ও হস্তশিল্পের তুলনায় সংগঠিত শিল্পের অধীনে উৎপাদন মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশ অধিকার করছে – এরকম কোনও অবস্থা তখন তৈরি হয়নি। ঋণগ্রস্ততার কারণে চাষির উচ্ছেদ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও তারা শহরে এসে ব্যাপক হারে কাজে যুক্ত হবে এমন অবস্থা তখন ছিল না, সংগঠিত শিল্প তখনও অত বেশি নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মতো দেশ-জোড়া বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। স্থানীয়ভাবে যেসব জায়গায় শিল্প গড়ে উঠেছিল তার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল থেকে দুর্দশাগ্রস্ত চাষি শহরে চলে এসেছে, উচ্ছেদ হওয়া চাষি তার গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে বাঁচার তাগিদে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে, অনেক সময় শ্রমিকের কন্ট্রাক্টর তাদের দূরদূরান্তে নিয়ে গেছে। দলে দলে তারা ভারতীয় বড় শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত হচ্ছে, শ্রমিক নিয়োগের এমন অবস্থা তৈরির অনুকূল দেশজোড়া ক্ষেত্র তখনও ভারতে তৈরি হয়নি। ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৫, এই ২০ বছরে মোট নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার বিভিন্ন সেনসাস-ভিত্তিক তথ্য থেকে এমন প্রমাণ মেলে না যা থেকে বলা যেতে পারে ওই সময়ে কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে বিপুল সংখ্যক কৃষক উৎখাত হয়ে অন্যত্র নিযুক্ত হয়েছিল।

কৃষিতে নিযুক্ত কর্মরত মানুষের সংখ্যা

সাল	সব বিভাগে নিযুক্ত মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যা (মিলিয়ন)	কৃষিতে নিযুক্ত মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট নিযুক্তিতে কৃষিতে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার ভাগ (শতকরা)
১৮৭৫	১১৭.৭	৮৬.৪	৭৩.৪%
১৮৯৫	১৩০.০	৯৫.৫	৭৩.৪%

Source: Heston, A. “National Income”. *The Cambridge Economic History of India* Vol 2, Table 4.2 থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা হিসাব করেছি।
মূল তথ্যসূত্র: ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন সেনসাস

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৫, এই ২০ বছরে বিভিন্ন বিভাগে মোট কর্মরত জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১০.০৪ ভাগ, সেখানে কৃষিতে নিযুক্ত মোট কর্মরত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ১০.৪ ভাগ। এর ফলে ওই কালপর্বে মোট কর্মরত জনসংখ্যায় কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত একই থেকে গেছে। এই অনুপাত কমার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

ডেভিড রিকার্ডোর 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তুলনামূলক সুবিধা'র তত্ত্বটি থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই যুক্তি অনুযায়ী যে-দেশে বা যে-অঞ্চলে স্থির পুঁজি তৈরির উপকরণ ও আর্থিক পুঁজির জোগানের তুলনায় শ্রমের জোগান বেশি, সেই দেশে বা অঞ্চলে শ্রম অপেক্ষাকৃত সস্তা, ফলে সেসব দেশে পুঁজিনির্ভর উৎপাদন-ক্ষেত্রের তুলনায় শ্রমনির্ভর উৎপাদন-ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইসব দেশের উচিত শ্রমনির্ভর পণ্য উৎপাদনে ও তার রপ্তানিতে বেশি মনোযোগ দেওয়া। এবং আমদানির মাধ্যমে দেশের উপভোক্তাদের পুঁজিনির্ভর পণ্যের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা উচিত। অপর পক্ষে তুলনায় কম জনবহুল যেসব দেশে ইতিমধ্যেই শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকার কারণে পুঁজি সহজলভ্য হয়েছে, সেসব দেশ যদি পুঁজি-ঘন পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে পুঁজি-ঘন পণ্য রপ্তানির বিনিময়ে আমদানি-মারফত দেশের মানুষের শ্রম-ঘন পণ্যের চাহিদা মেটায়, তাহলে দুই ধরনের দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক ভাবে লাভবান হতে পারে। এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলি ক্রমে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই যুক্তি অনুযায়ী এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার যেসব দেশ তুলনামূলক ভাবে জনবহুল, যারা শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পুঁজি গঠনের অবস্থায় নেই, সেইসব দেশের পক্ষে কৃষি ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে জোর দেওয়া উচিত। এবং এইভাবে উৎপন্ন শ্রম-নিবিড় পণ্য রপ্তানির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্য আমদানি করা উচিত। একই সঙ্গে শিল্পে পুঁজি সঞ্চয়নের নিরিখে পশ্চিম ইউরোপের যেসব দেশ এগিয়ে আছে, তাদের পক্ষে উচিত হবে শিল্পোৎপাদনে বিশেষায়ন ঘটানো, এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য আমদানি করা। এটাই ছিল ঊনবিংশ শতকের আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের পক্ষে যুক্তি। এই যুক্তি সেই সময়কার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরনকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এই বিশেষায়নের ধরন অবশ্যই শিল্পে অপেক্ষাকৃত অগ্রণী পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পুঁজিসঞ্চয়নভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন ও বিশেষায়নের এই ধরন অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার দেশগুলির স্বার্থানুকূল ছিল না। কৃষিতে দানাশস্য, পাট, তুলা ইত্যাদি যেগুলি সরাসরি ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত, অথবা ব্যবহৃত হত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পে, সেসব পণ্য উৎপাদনের প্রতি বিশেষ উদ্যোগও শেষপর্যন্ত এদের পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। ভোগ্যপণ্যগুলির অত্যাবশ্যকীয় চরিত্রের জন্য এগুলির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে মানুষের আয় বাড়লে এইসব ভোগ্যপণ্যের ওপর মোট আয়ের ক্রমশ আরও কম অংশ ব্যয় হতে থাকে। ফলে যে-হারে মানুষের আয় বাড়ে, সেই হারে এইসব পণ্যের চাহিদা বাড়তে পারে না ও আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের দামের তুলনায় এইসব অত্যাবশ্যক পণ্যের তুলনামূলক মূল্যহার ক্রমশ কমতে থাকে। এইসব পণ্য রফতানিকারী দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে কখনই তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে না। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের এগিয়ে থাকা দেশগুলির সঙ্গে অসম বাণিজ্যসম্পর্ক ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে অসম সম্পর্কের দরুন— অধীনতা ও কর্তৃত্ব— প্রাথমিকভাবে পিছিয়ে পড়া এইসব দেশ চিরকাল পশ্চাদপর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবেই থেকে যায়। এমনকী কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মতো কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এইসব দেশের কৃষি

উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্প ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যে আদিম পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল, ভারতের মতো এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার অনেক দেশই সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়নি। বাইরে থেকে আসা অধিকতর শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা, দুর্বলতর বিকেন্দ্রায়িত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে নিজের অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং অসম বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে ছোট উৎপাদকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত, এমনকী তার ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের একটি অংশ পর্যন্ত তারা শোষণ করেছে। যে-বাণিজ্যিক আর্থিক পুঁজি পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্র-উত্তর অর্থনীতিতে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হয়ে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিবর্তিত হয়েছে, সেই আর্থিক পুঁজিই পিছিয়ে পড়া প্রাচ্যের দেশগুলিতে মহাজনি পুঁজি ও বাণিজ্যিক পুঁজি রূপে তার কার্যকারিতার মাধ্যমে এদেশের ছোট ও দুর্বল উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলি থেকে সমস্ত উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শোষণ করেছে। মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু উৎপাদন-ক্ষেত্র, বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করে, কখনও বিদেশি বাণিজ্যিক শক্তির দেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে গেছে। এই পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও উৎপাদন-ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দ্রুত পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার মাধ্যমে গতিশীল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে আসেনি। উৎপাদন-ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির অধীনে থাকার কারণে প্রাক্-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে গতিশূন্য করে রেখেছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া বিরাট বিরাট পরিবর্তনগুলি এই দুই বিপরীত মেরুর আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেকার অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলগত পার্থক্যগুলিকেই সামনে নিয়ে আসে।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য, কয়েকটি পণ্যের তুলনামূলক গুরুত্ব

সাল	খাদ্য শস্য %	বাণিজ্যিক শস্য %*	শিল্পে উৎপাদিত পণ্য %**
১৮৫০—৫১	৪.১	৩১.১	৪.৬
১৮৭০—৭১	৮.১	৪৫.৭	৩.১
১৯০০—০১	১৩.১	২১.৫	১৩.৭
১৯১০—১১	১৮.৪	২৪.৮	১৪.১
১৯৩৫—৩৬	—	২৯.৫	১৫.৮

*বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা ও নীল ধরা হয়েছে।

**শিল্পপণ্য বলতে সুতি ও পাটের জিনিস বোঝানো হয়েছে।

Source: Chaudhuri, K. N. "Foreign Trade and Balance of Payment." *The Cambridge Economic History of India* vol. 1

Main Source: Statistical Abstract of India 1850-51 to 1935-36

তথ্যসূত্র

১. Dobb, M. 1965. *Studies in The Development of Capitalism*. 1st Edition. Routledge.

২. Marx, K. 1971 *Capital* vol. 3. Moscow: Progressive Publishers.

৩. তদেব

৪. Dobb, M. 1965. *Studies in The Development of Capitalism*. 1st Edition. Routledge.

৫. Dobb, M. 1965. *Studies In The Development of Capitalism*. 1st Edition. Routledge. & Marx, K. (1971).

৬. Marx, K. 1971. *Capital* vol 3. Moscow: Progressive Publishers.

৭. Dore, R. P. 1966. *Land Reform in Japan.* Oxford University Press.

৮. Allen, G. C. 1963. *A Short Economic History of Modern Japan*. 6th impression. London: Unwin University Books.

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. Dore, R. P. 1966. *Land Reform in Japan.* Oxford University Press.

১২. Kajita, M. 1962. Agriculture Policy Research committee. *Land Reform In Japan,* Agriculture Development Series.

১৩. Chakraborty, A. 1983. "The Social Formation of the Indus Society." *EPW*. vol. 18 no. 50.

১৪. তদেব

১৫. গৌতম ভদ্র. (১৯৮৩). *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*. কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

১৬. তদেব

১৭. তদেব

১৮. তদেব

১৯. Raychaudhury, T., and H. Habib Edited. 1984. *The Cambridge Economic History of India*. vol. 1, Orient Longman in association with CUP.

২০. Kumar, D. Edited. 1984. *The Cambridge Economic History of India*. vol. 2, Orient Longman in association with CUP.

২১. *Hasnabad Settlement Report* 1865, 1891-96

২২. *The Cambridge Economic History of India*. pg. 82

২৩. *The Cambridge Economic History of india*. Pg. 212-213

২৪. Saradamoni, K. 1973. *Agrestic Slavery In Kerala In the 19th Century.*

২৫. Aiyppan, A. 1945. *Iravs and Cultural Change.* vol 1. Madras Museum.

২৬. Banaji, J. 1977. "Capitalist Domination and the Small Peasantry: Deccan Districts In the Late Nineteenth Century." *EPW.* 12 (33).

২৭. Campbell, J. M. 1880. *Gazetteer for Ratnagiri and Swantawadi.* vol 10. Government Central Press.

২৮. Fukazawa, H. *The Cambridge Economic History.* pg. 206.

২৯. *Report on The Administration of the Revenue Department in Bengal for the Years 1885-1913 and 1929 to 1946.*

৩০. Blyn, G. 1966. *Agriculture Trends in India, 1891-1947: Output Availability and Productivity*, University of Pennsylvania press.

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের কৃষি

বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ক্ষমতার বিন্যাসে নতুন শক্তির উৎপত্তি ও ভারতীয় কৃষি

আমরা আগেই দেখেছি, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের সূচনাপর্বে আদিম পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার দু'টি আবশ্যিক শর্ত পূরণ হয়েছিল কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে: এই শর্তগুলি হল, একদিকে বাণিজ্যিক ও মহাজনি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক পুঁজির সঞ্চয়ন, অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, গিল্ডের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছোট হস্তশিল্পগুলির স্বাধীন উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া ও সামন্ততান্ত্রিক নিয়মের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে ছোট চাষিদের স্বাধীন ছোট উৎপাদকে পরিণত হওয়া। গোটা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর পরবর্তী স্তরে এইসব ছোট উৎপাদক জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে উচ্ছেদ হয়ে শ্রম ও জমিসহ উৎপাদনের উপকরণের মুক্তবাজার গঠন করে। একই সঙ্গে এই আর্থিক পুঁজি, মুক্ত শ্রম ও উপকরণের সংগ্রহে বিনিয়োজিত হয়ে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিণত হয়। এই আদিম পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার গতিকে মসৃণ রাখার প্রয়োজনে তাই পুঁজিবাদী উৎক্রমণ প্রক্রিয়ায় স্থিত অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রম ও সস্তা কাঁচামালের জোগান অব্যাহত রাখা। সে জন্য বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশগুলি থেকে এইসব অত্যাবশ্যক উপকরণের সরবরাহ সুনিশ্চিত রাখা তাদের কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল, একই সঙ্গে তাদের উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান বাজার খুঁজে বের করা ছিল একটা দায়। কাজেই, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিকে যাতে বাজার হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই দিকে তাকিয়ে এইসব দেশে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছিল তখন। পুঁজিসঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে ক্রমশ সঞ্চিত উৎপাদনশীল পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শুধু যে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে ও পরিকাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয় তাই নয়, এই সব অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে। এই কারণে আমরা দেখেছি ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বহির্বাণিজ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক-মহাজনি পুঁজির আধিপত্যের মধ্য দিয়ে ক্রমে অষ্টাদশ শতকে গোটা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থের বাহক ব্রিটিশ রাষ্ট্রের আধিপত্যের সূচনা হল। ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বার্থে পরিচালিত করার জন্য নানাপ্রকার পরিবর্তন আনা হল। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিবাদ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ সেই সময় পুঁজির আদিম

সঞ্চয়নপ্রক্রিয়ায় সস্তার শ্রম, কাঁচামাল ও বাজার খোঁজার প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে নিজ নিজ প্রভাবাধীন অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করার প্রতিযোগিতায় রত ছিল। এরই পরিণামে বিংশ শতকের শুরুতেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। এই যুদ্ধের পরিণতিতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কিয়দংশকে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি বহন করতে হয়, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ তাদের পণ্যের পূর্বতন বাজার হারায়, এবং বিভিন্ন দেশের ওপর যে-বিশাল আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়, তা পণ্য ও পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচল ব্যবস্থায় বিশৃংখলা নিয়ে আসে। এসবের পরিণতিতে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বিনিয়োগ ও নিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদী দুনিয়াকে গভীর আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকারত্ব, অতি উৎপাদন, চাহিদার অ-প্রতুলতা ও গভীর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই সংকট আবার নতুন নতুন বাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরির আবশ্যিকতা এবং সেইসূত্রে তীব্রতর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, ফলে ১৯৩৯ সালে দেখা দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্ষমতার বিন্যাসে নতুন শক্তি হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান এবং সংযুক্ত জাতিসংঘ (ইউ এন ও), বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, ও 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণসম্মতি সংস্থা'র (গ্যাট-এর) প্রতিষ্ঠা ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দুনিয়ার সর্বব্যাপক আধিপত্যের জায়গায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের সূচনা করে। বেশ কয়েকটি ঔপনিবেশিক দেশ কোনও না কোনও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সরাসরি রাজনৈতিক ও সামাজিক অধীনতা থেকে মুক্তি পায়। জাপান সহ অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ছাড়াও ইউরোপের আধিপত্যাধীন তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন হওয়া পূর্বতন উপনিবেশগুলির অর্থনীতিকে নতুন ভাবে সংগঠিত করার জন্য এইসব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আমেরিকা, নতুন নতুন নীতি, পদ্ধতি, নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার ও প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া শুরু করে।

ভারত ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে, কৃষি-অর্থনীতির পুরনো পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করে কৃষিকে একটি বিকাশমান উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আমূল ভূমি সংস্কারের ঘোষিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে কর্মসূচি সাজায়। ১৯৬৫ সালের পর আমেরিকার বিশেষজ্ঞের পরামর্শে কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুরনো প্রকৌশলের জায়গায় আধুনিক উৎপাদন-বর্ধক প্রকৌশল প্রয়োগের কথা ওঠে ও সেই অনুযায়ী কৃষির উৎপাদন-কৌশলে আমূল পরিবর্তন আনার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জাপানে পিছিয়ে পড়া উৎপাদন-সম্পর্কের অবশেষগুলি নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে আমেরিকান অকুপেশন অথরিটির সরাসরি হস্তক্ষেপে যে-ভূমিসংস্কার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তাতে পুঁজিবাদী কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। জাপানের এই ভূমিসংস্কারের দু'টি আশু উদ্দেশ্য ছিল: ভাগ-চাষ প্রথার অবসান ও পূর্বতন ভাগ-চাষিদের মালিকানা স্বত্ব কিনে নেওয়ার প্রথম সুযোগ দেওয়ার শর্তে মালিকদের নিজ তত্ত্বাবধানে মাঝারি মাপের জোতে চাষের জন্য মালিকানা ও দখলি স্বত্ব প্রদান। দ্বিতীয়ত, খুব বড় ও খুব ছোট জোতের অবসানকল্পে ও মাঝারি জোতে নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে জমির মালিকানা ও দখলি স্বত্বের ওপর ঊর্ধ্বসীমা প্রয়োগ। ১৯৪৭-এর পর ভারতের কৃষিতে সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী— যেমন জোতদার-জমিদার-জায়গিরদার, যারা ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান সামাজিক ভিত্তি — তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলে এবং মাঝারি মাপের চাষে নিজ তত্ত্বাবধানে চাষব্যবস্থা চালু করার জন্য জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ ও তা প্রয়োগ করা শুরু হয়। কিন্তু জাপান আর ভারতের ভূমিসংস্কার কর্মসূচির

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা এইখানে রয়ে গেল যে, ভারতে ভাগ-চাষি বা স্থির খাজনার চাষ ব্যবস্থার অবসান করা এবং এই উদ্দেশ্যে পূর্বতন ভাগ-চাষি বা স্থির খাজনার চাষিদের সাধারণভাবে মালিকানা বা দখলি স্বত্ব কিনে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য এই ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সামনে ছিল না। উপরন্তু এই কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোনও প্রেরণা এই ভূমিসংস্কার কর্মসূচি বা এর প্রয়োগকে প্রভাবিত করেনি। উচ্চতম স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষমতার অবসান ঘটানো ব্যতীত গোটা মধ্যস্বত্বভোগীর উপর নির্ভরশীল ছিল যে-ব্যবস্থা, তাতে কোনওরকম পরিবর্তন আনা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দেখা গেল, এই সংস্কার কর্মসূচি ও নতুন প্রকৌশলগত পরিবর্তনের কর্মসূচিগুলি কিন্তু বাস্তবে জাপানে যেমনটা ঘটেছিল তেমনভাবে ভূমিব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারেনি। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা তার সনাতন, গভীর ও সর্বব্যাপক জাড্য কাটিয়ে নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে না। পরবর্তীতে, ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে জোরালো করার জন্য নতুন চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে জোর দেওয়া হয়েছিল সনাতন জলাপেক্ষী দানাশস্যের জায়গায় ব্যাপকভাবে অধিক মূল্যযুক্ত হালকা পণ্যের চাষের ওপর। কিন্তু ভারতীয় কৃষি এইসব পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার সনাতন পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছে সেটা একটা প্রশ্ন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এই প্রশ্নটি সামনে রেখে এগোব। প্রথমত আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে, ভারতের কৃষিকে তার সনাতন পিছিয়ে পড়া উৎপাদন-সম্পর্ক ও পুরাতন প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে গতিশীল পুঁজি বিনিয়োগ ও সঞ্চয়নভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিণত করার এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্য এই প্রকল্পগুলির সামনে আদৌ ছিল কি না, থাকলে কতটা। দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণ পদ্ধতি কী পরিমাণে এই উদ্দেশ্যসাধনে সফল হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় কৃষিতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে থাকবে সবুজ বিপ্লব, শস্যবৈচিত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি সমেত ভারতীয় কৃষির নানা দিক নিয়ে আলোচনা।

ভারতীয় কৃষিতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির ব্যর্থতা: উৎপাদন সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক উপস্থিতি

আমরা দেখেছি, ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার জমি থেকে আসা আয় আরও সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। ফলে পুরনো জমিদাররা নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনা দেওয়ার শর্তে ভূস্বামীতে পরিণত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, জমির পরিমাণ অনুযায়ী জমিদারকে টাকার অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে হত। এই ব্যবস্থায় জমিদার তার নিজের আয় ঠিক রাখার জন্য চাষির ওপর যথেচ্ছ খাজনার ভার চাপাত। অতিরিক্ত খাজনার ভারে পিষ্ট চাষির উৎপাদন-ক্ষমতার ওপর পড়ত ক্ষতিকারক প্রভাব, সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত। আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা যথেষ্ট ফসল না হলে জমিদার খাজনা দিতে অপারগ হলে তার জমি নিলামে উঠানো হত ও

শেষপর্যন্ত জমিদারের হাত থেকে সেই জমি চলে যেত অন্য কোনও নতুন সৃষ্ট জমিদারের হাতে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘকালীন বিচারে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। টাকার দাম কমে গেলে খাজনা থেকে আয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যেত। জমিদারের মোট আদায়ে সরকারের খাজনার অংশ কমে গিয়ে জমিদারের আয়ের অংশ বাড়ত। এই কারণে পরবর্তীতে নতুন জমিদারি স্থাপন করার সময় এই ব্যবস্থাকে অস্থায়ী করা হয়, ভূমি-খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নতুন করে হিসাব করার নিয়ম চালু করা হয়। কোনও মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই চাষির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রক্ষার জন্য আর একটি নতুন ব্যবস্থা আসে: রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রায়তের কাছ থেকে সরাসরি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় করা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই খাজনা পরিবর্তন করার জন্য নতুন করে হিসেব করা হত। খাজনার গোটা অংশই সরকার পায়, কোনও অংশই কোনও মধ্যস্বত্বভোগী পায় না। এই নতুন ব্যবস্থা প্রথমে তৎকালীন মাদ্রাজে ও পরে ভারতের প্রায় অর্ধেক স্থানে চালু করা হয়। ব্রিটিশরাজের অবসানের মুহূর্তে ভারতে তিন ধরনের ভূমিব্যবস্থা চালু ছিল। ক) চিরস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা, খ) অস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা, গ) রায়তওয়ারি ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা স্থানীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকলেও তারা অর্থনীতিতে নীতিনির্ধারকের ভূমিকায় ছিল না। তারা এদেশে বিদেশি শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। বিদেশি শাসনের অবসান হওয়ার আগে থেকেই ধীরে ধীরে অর্থনীতিতে এদের প্রভাব ক্ষীয়মাণ ছিল। নতুন একটি জোতদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটছিল, যে-শ্রেণিটির হাতে ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল বাণিজ্যিক ও মহাজনিপুঁজি। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু বণিক-মহাজন ছোট ছোট বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করে বাণিজ্যিক পুঁজিকে উৎপাদনশীল পুঁজিতে পরিবর্তন করার সুযোগ ব্যবহার করছিল, দু’-একজন সফল ব্যবসায়ী সুতি বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের কিছুটা গুরুত্বের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে টাটা-পরিবার বস্ত্রব্যবসায়ে সফল হওয়ার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন অবসান হওয়ার অল্প সময় আগে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পুঁজি-বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কিছুটা গুরুত্বের জায়গায় যাচ্ছিল। কিন্তু তদানীন্তন এই ছোট শিল্পপতির শিল্পগুলির অস্তিত্ব পুরোপুরি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-কাঠামোর সুলভতার ওপর নির্ভর করে টিকে থাকত। লৌহ ও ইস্পাতের দেশীয় বাজার পাওয়াও ব্রিটিশ শাসকদের বদান্যতার ওপর নির্ভর করত। বস্ত্রশিল্পের দেশীয় বাজার অবশ্য ভারতীয় হস্তশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে বহুদিন থেকেই চালু ছিল। সব শিল্পপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যই পুরোপুরি বিদেশি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কয়েকজন দেশি ব্যবসায়ী বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় ভারতের বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের একটি বড় অংশ, যাদের মধ্যে নতুন শিল্প-বিনিয়োগকারীরাও ছিলেন, তখনও অবধি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে নিজেদের সামিল করার অবস্থায় ছিলেন না। এদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী অবস্থানও তত দৃঢ় ছিল না। চলতি অর্থনৈতিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। এইসব বাণিজ্যিক পুঁজিপতি তথা উঠতি বুর্জোয়া-শ্রেণি ছিল ক্ষমতায় দুর্বল, ও নির্ভরশীল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কোথাও কোথাও তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান থাকলেও একই সঙ্গে অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত করে, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার

বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে, নতুন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্য নিজেদের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় উদ্যোগ, প্রয়াস বা ক্ষমতা কোনওটাই ছিল না।

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনায় দেশীয় যে-নেতাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত, তাঁদের কোনও একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে দেখা যায় কি না তা নিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিস্তর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। সপ্তদশ শতকের ব্রিটেনের 'গৌরবময় বিপ্লব', অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব, জার্মানিতে ১৮৪০ সালের বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে যে-পরিবর্তন এসেছিল তার অভিমুখ ছিল স্পষ্টতই প্রাক্‌পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণের দিকে। এই পরিবর্তন এসেছিল মানুষের সামাজিক অবস্থানের ধরনে ও সাংস্কৃতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজতন্ত্র-জমিদারতন্ত্রের উচ্চতর কর্তৃত্বের কাছে সর্বাত্মক বশ্যতার জায়গায় এসেছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা, সেটা অর্থনীতি-সমাজনীতির বৈশিষ্ট্যে আমূল পরিবর্তন আনে। ইউরোপের দেশগুলিতে এই পরিবর্তনের নায়করা শ্রেণি-অবস্থানের দিক থেকে ছিল পুঁজিপতি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, অথবা তারা পুঁজিপতিদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিল। এদের কার্যকলাপ ও নীতিতে এদের শ্রেণি-অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অর্থনীতির ভিতরে ঘটে চলা পরিবর্তন সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গী যা ছিল, ভূমিসংস্কারের যেসব কার্যক্রম বা কৃষি-সম্পর্কিত এরা নীতি গ্রহণ করছিল, তার সবগুলিই ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের অনুকূল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা রাজনৈতিক দল হিসেবে মূলত কংগ্রেস, সেইসঙ্গে অংশত ছোট ছোট অন্যান্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মাধ্যমেই দেশের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসকবর্গের শ্রেণিচরিত্র স্পষ্ট জানা না গেলেও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রধান প্রভাবশালী নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন পুরনো জমিদার বা বণিক পরিবারের উত্তরসুরি, নব্যশিক্ষিত উদারপন্থী চিন্তার ধারক, উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। ভূমিসংস্কার, শিল্পনীতি বা বৈদেশিক বাণিজ্য, অথবা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার সংক্রান্ত নতুন নীতিগুলো রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই তাঁদের দোদুল্যমান অবস্থান ধরা পড়ে। বিভিন্ন সুবিধাভোগী শ্রেণি সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে-শ্রেণিগুলির প্রভাব প্রকটভাবে বজায় ছিল, যে-শ্রেণিগুলির স্বার্থ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের নায়কদের উদ্বেগ প্রকাশ পেত তার ধরন থেকেই এই আঁচ পাওয়া যায় শাসকবর্গের শ্রেণিচরিত্র কী ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রণীত যে-ভূমিসংস্কার কর্মসূচি বিভিন্ন সংশোধন ও পরিবর্তনের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রূপায়িত হয়েছিল, তার মূলগত চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও শাসকবর্গের শ্রেণি-অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একই ইঙ্গিত জোগায় পুরনো আমলের সুবিধাভোগী শ্রেণি সম্বন্ধে শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গীও। সাধারণভাবে ভারতীয় ভূমিসংস্কার কর্মসূচি এতাবৎ সুবিধাভোগী শ্রেণিগুলির, অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব রক্ষায় বিশেষ যত্নশীল শ্রেণিটির কায়েমি স্বার্থকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে রচিত বা রূপায়িত হয়নি। একটি উদীয়মান পুঁজিবাদী ধরনের অর্থনীতির পক্ষে তার শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বা পুঁজিবাদী বিকাশের স্বার্থে কৃষিকে যে-রকম সহায়ক ভূমিকায় রাখা উচিত ছিল সেদিকে তাকানো হয়নি, এবং কৃষিকে সেই ভূমিকা পালনে সমর্থ করে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে যেভাবে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন উচিত ছিল তা করা হয়নি। পুরনো ভূমিব্যবস্থার মূলগত চরিত্রকে পরিবর্তন করারও তেমন কোনও উদ্দেশ্য এই কর্মসূচির মধ্যে ধরা পড়ে না। কী

ধরা পড়ে? ধরা পড়ে সুবিধাভোগীদের শ্রেণিস্বার্থের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা, দেখা যায় পুরনো ভূমি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। আমরা এই অধ্যায়ে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করব, ওই কর্মসূচির বা কৃষি-নীতির প্রণয়ন ও রূপায়ণের পদ্ধতি কী পরিমাণে ভারতীয় অর্থনীতিতে ঐতিহাসিকভাবে থেকে যাওয়া কাঠামোগত দুর্বলতাগুলিকে দূর করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল এবং এই কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগ সেই লক্ষ্যসাধনে কতটা অনুকূল ভূমিকা নিয়েছিল।

ভূমিসংস্কার বিষয়ে আলোচনা করার আগে ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় ভূমিব্যবস্থার স্বরূপ কী ছিল সেটি জানা জরুরি। জমিদারি ব্যবস্থায় প্রকৃত উৎপাদক চাষির পক্ষে চাষের উন্নতির জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়ার অনুকূল অবস্থা ছিল না, তারা ছিল বিশাল খাজনার ভারে পিষ্ট। চাষে তার কোনও উৎসাহ ছিল না, তার কারণ শুধু এই নয় যে, তাকে জমিদারকে ফসলের ভাগ দিতে হত। কালক্রমে উদ্ভূত ভূমিব্যবস্থা প্রকৃত উৎপাদকের স্বার্থের প্রতিকূল তো ছিলই, তা ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। এর কারণ, বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর দাবি মেটানোর পর প্রকৃত উৎপাদকের হাতে উৎপাদনের যে-সামান্য অংশ থাকত তাতে কোনও প্রকৃত উৎপাদকের বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব। রায়তরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজে জমি চাষ করত না, নানা স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীর মধ্য দিয়ে সেই জমি প্রকৃত উৎপাদকের কাছে পৌঁছাত। অনেক সময়ে রায়ত ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারলে জমি বন্ধকি দিয়ে মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য থাকত, মহাজন এই জমি অন্য কোনও চাষিকে দিয়ে চাষ করাবার ব্যবস্থা করত। আবার এই ব্যক্তিও অবস্থাবিশেষে জমিটি অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাতে পারত। এইভাবে অনেকগুলি স্তর পার হয়ে জমি যেত প্রকৃত উৎপাদকের হাতে। এমনকী কোথাও কোথাও প্রকৃত উৎপাদক ও জমিদারের মধ্যে ৫০ জনের বেশি মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়ে যেত।[১] এইভাবে জমিদারি ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত অনুৎপাদনশীল ও প্রকৃত উৎপাদক চাষির পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা যদিও রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি প্রকৃত উৎপাদক রায়তের সংযোগ রক্ষার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে চড়া সুদে মহাজনি ঋণ ও বন্ধকি ব্যবস্থার প্রচলন এ ক্ষেত্রেও প্রকৃত উৎপাদক ও চাষির মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম দিয়েছিল। এই ব্যবস্থাও, জমিদারি ব্যবস্থার মতোই, চাষের ও চাষির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক রূপ নেয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে এই ব্যবস্থার একটা মূলগত পার্থক্য ছিল এবং সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জমিদারি ব্যবস্থায় চাষিদের ওপর একজন জমিদার থাকত, চাষিদের কাছ থেকে খুশিমতো খাজনা আদায়ের অধিকার ছিল তার। শুধু তাই নয় তাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার ছিল। আর সব থেকে বড় দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থরক্ষা। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় তেমন কোনও বড় মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল না।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত হতে থাকে। ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে কংগ্রেস কৃষি-সংস্কার কমিটি[২] ভূমিসংস্কারের যে-উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল সেগুলির মধ্যে ছিল: ক) কৃষি-অর্থনীতি কৃষকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে। খ) উৎপাদন সবচেয়ে বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে। গ) একশ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণিকে শোষণ করার কোনও পরিস্থিতি যেন না থাকে। ঘ) ভূমিসংস্কার কর্মসূচিটিকে অবশ্যই বাস্তবানুগ হতে হবে। এই

উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে কোন ধরনের কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থার তুলনামূলক প্রযোজ্যতা আলোচনায় ওঠে। এই বিকল্প ব্যবস্থাগুলি হল: ক) পুঁজিবাদী খামার। খ) রাষ্ট্রপরিচালিত খামার গ) যৌথ উৎপাদনভিত্তিক খামার ঘ) ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ ব্যবস্থা। ঙ) সমবায় ব্যবস্থায় চাষ। এই কমিটি পুঁজিবাদী খামার সম্বন্ধে স্পষ্টত এক বিরোধী মত প্রকাশ করেছিল। বলা হয়েছিল, পুঁজিবাদী খামারব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই ব্যবস্থা চাষিদের জমির অধিকার খর্ব করে ও তাদের শুধুমাত্র মজুরি শ্রমিকে পরিণত করে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় খাদ্যের মতো অত্যাবশ্যক একটা পণ্যের জোগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ, জমি থেকে চাষির উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পুঁজিবাদী খামার-ব্যবস্থায় উত্তরণের নীতিটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিকল্পটি ছিল, রাষ্ট্র-পরিচালিত খামার-ব্যবস্থা। এ বিষয়ে কমিটির মত ছিল: প্রাথমিক স্তরে পতিত জমি উদ্ধার ও সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। এই সব নতুন ভূমিমালিক-চাষিরা যাতে ঠিকমতো চাষবাস করতে পারে সে জন্য প্রাথমিক ভাবে সবরকম সহায়তা জোগাতে হবে সরকারকে। এই নতুন মালিকরা চাষের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করলে এক-একটি অঞ্চলের কৃষি-খামার নিয়ে যৌথ চাষব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই যৌথ চাষব্যবস্থার কথা বলা হলেও তার যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা সেই ব্যবস্থায় পৌঁছানোর জন্য বাস্তবসম্মত কোনও পরিকল্পনা নিয়ে কোনও আলোচনা করা হয়নি।

ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ করার প্রশ্নে কমিটির মত ছিল, যথোপযুক্ত মাপের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষই প্রকৃতপক্ষে ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে, এবং এই ব্যবস্থাতেই চাষিদের মধ্যে চাষ বিষয়ে ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকৃত উৎসাহ সঞ্চার করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থা জমি ও কৃষি আয়ের বণ্টনে অসমতার অবসান ঘটাবে, ফলে একশ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণিকে শোষণ করার সমস্ত বাস্তব ভিত্তির অবসান ঘটবে। উপরন্তু এই ব্যবস্থায় চাষি যদি জমিতে ও চাষে কোনও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়, তবে তার সমস্ত সুফল চাষির কাছেই যাবে, অন্য কোনও মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে নয়। এই নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারলে এই ব্যবস্থা চাষিকে উন্নত ধরনের চাষে উৎসাহ দেবে।

কংগ্রেস কৃষি-সংস্কার কমিটির বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই কমিটি দেশের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ, যেখানে প্রকৃত উৎপাদকই জমির মালিক, তাকে সবথেকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল ও পুঁজিবাদী ধরনের খামার-ব্যবস্থায় চাষের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কমিটি এই মতও ব্যক্ত করেছিল যে, কোনও একটি বিশেষ ভূমিব্যবস্থা সারা দেশে অবস্থা অনুযায়ী সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে না, কাজেই কৃষি-ব্যবস্থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে। কমিটির মতামত দেওয়ার ধরন থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে কোনও একটি বিশেষ ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা সারা দেশে চালু করার মতো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে তাঁরা ছিলেন না।[৩]

কৃষি সংস্কার কমিটির এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, তারা কৃষি সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক অবস্থানে ছিলেন না। এর কারণ, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষের পদ্ধতিকে উৎসাহিত করলে, যদি মুক্ত প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে অচিরেই অপেক্ষাকৃত বড় জোতগুলি বৃহদায়তন

উৎপাদনের সুবিধা নিয়ে বাজার থেকে ছোট জোত-নির্ভর চাষিদের হটিয়ে দিয়ে বড় জোতের প্রাধান্য কায়েম করবে। ফলে ঋণ, উপকরণ ও পণ্য ইত্যাদির বাজারগুলির মুক্ত চলাচলের পথে কোনও বাধা যদি না থাকে তাহলে এই অবস্থা ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য যোগ করবে। ব্যক্তি-মালিকানায় চাষের ওপর কোনও বাধা নিষেধ বা জমির মালিকানার কোনও ঊর্ধ্বসীমা দৃঢ়ভাবে না চাপানো থাকলে অচিরেই এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্ম দেবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের সূচনাকে ঠেকিয়ে রাখার আর-একটি বিকল্প ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা হল কৃষিতে সমবায় ও যৌথ মালিকানায় চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সামনে রেখে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারে ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষকে উৎসাহ দেওয়া। যদিও কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালুর বিপক্ষে তারা এই দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছিল যে, এই ব্যবস্থা অনৈক্য ও শোষণকে উৎসাহিত করে সুতরাং আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, তবু তাদের সামনে সমাজতান্ত্রিক সমবায় বা যৌথ মালিকানায় চাষ প্রবর্তনের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাও ছিল না। এই পরিকল্পনা না থাকলে ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ খোলামেলা প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ধরনের ব্যবস্থারই সূচনা ঘটায়। অবশ্য পুঁজিবাদী উৎক্রমণের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চালু হতে পারে কেবল পুঁজিবাদ বিকাশের অন্যান্য শর্তগুলি কার্যকর থাকলে। এই শর্তগুলির মধ্যে প্রধানতমটি হল, কৃষি পণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি শ্রমিকের মুক্ত বাজার গড়ে ওঠা। এই শর্তপূরণের অবস্থা বজায় না থাকলে মহাজনি ও বাণিজ্যিক পুঁজির মিলিত কার্যকারিতা প্রকাশ পায় না। কৃষি-উদ্বৃত্ত উৎপাদনের রাস্তায় না গিয়ে সেই পুঁজি তখন আবদ্ধ থাকে অনুৎপাদক ব্যবসায়ী-মহাজনি কারবারের মধ্যে, এবং কৃষিকে ক্রমগত ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। ঋণের ওপর, অথবা জমির মালিকানার ওপর, ঊর্ধ্বসীমা বসানো থাকলে এই ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত উৎপাদনের সামগ্রিক বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে তাকে বন্ধ্যাত্বের দিকে নিয়ে যাবে। এই দুই বিকল্প সম্ভাব্য পরিণতির কথা সংস্কার কমিটির চিন্তায় ছিল না। চিন বা রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যদিও প্রথমে জমি অধিগ্রহণ ও পুনরায় ছোট জোতে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিভাজনের মধ্য দিয়ে ছোট জোতে চাষ শুরু করার নীতি নেওয়া হয়েছিল, তবু ক্রমশ এই ছোট চাষ-নির্ভর কৃষি থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে বড় যৌথ মালিকানা-নির্ভর চাষ-ব্যবস্থায় উত্তরণের দীর্ঘকালীন কর্মসূচি নেওয়া হয়। অপরপক্ষে জাপানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রথমে যদিও মাঝারি মাপের জোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষ শুরু হয়, তবু পরে পুঁজিবাদী খোলামেলা প্রতিযোগিতা ও সব ধরনের বাজারের স্বাধীন ক্রিয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, ফলে পুঁজিবাদী বৃহৎ জোতনির্ভর চাষের বিকাশের পথে সমস্ত বাধাগুলি হঠে যায়। ভারতীয় ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে জাপান বা চিন-রাশিয়ার ভূমিসংস্কারের মতো দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। ভূমিসংস্কারের গৃহীত আশু কর্মসূচিগুলি দীর্ঘ সময় বাদে কোন পরিণতির দিকে এগোবে সে সম্বন্ধেও কোনও ধারণা বা প্রস্তুতি ছিল না। খুব হালকাভাবে ভবিষ্যতে সমবায় ব্যবস্থায় চাষ, পণ্য ও উপকরণের সংগঠিত প্রয়াসের পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোনওদিনই গুরুত্ব দিয়ে সমবায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়নি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। এই আইনগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল: ১) মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার বিলোপ। ২) ভাগ-চাষ প্রথার সংস্কার ৩) জোতের আয়তনের ওপর ঊর্ধ্বসীমা স্থির করা। ৪) কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন ৫) সমবায় চাষ-প্রথা ও গ্রামের সমবায়ভিত্তিক পরিচালনাকে শেষ পরিণতি হিসেবে সামনে রাখা। চিরস্থায়ী

জমিদারি বন্দোবস্ত ও সাময়িক জমিদারি ব্যবস্থা চালু ছিল এমন এলাকাগুলিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগেই মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার বিলোপ সংক্রান্ত আইনটির দ্রুত প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঘটে। উত্তরপ্রদেশে ১৯৫০ সালের মধ্যেই জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়, কিন্তু ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই আইনটিকে বার বার সংস্কার করা হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি এস্টেট অধিগ্রহণ আইনটি ১৯৫৫ সালে প্রণীত হয়। বিহারে ১৯৫০ সালে প্রণীত হয় বিহার ভূমিসংস্কার আইন এবং ওড়িশাতে জমিদারি এস্টেট ব্যবস্থা বিলোপের আইন প্রণীত হয় ১৯৫১ সালে। রাজস্থানে ভূমিসংস্কার ও জায়গির পুনর্দখল আইন প্রণীত হয় ১৯৫২ সালে, অন্ধ্রপ্রদেশে জায়গির এস্টেট বিলোপ আইনটি ১৯৪৯ সালেই প্রণীত হয়।

মধ্যস্বত্বভোগীদের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন ধরনের জমিগুলি হল: ১) গ্রামের সাধারণ ব্যবহারের জমি, ২) মধ্যস্বত্বভোগীর নিজস্ব অধিকারে থাকা গৃহ-সংলগ্ন পারিবারিক জমি। যে-জমি হয় এরা নিজেরাই লোক নিয়োগ করে চাষ করাত অথবা ভাড়াটে কিংবা ভাগ-চাষিকে দিয়ে চাষ করাত। ৩) গৃহ-সংলগ্ন পারিবারিক জমি ছাড়াও তাদের ব্যক্তিগত নিজস্ব চাষের জমি। ৪) মধ্যস্বত্বভোগীর কাছ থেকে সরাসরি যে-সব জমি খাজনাদাতা প্রকৃত চাষির হাতে গেছে। ৫) যেসব জমি সরাসরি খাজনাদাতার কাছ থেকে প্রকৃত উৎপাদক চাষির হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে।

আমরা জানি, মধ্যস্বত্বলোপী আইন জমিদার-জায়গিরদারের খাজনা আদায়ের জমিদারি বা জায়গিরদারি অধিকারের বিলোপ ঘটিয়েছিল। কিন্তু এই আইন জমিদারি এলাকার পতিত জমি, জঙ্গল, আবাদি জমিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রযোজ্য ছিল না। এই ধরনের জমির ক্ষেত্রে যে-আইন প্রণীত হল সেটিও মূল জমিদারি জায়গিরদারি বিলোপ আইনের অনুরূপ। এই সব পতিত জমি-জঙ্গল ইত্যাদির ওপর মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকারের বিলোপ ঘটিয়ে সরাসরি সরকারি মালিকানা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। জমিদার-জায়গিরদারের গৃহসংলগ্ন বিশাল জমি ইত্যাদি এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিগত চাষের জমি সম্বন্ধে এক-এক প্রাদেশিক সরকার এক-একরকম আইন প্রণয়ন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে-আইন প্রণীত হল, তাতে খাস-জমি (নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকারের জমি)-র ওপর একটা নির্দিষ্ট সীমা অবধি একজন চাষি সরকারের ভাড়াটে চাষি হিসেবে তার অধিকার পেল। তাদের খাস জমির এই অংশের জন্য তারা রাষ্ট্রের কাছে রাজস্ব-দাতা ভাড়াটে চাষি হিসেবে গণ্য হল। এদের অধীন পূর্বতন ভাড়াটে চাষিদের কোনও অধিকার এই আইন স্বীকার করে না। খাস-জমির রায়তি স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছিল সর্বোচ্চ ২৫ একর জমির ওপর। ২৫ একরের ওপর সব খাস-জমি সরকার অধিগ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশে জমিদারি বিলোপ ও জমি অধিগ্রহণ আইনে জমিদারি এস্টেটের সব জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিল। এই জমির পূর্বতন চাষিরা সরাসরি সরকারের অধীনস্থ ভূমিখাজনা-দাতা ভাড়াটে চাষিতে পরিণত হল। তবে চাষিদের এই জমি কিনে নেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়, সেজন্য চলতি খাজনার দশ গুণ দাম দিতে হত। পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের খাস-জমির ওপর অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়। সমগ্র মধ্যভারতের জায়গিরদারি অঞ্চলে, আজমিরে ও ভোপালেও একইরকম আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। রাষ্ট্রকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়।

মধ্যভারতের জমিদারি অঞ্চলে ও রাজস্থানে অবশ্য এই খাস-জমি সংক্রান্ত নীতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়: এইসব অঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগীদের খাস-জমি তারা নিজস্ব মালিকানায় আগের মতোই রেখে দিতে

পারত। মধ্যভারতে অবশ্য এইসব জমির পূর্বতন খাজনাদাতা প্রকৃত চাষিদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জমির মালিকানা কিনে নিতে পারে। রাজস্থানে খাস-জমির পূর্বতন খাজনা-দাতা প্রকৃত চাষিরা শ্রমের খরচের ওপর ১২০০ টাকা অবধি আয় হয় এমন পরিমাণ জমি কিনে নেওয়ার অধিকার পায়। দিল্লিতে খাস-জমির পূর্বতন ভাড়াটে চাষিরা খাজনার ২০ থেকে ৪০ গুণ দাম দিয়ে খাস-জমির মালিকানা কেনার সুযোগ পায়। অবশ্য অনেক প্রদেশে নিজস্ব চাষের অধীনে থাকা খাস-জমিরও একটা সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা হয়েছিল। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে এই ধার্য সীমা হল ২৫ একর। অপরপক্ষে কোনও কোনও রাজ্যে আবার পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের খাস-জমির এলাকার ওপর আরও খানিকটা জমি ব্যক্তিগত চাষের জন্য রেখে দেওয়ার অধিকার পায়।

সাধারণভাবে জমিদার বা জায়গিরদারদের এস্টেটে জমিদারি ও জায়গিরদারি অধিকার বিলোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অধীনে থাকা বড় মাপের ও প্রথম স্তরের প্রধান খাজনা-দাতা ভাড়াটে চাষিদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আইন প্রবর্তন করা হয়। সবক্ষেত্রেই এদের রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে আনা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে তাদের অধিকার-সংক্রান্ত আইনে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা চালু হয়। বিভিন্ন প্রদেশে মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণেও পার্থক্য ছিল। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম, ভোপাল ও বিন্ধ্য প্রদেশে এই প্রথম স্তরের প্রধান অধিকারভোগীরা কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জমির ওপর স্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য অধিকার পায়। উত্তরপ্রদেশে জমিদারদের ঠিক নীচে অবস্থানকারী এই প্রধান দখলদারি অধিকারভোগীরা কোনও ক্ষতিপূরণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জমির ওপর স্থায়ী, বংশানুক্রমিক অধিকার পেয়েছিল, কিন্তু জমি হস্তান্তরের অধিকার তাদের ছিল না। অবশ্য খাজনার দশগুণ মূল্য দিয়ে তারা হস্তান্তরের অধিকার কিনতে পারত।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, জমিদারি ও জায়গিরদারি এলাকায় জমিদার বা জায়গিরদারদের নীচে স্তরে স্তরে অনেক মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল। এদের মধ্যে জমিদার বা জায়গিরদারের ঠিক নীচে অবস্থানকারী প্রধান মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটি, তাদের নীচে থাকা আরও অনেক দখলদারি অধিকার ভোগকারী মধ্যস্বত্বভোগী সমেত বিস্তীর্ণ জমিদারি এলাকার ওপর খাজনা আদায়ের অধিকার ভোগ করত। ভূমিসংস্কার আইন জমিদার ও জায়গিরদারদের ক্ষমতা নাশ করে এই প্রধান মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার আইনসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে পূর্বতন ব্রিটিশরাজের স্বার্থবাহী জমিদার-জায়গিরদার শ্রেণিটির অবলুপ্তি ঘটলেও আসলে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার অবসান হয় না। এই বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটির অধিকার এতে আরও দৃঢ় হয় এবং এর বিনিময়ে এদের কোনওরকম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না। ভূমিসংস্কার সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় কোনও আঘাত হানে না।

এইসব বৃহৎ প্রাক্তন মধ্যস্বত্বভোগীরা এখন সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে চলে এলেও এদের নীচে অনেক খাজনাদাতা প্রজাস্বত্বভোগী চাষি বা ভাগ-চাষি, বা তাদেরও নীচে এদের ভাড়া করা, এদের খাজনা দেওয়া ভাগ-চাষি বা প্রজাস্বত্ব পাওয়া চাষি ছিল। ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্তনের আগে এইসব দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ভাড়াটে চাষিদের কোনওরকম দখলদারি অধিকার ছিল না। ভূমিসংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর এদের প্রথম পাঁচ বছরের জন্য দখলদারি অধিকার দেওয়া হল এবং তারপর এদের সুযোগ দেওয়া হল চলতি খাজনার ১৫ গুণ দাম দিয়ে মালিকানা অধিকার কিনে নেওয়ার। যারা এই দাম দিতে অপারগ, জমির ওপর তাদের

কোনওরকম মালিকানা বা দখলদারি অধিকার আইনত স্বীকার করা হল না। এদের মধ্যে যারা ছিল ভাগ-চাষি, আইনত তাদের ভাড়াটে প্রজা-চাষির স্বীকৃতি দেওয়া হল না। অর্থাৎ আইন এদের কোনওরকম অধিকার স্বীকার করল না। আবার একেবারে প্রথম স্তরের রায়তরা তাদের ব্যক্তিগত চাষের অধীনে আইনমাফিক একটা ঊর্ধ্বসীমার মধ্যে জমি রাখতে পারত। কোনও কারণে তারা ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস চালাতে না পারলে তাদের ব্যক্তিগত চাষের জমি লিজে নিয়মিত খাজনা পাওয়ার শর্তে ভাড়াটে প্রজা-চাষিকে দিতে পারত। এইসব ভাড়াটে প্রজা-চাষির দখলদারি বা মালিকানা, কোনও অধিকারই থাকত না, কারণ যে-কোনও সময় মালিক এদের উচ্ছেদ করে এদের চাষ করা জমি তার ব্যক্তিগত চাষের আওতায় নিয়ে আসতে পারত।

যেসব চাষি ব্যক্তিগতভাবে জমি চাষ করত, তাদের মালিকানার ওপর ভূমিসংস্কার আইনে জমির একটা ঊর্ধ্বসীমা চাপানো হল। তার বেশি জমি থাকলে সরকার তা অধিগ্রহণ করবে ও এই অধিগৃহীত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে ভাগ করা হবে, এটাই আইনত স্থির হল।

জাপান, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও বিপ্লব-পরবর্তী চিন ও রাশিয়ার ভূমিসংস্কারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল কৃষি থেকে প্রাক্-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্মূল করে কৃষিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পথ উন্মুক্ত করা। বিপ্লব-পরবর্তী চিন ও রাশিয়ার ভূমিসংস্কার একেবারে প্রাথমিক স্তরে কৃষি থেকে প্রাক্পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্মূল করতে চেয়েছিল। তারা কৃষি থেকে পুরনো ভূস্বামীর কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষি-জমিগুলো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অধিগ্রহণ করে প্রকৃত উৎপাদক ভূমিহীন চাষির হাতে তুলে দেয়। একই সঙ্গে যে-সমস্ত মুষ্টিমেয় কৃষিকাজে শ্রমদাতা চাষি মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষ করত ও প্রয়োজনে কিছু কিছু কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করত সাময়িক ভাবে ও শর্তাধীনে, তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের রাস্তায় কোনও বাধা দেওয়া হয় না। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই এই ব্যবস্থা নিলেও এর ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যেই স্পষ্টভাবে বলা ছিল এই পদক্ষেপগুলির রূপায়ণের পরবর্তী স্তরের কর্মসূচি কী হবে। এটা একটা ক্রমিক প্রক্রিয়া। সেখানে বলা হয় যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নূতন সৃষ্ট ব্যক্তিগত চাষের আওতায় থাকা কয়েকটি করে জোত একত্রিত করে ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চাষ শুরু করা হবে, তারপর সমবায় ব্যবস্থায় চাষ ও পরে অঞ্চলভিত্তিক যৌথ মালিকানায় বৃহৎ চাষব্যবস্থা চালু করা হবে। এই দেশগুলির রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটানো। অপর পক্ষে জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক স্তরে কৃষিতে ব্যক্তি-উদ্যোগে চাষের রাস্তা প্রস্তুত করা ও সেই সঙ্গে কৃষি-জমি, কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি শ্রমের মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়া গঠনের পথে সমস্ত আইনগত ও পরিকাঠামোগত বাধা অপসারণ করা। এর মাধ্যমে তারা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশকে অবাধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ভূমিসংস্কার আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে এটা আদৌ স্পষ্ট নয় যে, কৃষিতে শেষ পর্যন্ত কোন ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে চাওয়া হয়েছিল। তার কর্মসূচি থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, এই ভূমি সংস্কারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সবচেয়ে উপরতলার যে-মধ্যস্বত্বভোগীরা এদেশে ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষাকারী ছিল, তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। কিন্তু ভাগ-চাষ প্রথা বা স্থির খাজনায় ভাড়াটে চাষিকে দিয়ে চাষের পদ্ধতির অবসান ঘটানোর কোনও উদ্দেশ্য এই সংস্কারের ছিল না। স্থির খাজনায় চাষের আওতায় থাকা জমিতে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি করার, পুঁজিবাদী প্রথায় চাষপদ্ধতি বিকশিত করার, এবং তার মধ্য দিয়ে স্থির খাজনাকে পুঁজিবাদী কৃষি খাজনায় পরিণত করার কোনও উদ্দেশ্য এই কর্মসূচির পিছনে ছিল না। অথবা

এই সব জমি অধিগ্রহণ করে এই চাষিদের জোতে ব্যক্তিগত চাষের মাধ্যমে চাষ চালু করে জমিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের রাস্তা বাধাহীন করাও এই সংস্কার প্রচেষ্টার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল না। বিপরীতে এই সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ভাগ-চাষ বা স্থির খাজনার চাষ-ব্যবস্থার সংস্কার-পূর্ব অবস্থা বজায় রেখে কেবলমাত্র স্থির খাজনার চাষিদের দখলদারি অধিকার আরও জোরদার করা, ও খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। অর্থাৎ পূর্বতন প্রধান মধ্যস্বত্বভোগীদের ঠিক নীচে অবস্থানকারী মধ্যস্বত্বভোগী, যারা স্থির খাজনা ব্যবস্থায় থাকা জমির মালিক, তাদের পূর্বতন কর্তৃত্ব বা পূর্বতন ব্যবস্থার মূল চরিত্রে কোনও পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্য ভূমি সংস্কার আইনে পাওয়া যায় না।

আমরা আগেই দেখেছি, ঊনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে বিংশ শতকের প্রথম চার দশকে জমিবন্ধকি ও জমি হস্তান্তর সহজতর হওয়ার ফলে ব্যবসায়ী মহাজন শ্রেণি-জোতদার শ্রেণির উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ইতিমধ্যেই গ্রাম-সমাজের ওপর জমিদার ও জায়গিরদার শ্রেণির কর্তৃত্ব কমছিল ও জোতদার শ্রেণির কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভূমিসংস্কার এই জোতদার শ্রেণির মহাজনি ও বন্ধকি কাজকর্মের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও বাধা সৃষ্টি করল না। পূর্বতন রায়তদের মধ্য থেকে এরা যে বিপুল সংখ্যক ভাগ-চাষির জন্ম দিয়েছিল, সংস্কার আইন সেই ভাগ-চাষিদের সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। জাপান বা ইউরোপিয়ান দেশগুলি এবং চিন-রাশিয়ার মতো দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের দিক থেকে ভারতীয় ভূমিসংস্কার আইনের সীমাবদ্ধতা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমির ঊর্ধ্বসীমা জারি করে সীমা-বহির্ভূত জমি ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ছোট ছোট জমিতে ব্যক্তি-উদ্যোগে চাষব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এই আইনটির উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা জাপানের ক্ষেত্রে দেখেছি কৃষি পণ্য, জমি, কৃষি-শ্রমিক ও কৃষি-ঋণের মুক্ত বাজার যদি উপস্থিত থাকে এবং বাধাহীনভাবে পুঁজির বিনিয়োগ যদি সম্ভব হয়, তবে চাষিদের মধ্যে জমির পরিমাণে অসাম্যের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট ও বড় উৎপাদকদের মধ্যে বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এবং দেখা যায় অপেক্ষাকৃত বড় উৎপাদকদের পুঁজি বিনিয়োগ থেকে লাভের হার ছোট উৎপাদকদের থেকে বেশি, তাদের মুনাফার হারও বেশি। এরা পুঁজি পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে এগিয়ে যায় ও ছোট উৎপাদকরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কৃষি অর্থনীতি ক্রমশ বড় জোতে পুঁজিবাদী চাষের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের দেশে কৃষিসংস্কার প্রক্রিয়ায় জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনটি প্রবর্তনের সময় এই ধরনের পরিণতি সম্পর্কে সংস্কার-কর্তাদের স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। তাঁরা কৃষি-শ্রমিক সহ কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-ঋণের মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়া গড়ে তোলার বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেননি। কৃষিপণ্যের বাজার, কৃষি-ঋণের বাজার ও কৃষি উপকরণের বাজারের নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী-মহাজন শ্রেণিটির প্রভাব থেকে কৃষি অর্থনীতিকে মুক্ত করার জন্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ সেই সময়কার কৃষি-কর্মসূচির মধ্যে ছিল না। ফলে সংস্কার আইনগুলি প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বাজার-প্রক্রিয়াকে মুক্ত করার কোনও পরিকল্পনা তাঁরা করেননি। কীভাবে সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিতে উপস্থিত প্রাক-পুঁজিবাদী উপাদানগুলি নির্মূল করা যায় তার কোনও পরিকল্পনা তঁদের ছিল না।

অন্যদিকে এই সংস্কার আইনের বিভিন্ন উপবিভাগগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তৎপরতার অভাব দেখা যায়। ভাড়াটে, খাজনাদাতা প্রজাদের জমির ওপর দখলদারি স্বত্বের কোনও নিশ্চয়তা তৈরি হল না[৪], শুধু তা-

ই নয়, জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনটিও ব্যাপক ভাবে লঙ্ঘিত হল।[৫] কৃষিতে প্রাক-পুঁজিবাদী কর্তৃত্বকারী শক্তির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে এই আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। জোতদাররা জমির প্রকৃত পরিমাণ গোপন করে বিভিন্ন ভাবে বেনামে ঊর্ধ্বসীমার থেকেও বেশি জমি অধিকারে রেখেছিল। ঋণের ভারে জর্জরিত কৃষক-সমাজের ওপর ব্যবসায়ী-মহাজন-জোতদারদের কর্তৃত্ব ছিল অসীম। সেইসঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থাতেও এদের কর্তৃত্ব জারি ছিল, ফলে এদের পক্ষে এই আইন ফাঁকি দেওয়া কঠিন ছিল না। শুধুমাত্র জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা জারি করে এই কর্তৃত্ব রোধ করা যায়নি, বিভিন্ন বাজারে এদের নিয়ন্ত্রক ভূমিকার অবসান ঘটানোর জন্যও উপযুক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

সংস্কার-পরবর্তী কয়েক বছরে ভারতীয় কৃষি যে-অবস্থায় গিয়েছিল তা থেকে ভারতীয় কৃষিসংস্কারের ব্যর্থতার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের পর, ১৯৬০-৬১ সালে, জমির বিন্যাস ব্যবস্থা কেমন ছিল তা নীচের সারণি থেকে স্পষ্ট হবে।

সারণি ৩.১ মালিকানাধীন জোত ও কৃষিজমির বিন্যাস (শতকরা)

সাল	প্রান্তিক <১ হেক্টর		ক্ষুদ্র (১—<২ হেক্টর)		আধা-মাঝারি (২ – <৪ হেক্টর)		মাঝারি (৪– <১০ হেক্টর)		বৃহৎ (১০ হেক্টরের বেশি)	
	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি
১৯৬০-৬১	৬০.০৬	৭.৫৯	১৫.১৬	১২.৪০	১২.৮৬	২০.৫৪	৯.০৭	৩১.২৩	২.৮৫	২৮.২৪
১৯৭০—৭১	৬২.৬২	৯.৭৬	১৫.৪৯	১৪.৬৮	১১.৪০	২১.৯২	৭.৮৩	৩০.৭৫	২.১২	২২.৯১
১৯৮১—৮২	৬৬.৬৪	১২.১২	১৪.৭০	১৬৪৯	১০.৭৫	২৩.৩৪	৬.৪৫	২৯.৮৩	১.৪২	১৮.০৭
১৯৯১—৯২	৬৯.৩৪	১৬.৯৩	২১.৭৫	৩৩.৯৭	৫.০৬	১৭.৬৩	২.৮০	১৭.৬৪	০.৯৫	১৩.৮৩

Source: NSSO 17th, 26th, 37th, 48th Round

দেখা যাচ্ছে ১৯৬০—৬১ সালে মোট জোতের মধ্যে প্রান্তিক জোতের অনুপাত ছিল শতকরা ৬০ ভাগের বেশি ও ক্ষুদ্র জোতের অনুপাত ছিল শতকরা ১৫ ভাগের কিছু বেশি। অর্থাৎ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের জোতের (<২ হে মাপের) মোট অনুপাত ছিল শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি। এবং মোট জমির শতকরা ২০ ভাগ জমি এদের চাষের আওতায় ছিল। মাঝারি ও সর্ববৃহৎ অর্থাৎ ৪ হেক্টরের বেশি মাপের জোত ছিল শতকরা প্রায় ১২ ভাগ মাত্র এবং মোট জমির শতকরা ৫৫.৪৭ ভাগ এদের চাষের আওতায় ছিল [শতকরা ২.৮৫ ভাগ জোত ছিল অতি বৃহৎ, ১০ হেক্টরের বেশি বা ৩০ একরের বেশি মাপের, ও এই জোতের আওতায় ছিল মোট জমির শতকরা ২৪.২৪ ভাগ। শতকরা ৩১.২৩ ভাগ জমি ছিল মাঝারি জোতের আওতায় (৪—<১০ হেক্টর)]। এর বাইরে ২০.৫৪ ভাগ জমি আধা-মাঝারি (২—<৪ হেক্টর মাপের) জোত ছিল মোট জোতের শতকরা ১২.৮৬ ভাগ। শতকরা ২৪.২৪ ভাগের বেশি বৃহৎ জোতের জমির মালিক ছিল জোতদার শ্রেণি, পূর্বতন সবচেয়ে উচ্চে অবস্থানকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের ঠিক নীচে যাদের অবস্থান ছিল এবং যারা মূলত স্থির খাজনায় বা ভাগচাষে জমি চাষ করতে দিত। দেখা যাচ্ছে, ভূমিসংস্কারের পরও ১০ হেক্টর বা ৩০ একরেরও বেশি মাপের জমি কিছু চাষির অধিকারে ছিল এবং তাদের মালিকানায় ছিল মোট জমির প্রায় একচতুর্থাংশ জমি। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে ২৫ একরের সীমার অতিরিক্ত জমিগুলো অধিগৃহীত হয়নি।

এছাড়াও মাঝারি চাষি, যাদের জমির মাপ ৮.৬০ থেকে <১০ হেক্টর, তাদের বেলাতেও ২৫ একরে বেঁধে দেওয়া নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। এটি ভূমিসংস্কার আইনটির প্রয়োগে চরম ব্যর্থতার প্রমাণ। আবার উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, জাপানের মতো ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত বড় জোতে জমির কেন্দ্রীভবনের কোনও প্রবণতা দেখা যায়নি। উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১ সালের পর থেকে দশকের পর দশক বড় জোতের (৪ হেক্টর থেকে ১০ হেক্টরের বেশি) আওতায় জমির শতকরা ভাগ কমতেই থেকেছে। ১৯৮১–৮২ সাল থেকে ১৯৯০–৯১, এই দশকটিতে বড় জোতের আওতায় থাকা মোট জমির শতকরা ভাগ কমেছে সবচেয়ে বেশি— মোট জমির শতকরা ৪৮.০৫ ভাগ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩১.৫৭ ভাগে। বড় জোতে জমির কেন্দ্রীভবন হওয়ার পরিবর্তে বড় জোতের আওতা থেকে জমি কমে যাচ্ছে। দশকের পর দশক বড় জোতের সংখ্যার অনুপাতও কমছে দ্রুত। অনেকে বড় জোতের এই দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ঘটনাটিকে ১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মনে করা হয় এটি ভূমিসংস্কারে বাম সরকারের সাফল্যের নিদর্শন। কিন্তু জমির খণ্ডীকরণের এই চিত্রটি যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সত্যি তা নয়, এটি গোটা দেশেরই চিত্র।

অন্যদিকে এটা দেখা যেতে পারে যে, পূর্বতন জমিদারি এলাকা অধ্যুষিত রাজ্যগুলি, যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ— এই রাজ্যগুলি জমিদারি ব্যবস্থার অবসানের পর ১৯৬১ সালেও পূর্বতন রায়তওয়ারি ব্যবস্থার রাজ্যগুলি থেকে কৃষি উৎপাদন বা কৃষিতে উৎপাদন-কুশলতার দিক থেকে যথেষ্ট পশ্চাদপর ছিল। এই রায়তওয়ারি রাজ্যগুলি— পঞ্জাব, কেরালা ও মহারাষ্ট্র, ১৯৬১ সালে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার দিক থেকে অন্যান্য সব রাজ্যের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। আর-একটি রাজ্য, মাদ্রাজ, কিয়দংশে জমিদারি এলাকা অধ্যুষিত হলেও, কৃষিতে অগ্রগামী ছিল।

সারণি ৩.২ শস্য উৎপাদনে শতকরা বৃদ্ধি ১৯৫২–৫৩ থেকে ১৯৬৪–৬৫

রাজ্য	শস্য উৎপাদনে বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (শতকরা বৃদ্ধি) ১৯৫২–৫৩ থেকে ১৯৬৪–৬৫	স্থির খাজনা ও ভাগচাষের অধীনে মোট জমির শতকরা ভাগ	পূর্বতন ভূমিব্যবস্থা জমিদারি/ জায়গিরদারি/ রায়তওয়ারি
উত্তরপ্রদেশ	২.০	৮.৬০	জমিদারি
রাজস্থান	৩.৫০	১০.৯৯	জায়গিরদারি
মধ্যপ্রদেশ	৩.৫৪	১৯.৯১	জমিদারি
ওড়িশা	৩.১২	২১.৯১	জমিদারি
বিহার	৩.৮৬	৩২.১৮	জমিদারি
অসম	১.৩৬	৩৪.৬১	জমিদারি
পশ্চিমবঙ্গ	২.৩৬	৩৪.৯৫	জমিদারি
গুজরাত	৬.৫২	১৩.৩৩	রায়তওয়ারি
মহারাষ্ট্র	৩.৮০	২২.৬৯	রায়তওয়ারি
মাদ্রাজ	৫.৮৩	১৯.৯২	অংশত জমিদারি
মহীশূর	৪.৭৬	৩২.৬২	রায়তওয়ারি
কেরালা	২.৮২	৫৭.২১	রায়তওয়ারি
পঞ্জাব	৬.৫৪	৪৮.৬০	রায়তওয়ারি
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩.৪৬	২৩.৩২	জায়গিরদারি
ভারত		২৩.১৩	

Source: Ministry of Food and Agriculture

উৎপাদনের হার সংক্রান্ত তথ্য[৬] এবং স্থির খাজনা ও ভাগ চাষ সংক্রান্ত তথ্য[৭] ১৯৬১ সালের সেনসাসের ভিত্তিতে উপরে সারণি ৩.২তে উপস্থিত করেছি।

উল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ে ধারণা করতে পারি।

আমরা দেখছি, অধিকাংশ রাজ্যে ভূমিসংস্কার-পরবর্তী ১০/১২ বছরে বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৪ ভাগের নীচে ছিল। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩ ভাগেরও নীচে। বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ছিল গুজরাত, পঞ্জাব, মহীশূর ও মাদ্রাজে। যে সমস্ত এলাকা ভূমিসংস্কার আইন প্রয়োগের ১০ বছর পর গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে, তার মধ্যে মাদ্রাজ বাদে, পঞ্জাব, গুজরাত ও মহীশূর স্বাধীনতার আগে ছিল রায়তওয়ারি এলাকাভুক্ত। এমনকী মাদ্রাজও অংশত রায়তওয়ারি এলাকাভুক্ত ছিল। বৃদ্ধির হার যেসব অঞ্চলে সব থেকে নীচে, সেই

অঞ্চলগুলোর সব ক'টিই ছিল জমিদারি এলাকাভুক্ত। ভূমিসংস্কার পূর্বতন জমিদারি এলাকাগুলোর পশ্চাদপদতা কাটাতে খুব সাহায্য করেনি। ভূমিসংস্কারের ১০/১২ বছর পরেও জমিদারি ও রায়তওয়ারি প্রদেশগুলির মধ্যে কৃষি উৎপাদনে প্রকট তফাত ছিল।

একদিকে জোতগুলোর ক্রমহ্রাসমান গড় পরিমাপ, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের মাত্রার অসাম্য সেই সময়ে ছিল ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য। ভূমিব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, ভাগ-চাষ ও স্থির খাজনায় চাষের ব্যাপকতা। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে ভাগ-চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৪০ ভাগের বেশি, অনেক প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগের বেশি। উপরের সারণি থেকে আর-একটি তথ্যের হিসাব দেখা যাচ্ছে, তা হল, ভাগ-চাষ বা স্থির খাজনায় চাষ যে সবসময় নিজস্ব জমিতে নিজে চাষ পদ্ধতির তুলনায় কম উৎপাদনশীল, বা তাতে বৃদ্ধির হার কম ঘটে এমন নয়।

১৯৫০-এর দশকে পূর্বোল্লিখিত ভূমিসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে লিজব্যবস্থায় ভাড়াটে চাষিদের অবস্থা উন্নতির জন্য টেনান্সি আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ হয়। কিন্তু ১৯২৮-এর বেঙ্গল টেনান্সি আইন ও পরবর্তীতে এই আইনের যে-বিভিন্ন সংস্কার হয়েছে তার কোনও ধারাতেই বর্গাদার বা ভাগচাষিদের জমির ওপর দখলি অধিকার স্বীকার করা হয়নি, যদিও স্থির খাজনার চাষের চাষিদের দখলদারি স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছিল।

১৯৪৬–৪৭ সালে তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় ও বাংলার বিভিন্ন রাজ্যে তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ভাগ-চাষ প্রথার সংস্কার। তেভাগা আন্দোলনের ঘোষিত মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাগ-চাষি বা বর্গাদারদের জন্য মোট ফসলের মূল্য থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে বাকি অংশের তিন ভাগের দুইভাগ ফসল বর্গা-চাষিদের অধিকারে রাখা। এই আন্দোলন ভূমিব্যবস্থায় বা বর্গা-ব্যবস্থায় কোনও মূলগত পরিবর্তন আনতে না পারলেও গ্রামীণ ভূমি-সম্পর্কে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। ১৯৫০-এর দশকের ভূমিসংস্কার আইনের পরে ১৯৫৫ সালে এল টেনান্সি সংস্কার আইন। সেই আইনবলে স্থির খাজনার চাষিদের দখলদারি স্বত্ব স্বীকৃত হল, সেই সঙ্গে জমির মালিক ও ভাড়াটে চাষিদের মধ্যে শ্রম ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন উপকরণের খরচের দায় ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যবস্থা হল, খাজনার পরিমাণও স্থির করা হল সেই অনুযায়ী। কিন্তু সেখানেও ভাগ-চাষি বা বর্গাদারদের আইনত কোনও দখলদারি অধিকার স্বীকার করা হয়নি, মালিক ইচ্ছা করলে যে-কোনও সময়ে তাদের উৎখাত করতে পারত। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে অবশ্য প্রথম ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার সময়েই তারা খাজনার দশ গুণ অর্থ দিয়ে এই অধিকার কিনতে পারত। কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনের যথাযথ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার ফলে গোটা দেশেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমিদারি ধরনের শোষণে কোনও পরিবর্তন আসেনি। শুধুমাত্র সবচেয়ে ওপরের তলার ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী জমিদার শ্রেণি তাদের পূর্বতন অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু জমিদারের নীচের স্তরে যেসব জোতদার-জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী ও ব্যবসায়ী-মহাজন ছিল তাদের তীব্র শোষণের শিকার হওয়া থেকে ছোট চাষি ও ভূমিহীন চাষিদের নিষ্কৃতি মেলেনি। চাষিদের ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র চাষ-ব্যবস্থাকে পশ্চাদপদ করে রেখেছিল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন সমাজজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই আন্দোলনের মূল প্রক্রিয়া ছিল জোতদারদের হাতে থাকা সীমা-বহির্ভূত বিরাট জমি বলপূর্বক

অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টন, জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনি কাগজপত্র ধ্বংস করা, ঋণের বিপরীতে জমিবন্ধকি ব্যবস্থাগুলিকে বাতিল করা ও ঋণের ওপর সুদ দেওয়া বন্ধ করা। ১৯৬৭ থেকে ’৭০ সালের মধ্যে জমির আইন-নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমার উপরে থাকা জমির একটি বড় অংশ অধিগ্রহণ করে বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তৎকালীন বাম-বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকার ও এই সরকারের পতন হলে কংগ্রেস সরকার, নির্মমভাবে এই আন্দোলনকে দমন করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা ব্যাপক দমন-পীড়নের সম্মুখীন হয়; তাঁদের বেশিরভাগই কারারুদ্ধ ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়, নতুবা সরকারের নির্দেশে পুলিশ এদের মিথ্যা সংঘর্ষের নামে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ১৯৭০ থেকে ’৭৭-এর মধ্যে অধিগৃহীত জমিতে জমির মালিকরা আবার তাদের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে জোতদার জমিদার ও মহাজনের চাপানো সামন্ততান্ত্রিক শাসনে পিষ্ট কৃষক জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষ ঘটায়, তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস জোগায়। ফলে এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মননে তা বিরাট পরিবর্তন আনে। ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে মালিক-শ্রেণি ও তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্ররাও উপলব্ধি করে যে, কৃষক জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত রাখার জন্য ভূমিসংস্কার আইনের আরও ব্যাপক প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর বর্গাদারদের সংগঠিত বর্গা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হল বর্গা আইন। এই প্রথম বর্গাদারদের দখলদারি অধিকার আইনত স্বীকার করা হল। এই অধিকারের বিপরীতে মালিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ কাটানোর জন্য সম্মিলিত বাম দলগুলি বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এর ফলে আইনত বর্গাদারদের দখলদারি স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্গাদারদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। জাপান ও ইউরোপের দেশগুলি কৃষিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বার খুলে দেওয়ার নীতি নিয়েছিল ও সেই লক্ষ্যে খাজনার বিনিময়ে চাষ ও ভাগ-চাষ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানোর পথে এগিয়েছিল। চিন ও রাশিয়ার মতো সদ্য সমাজতন্ত্রে পা-রাখা দেশগুলি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাষ ও পরবর্তীতে সমবায় ব্যবস্থা ও যৌথ মালিকানায় চাষ ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়েছিল। এদিকে অপারেশন বর্গা সমেত ভারতের ভূমিসংস্কার আইন ছিল ভাগ-চাষি বা স্থির খাজনার চাষিদের জমির মালিকানা দেওয়ার নীতি থেকে অনেক দূরে, বরং এই নীতিগুলো ছিল তাদের বর্গা অধিকার বা স্থির খাজনার চাষি হিসেবে আইনগত পরিচয়কেই দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার উদ্যোগ।

ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, জমি-চাষ পদ্ধতির সংস্কার ঘটাতে চাওয়া আইনগুলিতে কয়েকটা বিশেষ ত্রুটি থাকার দরুন ভাড়াটে চাষিদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টেনান্সি আইন লঙ্ঘিত হয়েছে কারণ টেনান্সি চুক্তিগুলি আইনসম্মত পদ্ধতি মেনে করা হয়নি। বেশিরভাগ সময়েই চুক্তিগুলো ছিল মৌখিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাজনার পরিমাণ ছিল আইন-নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি। টেনান্টদের কোনও দখলি স্বত্ব ছিল না এবং তাদের কাজের স্থায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। উলফ লাদেজিন্সকি[৮] তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, জমির ওপর খাজনায় নিযুক্ত ভাড়াটে চাষিদের দখলিস্বত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনটি বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন, সীমা-

বহির্ভূত জমি ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অধিগ্রহণ ও ভূমিহীন বা ক্ষুদ্র চাষির মধ্যে তা পুনর্বণ্টনের আইন। ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য প্ল্যানিং কমিশন ১৯৭২ সালে যে টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করেছিল তার প্রতিবেদনেও আছে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ।[৯] অশোক রুদ্র উল্লেখ করেছেন, ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ভূমিসংস্কার আইনগুলির অন্তর্গত দুর্বলতা এবং এগুলির প্রয়োগের ব্যর্থতা স্বীকার করা হত এবং আশা ব্যক্ত করা হত যে ভবিষ্যতে এই আইনগুলিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আইনটিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনা হবে ও যথাযথ প্রয়োগ করা হবে।[১০] ভূমিসংস্কার আইনের, বিশেষ করে সীমাবহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টন আইন প্রয়োগের, পরবর্তী ধাপ হওয়া উচিত ছিল সমস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোতের মালিকের জন্য সমবায় ব্যবস্থায় চাষপদ্ধতি গড়ে তোলা। তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপের স্বার্থে যেসব আইনি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা বরাবর অবহেলিত থেকে গেছে। সমবায় ব্যবস্থায় কৃষি-উৎপাদনের বিষয়টি আলোচনা থেকেই অন্তর্হিত হল। সমবায় কার্যকর রইল একমাত্র কৃষিঋণ ও কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থায়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকের ঋণ পাওয়া ও যথাযথ দামে পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে যত সমস্যা ঘটে এর ফলে তার অতি সামান্য অংশ সমাধানের কিছুটা সুবিধা মিলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এল বামজোট— সংসদীয় পথ বর্জন করা বিপ্লবী বামগোষ্ঠীগুলি বাদে অন্যান্য দলের সমষ্টি। এই সরকার ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি নিল। এর আগেই, ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে কংগ্রেসি শাসনের অধীনে ১৯৫৫-র ভূমিসংস্কার আইন বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছিল। এই সংশোধনগুলির সূত্রে বর্গাদার সংক্রান্ত আইনের প্রধান ধারাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় ছিল এরকম: ১) ভূস্বামী যদি লাঙ্গল, বলদ, সার, বীজ ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করে তাহলে মোট উৎপাদিত শস্য ভূস্বামী ও বর্গাদারের মধ্যে আধাআধি ভাগ হবে। ভূস্বামী উৎপাদন ব্যয়ের কোনও অংশ বহন না করলে মোট উৎপাদিত শস্যের শতকরা ৪০ ভাগ পাবে, শতকরা ৬০ ভাগ পাবে বর্গাদার। ২) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ধান ঝাড়ার জায়গা স্থির হবে। ৩) মালিকের বর্গা দেওয়া জমি ও নিজস্ব চাষের জমির মোট পরিমাণ বর্গাদারের মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশের কম হলে মালিক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে বর্গা দেওয়া জমি পুনরায় নিজস্ব চাষের আওতায় আনতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও জমির মালিকানায় ২৫ একরের ঊর্ধ্বসীমা বহাল থাকবে। এইসব সংশোধন ছাড়াও ১৯৭৫ সালে গৃহ-সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণীত হয় এবং সরকার তা রূপায়ণের জন্য পদক্ষেপ করে। এই আইন অনুযায়ী নিজ গৃহ-সংলগ্ন জমির পরিমাণ ০.৮ একরের বেশি হলে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হবে, ও এই ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য ভূস্বামীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কিন্তু বর্গাদারদের জমির ওপর সীমিত দখলদারি থাকার ফলে ব্যাপকভাবে জমি অধিগ্রহণ চলতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে চাষ করার নামে বর্গাদার উচ্ছেদ করে বর্গাদারি জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য ১৯৭৭ সালে বর্গাদারি আইনের সঙ্গে একটি নতুন ধারা যোগ করা হল, ব্যক্তিগতভাবে নিজে চাষ করার প্রয়োজনে বর্গাদার উচ্ছেদ করার অধিকারটি পুনরায় নতুনভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়। এই নতুন ধারা অনুযায়ী বর্গাদারকে তখনই উচ্ছেদ করা যাবে যখন ১) ভূস্বামী বর্গাদারি জমির এলাকাতেই বাস করে, ২)

ভূস্বামী নিজেই, অথবা তার পরিবারের কোনও ব্যক্তি, জমি চাষ করে, ৩) জমি থেকে উপার্জনই তার আয়ের প্রধান উৎস। ৪) এই জমি অধিগ্রহণের পরে ন্যূনতম ২/৫ একর জমি বর্গাদারের হাতে থাকে।

এছাড়া আইনের সাহায্য নেওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গে ভাগ-চাষিরা যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ত তা দূর করার লক্ষ্যে ভাগ-চাষি হিসেবে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হল রাজ্যব্যাপী অপারেশন বর্গা কর্মসূচির মাধ্যমে। এটি ছিল আসলে বর্গাদারদের জন্য আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ।

ওপরের আলোচনায় বিভিন্ন দেশের ভূমিসংস্কারের সঙ্গে ভারতীয় ভূমিসংস্কারের তফাত স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জাপানের ভূমিসংস্কারের থেকে এর তফাত এইখানে যে, এর কোথাও দেশের কৃষি-অর্থনীতিকে প্রাক্‌পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে তাকে পুঁজিবাদী উৎক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ভিত্তি ছিল যে জমিদার-শ্রেণি, তার অবস্থানে আঘাত হানা হলেও পুরনো প্রাক্‌পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্ক ও এই ভূমি-সম্পর্কের ধারক মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণি থেকে উদ্ভূত জোতদার শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি ভাঙার উপযোগী কোনও ব্যবস্থা এতে ছিল না। জমির ঊর্ধ্বসীমা ও সীমা-বহির্ভূত জমির অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টনের কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল। অর্থাৎ ভারতের কৃষি-অর্থনীতিকে একটি প্রগতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত করার পথে যেসব বাধা ছিল তা অপসারণের জন্য সংস্কারকদের বিশেষ আগ্রহ ছিল এমন কোনও প্রমাণ মেলে না। মহাজনি ও ব্যবসায়িক পুঁজির দাপট থেকে কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মুক্ত করে তাকে স্বাধীন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত কোনও কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে রেখেও ছোট অসংগঠিত কৃষিকে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে বড় চাষের সুবিধা জোটানো যায়নি। ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতিকেও স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়ার জন্য যে-সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল তা ধীরে ধীরে কমানো হয়েছে। সরকারি ঋণ প্রদান ব্যবস্থা, কৃষিপণ্যের সরকারি বিপণন, কৃষি উপকরণের সরকারি জোগান, সব ব্যবস্থাকেই ধীরে ধীরে সংকুচিত করে আনার নীতি নেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র চাষ-নির্ভর কৃষি-অর্থনীতি ছিল দুর্বল। তাই সহজেই তা কৃষি-উপকরণের জোগানদাতা পণ্যের, কৃষি-উপকরণের ও ঋণের বাজারের সম্মিলনে উদ্ভূত শোষণের শিকার হয়, কর্পোরেট পুঁজির সামগ্রিক কর্তৃত্ব তাদের শোষণ করতে থাকে। তার উৎপাদিত উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ এই প্রক্রিয়ায় কৃষির বাইরে চলে যেতে থাকে।

কৃষি উপকরণের অস্বাভাবিক দাম, তুলনায় ফসলের দাম যথেষ্ট না মেলায় কৃষি ক্রমশ অলাভজনক উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপরন্তু খোলা বাজার-অর্থনীতির নিয়মে ভারতীয় কৃষি বাইরে থেকে আমদানি করা, ভরতুকি সংবলিত, সস্তার পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমশ হঠে যেতে থাকে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিষয়গুলির অবতারণা করব।

তথ্যসূত্র

১. Simon Commission Report 1928, H. D. Malavy Land Reforms In India. Indian National Congress. New Delhi. 1955.

২. Report of the committee of the Panel of Land Reforms, under the agrarian reform committee.

৩. "...no single uniform method of land utilisation can meet the requirements of the situation" and "...the future pattern of the agrarian economy shall be flexible" – Reports of the committee of the Panel of Land Reforms.

৪. Ladejinsky, W. (1972) "Land Ceiling and Land Reform." *Economic and Political Weekly*. vol 7 no 5/7.

৫. Planning Commission task Force report 1973.

৬. Rao, S. K. 1971. "Inter-Regional Variations in Agriculture Growth, 1952–53 to 1964–65: A tentative Analysis in Relation to Irrigation." *EPW*. vol 6, no 7.

৭. Sharma, P. S. 1965. "A Study of Structural and Tenurial Obstacles of Rural India on the basis of 1961 census." *Indian Journal of Agriculture Economics*.

৮. Ladejinsky, W. (1972) "Land Ceiling and Land Reform." *Economic and Political Weekly*. vol 7 no 7.

৯. Planning commission Taskforce report 1973.

১০. Rudra, A. 1992. *A Political Economy of Indian Agriculture*. K.P Bagchi & Company.

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক ভারতীয় কৃষিতে পিছিয়ে-পড়া উৎপাদন-সম্পর্ক

আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় কৃষিতে স্বাধীন ভারত সরকার যে-ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি নিয়েছিল, বিভিন্ন ইউরোপিয়ান ও এশীয় দেশের ভূমিসংস্কারের সঙ্গে নানা বিষয়ে তার পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট। প্রথমত এই কর্মসূচির মধ্যে কোথাও ভাগ-চাষ প্রথা বা খাজনার বিনিময়ে জমি ভাড়ার প্রথায় ছেদ টানার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে তাকে মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ভাগ-চাষ প্রথায় ভাগ-চাষি অথবা ভাড়াটে চাষির অধিকারের সুরক্ষা ও ভাগ-চাষির ফসলের ভাগ নির্দিষ্ট করার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভাগ-চাষ প্রথা অবসানের কোনও কর্মসূচিই নেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, ঊর্ধ্বসীমা বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ ও তার পুনর্বণ্টনের কর্মসূচিটি বিভিন্ন দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি সবক্ষেত্রেই নানা প্রকার ছাড় দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে চাষের উদ্দেশ্যে সীমা-বহির্ভূত অধিকৃত জমি মালিক তার নিজস্ব হেফাজতে রাখতে পারে। এই সুবিধাগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই এই ঊর্ধ্বসীমা আইন লঙ্ঘন করার সুযোগ থেকে গিয়েছিল। ঊর্ধ্বসীমা আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দৃঢ়তার অভাব ছিল, ফলে বহু জমি-মালিক সীমা-বহির্ভূত জমি বেনামে রেখে দেওয়ার সুযোগ নেয়। সীমা-বহির্ভূত জমি পুনর্বণ্টনের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। কৃষির ওপর মহাজন ব্যবসায়ীদের যুগ্ম চাপ থেকে চাষিরা যাতে মুক্ত হতে পারে সে জন্য ছোট কৃষি-জোতগুলিকে স্বাধীনভাবে প্রগতিশীল উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে সাহায্য করার দরকার ছিল। এর উপায় ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করে তোলা, কিন্তু সেই লক্ষ্যে কোনও কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। মহাজনি কারবার নিষিদ্ধ করার জন্যও কোনও আইন-নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হল না। বাজারে কৃষিজাত পণ্যের স্বাধীন ক্রয়-বিক্রয় সুনিশ্চিত করার জন্য উপযোগী কোনও সংগঠিত বাজার-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়নি। ভূমি সংস্কারের দীর্ঘকালীন কর্মসূচি হিসেবে সমবায়-ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কখনওই গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হল না। এসবের পরিণামে সংস্কারের পরেও ভারতের কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থা নানাপ্রকার পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে যে-বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের কৃষিকে দীর্ঘকালীন অনুন্নতির মধ্যে রেখে দিল সেগুলি হল: ১) বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির দাপট। ২) জমি ও শ্রমের অবিচ্ছিন্নতা, অসংগঠিত শ্রমের বাজার। ৩) সংগঠিত ঋণের অপ্রতুল জোগান। ৪) সংগঠিত পণ্য-বাজারের অপ্রতুল উপস্থিতি, যার ফলে ছোট চাষির পণ্য বাজার-জাত করার প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্তের বড় অংশ বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবে আবদ্ধ থাকে। ৫) সংগঠিত ঋণের আয়োজন ছিল অপ্রতুল। ফলে ছোট চাষির ওপর মহাজনি শোষণ চলতে থাকে এবং তার ফলে পুঁজির একটা বড় অংশ মহাজনি পুঁজির আকারে মহাজনি

কারবারে আবদ্ধ থাকে। ৬) উৎপাদন-সম্পর্কে এই সমস্ত প্রাক-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য থেকে যাওয়ায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে ধীর গতিতে।

ভারতের মতো যেসব দেশ দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসনপ্রক্রিয়ার প্রভাবে ছিল, ফলত উন্নয়নের নিরিখে যারা পশ্চাদপর, তাদের সঙ্গে আজকের উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধীন দেশগুলির পার্থক্যের একটি বড় কারণ হল, দুই ধরনের দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষির অবদানের পার্থক্য। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের প্রথম সারির উন্নত দেশগুলির সমগ্র অর্থনীতিতে যে-নূতন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছিল তার মূলে ছিল তার পূর্ববর্তী প্রায় একশো-দেড়শো বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস। ইংল্যান্ড তথা বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলির সেই সময়কার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেসব অঞ্চলে বহির্বাণিজ্য বিপুল প্রসারিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বণিকের হাতে জমে ওঠা পুঁজি ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এর মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ওপর বণিক শ্রেণির প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়া চালু ছিল। ফলে ছোট উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি সংযুক্ত হয়ে বড় উৎপাদন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। কৃষিপণ্যের উৎপাদনের ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ ও কৃষিতে বাজারমুখি মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। অপর দিকে একই সময়ে ছোট কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত চাষি, ছোট কারিগর ও ছোট কৃষি উৎপাদকরা নিজ নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন হতে থাকে, উৎপাদন-উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং মুক্ত স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে নিযুক্তির অপেক্ষায় থাকা বিপুল সর্বহারার দলে পরিণত হয়। এর বিপরীত প্রক্রিয়া হিসেবে জমি সমেত বিভিন্ন উৎপাদন-উপকরণ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কৃষি উপকরণের নবগঠিত বাজারের অংশে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার সমান্তরাল প্রক্রিয়া হল একদিকে বহির্বাণিজ্য থেকে আসা বিপুল আর্থিক পুঁজির সঞ্চয়, অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী নূতন বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদক সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি। এই দুই অবস্থার ফলস্বরূপ উৎপাদন-ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে, সদ্য পুরনো উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে মুক্ত হয়ে আসা উৎপাদন-উপকরণের সমষ্টি এবং জমি ও পুরনো উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়ে আসা, শ্রমের বিনিময়ে মজুরী প্রত্যাশী মানুষের বিপুল শ্রমের ভাণ্ডার কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি। নূতন মজুরি-শ্রমিকভিত্তিক অকৃষি উৎপাদন-কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা দেয়। সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে, বাণিজ্যবিস্তারের ফলে এই ক্রমবর্ধমান বাজার ও কাঁচামালের উৎসের ক্রমবিস্তার আজকের উন্নত ধনতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পুঁজিবাদী উৎক্রমণ প্রক্রিয়ায় সহায়কের ভূমিকা নেয়। এইসব দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবিকাশমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের এই প্রক্রিয়া দেশের অভ্যন্তরে কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। শ্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রম বহির্গমনের পথকে আরও মসৃণ করে। ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে বৃহৎ জমির মালিকরা কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিল। পৃথিবীব্যাপী বাজারের বিস্তারে উৎসাহিত বাণিজ্য-পণ্য উৎপাদনকারী শ্রেণিটি এবার কৃষি থেকে উৎখাত হওয়া শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণগুলি একত্র করার মাধ্যমে সঞ্চিত আর্থিক পুঁজি বিনিয়োগের

সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ণ মাত্রায়। এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সূচনা ও বিস্তার ঘটে। পরবর্তী কালে এই কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি এক-একটি বিরাট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আজকের উন্নত দেশ জাপানের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইউরোপের পার্থক্য থাকলেও জাপানেও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাহীন করার জন্য ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষির পশ্চাদপদ লক্ষণগুলিকে সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান, এই উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কৃষি-জমি, কৃষি-উৎপাদনের উপকরণ, কৃষি-শ্রমিক, কৃষিপণ্য ও কৃষিঋণের সংগঠিত বাজার-ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের উন্নয়নের ইতিহাস অনুরূপ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়নি, ফলে এখানে উন্নয়নের প্রক্রিয়ার গতিকে সক্রিয় রাখার প্রয়োজনে কৃষিতে আমূল পরিবর্তন আনার অবস্থা তৈরি হয়নি। আমরা দেখেছি ষোড়শ–সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ ও জাপানের কৃষিতে যে-আমূল ভূমিসংস্কার হয়েছিল, ভারতের কৃষিতে তেমন সফল কর্মসূচি নেওয়া হয়নি; ভূমিসংস্কারের যে-কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তার পিছনে কৃষি-শিল্প সহ গোটা অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ প্রথমত এই গোটা প্রক্রিয়া শুরুর আগে বাণিজ্যিক কাজকর্মের মাধ্যমে বিপুল আর্থিক উদ্বৃত্ত জমা হতে পারেনি। এই দেশ বিদেশি শাসনের অধীনে থাকায় বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি তাদের অসম বাণিজ্যিক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের বড় অংশ উৎপাদনশীল পুঁজি হিসেবে নিজ দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেত। তাই দেশীয় উদ্যোগে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহী কোনও শ্রেণি, তাদের হাতে জমা থাকা আর্থিক পুঁজি উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ যারা খুঁজছে— এমনটা ঘটার মতো কোনও পরিস্থিতি তখন এ দেশে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, একইরকম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, এদেশের বাণিজ্যিক-মহাজন শ্রেণিটি ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজিবাদী বিনিয়োগের পরিবর্তে কম ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য ও মহাজনি কারবারে তাদের আর্থিক পুঁজি ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। কারণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থা এর অনুকূলে ছিল না। প্রথম স্তরের বড় মধ্যস্বত্বভোগীদের পুরনো ক্ষমতার অবসান হলেও গ্রামীণ রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসে দ্বিতীয় স্তরে অবস্থানকারী পুরনো স্থানীয় ক্ষমতাশালী ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়নি। স্বাধীন শ্রমের ও উৎপাদনের উপকরণের বাজার গড়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল পুরনো ক্ষুদ্র চাষভিত্তিক উৎপাদন কাঠামোতে কৃষি-জমি, অন্যান্য উপকরণ ও কৃষি-শ্রমিকের জমির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকা। ফলে জমি, শ্রম ও উপকরণের মুক্ত বাজার ছিল অনুপস্থিত। এর সঙ্গে কৃষিঋণ ও কৃষিপণ্যের অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থায় ঋণ উপকরণ ও পণ্যের বাজারের যুক্ত ক্রিয়ায় সম্ভাব্য কৃষি-উদ্বৃত্ত কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথ থেকে সরে গিয়ে অনুৎপাদক বাণিজ্যিক মহাজনি পুঁজির কলেবরই বৃদ্ধি করে ও অনুৎপাদক ক্ষেত্রে চলাচল করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কৃষিক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল বিনিয়োগের তুলনায় বাণিজ্যিক মহাজনি পুঁজি পণ্য, উপকরণ ও ঋণের যুগ্ম বাজার-প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিহীন বিনিয়োগের পথ খুঁজে নেয় এবং তার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর হাতে বেশি সম্ভাব্য আয় সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থাকে দীর্ঘকালীন জড়ত্বের মধ্যে আবদ্ধ রেখে সমস্ত সম্ভাব্য কৃষি-উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ক্ষেত্র থেকে সরে যায় এবং অনুৎপাদক বিনিয়োগের চক্রে আবদ্ধ থাকে।

ইংল্যান্ডে যৌথ মালিকানায় থাকা সাধারণের ব্যবহার্য গোচারণভূমিগুলিকে ব্যক্তিগত পৃথক মালিকানার আওতায় এনে ছোট পশুপালকদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, বড় বড় পশুচারণ ভূমিকে ব্যবসায়ী উৎপাদক শ্রেণির ব্যক্তিগত মালিকানায় এনে দূরদূরান্তের বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করা, এবং তার ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত বিপুল আর্থিক পুঁজির পুজিবাদী ধরনের বিনিয়োগের পথ প্রস্তুত করা। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে একদিকে শ্রম, জমি ও অন্যান্য উপকরণের স্বাধীন বাজার গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে বাণিজ্যিক, মহাজনি ও বড় ভূস্বামীর হাতে জমে থাকা উদ্বৃত্ত কৃষিতে বিনিয়োগ করে কৃষিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়মের আওতায় এনে ফেলেছিল। আর্থিক পুঁজির জোগানদাতা বাণিজ্যিক-মহাজনি কাজের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত পুঁজির নিয়ন্ত্রক বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এসব ঘটেছিল। সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা এই পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগের পিছনে সহায়তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই একই উদ্যোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অ-কৃষি উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী শ্রেণিটি গিল্ডের বন্ধন থেকে ছোট অ-কৃষি উৎপাদককে মুক্ত করে প্রথমে এদের স্বাধীন উৎপাদকে পরিণত করে, পরবর্তীতে এদের বড় বড় উৎপাদন ক্ষেত্রে একত্রিত করে বড় পুঁজিবাদী উৎপাদন-সংস্থায় পরিণত করার প্রক্রিয়া চালু করেছিল। সর্বোপরি পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এই পরিবর্তনগুলি আনার জন্য যে রাজনৈতিক-সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা পত্তনের প্রয়োজন ছিল তাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় পুরনো সামন্তবাদী প্রভুদের জায়গায় প্রথমে বণিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের এবং পরবর্তীতে পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের দেশে বিদেশি শাসনের অবসানের আগে বা পরে, কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভূমিসংস্কারের যে-কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তা ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে অজস্র ত্রুটি এবং সংস্কারের পিছনে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অভাবের কারণে অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবথেকে ওপরের স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হলেও তার নীচের অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী নানাভাবে আইনের ফাঁক ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে তাদের পুরনো অবস্থাতেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের পূর্বশর্তগুলির মধ্যে প্রধান শর্তটি পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলস্বরূপ আমরা দেখি একদিকে জমির আইনগত ঊর্ধ্বসীমা বহির্ভূত জমির মালিকানায় মোট জমির একটি বড় অংশ রয়ে গেছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নানা গতি-নির্ধারক শক্তির কার্যকারিতার অভাবে ভারতীয় কৃষি বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র জোতের একটি গতিহীন কৃষি-অর্থনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতিনির্ধারক শক্তিগুলির মধ্যে প্রধান হল স্বাধীন মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা। পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক মহাজনি পুঁজি ছিল অনুপস্থিত। শ্রম-উপকরণ-কৃষিপণ্যের মুক্ত বাজারও তাই। এর ফলে বাণিজ্যিক ও অসংগঠিত মহাজনি পুঁজির সংযোগে গঠিত আর্থিক পুঁজি ছোট উৎপাদকের উৎপাদনের ওপর কর্তৃত্ব করত, চড়া সুদে মহাজনি ঋণ ও অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছোট উৎপাদকের সমস্ত উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে তাকে নিঃস্ব করত। কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশক্তির উদ্যোগে যে-বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছিল, ছোট উৎপাদকের কাছে তা ছিল এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা তাদেরই নিজ স্বার্থে উপর থেকে চাপানো একটি ব্যবস্থা। কৃষির ওপর তার সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব ছোট চাষির সমস্ত উদ্বৃত্ত ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়, কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থা হয় গতিহীন।

স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন কৃষি-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই অসংগঠিত মহাজনি পুঁজি-বাণিজ্যিক পুঁজির মিলিত প্রভাব ছিল। এদেশের বাণিজ্যিক কৃষি-উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি ব্রিটিশ বণিকের কর্তৃত্বের কারণে ইউরোপীয় দেশগুলির মতো সেই সময় এদেশের কৃষিতে একটি বৃহৎ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উদ্যোগী মালিক-শ্রেণি গড়ে উঠতে পারেনি। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ছোট উৎপাদকরা যুক্ত থাকায় জমিসহ অন্যান্য উপকরণের এবং শ্রমের মুক্ত বাজার গড়ে উঠতে পারে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে ওঠার অবস্থা তৈরি হয় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতেও দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে থাকে।

পুঁজিবাদী বিকাশের পূর্বশর্তগুলি পূরণের কী অবস্থায় আজকের ভারত রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে। তার আগে, ভারতীয় কৃষির কাঠামোগত বিন্যাস, জোতের মালিকানা ও ব্যবহারিক জোতের বিন্যাস, ভারতীয় কৃষিতে একদিকে ক্ষুদ্রজোতের প্রাধান্য ও অন্যদিকে ভাগচাষ ও স্থির খাজনায় লিজভুক্ত জমিতে চাষ, জমির ক্রমখণ্ডীকরণের প্রবণতা কী পরিমাণে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতার ওপর বিপরীত ক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা থাকবে এই অধ্যায়ে। ভারতীয় কৃষির খণ্ডীকরণ প্রবণতা কতটা পরিমাণে তার প্রকৌশলগত উন্নয়নে বাধা দেয় এবং ক্ষুদ্র-চাষ ভিত্তিক ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা কতটা, তারও আলোচনা এখানে থাকবে।

ভারতীয় কৃষির প্রান্তিকীকরণ ও কৃষিতে দীর্ঘকালীন জাড্য

আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালের আগে সরাসরি বিদেশি শক্তির শাসনে থাকা ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল প্রাক্‌পুঁজিবাদী। একদিকে বিদেশি বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কহীন এদেশি বণিকদের হাতে বাণিজ্যিক পুঁজির সূত্রে সৃষ্ট মহাজনি পুঁজির দাপট, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থানীয় ছোট উৎপাদকের ওপর নানান স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী ও সবচেয়ে ওপরে অবস্থানকারী জমিদার, জায়গিরদার, ইত্যাদি বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগীর কর্তৃত্ব। ১৯৪৯–৫০ সালে সারা ভারতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি নেওয়ার ফলে সবচেয়ে ওপরের স্তরে অবস্থানকারী বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবসান হলেও দ্বিতীয় স্তরের ক্ষমতাশালী সুবিধাভোগী শ্রেণিটির সামাজিক ক্ষমতার অবসান হয়নি। জমিতে ভাড়াটে চাষি বা ভাগ-চাষি ব্যবস্থায় চাষের অবসান হয়নি। ভাগ-চাষ সংক্রান্ত ভূমিসংস্কার আইনটির উদ্দেশ্য তা ছিলও না। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনটি ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। অর্থাৎ কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রাথমিক শর্তটি পূরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভূমিসংস্কার আইনটির ব্যর্থতা খুব স্পষ্ট। পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

নীচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ’৫০ এর দশক থেকে ২০০১ অবধি প্রত্যেক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হারের তুলনায় গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার কম এবং সময়ের সঙ্গে এই হার আরও কমেছে। কিন্তু মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় ’৫০, ’৮০ ও ’৯০-এর দশকে কৃষিতে সরাসরি নিযুক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত বেশি।

সারণি ৪.১ দশক অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা, গ্রামীণ জনসংখ্যা ও সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসেবে)

সাল	১৯৫১–৬১	১৯৬১–৭১	১৯৭১–৮১	১৯৮১–৯১	১৯৯১–২০০১	২০০১–১১
মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার (শতকরা)	২১.৬২	২৪.৮১	২৪.৬৪	২৩.৮৬	২১.৫৩	১৭.৭০
গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার (শতকরা)	২০.৬৬	২১.৮৪	১৯.৩৪	২০.০৪	১৮.০৭	১২.২৬
সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার (শতকরা)	৩৪.৮৭	–৪.১১	১৭.৭৪	২৫.২০	২৬.৩৩	১২.৩৯

Source: Registrar General of India
শতকরা বৃদ্ধির হার প্রতি দশ বছরের হিসেবে।

সরাসরি কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে গ্রাম বা শহরের অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের স্থানান্তরিত হওয়ার ও শিল্প-শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়ার বদলে কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এইভাবে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষি থেকে সরে গিয়ে শিল্পে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে কৃষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ বেশিই থেকে যায়। একমাত্র ২০০১-১১-এর দশকে এসে এই হার অনেক কমেছে। উল্লেখযোগ্য, এই সময়ের পর থেকে গ্রামীণ অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও এইসব ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু কৃষিতে সরাসরি কর্মরত জনসংখ্যার বৃদ্ধিহারে হ্রাস ঘটা সত্ত্বেও কৃষি-জোতের খণ্ডীকরণ ও প্রান্তিক জোতের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছাড়াও মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত, ও কৃষিতে সরাসরি নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত থেকেও এই পর্যবেক্ষণের সমর্থন পাই। দেখা যাচ্ছে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৫১ থেকে ২০০১ এই পঞ্চাশ বছরে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ প্রতি দশকে গড়ে গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেয়েছে শতকরা ২ ভাগ। সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৭১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে খুব বেশি কমেনি। মোট গ্রামীণ জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ২০০১ সালে ছিল ১৯৭১, ‘৮১, ও ’৯১ সালের তুলনায় বেশি।

সারণি ৪.২ গ্রামাঞ্চলে ও কৃষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

সাল	মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত	মোট জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত সংখ্যার অনুপাত	মোট গ্রামীণ জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত
১৯৫১	৮২.৭০	২৬.৯১	৩২.৫৫
১৯৬১	৮২.০০	২৯.৮৪	৩৬.৩৮
১৯৭১	৮০.১০	২২.৯২	২৮.৬৩
১৯৮১	৭১.৭০	২১.৬৫	২৮.২৪
১৯৯১	৭৪.৩০	২১.৮৯	২৯.৪৬
২০০১	৭২.২০	২২.৭৫	৩১.৫২
২০১১	৬৮.০	২৬.৯০	৩১.৫৫

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2003, 2016, Ministry of Agriculture

মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত কমেছে ঠিকই, কিন্তু ’৮১ সালের তুলনায় ’৯১ সালে এই অনুপাত বাড়ে, এমনকী ’৮১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে এই অনুপাতটি সামান্য বেশি ছিল। আবার ১৯৭১ থেকে ২০১১, এই ৪০ বছরে মোট জনসংখ্যায় ও গ্রামীণ জনসংখ্যায় কৃষিতে সরাসরি নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বেড়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে শিল্পায়নের হারের দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও ’৫১ সাল থেকে ’৬১ ও ’৭১ সালের মধ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি অথবা ’৭১ সালের পর থেকে গ্রামীণ জনসংখ্যায় কৃষিতে সরাসরি নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেনি। এমনকী মোট জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতও ’৮১ সালের পর থেকে হ্রাস পায়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই সারণিগুলি থেকে যে-তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে গ্রাম থেকে শহরে বা কৃষি থেকে অন্য জীবিকায় ব্যাপক হারে মানুষের বহির্গমন ঘটেছে। কৃষিতে জনসংখ্যার এই চাপের কারণে কৃষি-জোতের কী পরিমাণে খণ্ডীকরণ ঘটছে, নীচের সারণি থেকে আমরা সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারি।

এই সারণি থেকে কৃষিতে বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক ও ছোট চাষির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে এই প্রান্তিক চাষির মোট সংখ্যা ও মোট কৃষিজোতের মধ্যে এদের অনুপাত বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে মাঝারি জোতের সংখ্যা ১৯৮১ সালের পর থেকে কমে এবং বৃহৎ জোতের সংখ্যা ’৭১ সালের পর থেকেই কমতে থাকে। কৃষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও তার পরিণামে জোতের এই ক্রমাগত খণ্ডীকরণের প্রবণতার কারণে কৃষি উৎপাদন থেকে আয় ক্রমাগত কমে। অথচ শিল্পের উন্নয়ন ও শিল্পে নিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট না বাড়ার কারণে এবং কৃষিতে মজুরি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগের অভাবে অনেক সময়েই কৃষিতে যুক্ত এইসব অতি নিম্ন আয়ের মানুষ গ্রামীণ অসংগঠিত কাজকর্মে যুক্ত হচ্ছে। কৃষির দুর্দশাজনক অবস্থার কারণে কৃষি থেকে মানুষের সরে যাওয়ার প্রবণতা ঘটছে। কিন্তু এই প্রবণতা শিল্পের প্রসারের কারণে শিল্প-

শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ঘটেনি। কারণ গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশকে শিল্পক্ষেত্র নিয়োগহীন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছে; কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই আয় সৃষ্টিকারী কাজের অপ্রতুলতা মানুষকে গ্রামে ও শহরে অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রগুলি গড়ে তুলে কোনওভাবে জীবিকা অর্জনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই বিষয়টি আমরা আমাদের শেষ বা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পরবর্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে আমরা যথাক্রমে ভারতে কৃষিশ্রমের বাজার, কৃষিঋণের বাজার, কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ে আলোচনা করেছি।

সারণি ৪.৩ ব্যবহারিক জোত ও কৃষি-জমির পরিমাণ ও বিন্যাস

সাল	প্রান্তিক (<১ হেক্টর)		ছোট (১ < ২ হেক্টর)		আধামাঝারি (২ < ৪ হেক্টর)		মাঝারি (৪ < ১০ হেক্টর)		বৃহৎ (১০ হেক্টর এবং ১০ হেক্টরের বেশি)		মোট জোত		গড় মাপ
	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	জোত	জমি	
	মি	মি হে	মি	মি হে	মি	মি হে	মি	মি হে	মি	মি মি হে	মি	মি হে	হেক্টর
’৭০–’৭১	৩৬.২০	১৪.৫৬	১৩.৪৩	১৯.৪৩	১০.৬৮	৩০.০০	৭.৯৫	৪৮.২৩	২.৭৬	৫০.০৬	৭১.০১	১৬২.২৮	২.২৮
শতকরা	৫১.০০	৮.৯৭	১৮.৯০	১১.৯৭	১৫.০০	১৮.৪৮	১১.২০	২৯.৭২	৯.৬৯	৩০.৮৪			
’৮০–’৮১	৫০.১২	১৯.৭৪	১৬.০৭	২৩.১৬	১২.৪৫	৩৪.৬৫	৮.০৭	৪৮.৫৪	২.১৭	৩৭.১৭	৮৮.৮৮	১৬৩.৮০	১.৮৪
শতকরা	৫৬.৪০	১২.০৫	১৮.১০	১৪.১৪	১৪.০০	২১.১৫	৯.১০	২৯.৬৩	২.৪০	২২.৭০			
’৯০–’৯১	৬৩.৩৯	২৪.৯০	২০.০৯	২৮.৮৩	১৩.৯২	৩৮.৩৮	৭.৫৮	৪৪.৭৫	১.৬৫	২৮.৬৬	১০৬.৬৩	১৬৫.৫২	১.৫৫
শতকরা	৫৯.৪০	১৫.০৪	১৮.৮০	১৭.৪০	১৩.১০	২৩.১৮	৭.১০	২৭.০৩	১.৬০	১৭.৩০			
২০০০–০১	৭৫.৪১	২৯.৮১	২২.৭০	৩২.১৪	১৪.০২	৩৮.১৯	৬.৫৮	৩৮.২২	১.২৩	২১.০৭	১১৯.৯৩	১৫৯.৪৪	১.৩৩
শতকরা	৬২.৯০	১৮.৭০	১৮.৯০	২০.২০	১১.৭০	২৪.০০	৫.৫০	২৪.০০	১.০০	১৩.২০			
’১০–’১১	৯২.৮৩	৩৫.৯১	২৪.৭৮	৩৫.২৪	১৩.৮৯	৩৭.৭১	৫.৮৮	৩৩.৮৩	০.৯৭	১৬.৯০	১৩৮.৩৫	১৫৯.৫৯	১.১৫
’১৫–’১৬	৯৯.৮৬	৩৭.৯৬	২৫.৭৮	৩৬।৪৩	১৩.৭৮	৩৭.১৬	৫.৪৮	৩১.৩৭	০.৮৩	১৪.২১	১৪৫.৭০	১৫৭.১৯	১.০৮
শতকরা													
২০১০–১১	৬৭.১০	২২.৫০	১৭.৯০	২২.১০	১০.০০	২৩.৬০	৪.২০	২১.২০	০ .৮০	১০.৬০			
২০১৫–১৬	৬৮.৫৪	২৪.০৭	১৭.৬৯	২৩.১৮	৯.৪৬	২৩.৬৫	৩.৭৬	১৯.৯৬	০.৫৭	৯.০৪			
জোতের গড় মাপ													
২০০১	০.৪০		১.৪২		২.৭২		৫.৮১		১৭.১২		১.৩৩		
২০১০	০.৩৯		১.৪২		২.৭১		৫.৭৬		১৭.৩৮		১.১৫		
২০১৫–১৬	০.৩৮		১.৪১		২.৭০		৫.৭২		১৭.১০		১.০৮		

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2016 এবং Input Survey, 2018. Agricultural Census Department, Govt. of India. 2018

আমাদের শেষ বা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা দেখব গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি কৃষির তুলনায় অনেক কম। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় অনেক সময় ঋণভারাক্রান্ত ছোট চাষির পক্ষে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় কৃষি থেকে আয় তার জীবনযাত্রা চালানোর ব্যয়ের তুলনায় কম, ফলে মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর না করে কৃষির পরিবর্তে অথবা কৃষির সহায়ক হিসেবে অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্র গড়ে তুলে স্বনিযুক্ত কাজে যুক্ত হয়। ভারতীয় কৃষি-শিল্পে এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি।

প্রান্তিক জোতনির্ভর কৃষিতে পুঁজিবাদী ধরনের মজুরি-শ্রমিকনির্ভর উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কতটা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। এই প্রসঙ্গে ওপরের সারণি ৪.৩কে আমরা আর একবার আলোচনায় আনতে পারি। ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় কৃষি অতিমাত্রায় প্রান্তিক জোত-নির্ভর। শুধু তাই নয়, দশকের পর দশক এই প্রান্তিক জোত-নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। ১৯৭০–’৭১

সালে প্রান্তিক জোতের সংখ্যা ছিল ৩৬.২০ মিলিয়ন যা ছিল মোট জোতের শতকরা ৫১ ভাগ। দশকের পর দশক প্রান্তিক জোতের সংখ্যা বেড়ে ১৯১০–১১ সালে দাঁড়িয়েছে ৯২.৮৩ মিলিয়নে যা মোট জোতের শতকরা ৬৭.২৩ ভাগ। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে ১৯১৫–১৬ সালে প্রান্তিক জোতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯.৮৬ মিলিয়ন এবং প্রান্তিক জোতের আওতায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৩৭.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর। অর্থাৎ ২০১৫–১৬ সালে প্রান্তিক জোত মোট জোতের শতকরা ৬৮.৫৪ ভাগ, প্রান্তিক জোতের আওতায় জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ২৪.০৭ ভাগ। ছোট জোতের সংখ্যাও একই রকমে বেড়েছে। ফলে ২০১৫–১৬ সালে দেখা যায়, মোট জোতের শতকরা ৮৬.২৩ ভাগ হয় প্রান্তিক জোত, নয় ছোট জোত এবং মোট জমির শতকরা ৪৭.২৫ ভাগ ছোট ও প্রান্তিক জোতের আওতায় চাষ হচ্ছে। অপরপক্ষে আধা-মাঝারি জোতের সংখ্যা ২০০০–০১ সাল পর্যন্ত স্বল্প বৃদ্ধি পেলেও ২০১০–১১ সালে কমে। মাঝারি জোতের সংখ্যা ১৯৮০–৮১ সাল অবধি বৃদ্ধি পাওয়ার পর ক্রমাগত কমেছে। বৃহৎ জোতের সংখ্যা ১৯৭০–৭১ সালের পর থেকেই কমতে শুরু করে। ২০১০–১১ সালে আধা-মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোত মেলালে দাঁড়াত মোট জোতের শতকরা ১৫ ভাগ এবং মোট জমির শতকরা ৫৫ ভাগ ছিল এদের আওতায়। ২০১৫–১৬ সালে আধা-মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোতের আওতায় চাষ হত শতকরা ১৩.৭৭ ভাগ জোত ও শতকরা ৫২.৭৫ ভাগ জমি। অর্থাৎ বড়, মাঝারি ও আধা-মাঝারি জোতের মোট সংখ্যা ও এইসব জোতের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ ক্রমশ দশকের পর দশক কমেছে ও জোতের গড় মাপ কমেছে। পুঁজিবাদী সচলতায় জমির কেন্দ্রীভবনের যে-বাজার-তাড়িত প্রবণতা থাকে এক্ষেত্রে তার ঠিক উলটো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সারণি ৪.৪ ভারতের কৃষিতে জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রা

বছর	কেন্দ্রীভবনের মান	শতকরা পরিবর্তন
১৯৭০–৭১	২৯০.১২	
১৯৭৬–৭৭	২৪০.৮০	–১৭.০০
১৯৮০–৮১	২০১.০২	–১৬.৫১
১৯৮৫–৮৬	১৬৭.৮৪	–১৬.৫০
১৯৯০–৯১	১৩৬.৬৫	–১৮.৫৮
১৯৯৫–৯৬	১১১.৪১	–১৮.৪৭
২০০০–০১	৯৫.৬৯	–১৪.১০
২০০৫–০৬	৮৪.৯০	–১১.২৭
২০১০–১১	৭১.৩০	–১৬.০২
২০১৫–১৬	৬১.২৬	–১৪.০৭

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, Ministry of Agriculture

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে ব্যবহারিক জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রা ক্রমাগত কমেছে।

আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের কৃষিতে ভূমিব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটায় ছোট চাষ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, পিছিয়ে পড়া কৃষিতে চড়া সুদে মহাজনি পুঁজি ও অসংগঠিত বাণিজ্যিক পুঁজির যৌথ প্রভাব কর্তৃত্ব করে, চাষিরা নিঃস্ব হয় এবং জমির সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত থাকে। ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ছোট চাষি অসংগঠিত ছোট উৎপাদন বা ব্যবসাক্ষেত্রে যুক্ত থেকে অসংগঠিত উৎপাদন-কাঠামোর বিপুল বৃদ্ধি ঘটায়। কৃষি-শ্রমের মুক্ত বাজার ব্যবস্থার বিকাশের অভাবে কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভবের অবকাশ সীমিত ছিল। ১৯৬৫–৬৬ সালে আমরা ভারতীয় কৃষিকে একটি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখি। এর পরবর্তীতে ভূমিসংস্কার ও কৃষি অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচির যথার্থ প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই অনীহাজনিত অপূর্ণতার প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৫–৬৬ সালে সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি নেওয়া হয়। নব আবিষ্কৃত উচ্চফলনশীল বীজ, হেক্টর পিছু বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দিষ্ট উপযুক্ত পরিমাণ সার ও নিয়ন্ত্রিত জলের সরবরাহ নিয়ে একটি নতুন ভাবে উদ্ভাবিত কৃষি-উপকরণের প্যাকেজ ব্যবহারই ছিল এই নতুন প্রযুক্তির মূল কথা। কিন্তু এই প্রযুক্তির প্রয়োগে ধান ও গমের ক্ষেত্রে বীজ রোপণের পর থেকে ফসল ওঠা পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে একই জমিতে একাধিক বার চাষ করা সম্ভব হয় ও মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। তাই উচ্চফলনশীল বীজের প্যাকেজ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টর, হারভেস্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ে। কিন্তু ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ না হওয়ায় জমির মালিকানা ও জমির সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদক চাষির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক— যা প্রান্তিক চাষের প্রাধান্য ও নিজ জমিতে নিজে চাষ ব্যবস্থায় ছোট উৎপাদকের কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যাপক হারে বহির্গমনের প্রবণতার অভাব থেকে স্পষ্ট— কৃষিতে দীর্ঘকালীন জাড্য বজায় রাখে। ফলে বাইরে থেকে আসা ভারতীয় কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর চাপিয়ে দেওয়া নতুন প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। আমূল ভূমিসংস্কারের অভাব এবং কৃষিতে পুরানো উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি অনেকাংশেই এই অবস্থা বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এই কারণেই বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির সর্বব্যাপক প্রভাব থেকে ভারতীয় কৃষিকে মুক্ত করার মতো শক্তি ভারতীয় কৃষিতে কার্যকর হতে পারে না। নতুন প্রযুক্তির কার্যকারিতা শুধুমাত্র ভারতের মতো উদ্বৃত্ত শ্রম-অর্থনীতির পক্ষে অনুপযুক্ত তাই নয়, ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির কাঠামোগত পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি এই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই বাধা হয়ে দেখা দেয়। কৃষিতে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা বজায় থাকে তাই নয়, ভারতীয় কৃষি এক দীর্ঘকালীন স্থবিরতায় আবদ্ধ থাকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক, যে-কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারতীয় কৃষির সংকটে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী উত্তরণের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে থাকে। ভারতের কৃষিতে পিছিয়ে থাকা প্রাক্‌পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণগুলি আজও কী পরিমাণে বিদ্যমান, অথবা ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণগুলি কতটা স্পষ্ট তার আলোচনা থাকবে এই অধ্যায়ে। পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষিতে সবুজ বিপ্লব, শস্যবৈচিত্র ইত্যাদি উৎপাদন-পদ্ধতিগত, প্রকৌশলগত বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে জরুরি অন্তর্দেশীয় বাজার তৈরির জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক শ্রম বিভাজনের। ইউরোপের কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম পর্বে আমরা দেখি অকৃষি-ক্ষেত্রে

নিযুক্ত জনসংখ্যা ক্রমশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার তুলনায় বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ জনসংখ্যার বেশি বেশি অংশ কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে শিল্প উৎপাদন-ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হতে থাকে। উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতার ফলে একদিকে শ্রম অন্যদিকে জমিসহ অন্যান্য উপকরণ পণ্যে পরিণত হয় ও স্থির পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ছোট উৎপাদকের ন্যূনতম ভোগ্যদ্রব্যগুলিও বাজারে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। আমাদের দেশে জমির সঙ্গে চাষির বিচ্ছিন্নতা ঘটতে পারে না। কৃষিতে প্রান্তিক ও ছোট জোতের প্রাধান্য ও বিপুল সংখ্যক চাষির এই প্রান্তিক ও ছোট জোতে আটকে থাকার কোনও পরিবর্তন হয় না। শ্রমের বাজার প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা পরে দেখব, ভারতের কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায় এখনও বিপুল সংখ্যক পারিবারিক শ্রমিকের প্রাধান্য রয়ে গেছে।

ছোট জোতের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা

আমরা জানি পুঁজিবাদী উৎপাদন পর্বের বিকাশের আদিপর্বে সামন্ততান্ত্রিক খামার ভেঙে দিয়ে ছোট পরিবারভিত্তিক জোত গঠিত হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছায় যে এটাই তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী উৎক্রমণের স্তরে কৃষি-উৎপাদনের বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া যত দ্রুত বাড়তে থাকে ততই বাণিজ্যিক পুঁজি পারিবারিক শ্রমনির্ভর ছোট কৃষক ও কারিগর-উৎপাদককে তার নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসে। সাম্রাজ্যবাদের অধীন পশ্চাদপদ দেশে সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক পুঁজির মাধ্যমে উৎপাদনকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে সামন্ততান্ত্রিক খাজনার মাধ্যমে শোষণকে টিকিয়ে রেখে ও উদ্বৃত্ত আহরণের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাদপদ দেশকে পুঁজি বিনিয়োগের একটি লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে দেখে। এইসব দেশের শিল্পে বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতেও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে তা পদক্ষেপ করতে পারে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদ থেকেই। কিন্তু এই কাজটি সাম্রাজ্যবাদ করে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীকে সহযোগী রেখে, কারণ পদানত দেশে স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশ তার অভিপ্রেত নয়। এই বৈপরীত্যমূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্য থেকে দু'ভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রথমটিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূল রূপ, নিরপেক্ষ ভূমি-খাজনা বজায় রেখে ধীরে ধীরে উৎপাদনে নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটানো হয়, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর আওতাভুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই অতি ধীর গতিতে মূলধন বিনিয়োগের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। আর দ্বিতীয়টিতে স্বাধীন কৃষক-উৎপাদক পুঁজিগঠন ও পুঁজির পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী শোষকে রূপান্তরিত হয়। পুঁজিবাদ বিকাশের ঐতিহাসিক পর্যায়ের এই মার্কসীয় ব্যাখ্যায় প্রাক্‌পুঁজিবাদী পর্যায়ের সরল পুনরুৎপাদন ব্যবস্থায় থাকা ছোট কৃষক থেকে পুঁজিবাদী কৃষকে রূপান্তরের ইঙ্গিত রয়েছে। মার্কস[১] স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিশ্লেষণ রেখেছেন: এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী একদিকে প্রাক্‌পুঁজিবাদী পারিবারিক শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির অবসান ঘটানোর মধ্য দিয়ে পুঁজির কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছোট উৎপাদকের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের উপকরণের কেন্দ্রীভবন— এই দু'টি সমান্তরালভাবে ঘটতে থাকা প্রক্রিয়া

একত্রে পুঁজিবাদী বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সূচনার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। এই দু'টি প্রক্রিয়ার মিলিত কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে একদিকে পুঁজি ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী পুঁজিপতি শ্রেণি ও অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভূমিমালিকানা-বন্ধনহীন, মুক্ত শ্রমিক শ্রেণি পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার দু'টি আবশ্যিক উপাদানে পরিণত হয়। অবশ্য মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠার এটিই একমাত্র পথ নাও হতে পারে।[২] প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র জোতের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে বৃহদাকার কৃষি উৎপাদন গড়ে ওঠাকে যখন পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদন গড়ে ওঠার শর্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন এই প্রারম্ভিক যুক্তি গ্রহণ করা হচ্ছে যে, ছোট জোতের প্রতি এককে উৎপাদন খরচ বড় জোতের তুলনায় বেশি এবং ছোট জোতের তুলনায় বড় জোত বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলি অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারে প্রতিযোগিতার নিয়ম বজায় থাকলে ক্ষুদ্র জোত বৃহৎ জোতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয় ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জোতের মধ্যে অসম ক্ষমতার কারণে এই প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র জোত টিকে থাকতে পারে না, অচিরে বিলুপ্তির পথে যায়, যার মধ্য দিয়ে বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অচিরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে পুঁজির বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অপেক্ষাকৃত বড় জোতগুলি শক্তিশালী পুঁজিবাদী উৎপাদন সংস্থায় পরিণত হতে থাকে। কিন্তু প্রারম্ভিক অনুমানের একটি দুর্বলতা এই ব্যাখ্যাটিকেও দুর্বল করে। এখানে মনে করা হচ্ছে, ক্ষুদ্র জোতে উৎপাদনের অর্থই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন। এই অনুমানটি সবসময় সঠিক নয়। ক্ষুদ্র জোতে উন্নত ধরনের উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু করলে নিবিড় চাষের মাধ্যমে বিনিয়োগ অধিক উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারে এবং তা থেকে বৃহদায়তন চাষের বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারে। এইভাবে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু করা যায়। কার্ল কাউৎস্কি পুঁজিবাদ বিকাশের এই ধরনটি ব্যাখ্যা করেন।[৩] কাউৎস্কির এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংক্রান্ত 'নতুন তথ্য'-র ওপর লেনিনের বিখ্যাত আলোচনা থেকে।[৪] লেনিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি-সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। ছোট জোতে নিবিড়তর উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পুঁজির যে-বিকাশ ঘটেছিল লেনিন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ক্ষুদ্র জোতে নিবিড়তর চাষ বৃহৎ জোতে বর্ধিত হারে চাষের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক ও ফলপ্রসূ। এই কারণে এই পথে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিকাশের পথে পুঁজির কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার উল্টো প্রবণতা অর্থাৎ বড় জোতের খণ্ডীকরণ ও জোতের গড় আয়তনের হ্রাসপ্রক্রিয়া কৃষি-জোতের বিন্যাসের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিতে পারে।

সারণি ৪.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় কৃষিতে জোতের বিন্যাসের পরিবর্তন গাঁথা আছে এই ক্রমাগত খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থেকেই ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সংক্রান্ত লেনিনের এই ব্যাখ্যা এবং কাউৎস্কির ক্ষুদ্র জোতের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ পশ্চাদপদ দেশের কৃষি অর্থনীতির পক্ষে কতটা প্রযোজ্য সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন। এটি আরও নানা দিক থেকে অনুসন্ধান দাবি করে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ কৃষি-অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশকে খর্ব করে রেখেছিল সামন্তবাদী, মহাজনি ও ব্যবসায়ী শোষণ চাপিয়ে। কৃষিতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথ থেকে সরে গিয়ে অনুৎপাদনশীল মহাজনি ও ব্যবসায়ী পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কৃষিতে আমূল ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে কৃষির পশ্চাদপদ সম্পর্কগুলিকে নির্মূল করা যায়নি। এর পরিণামে ভারতীয় কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি খাজনার দাপট কমলেও, নানা ধরনের পশ্চাদপদ সম্পর্ক বহাল থাকে, ক্ষুদ্র উৎপাদকের পক্ষে স্বাধীনভাবে উদ্বৃত্ত আহরণ ও এই উদ্বৃত্তের উৎপাদনশীল ব্যবহার সীমায়িত থেকে যায়। এই পশ্চাদপদ উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যে কৃষিপণ্য, কৃষি-শ্রমিক, কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণের অনুন্নত বাজার ব্যবস্থা ও এইসব বাজারের নানা ধরনের প্রতিকূল কার্যকারিতার ফলে কৃষি উৎপাদনে উৎপাদিত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত কৃষিতে উৎপাদনশীল ভাবে বিনিয়োজিত হতে পারে না, অনুন্নত বাজারব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। এইসব দেশে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্র জোতে নিবিড়তর চাষের মাধ্যমে পুঁজিবাদ কতটা বিকশিত হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল কৃষিতে উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে ইচ্ছুক মানুষের হাতে বিনিয়োগোপযোগী আর্থিক পুঁজির সঞ্চয়। কৃষি-উৎপাদনে যুক্ত মানুষের ক্রমাগত কৃষি থেকে সরে গেলে ও এর পরিণামে কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন অকৃষি উৎপাদনকে কেন্দ্র করে নগরায়ণ ঘটতে থাকলে কৃষিপণ্যের অন্তর্দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়, ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের তাগিদ তৈরি হয়। শিল্পবিকাশের সূচনা ঘটলে ও কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে শহরের সদ্য গড়ে ওঠা শিল্পক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবীর বহির্গমনের অবস্থা তৈরি হলে এই তাগিদ আরও তীব্র হয়। এই প্রক্রিয়ার সূচনা হলে কৃষিতেও মুক্ত মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে পুঁজিবাদী ধরনের লাভের জন্য বাজারমুখী চাষের সূচনা হতে পারে। অর্থাৎ কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে শ্রম, জমি ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণের মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার সূচনা হওয়া আবশ্যিক। যতদিন বাণিজ্যিক পুঁজি ও মহাজনি পুঁজি ছোট ছোট দুর্বল উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্তের বিশাল অংশ আহরণ করে উৎপাদন ক্ষেত্রকে দুর্বল করে রাখে, যতদিন অবধি উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে বাণিজ্যিক ও মহাজনি কাজকর্ম অবাধে চালানোর জন্য বাণিজ্যিক ও মহাজনি উদ্বৃত্ত আহরণের সহজ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অবাধ সুযোগ বজায় রাখার চেষ্টা চলে, ততদিন কৃষি-উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসা শক্ত। তা এক সময়সাপেক্ষ দীর্ঘ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় ও এই উত্তরণও হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীর পদানত কোনও দেশে এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সরাসরি প্রভাবের বাইরে আসার পরও দীর্ঘদিন উৎপাদন ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি রয়ে যায়। বিশেষ করে নতুন শাসকশ্রেণি আমূল ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পুরানো উৎপাদন-সম্পর্কের প্রগতিবিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্মূল করতে না পারলে, শিল্প ও অকৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের যথেষ্ট সম্প্রসারণ না ঘটলে, জমির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছোট দুঃস্থ চাষির কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় বর্হিগমন না ঘটলে ও একই সঙ্গে স্বাধীন শ্রম ও কৃষিঋণ কৃষিপণ্য সহ কৃষি-উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলির মুক্ত বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার অবস্থা তৈরি না হলে কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কে পুরানো বৈশিষ্ট্যগুলি টিকে থাকা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

ভারতীয় কৃষিতে জোতের মাপের সঙ্গে জমির উৎপাদনকুশলতার বিপরীতগামী সম্পর্ক: ছোট জোত মারফত ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের সম্ভাব্যতা

ভারতীয় কৃষিতে জোতের মাপের সঙ্গে উৎপাদনকুশলতার বিপরীতধর্মী সম্পর্কটি একটি বহু আলোচিত ও বিতর্কিত প্রশ্ন। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন 'ইকনমিক উইকলি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে[৫] ফার্ম ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সমীক্ষা থেকে পাওয়া কৃষক পরিবারভিত্তিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, সাধারণভাবে জোতের আয়তন বাড়লে জমির উৎপাদনশীলতা কমে। তারপর পরপর দীপক মজুমদার (১৯৬৫)[৬], সি এইচ হনুমন্ত রাও (১৯৬৬), এ পি রাও (১৯৬৭), এ এম খুস্র (১৯৬৮), অশোক রুদ্র (১৯৬৮) প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের পরিসংখ্যানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণগুলি[৭] প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে জি আর সাইনি (১৯৭১)[৮], অশোক রুদ্র (১৯৭৩), কৃষ্ণা ভরদ্বাজ (১৯৭৪)[৯] দ্বিতীয়বার বিতর্কটির সূচনা করেন। আরও পরে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের গ্রামভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণ আসতে থাকে। করনিয়া (১৯৮৫) ১৫টি উন্নয়নশীল দেশের পরিসংখ্যান থেকে সিদ্ধান্তে আসেন, এইসব দেশে বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতের অধিক উন্নয়নশীলতা একটি সাধারণ সত্য।

জোতের পরিমাপের সঙ্গে উন্নয়নশীলতার বিপরীতধর্মী সম্পর্কটি এ পি রাও (১৯৬৭)[১০]-এর পর্যবেক্ষণে সমর্থিত। এ পি রাও একই গ্রামের জোতভিত্তিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এবং কয়েকটি গ্রামে অনুরূপ সমীক্ষা চালিয়ে দেখান যে, তাঁর সমীক্ষার অধীন সব গ্রামেই জোতের মাপ নির্বিশেষে জমির উৎপাদনশীলতার কোনও পার্থক্য নেই। এই সিদ্ধান্তটি অশোক রুদ্র (১৯৬৮)-র পর্যবেক্ষণেও সমর্থিত হয়েছে। আরও পরে মানবেন্দু চট্টোপাধ্যায় দেখান যে, পুরনো ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল ব্যবহারকারী জোতে বড় ও ছোট জোতের মধ্যে কোনও তফাত নেই, একর পিছু উৎপাদনেও না। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জোতে একর পিছু উৎপাদনে বড় ও ছোট জোতের মধ্যে পার্থক্য আছে। ছোট জোতে বড় জোতের তুলনায় একর প্রতি উৎপাদনের হার বেশি। দেবজিৎ রায় (২০১২)[১১] তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও বীরভূমের কয়েকটি গ্রামসমীক্ষা থেকে জানান যে, গ্রামগুলিকে পরিকাঠামোর দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা, কিছুটা এগিয়ে থাকা ও একেবারেই পিছিয়ে পড়া, এই তিন প্রকারে ভাগ করলে দেখা যায় প্রত্যেক ভাগের বড় জোত ও ছোট জোতের মধ্যে একর প্রতি উৎপাদনে পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। যদিও, সবধরনের জোতকে একত্রিত করলে দেখা যায় জোতের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একর প্রতি উৎপাদন বাড়ে। দেবজিৎ রায় প্রতিটি জোতের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার এবং কৃৎকৌশলগত দক্ষতার পরিসংখ্যান বিবেচনায় রেখে রিগ্রেসান সমীকরণ গঠন করে তার পরিসংখ্যানগত মাপ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জোতগুলির মধ্যে এই উপকরণগুলির ব্যবহারের পরিমাণের পার্থক্য ও কৃৎকৌশলগত পার্থক্য না থাকলে জোতের পরিমাপের সঙ্গে উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের ঋণাত্মক প্রবণতাটি সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

আমাদের দেশে রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান কাজে লাগিয়েও জোতের মাপ ও একর-প্রতি উৎপাদনশীলতার সম্পর্কটি আলোচিত হয়েছে।

আমাদের নিজস্ব একটি গবেষণায়[১২] আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জোতের গড় মাপের ক্রম অনুযায়ী একর-প্রতি উৎপাদনশীলতা সমেত বিভিন্ন প্রগতিসূচকের পরিসংখ্যানগত আন্তঃসম্পর্ক হিসাব করেছি। আমরা জোতের মাপের সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও তার বৃদ্ধির হারের ধনাত্মক সম্পর্ক দেখেছি। উৎপাদন বৃদ্ধির হার ও একর-প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারেও এই সম্পর্ক ধনাত্মক। কিন্তু কর্ষণের নিবিড়তা ও জমির একক-পিছু উৎপাদনের প্রকৃত মূল্য— এই দু'টি সূচকের ক্ষেত্রে সম্পর্কটি ঋণাত্মক। অর্থাৎ আমাদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখছি জোতের গড় আয়তন অনুযায়ী যে-রাজ্য যত এগিয়ে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা, তার বৃদ্ধির হার ও একর প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এই রাজ্যগুলিতে তত বেশি। অন্যদিকে জোতের গড় আয়তনের দিক থেকে যে-রাজ্য যত পিছিয়ে, কর্ষণের নিবিড়তা ও একর প্রতি উৎপাদনের প্রকৃত মূল্যের দিক থেকে সেই রাজ্য তত এগিয়ে। অর্থাৎ ছোট জোত সংবলিত রাজ্যে চাষিরা জমির কর্ষণের নিবিড়তা বাড়িয়ে প্রতি একর জমিতে গড়ে বেশি উৎপাদন করে। আমাদের জোতের মাপ ও একর-প্রতি উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক বিষয়টি আমাদের দেশে রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়েও আলোচিত হয়েছে।

জোতের মাপের সঙ্গে জমির উৎপাদনশীলতার ঋণাত্মক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অপর একটি সমীক্ষায়[১৩] আমরা দেখেছি, উৎপাদনে কৃৎকৌশলগত দক্ষতার পার্থক্যের ক্ষেত্রে জোতের মাপের কোনও ভূমিকা নেই। অপরদিকে পুঁজিবাদী বিকাশের অন্যান্য সূচক হিসাবে আমরা প্রতি হেক্টরে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, গ্রস সেচসেবিত এলাকার ভাগ, হাজার হেক্টর-প্রতি ট্রাক্টর ও পাম্পসেটের রাজ্যওয়ারি সংখ্যার সঙ্গে গড় জোতের আয়তনের ক্রমের পরিসংখ্যানগত আন্তঃসম্পর্ক দেখেছি। আমরা দেখেছি, জোতের গড় আয়তনের সঙ্গে হাজার হেক্টর-প্রতি ট্রাক্টর ও পাম্পসেটের আন্তঃসম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ জোতের আয়তন বাড়লে এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ে। ছোট জোতে হাজার হেক্টর-প্রতি ট্রাক্টর, পাম্পসেটের ব্যবহার বড় জোতের তুলনায় কম। আবার ছোট জোতে জমির উৎপাদনশীলতা বেশি হলেও বড় জোত জমির পরিমাণের তুলনায় অধিক পরিমাণে মূলধনি উপকরণ ব্যবহার করে, হেক্টর-প্রতি শ্রমের ব্যবহার কম করে, অথচ বড় জোতে বৃদ্ধির হার ছোট জোতের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে কিছুটা পরিমাণে পুঁজিবাদী মূলধনি বিনিয়োগ বেশি সেখানে বড় জোতের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী ধরনের বিকাশ সম্ভব হতে পারে, ছোট জোতের মাধ্যমে নয়।

আমরা নীচে সারণি ৪.৪ ক, ৪.৪ খ এবং ৪.৪ গ এই তিনটি সারণিতে ভারতের প্রদেশগুলিকে কৃষি-উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন মাপ অনুযায়ী ভাগ করে দেখিয়েছি। আমরা দেখছি (সারণি ৪.৪ ক), সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীলতা (>৫০০০০টাকা/ হেক্টর) যে-রাজ্যগুলিতে, তাদের মধ্যে পঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশে জোতের মাপ ১ হেক্টরের বেশি, এর মধ্যে পঞ্জাবে জোতের মাপ ৩ হেক্টরের বেশি ও হরিয়ানায় ২ হেক্টরের বেশি। এই রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীভবনের সূচকের (বড়+মাঝারি জোতের আওতায় জমি/ ছোট+প্রান্তিক জোতের আওতায় জমি) মাপও সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এইসব সবচেয়ে বড় জোত অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে বড় জোতের আওতায় জমির তুলনায় ছোট জোতের আওতায় জমি যথেষ্ট কম। এই রাজ্যগুলি

সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল গ্রুপটি, যাদের উৎপাদনশীলতার মূল্য একর-প্রতি ৫০০০০ টাকার উপরে, এমন রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে উৎপাদনশীল রাজ্য কেরালায় কিন্তু জোতের গড় মাপ মাত্র ০.২২ হেক্টর এবং কেন্দ্রীভবনের মাত্রার দিক থেকেও কেরালা অনেক পিছনে। কিন্তু এই সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল রাজ্যগুলির মধ্যে আরও দু'টি রাজ্য রয়েছে, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ। এদের জোতের মাপও যথেষ্ট ছোট, যথাক্রমে ০.৮০ ও ০.৭৭।

সারণি ৪.৪ খ-তে আমরা যে-রাজ্যগুলিতে মাঝারি উৎপাদনশীলতা রয়েছে, অর্থাৎ যাদের উৎপাদনশীলতার মূল্য হেক্টর-পিছু ৪০০০০ টাকার বেশি এবং ৫০০০০ টাকার কম, সেই রাজ্যগুলিকে তাদের কেন্দ্রীভবনের সূচক ও জোতের মাপ সহ উপস্থিত করেছি। সারণিটিতে মাঝারি উৎপাদনশীলতার রাজ্যগুলিকে নেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে গড় জোতের মাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বেশি হলেও এই গ্রুপের মধ্যে এমন রাজ্যও রয়েছে (ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশ) যাদের গড় জোতের মাপ খুবই ছোট, কিন্তু উৎপাদনশীলতার নিরিখে উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে এগিয়ে, আর কেরালা, মহারাষ্ট্র ও অরুণাচল প্রদেশের তুলনায় এগিয়ে।

সারণি ৪.৪ গ সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল রাজ্যগুলিকে দেখাচ্ছে। এই সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল (<৪০০০০ টাকা প্রতি হেক্টরে) গ্রুপটিতে ১২টি রাজ্য আছে। এদের মধ্যে চারটি রাজ্য, উত্তরাখণ্ড, বিহার, জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ রাজ্যগুলিতে জোতের মাপ ১ হেক্টরের কম। তাছাড়া বাকি সব রাজ্যেই জোতের মাপ ১ হেক্টরের বেশি এবং গুজরাত ও রাজস্থানে জোতের মাপ যথাক্রমে ২ ও ৩ হেক্টরের বেশি। সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল, মাঝারি উৎপাদনশীল ও সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল, এই তিন ধরনের জোতের গ্রুপগুলির গড় মাপ যথাক্রমে ১.৪৪ হেক্টর, ২.২২ হেক্টর ও ১.৩২ হেক্টর। আপাতভাবে মাঝারি উৎপাদনশীল রাজ্য গ্রুপটির গড় মাপ সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে বটে, তবে তার কারণ এই গ্রুপে নাগাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি। নাগাল্যান্ডের গড় জোতের মাপ অস্বাভাবিক বেশি। নাগাল্যান্ড বাদ দিয়ে এই গ্রুপের বাকি পাঁচটি রাজ্যের জোতের গড় মাপ দাঁড়ায় ১.৪৬ হেক্টর, অর্থাৎ অন্য দুটি গ্রুপের, বিশেষ করে প্রথম গ্রুপটির অনুরূপ। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপটিকে শুধু বিবেচনায় রাখলে মনে হয় উৎপাদনশীলতার তফাতের সঙ্গে জোতের মাপের তফাতের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, কিন্তু তৃতীয় গ্রুপটিকেও আলোচনায় আনলে দেখা যায় এই সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল গ্রুপটির জোতের গড় মাপ সবচেয়ে কম। অর্থাৎ সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল রাজ্যগুলির জোতের গড় মাপ সব চেয়ে ছোট।

সারণি ৪.৪ ক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জোতের মাপের সম্পর্ক (উৎপাদনশীলতা >৫০০০০টাকা)

ক্রম	রাজ্য	উৎপাদনশীলতার মূল্য (টাকা/হেক্টর)	জোতের কেন্দ্রীভবনের* সূচক (শতকরা)	জোতের গড় মাপ (হেক্টর)
১	কেরালা	৭৯৩৩১.৬	১৫.৭৩	০.২২
২	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭২৪৪০.৯	৩৫.১৮	১.০৮
৩	পঞ্জাব	৬৯০৭৫	৭৪০.৭৫	৩.৭৭
৪	কর্ণাটক	৬৮৬৩৮.৬	৮০.০১	১.৫৫
৫	পশ্চিমবঙ্গ	৬৫৪৯৫.৬	৭.৪৫	০.৭৭
৬	হরিয়ানা	৬৩৪৩৫.৭	৯৯.৯২	২.২৫
৭	তামিলনাডু	৫৭৫১০.১	২০.৯০	০.৮
৮	ঝাড়খণ্ড	৫১৪৯৭.৬	৬০.৭১	১.১৭

সারণি ৪.৪ খ (মাঝারি মাপের জোতের উৎপাদনশীলতা = >৪০,০০০ – <৫০০০০)

ক্রম	রাজ্য	উৎপাদনশীলতা	জোতের কেন্দ্রীভবনের সূচক (শতকরা)	গড় জোতের পরিমাণ (হেক্টর)
৯	উত্তরপ্রদেশ	৪৮৫৩১.৪	২২.৫৯	০.৭৬
১০	অসম	৪৭৭০১.৮	৪৯.১৯	১.১
১১	নাগাল্যান্ড	৪৭৫৯৩.৪	৩৪৯৪.৩	৬.০২
১২	ত্রিপুরা	৪৪৯০৯.৬	৭.০৩	০.৪৯
১৩	মহারাষ্ট্র	৪০০৯৫.৭	৫৬.৮৮	১.৪৪
১৪	অরুণাচল প্রদেশ	৪০০০৫.৫	৬৬৭.৪৭	৩.৫১

সারণি ৪.৪ গ (সর্বনিম্ন উৎপাদনশীলতা: <৪০০০০)

ক্রম	রাজ্য	উৎপাদনশীলতা	জোতের কেন্দ্রীভবনের সূচক (শতকরা)	জোতের গড় মাপ
১৫	মণিপুর	৩৯৪৯৭	১৩.৪৫	১.১৪
১৬	বিহার	৩৯১৩০.৬	৯.৪৭	০.৩৯
১৭	গুজরাত	৩৬৯৮৪.২	১৩৩.৪৬	২.০৩
১৮	রাজস্থান	৩৬৯৬৫.৬	৪১০.৭২	৩.০৭
১৯	উত্তরাখণ্ড	৩৬৯৪৮.৫	২২.৯৭	০.৮৯
২০	মিজোরাম	৩৫৯৯২.৯	১৮.৯৩	১.১৪
২১	মধ্যপ্রদেশ	৩৪৮৪৬.৫	১১০.৪৫	১.৭৮
২২	ওড়িশা	৩৪৬৯৬.৯	১৫.০১	১.০৪
২৩	ছত্তীসগঢ়	৩৩৩৪০.৬	৭৫.২৩	১.৩৬
২৪	হিমাচল প্রদেশ	৩১৮৮৩.৬	৪০.০১	০.৯৯
২৫	জম্মু ও কাশ্মীর	২৮৩২৪.৬	১১.৩৪	০.৬২
২৬	সিকিম	২৭৩৬৭.৯	১২৬.৫১	১.৪২

উৎপাদনশীলতার পরিসংখ্যান: Key Indicators of Situation of Agricultural Household in India (NSS 70th round)

রাজ্যভিত্তিক মোট শস্যাধীন জমি: Key Indicators of Situation of Agricultural Household in India (NSS 70th round)

কেন্দ্রীভবন সূচক: (বড়+মাঝারি জোতের আওতায় জমি)/(প্রান্তিক+ছোট জোতের আওতায় জমি) Agricultural Census–এর ভিত্তিতে আমাদের হিসাবে।

সারণি ৪.৫ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবহারিক জমি ও জোতের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা

রাজ্য	ব্যবহারিক জোতের আওতায় জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রা		শতকরা পরিবর্তন	ব্যবহারিক জোতের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা		শতকরা পরিবর্তন
	২০১০-১১	২০১৫—১৬		২০১০—১১	২০১৫—১৬	
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩.৮০	২.৭০	—২৮.৯৩	৩৫.৯৫	২৮.১৩	—২১.৭৪
অরুণাচল প্রদেশ	৮৭.৫	৬৪.৭০	—২৬.০৫	৬৬৩.১৫	৫৭১.১১	—১৩.৮৮
অসম	৩.৮২	৩.৫১	—৮.১২	৪৯.১৭	৪৬.৫২	—৫.৪০
বিহার	০.৫৩	০.৫২	—১.৪০	৯.৪৭	৯.৭০	২.৪০
ছত্তীসগঢ়	৭.৬৩	৬.১৭	—১৯.০৪	৭৫.২৩	৬১.৬৮	—১৮.০১
গুজরাত	১৭.৩১	১৪.৭৪	—১৪.৮৩	১৩৩.৪৪	৯৯.৫৩	—২৫.৪১
হরিয়ানা	২২.০৪	২০.৮৫	—৫.৩৯	২৪৩.৯৮	২২৯.৫৭	—৫.৯০
হিমাচল প্রদেশ	৩.৬৬	৩.২৭	—১০.৬৭	৪০.০৩	৩৬.৬২	—৮.৫৩
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৮৭	০.৮৯	২.০০	১১.৩৬	১১.৩২	—০.৩৫
ঝাড়খণ্ড	৬.৫৪	৬.৩৮	—২.৪৯	৭৬.৪৫	৭৬.৮৩	০.৪৯
কর্ণাটক	৯.৬৭	৭.২৬	—২৪.৮৬	৮০.০২	৬৬.১২	—১৭.৩৭
কেরালা	০.২০	০.১৭	—১৬.৪৬	১৫.৭৫	১৪.১১	—১০.৩৯
মধ্য প্রদেশ	১৩.৮৪	১০.১৮	—২৬.৪৫	১১০.৪৮	৭৯.৫৯	—২৭.৯৫
মহারাষ্ট্র	৭.২৩	৬.০৫	—১৬.৩৩	৫৬.৮৮	৪৮.৯৫	—১৩.৯৩
মেঘালয়				৪১.৪৬	৪০.৪৪	—২.৪৬
ওড়িশা	১.৬৩	১.২১	—২৫.৫৪	১৫	১০.৬৯	—২৮.৭২
পঞ্জাব	১০২.৫০	১০০.৫৫	—১.৯০	৭৪১.০৮	৬৭৫.৪৫	—৮.৮৫
রাজস্থান	৩৮.০৫	৩১.৩৮	—১৭.৫৩	৪১০.৬৪	৩৩৬.০৭	—১৮.১৫
সিকিম				১২৫.৭১	৫৫.৫৫	—৫৫.৮০
তামিলনাড়ু	২.২৫	১.৯৪	—১৩.৬৬	৩০.৪৩	২৭.৬৮	—৯.০৪
তেলাঙ্গানা	৩.৮৩	২.৫৭	—৩২.৯৮	৩৪.২২	২২.৩৪	—৩৪.৭১
ত্রিপুরা				৬.৯৪	৬.৩৯	—৭.৯৪
উত্তরপ্রদেশ	১.৯৬	১.৮০	—৭.৭৫	২২.৫৯	২১.০৭	—৬.৭২
উত্তরাখণ্ড	২.১৭	১.৮৫	—১৪.৫০	২২.৮৪	২০.৮৫	—৮.৬৭

পশ্চিমবঙ্গ	০.৩৫	০.২৭	–২২.৩৭	৭.৪৬	৬.৭৮	–৯.১২

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, Ministry of Agriculture

জমির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা (X) যে-সব রাজ্যে ২০১০ সালে সবচেয়ে বেশি ছিল (X>১০) সেগুলি হল পঞ্জাব, অরুণাচল প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ। জমির কেন্দ্রীভবন তার চেয়ে কম কিন্তু অন্য রাজ্যের চেয়ে বেশি (৫<X<১০) সেই রাজ্যগুলি হল মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড। তার থেকে আরও কম (১<X<৫) কেন্দ্রীভবন যে-রাজ্যগুলির সেগুলি হল: হিমাচল প্রদেশ, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। সবচেয়ে কম (X<১) কেন্দ্রীভবন যে-রাজ্যগুলিতে সেগুলি হল: বিহার, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ। উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কেন্দ্রীভবনের কোনও সম্পর্ক নেই। ২০১৫–১৬ সালে প্রায় সব রাজ্যেই কেন্দ্রীভবনের মাত্রা ২০১০–১১র তুলনায় অনেকটা পরিমাণে কমেছে, কিন্তু কয়েকটি রাজ্যে কমার অনুপাত খুবই কম। যেমন পঞ্জাবে সময়ের সঙ্গে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা কমেছে খুবই সামান্য। সেইরকম জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রা খুবই কম কমেছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানায়। কেন্দ্রিকতার মাত্রা যথেষ্ট কমেছে অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, অন্ধ্রপ্রদেশে। জম্মু-কাশ্মীরে এই পাঁচ বছরে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা বেড়েছে।

উৎপাদন-দক্ষতার সঙ্গে জোতের মাপের সম্পর্ক: একটি জোত-স্তর বিশ্লেষণ

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও বীরভূম জেলার ছয়টি ব্লকের ৩৬০টি জোতের উৎপাদন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সনাতন আউস, আমন এবং বোরো ধান ও সবজি চাষে জোত স্তরে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ আলাদাভাবে নিয়ে সবচেয়ে দক্ষ জোতের সাপেক্ষে প্রতিটি জোতের তুলনামূলক উৎপাদন দক্ষতার সূচকের পরিমাপ করেছি[১৪]। এই সূচকটি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, সার, বীজ, কীটনাশক ও জল, শ্রম দিবস এবং জোতের মাপ ইত্যাদির প্রভাবে কতটা প্রভাবিত তা দেখার জন্য টবিট রিগ্রেশন মডেল গঠন করে উৎপাদনকুশলতার ওপর এদের প্রভাবকে পরিসংখ্যানগতভাবে পরিমাপ করেছি। আমরা দেখেছি, উৎপাদনকুশলতার ওপর জমি বাদে অন্যান্য সব উপকরণের প্রভাব ঋণাত্মক। অর্থাৎ এইসব উপকরণকে কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে এদের ব্যবহার আরও কমানো দরকার। কিন্তু আউস ও আমন ধানের ক্ষেত্রে জোতের মাপের প্রভাব সূচকটির মান ধনাত্মক। এর অর্থ, অন্যান্য উপকরণগুলির মাপ একই রেখে জোতের মাপ আরও বাড়িয়েই কেবলমাত্র আমন ও আউস ধানের উৎপাদনকুশলতা বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই মাপটির পরিসংখ্যানগত মানটির নির্ভরযোগ্যতা যথেষ্ট নয়। তেমনই বোরো ধানের ক্ষেত্রে সূচকটির মান ঋণাত্মক, যার অর্থ বোরো ধানের ক্ষেত্রে জোতের মাপ কমলে অধিক কুশলতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রেও আউস ও আমনের মতোই মানটির পরিসংখ্যানগত নির্ভরযোগ্যতা গ্রহণযোগ্য স্তরের নীচে আছে, তাই এটিকে একটি অত্যন্ত দুর্বল ইঙ্গিতের থেকে বেশি কিছু গণ্য করা ভুল হবে। কিন্তু সবজি

চাষের ক্ষেত্রে এই সূচকটির মান পরিসংখ্যানগত ভাবে অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ সবজি চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদনকুশলতা্র ওপর জোতের মাপের উল্লেখযোগ্য কোনও প্রভাব নেই। অন্যদিকে পরিসংখ্যান অনেকটা নিশ্চিতভাবে দেখাচ্ছে যে, প্রায় সব ধরনের চাষে, উৎপাদনকুশলতার ওপর জোতের মাপের কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু বিশেষ করে বোরো চাষে, সার, কীটনাশক বা জলের জন্য খরচ অতিরিক্ত এবং এই উপকরণগুলির একক বাড়িয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় না। বরং উৎপাদনকুশলতার স্বার্থে এই উপাদানগুলির ব্যবহার আরও কমানো উচিত।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে আমাদের কাছে দু'টি বিষয় পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। তার প্রথমটি হল, পশ্চিমবঙ্গ মূলত একটি ধান উৎপাদন-প্রধান রাজ্য হলেও এখানে উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার মোটেই উৎপাদনকুশল নয়। এই সমস্ত উপকরণ, বিশেষত সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ধরনে চাষির অজ্ঞানতার ও অদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার শুধু যে উৎপাদনব্যয় অহেতুক অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয় তাই নয়, এই উপকরণগুলির রাসায়নিক অন্তর্বস্তু ফসল ও জমি উভয়েরই ক্ষতি করে। উৎপাদনকুশলতাকে সর্বোত্তম স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগুলির ব্যবহার কমানো জরুরি। এই সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার ভারতীয় কৃষিতে একটি ক্ষতিকারক প্রবণতা, যা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অন্যান্য এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতেও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় একটি সমস্যা। পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে চাষিদের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে সৃজিত মিশ্র ও অন্যান্যদের পর্যবেক্ষণ[১৫] থেকে জানা যায়, চাষিদের এই অতিরিক্ত সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের প্রবণতার পিছনে রয়েছে এগুলির ব্যবহার বিষয়ে উপকরণ-বিক্রেতাদের পরামর্শ। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের জন্য চাষিরা এই উপকরণগুলির বিক্রেতা ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। এরাই উপকরণের সঠিক পরিমাণ ও বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সঠিক অনুপাত বিষয়ে চাষিদের পরামর্শ দেয়। এরাই অনেক সময়ে উপকরণের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে অপারগ চাষিকে চাষ ওঠার পর শোধ করার শর্তে ধারে এইসব উপকরণ জোগান দিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া উপকরণগুলির অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করে এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়। গোটা ঘটনাটি উপকরণ জোগানদাতার উদ্যোগের পরিণাম।[১৬]

সারণি ৪.৬ উৎপাদনকুশলতায় বিভিন্ন সূচকের অবদানের পরিসংখ্যানগত গুরুত্ব

	আউস ও আমন	বোরো	সবজি
ধ্রুবক	০.৫৯৪১৫৩৯ (৯.৪৫)	০.৮১৪২৪৮৩ (১১.৩৫)	০.৩৮৯৭৬২৩ (২.৫০)
সার	–০.০০০০১১৯ (–২.৮২)	–০.০০০০৩১৮ (–৪.২১)	০.০০০০০০১৬৮ (১.০৫)
কীটনাশক	–০.০০০০৩৭ (–৩.০৭)	–০.০০০০০০১১৩ (০.০৮)	–০.০০০০০০২২০ (–০.৩৩)
বীজ	০০০০০০১৩৭ (০.১৬)	–০.০০০০০৯৬৩ (–১.১৭)	–০.০০০০০২৬৬ (–২.২৬)
জল	–০.০০০০২২(–১.৭৪)	–০.০০০০২০৭ (–৪.০৫)	–০.০০০০০৫২৩ (–৩.০৮)
শ্রম দিবস	–০.০০০০২২ (–০.৮৩)	–০.০০০১৪৬৩ (–২.০৮)	–০.০০০০২৪ (–২.৫২)
শস্যবৈচিত্রসূচক	–০.১৪৯৮১৪ (–১.৫১)	০.২২০৮৫১ (২.২২)	–০.১৯৬১৮৫ (–১.১৭)
জোতের মাপ	০.০৩২৯৬৪ (১.৮০)	–০.০৪৫৯১৬২ (–১.৯৮)	০.০৩৫০২২১ (১.০৬)
গলসি	–০.১৭০৬৪০২ (–২.৯৫)	০.০৩৩৪২৯৮ (০.৫২)	–
মেমারি	–০.০৮৭৯৩৩ (–১.৫৯)	–০.০৯২০১৬৭ (–১.২৮)	–
বলাগড়	–০.০০৩৮৮৪ (–০.০৭)	০.০৮৩১০৯৬ (১.৫১)	০.১৪০৩১১৭ (১.৭১)

উৎস: নিজস্ব গবেষণা [ব্র্যাকেটের মধ্যে T-এর মান] তৃণমূল স্তরে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মাপ।

Aparajita Mukherjee(2015): 'Evalution of the Policy of Crop Diversification as a Strategy for Reduction of Rural Poverty in India'in Poverty Reduction Policies and Practices in Developing Asia ed by A.Heshmati, E.Maasoumi and G.Wan,ADB and Springer International Publishing AG.

অপর এক অনুসন্ধানে আমরা জমির উৎপাদনকুশলতার মতো হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের ওপর জোতের মাপের কোনও প্রভাব আছে কিনা এবং সার, বীজ, জল, শ্রম ইত্যাদি উপকরণের প্রভাব স্থির রেখে জমির হেক্টর-প্রতি উৎপাদনশীলতার ওপর জোতের মাপের প্রভাব কী দেখার চেষ্টা করেছি। এ জন্য উৎপাদনশীলতাকে একটি প্রভাবিত চলরাশি হিসেবে দেখে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণকে প্রভাব সৃষ্টিকারী চলরাশি হিসেবে ধরে একটি রিগ্রেশন সমীকরণ গঠন করা হয় এবং উৎপাদনশীলতার ওপর বিভিন্ন উপকরণের প্রভাব-মাত্রার পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা হয়। এইসব উপকরণকে স্থির রেখে শুধুমাত্র জোতের মাপ পরিবর্তন করলে উৎপাদনশীলতা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে তার মাত্রারও পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই উৎপাদনের উপকরণগুলি পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে রাজ্যে উৎপাদনশীলতার যে-তফাত হয় সেটিকেই আমাদের এই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে সমগ্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান সূত্রে প্রাপ্ত রিগ্রেশন সমীকরণটি চতুর্থ অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে (অন্য সব উপাদানের ব্যবহার একই স্তরে রেখে) সেচের এলাকা বাড়িয়ে এবং চাষের নিবিড়তা বাড়িয়ে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়ানো যায়। অর্থাৎ যদি কোনও রাজ্যে এই দু'টি সূচকের মান অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি থাকে তাহলে প্রথমোক্ত রাজ্যগুলিতে হেক্টর-প্রতি গম উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিতীয়োক্ত রাজ্যের তুলনায় বেশি হবে। কিন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে মোট গম উৎপাদন এলাকার তুলনায় গ্রামীণ রাস্তার দৈর্ঘ বেশি হলে গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কম হবে। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় প্রয়োজনীয় রাস্তা অনেক বেশি তৈরি হয়ে গেছে। ফলে রাস্তা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো যাবে না, বরং তুলনায় রাস্তার দৈর্ঘ যে-সব রাজ্যে তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে উৎপাদনের মাত্রা খানিকটা বেশি। অন্যান্য উপাদানগুলি ব্যবহারের স্তর সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই এত বেশি যে, এই উপাদানগুলি আরও বাড়া বা কমার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনে কোনও প্রভাব পড়বে না। রাজ্যগুলির মধ্যে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের পার্থক্য নির্ণয়ে জোতের মাপের ভূমিকা আছে। জোতের মাপ বেশি হলে উৎপাদনশীলতার মাত্রা বেশি হবে। এই শেষোক্ত পর্যবেক্ষণটির অর্থ হল, বড় চাষ অধিক উৎপাদনশীল। এই পর্যবেক্ষণটি, আমাদের আলোচিত রাজ্যগুলির প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অন্তত গমচাষের ক্ষেত্রে সত্যি না হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি বহুদিনের পুরনো জোতের মাপ ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্কের সিদ্ধান্তটির সরাসরি বিরোধিতা করছে। অবশ্য আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি শুধুমাত্র একটি শস্য, গমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বহুদিনের পুরনো ও বহুচর্চিত জোতের মাপ ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে বিপরীতগামী সম্পর্ক, অর্থাৎ বড় জোতের তুলনায় ছোট জোত বেশি উৎপাদনশীল, এই বিষয়টি প্রাক্‌সবুজ বিপ্লব যুগের একটি পর্যবেক্ষণ। কৃষিতে প্রকৌশলগত উন্নয়নের পর এই পর্যবেক্ষণের যাথার্থ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং সিদ্ধান্তটির সমর্থনে ও এর বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন বহু নতুন নতুন আলোচনা উঠে এসেছে। আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি ২০১৬–১৭ সালের তথ্য ব্যবহার করে ২৬টি প্রধান রাজ্য নিয়ে করা হয়েছে। নতুন ধরনের বীজ, সার ও

অন্য উপকরণের সর্বব্যাপী ব্যবহার, সেইসঙ্গে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জোতের মাপ অন্তত গম চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতাকে কীভাবে ও কতটা প্রভাবিত করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছে আমাদের পর্যবেক্ষণটি। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ওপর নতুন প্রযুক্তির প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, বড় জোতের রাজ্যগুলির পক্ষে গমচাষের উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমরা শুধুমাত্র গমচাষের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র অভ্যন্তরীণ কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রেও ২০১৪ সালের রাজ্যভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিট উৎপাদন ও বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করেছি। পরিসাংখ্যিক পরিমাপ থেকে পাওয়া রিগ্রেশন সমীকরণটি চতুর্থ অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

আমাদের এই পরিসাংখ্যিক পর্যবেক্ষণটি আর-একবার কৃষি-উৎপাদনের ওপর জোতের মাপের ধনাত্মক প্রভাব প্রমাণ করল। আমাদের বিশ্লেষণটি থেকে দেখা যাচ্ছে যদি অন্যান্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো ও উপকরণের ব্যবহার, রাস্তাঘাট, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি একই স্তরে থাকে তাহলে জোতের মাপের সঙ্গে নিট অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক ধনাত্মক, অর্থাৎ জোতের মাপ বেশি হলে নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্রা বেশি হয়। জোতের মাপ ছাড়াও নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্রা আর যেসব উপাদানের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় সেগুলি হল, গ্রামীণ রাস্তা ইত্যাদি পরিকাঠামো ও সারের ব্যবহার ইত্যাদি প্রকৌশল। এই উপাদানগুলি বাড়লে কৃষি-উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা যেমন ফসল বাজারজাত করার সুবিধা বোঝায়, তেমনই গ্রামীণ রাস্তা সামগ্রিক উন্নয়নের সূচক। গ্রামীণ রাস্তাঘাট বেশি থাকার অর্থ ওই রাজ্যে সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা বেশি তৈরি হওয়ায় চাহিদা ও আয় সংস্থানের উপায় বেড়েছে। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার যেসব রাজ্যে বেশি বিস্তৃত, সেখানে যেমন সারের অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার হয়ে থাকে, তেমনই কোনও কোনও রাজ্যে সারের ব্যবহার যথোচিত স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। এই দ্বিতীয় স্তরের রাজ্যগুলিতে সারের ব্যবহার বাড়লে অবশ্যই উৎপাদন বাড়বে। আর-একটি উপাদান হল শস্যবৈচিত্র। আমরা শস্যবৈচিত্রের সূচকটিকে একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে ধরে পরিসাংখ্যিক গণনা করে দেখেছি, নিট কৃষি উৎপাদনের ওপর এই উপাদানের প্রভাব ধনাত্মক, অর্থাৎ শস্যবৈচিত্রের মাত্রা বেশি হলে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি।

সারণি ৪.৪, ৪.৫ ও ৪.৬ দেখাচ্ছে, বড় জোতের রাজ্যগুলির মধ্যে যেমন পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো প্রযুক্তি-প্রয়োগে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি আছে, তেমনই রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের মতো অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিও আছে।

এই বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট ভাবে বোঝার জন্য আমরা ভারতের বাছাই করা ২৭টি প্রধান রাজ্যকে জোতের মাপ অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করেছি: ১) যে-রাজ্যগুলির গড় জোতের মাপ ২ হেক্টর বা তার বেশি, ২) যে-রাজ্যগুলির গড় জোতের মাপ ১ হেক্টরের বেশি কিন্তু দুই হেক্টরের কম, এবং ৩) যে-রাজ্যগুলিতে গড় জোতের মাপ ১ হেক্টরের থেকে কম। এই ভাগ অনুযায়ী তিনটি দলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা যথাক্রমে ৬টি, ১২টি এবং ৯টি। নীচের সারণিতে রাখা হল এই রাজ্যগুলিতে জমির কেন্দ্রীভবন সূচক ও সেই রাজ্যের সবক'টি প্রধান ফসলের উৎপাদন-সমষ্টির হেক্টর-প্রতি পরিমাণের গড় (অর্থাৎ সব শস্য বিবেচনায় এনে গড় উৎপাদনশীলতা)।

সারণি ৪.৭ জোতের গড় মাপ অনুযায়ী তিন ভাগে বিন্যস্ত রাজ্যগুলিতে জমির কেন্দ্রিকতার সূচক ও প্রতিটি ভাগের অন্তর্গত রাজ্যগুলির গড় উৎপাদনশীলতা।

বড় জোত (২ হেক্টর বা তার বেশি)	কেন্দ্রীভবন সূচক	মাঝারি গড় জোত (১ হেক্টর থেকে ২ হেক্টরের নীচে)	কেন্দ্রীভবন সূচক	ছোট গড় জোত (১ হেক্টরের কম)	কেন্দ্রিকতা সূচক
অরুণাচল প্রদেশ (৩.৫১)	৬৬৭.৪৭	অন্ধ্রপ্রদেশ (১.০৮)	৩৫.১৮	বিহার (০.৩৯)	৯.৪৭
গুজরাত (২.০৩)	১৩৩.৪৬	অসম (১.১০)	৪৯.১৯	হিমাচল প্রদেশ (০.৯৯)	১১.৩৪
হরিয়ানা (২.২৫)	৯৯.৯২	ছত্তীসগঢ় (১.৩৬)	৭৫.২৩	জম্মু ও কাশ্মীর (০.৬২)	–
নাগাল্যান্ড (৬.০২)	৩৪৯৭.০৩	ঝাড়খণ্ড (১.১৭)	৬০.৭১	কেরল (০.২২)	১৫.৭৩
পঞ্জাব (৩.৭৭)	৭৪০.৭৫	কর্ণাটক (১.৫৫)	৮০.০১	তামিলনাড়ু (০.৮০)	২০.৯০
রাজস্থান (৩.০৭)	৪১০.৭২	মধ্যপ্রদেশ (১.৭৮)	১১০.৪৫	ত্রিপুরা (০.৪৯)	৭.০৩
		মহারাষ্ট্র (১.৪৪)	৫৬.৮৮	উত্তরাখণ্ড (০.৮৯)	২২.৯৭
		মণিপুর (১.১৪)	১৩.৪৫	উত্তরপ্রদেশ (০.৭৬)	২২.৫৯
		মেঘালয় (১.৩৭)	–	পশ্চিমবঙ্গ (০.৭৭)	৭.৪৫
		মিজোরাম (১.১৪)	১৮.৯৩		
		ওড়িশা (১.০৪)	১৫.০১		
		সিকিম (১.৪২)	১২৬.৫১		
গড় উৎপাদনশীলতা (বড় জোত) টাকায়	৪৯০০৯.৮৯	গড় উৎপাদনশীলতা (মাঝারি জোত)	৪২৭৭১.২৩	গড় উৎপাদনশীলতা (ছোট জোত)	৪৮০০৭.২৯

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

সারণি ৪.৬ থেকে ধরা পড়ছে যে, সবচেয়ে বড় জোতের রাজ্যগুলিতে উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি। ছোট জোতগুলির গড় উৎপাদনশীলতার তুলনায় মাঝারি জোতের উৎপাদনশীলতা অনেকটা নীচে থাকলেও সবচেয়ে বড় জোতের রাজ্যগুলির সর্বোচ্চ গড় উৎপাদনশীলতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইঙ্গিত মেলে। সারণি ৪.৪ ক, ৪.৪ খ ও ৪.৪ গ এই তিনটি সারণিতে আমরা রাজ্যগুলিকে তাদের উৎপাদনশীলতার মাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করে তাদের জোতগুলির গড় মাপ বিচার করেছিলাম। আমরা দেখেছি, একটি ব্যতিক্রমী রাজ্যকে (নাগাল্যান্ড, তার জোতের গড় মাপ অস্বাভাবিক বেশি, ৬.০২ হেক্টর) বাদ দিয়ে হিসাব করলে তিন দলের রাজ্যগুলির গড় জোতের পরিমাপ দাঁড়ায় (সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন উৎপাদনশীলতা, এই ক্রমে) ১.৪৫, ১.৪৬ এবং ১.৩২ হেক্টর। স্পষ্টতই সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং মাঝারি উৎপাদনশীল রাজ্যগুলির মধ্যে জোতের মাপের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল রাজ্যগুলির জোতের গড় মাপ অন্যান্য রাজ্যগুলির জোতের গড় মাপের তুলনায় বেশ কম। এই পরিসাংখ্যিক পর্যবেক্ষণটি যে-সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে তা হল, রাজ্য অনুযায়ী উৎপাদনশীলতার পরিমাণের পার্থক্য নির্ণয়ে জোতের মাপের খুব বেশি ভূমিকা নেই।

উপরের সারণি ৪.৬ থেকে আমরা দেখছি সবচেয়ে বড় জোতের রাজ্যগুলিতে জমির কেন্দ্রীভবন প্রবণতা সবচেয়ে বেশি এবং মাঝারি ও সবচেয়ে ছোট জোতের রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীভবনের মান ক্রমশ কমেছে। কিন্তু সারণি ৪.৫ এবং ৪.৬ ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে-রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা খুব বেশি, সেগুলি যে সবসময়ে অধিক উৎপাদনশীল এমন নয়। অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশের

জোতের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা যথেষ্ট বেশি, এদের জোতের মাপও বেশি, কিন্তু এরা উৎপাদনশীলতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। আবার পঞ্জাব-হরিয়ানায় কেন্দ্রীভবনের মাত্রার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার মাত্রাও বেশি। কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উৎপাদনশীলতার দিক থেকে যথেষ্ট এগিয়ে থাকা রাজ্য হলেও কেন্দ্রীভবনের মাত্রা বা জমির মাপের দিক থেকে এরা বেশ নীচে। অর্থাৎ জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রার সঙ্গেও উৎপাদনশীলতার সবসময়ে সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধরনের ঘটনাকে শুধুমাত্র ওপর থেকে দেখলে সাযুজ্যহীন মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, সবচেয়ে বড় মাপের জোতগুলির মধ্যে এমন কিছু রাজ্য রয়েছে যেগুলি উৎপাদনশীলতার দিক থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়া। এর কারণ, এই রাজ্যগুলি, যেমন, অরুণাচল প্রদেশ, রাজস্থান, নাগাল্যান্ড, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত ইত্যাদি বড় জোতবিশিষ্ট ও সেইসব রাজ্যে বেশি কেন্দ্রীভবনও ঘটেছে। কিন্তু এই রাজ্যগুলি উৎপাদনশীলতার নিরিখে একেবারে পিছনে রয়েছে। উপরন্তু এই রাজ্যগুলি অন্যান্য নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের অবশেষ এইসব রাজ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। শুধু প্রকৌশলের দিক থেকেই নয়, শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ এবং পণ্যের মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্য চলাচলের ওপর বিভিন্ন অর্থনীতি-বহির্ভূত শক্তির প্রভাব সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গতিহীন করে রাখে। এই রাজ্যগুলিতে এখনও বড় জোতের চাষে মুক্ত মজুরি-শ্রমিক ব্যবহারের বদলে নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঋণগ্রস্ত বাঁধা-শ্রমিকের ব্যবহার উৎপাদন-সম্পর্কের প্রধান অঙ্গ হিসেবে রয়ে গেছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক ইত্যাদির মতো কিছু কিছু রাজ্যে অংশত প্রকৌশলগত উন্নতি এবং প্রগতিশীল বাজার-নির্ধারিত শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রম-প্রক্রিয়া ও উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকলেও ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় এখনও কৃষি উপকরণ, পণ্য ও ঋণের বাজার-প্রক্রিয়া যথাযথ চালু নয়, ফলে বড় জোত ও জমির অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন অনেক সময়েই প্রাক্‌পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক ধরনের উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরে রাখে। আবার এমন কিছু বড় জোতের রাজ্যও আছে, যেমন, পঞ্জাব ও হরিয়ানা, যারা অধিক উৎপাদনশীল রাজ্য, জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রাও এসব ক্ষেত্রে সারা দেশের গড় কেন্দ্রীভবনের মাত্রার থেকে বেশি। উৎপাদনশীলতার একই বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে জোতের মাপের দিক থেকে এদের কিছুটা নীচে, কিন্তু সারা দেশের গড় জোতের মাপের থেকে অনেকটা উপরে থাকা ও জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রার দিক থেকেও এগিয়ে থাকা কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে। কিন্তু পাশাপাশি কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি হল ছোট জোত ও তুলনায় কম মাত্রায় জমির কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এমন রাজ্য, তবু সেগুলিও অধিক উৎপাদনশীল রাজ্য, যাদের হেক্টর-পিছু উৎপাদনের মূল্য ৫০,০০০ টাকার বেশি।

পঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি ভারতের কয়েকটি রাজ্য আধুনিক প্রযুক্তি, নতুন ধরনের স্থির পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক চাষপদ্ধতি প্রয়োগ করে উৎপাদনশীলতার দিক থেকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই রাজ্যগুলিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি আছে। কিন্তু এই রাজ্যগুলিতেও ২০০০ সালের আগে-পরে কয়েকটি বছরে চাষিদের আত্মহত্যা এইসব রাজ্যে কৃষি-অর্থনীতির বাস্তবতা নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে এনে ফেলেছে। এইসব এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে মহাজন-ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বে থাকা কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণ, কৃষি-পণ্যের মিলিত বাজার-প্রক্রিয়া কীভাবে উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশকে প্রকৃত উৎপাদকের কাছ থেকে সরিয়ে এনে

ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক কাজে যুক্ত শ্রেণিটির নিয়ন্ত্রণে এনে দেয়, নতুন কিছু অনুসন্ধানে তার ইঙ্গিত মিলেছে। একই সঙ্গে ধরা পড়েছে যে, ভারতের কৃষি-অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার-বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত বিশ্বায়ন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত বাণিজ্য সংক্রান্ত নতুন নিয়মগুলি এবং আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব আইন। এগুলির মিলিত প্রয়োগে ভারতীয় কৃষি নিজ দেশের বাজারে অসম প্রতিযোগিতার দাপটে সংকটে পড়ছে এবং ভারতীয় চাষি আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রমাগত পুঁজি সঞ্চয়নের যে-প্রক্রিয়া কৃষিকে চলমানতার দিকে নিয়ে যেতে পারে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় কারণ পণ্য, উপকরণ ও ঋণের বাজারের মিলিত কার্যকারিতা আহরিত উদ্বৃত্তকে দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বড় জোত অধ্যুষিত কৃষির বাইরে যে বিস্তীর্ণ ভারতীয় কৃষি রয়েছে তা প্রান্তিক- ও ছোট জোত-নির্ভর। ভারতের কৃষিতে ছোট জোত-নির্ভর চাষের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উত্তরণ সম্ভব কিনা সে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমাদের সামনে অন্যান্য দেশের কিছু কিছু উদাহরণ আছে। আমরা জানি, ছোট জোতে চাষ মানেই ক্ষুদ্রায়তন চাষ নয়। ছোট জোতে চাষের নিবিড়তা বাড়িয়ে, পুঁজি-ঘন চাষের মাধ্যমে ছোট জোতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিকশিত হতে পারে। আমেরিকান কৃষি-অর্থনীতিতে ছোট জোতে বৃহদায়তন উৎপাদন মারফত ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশ ঘটেছিল। আমেরিকার কৃষি-অর্থনীতির এই বিকাশের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন এই যুক্তিটি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন যে, আমেরিকায় ছোট জোতের মাধ্যমে এই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, ছোট জোতের প্রাধান্য বৃদ্ধি, বা কৃষিতে জোতের গড় আয়তন হ্রাসের অর্থ এই নয় যে, কৃষিতে পুঁজিবাদের ভাঙন দেখা দিয়েছে। বরং এটি ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশকেও সূচিত করতে পারে। কিন্তু লেনিনের এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রটি ছিল আমেরিকার অর্থনীতি, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে সামন্ততন্ত্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ফলে উৎক্রমণের সময় সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলি পুঁজিবাদের বিকাশের পথে যে-বাধার সৃষ্টি করে, এক্ষেত্রে সেগুলি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রাক্-পুঁজিবাদী বাণিজ্য-পুঁজির কর্তৃত্বের যুগে বাণিজ্য-পুঁজি কৃষি-পণ্যের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বিচ্ছিন্ন ছোট উৎপাদকের পুঁজিকে একত্রিত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের পথে কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতির উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সদ্যবিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদন পুঁজিবাদী ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারকে বিস্তৃত করে এবং পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের জোগানকে সুনিশ্চিত করে। ফলে সরল পণ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎক্রমণের প্রক্রিয়ায় একদিকে ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির উচ্ছেদ, অন্যদিকে সংযুক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজির ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হওয়া একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে দেখা দেয়। আমেরিকান অর্থনীতিতে এই আদিম পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া বা এই প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ভূমিকা এবং ক্ষুদ্র পুঁজির সংযুক্তি বা উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিশেষ ভূমিকা, কোনওটিই আবশ্যিক শর্ত হিসেবে দেখা দেয়নি।

অন্যদিকে জাপানের উদাহরণটি লক্ষ করলে আমরা দেখি, জাপানে সংস্কারের ফলে ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতির ওপর থেকে সমস্ত প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের বোঝা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কৃষির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি মাপের জোতের ভিত্তিতে যে কৃষি-অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক-মহাজনি পুঁজির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং মুক্ত শ্রম, ঋণ, ও পণ্যের বাজারের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে কৃষিতে অবাধ পুঁজিগঠনের রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়। পুঁজিসঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় দেখা যায়,

বৃহদায়তন চাষের সুবিধাগুলি ছোট জোতের তুলনায় বড় জোতেই অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। ফলে মুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় অচিরেই ছোট জোতগুলি প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে থাকে, আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে বড় জোতগুলি আরও বড় আকার নেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষিতে পুঁজিগঠনের প্রক্রিয়াকে অবাধ রাখার জন্য প্রয়োজন পড়ে বড় জোতগুলির ওপর থেকে ঊর্ধ্বসীমা সরিয়ে তার বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করার। ১৯৬১ সালে জাপানে কৃষি-সংস্কারের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে প্রথমে কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে বৃহৎ আয়তনে চাষ শুরু করা ও পরবর্তীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃহদায়তন চাষ সংগঠিত করা আইনগত অনুমতি পায়।

কিন্তু জাপানে কৃষি-পুঁজিবাদ গঠনের এই প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পূর্বশর্ত শুধু কৃষি-অর্থনীতির আমূল সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিতে উপস্থিত পুরনো সম্পর্কের আমূল উচ্ছেদ নয়, কৃষির পাশাপাশি শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ, শ্রম ও জমিসহ সমস্ত উপকরণের মুক্ত বাজার গঠন, দ্রুত শিল্পবিকাশের ফলে শ্রম ও কৃষি-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, এগুলিই জাপানে কৃষি-পুঁজিবাদ গঠনের আবশ্যিক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ভারতীয় কৃষির অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গঠনের জন্য আরও যে-প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা জরুরি, এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছি: ক) ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে উৎপাদন কি মজুরি-শ্রম নির্ভর হয়ে উঠেছে ও এই প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কৃষিতে কি মুক্ত শ্রমের একটি সুসংগঠিত বাজার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে? খ) ভারতে কৃষিঋণের বাজার কতটা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে? স্থানীয় মহাজন শ্রেণিটি ঋণের জোগান কতটা নিয়ন্ত্রিত করে? গ) কৃষি-পণ্যের বাজার কতটা সুসংগঠিত ও তা কতটা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে? স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছোট উৎপাদকের উৎপাদন ও কৃষি-পণ্যের দাম কতটা নিয়ন্ত্রণ করে? খোলা বাজারের ভূমিকা কতটা? ঘ) কৃষিতে উৎপাদনের উপকরণের বাজার কতটা ব্যবসায়ী-মহাজনদের নিয়ন্ত্রণাধীন?

আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিষয়গুলির ওপরেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখব। এর মাধ্যমে আমরা এটাই দেখতে চাই যে, ভারতীয় কৃষি কী পরিমাণে তার দীর্ঘকালের সনাতন বৈশিষ্ট্য কাটিয়ে উঠে একটি গতিশীল উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি পূরণ করতে পারছে।

সংযোজন

ক. গমের পরিসংখ্যানগত পরিমাপ

$$Y = -1513.97 - 2.04X_1 + 384.31X_2 + 0.26X_3 - 1.34X_4 - 2.42X_5 + 18.67X_6 + 18.16X_7$$

t = (−1.10) (−2.90) (2.08) (0.43) (−0.28) (−1.34) (2.01) (2.40)

$R^2 = 0.93$ adj $R^2 = 0.84$

Y = প্রতি হেক্টর গম চাষে মোট উৎপাদনের পরিমাণ।

X_1 = গ্রামীণ রাস্তা (কিলোমিটার) হেক্টর-প্রতি মোট কর্ষিত এলাকা-পিছু।

X_2 = গড় জোতের মাপ।

X_3 = বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

X_4 = সার কেজি (প্রতি হেক্টর)।

X_5 = পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টা (প্রতি হেক্টর)

X_6 = সেচ: মোট কর্ষিত এলাকায় সেচ এলাকার শতকরা ভাগ।

X_7 = কর্ষণের নিবিড়তা।

খ. নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিসংখ্যানগত পরিমাপ

$$\text{Log } Y = 8.745 + 0.399\log X_1 + 0.679\log X_2 + 0.571\log X_3 + 0.004\log X_4 + 0.002\log X_5$$

T = (4.12) (2.10) (6.20) (3.14) (0.81) (0.05)

$$+ 0.171X_6 - 0.172X_7 + 1.492X_8$$

T = (0.62) (-1.82) (2.24)

$R^2 = 0.91$ adj $R^2 = 0.86$

Y = কৃষি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

X_1 = গড় জোতের মাপ।

X_2 = গ্রামীণ রাস্তা।

X_3 = সারের ব্যবহার প্রতি হেক্টর জমিতে।

X_4 = চাষের নিবিড়তা।

X_5 = বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রতি হেক্টর জমিতে।

X_6 = সেচের শতকরা।

X_7 = কৃষি-শ্রমিক প্রতি হেক্টরে।

X_8 = শস্যবৈচিত্র

তথ্যসূত্র

১. Marx, K. 1971. *Capital*. vol. 3. Moscow: Progress Publishers.

২. Marx, K. and F. Engels. 1971. "The Class Struggles in France 1848 to 1850." *Selected Works*. vol. 1. Moscow: Progress Publisher.

৩. Kautsky, K. 1987. *The Agararin question*. vol. 1. Pluto Press, 1987 from রতন খাসনবিশ. 1986. আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি. পিবিএস (মার্চ ১৯৮৬)।

৪. Lenin, V. I. 1977. "New Data on the Laws Governing the Development of Capitalism In Agriculture." *Collected Works.* vol 22, Moscow: Progress Publishers.

৫. Sen, A. K. 1964. "Size of Holding and Productivity." *Economic Weekly.*

৬. Mazumdar, D. 1965. "Size of Farm and Productivity: A Problem of Indian Peasant Agriculture." *Economica.*

৭. Rudra, A. 1968. "Farm Size and Yield Per Acre." *Economic and Political weekly.* Special Issue, July, 1968.

৮. Saini, G. R. 1971. "Holding Size, Productivity and Some Related Aspects of Indian Agriculture." *Economic and Political Weekly.* vol. 6. 26th June 1971.

৯. Bharadwaj, K. (1974). "Notes on Farm Size and Productivity." *EPW.* (30th March) and Rao, A. P. 1967. "Size of Holding and Productivity." *EPW.* vol 2, (11th November).

১০. Rao, A. P. 1967. "Size of Holding and Productivity." *Economic and Political Weekly.*

১১. Roy, D. 2012. *Some Aspects of Indian Agriculture under New Agricultural Policy Regime: A Case Study of some District of West Bengal.*

১২. অপরাজিতা মুখার্জি, রতন খাসনবিশ, প্রবীর সিংহরায়. ২০০৭. "অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, অশোক রুদ্র স্মরণে." পিপলস বুক সোসাইটি।

১৩. Mukherjee, A. 2015. "Evaluation of the Policy of Crop Diversification as a Strategy for Reducton of Rural Poverty in India." in Almas Heshmati, Esfandiar Maasoumi, Guanghua Wan (ed.) *Poverty Reduction Policies and Practices in Developing Asia.* Springer.

১৪. তদেব

১৫. Mishra, S. 2006. "Farmers' Suicides in Maharashtra.", *Economic and Political Weekly.* (22nd April, 2006).

১৬. Mukherjee, A. 2015. "Evaluation of the Policy of Crop Diversification as a Strategy for Reducton of Rural Poverty in India." in Almas Heshmati, Esfandiar Maasoumi, Guanghua Wan (ed.) *Poverty Reduction Policies and Practices in Developing Asia.* Springer.

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে কৃষিশ্রমের বাজার
মজুরি শ্রমিক ও পারিবারিক শ্রমিক

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের একটি প্রধান লক্ষণ হল মজুরির বিনিময়ে শ্রমের বাজার থেকে কেনা কৃষি-শ্রমিকের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল উৎপাদন। মালিক তার পূর্ব-সঞ্চিত আর্থিক পুঁজি দিয়ে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে দৈনিক নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য শ্রমিকের শ্রম কেনে। পুঁজিবাদী উৎপাদন যতই প্রসারিত হয় ততই মালিকের হাতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পুঁজির আকারে জমা হয় ও কৃষিতে শ্রমনির্ভর উৎপাদন ততই প্রসারিত হয়। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায়, রাশিয়ার কৃষিতে ক্ষুদ্র জোতে নিবিড় চাষের মাধ্যমে, অধিক পরিমাণে স্থির পুঁজির প্রয়োগ ঘটিয়ে ও মজুরি-শ্রমিক নির্ভর আধুনিক চাষপদ্ধতির সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন ছোট জোতে অধিক পরিমাণ স্থির পুঁজির প্রয়োগ করে মজুরি-শ্রমিক নির্ভর নিবিড় চাষ ও অধিক পরিমাণ মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে চাষকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বড় লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্রে এখনও বিভিন্ন ধরনের প্রাক্‌পুঁজিবাদী ধরনের প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল থেকে ঋণের বাজার, জমি ও অন্যান্য উপকরণের বাজার ও শ্রমের বাজারের স্বাধীন কার্যকারিতার পথ বন্ধ করে রাখে। ভারতে কৃষি-শ্রমের বাজার তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান। এটি শ্রমের জোগান নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কাজ করে। সেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় ভারতের কৃষি অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিসেবিত। অনেক স্থানেই বছরের একটা সময়ে চাষবাস বন্ধ থাকে, ফলে ঠিকা শ্রমিকের সামনে কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে সীমিত। তাকে তার নিয়োগকারী বড় চাষির ওপর ঋণের জন্য নির্ভর করতে হয়। বড় চাষি তাকে ব্যস্ত মরশুমের বর্ধিত মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে শ্রমের জোগান সুনিশ্চিত করার শর্তে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ঋণের বাজারের সঙ্গে শ্রমের বাজার যুক্ত হয়ে নিয়োগ ক্ষেত্রে শ্রমের স্বাধীন চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যস্ত মরশুমে শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরি অস্বাভাবিক বাড়ে। শ্রমের বাজারের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

ভারতীয় কৃষিতে স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করার ব্যবস্থা কতটা প্রসারিত হয়েছে, কতটা মজুরি-শ্রমনির্ভর উৎপাদন প্রসারিত হচ্ছে, এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে মজুরি-শ্রমিক নিয়োগের প্রকৃত অবস্থা ধারণায় আনা সম্পূর্ণত সম্ভব নয়। তার কারণ হল, চাষে নিযুক্ত

শ্রম সংক্রান্ত তথ্যে স্বাধীন শ্রমিক ও ঋণবন্ধকি শ্রমিকের মধ্যে কোনও প্রভেদ করা যায় না। ফলে কৃষিতে স্বাধীন শ্রমের বাজারের অবস্থাটাও পরিষ্কার হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত ভারতীয় কৃষিতে মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে চাষের সম্ভাব্যতা কতটা সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

গোটা ভারতে মোট কৃষকের সংখ্যার তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, নিজ জমিতে চাষ করা প্রান্তিক চাষির সংখ্যা এতই বেশি যে জোত-পিছু শ্রমিকের গড় সংখ্যা বাড়তে পারে না। শ্রমিক নিয়োগের তথ্যগুলো অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বড় জোতগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সারণি ৫.১ মোট নিযুক্ত ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়ন)

	১৯৯৯–০০	২০০৪–০৫	২০০৫–০৬	২০০৯–১০	২০১১–১২
মোট কর্মরত	৩৯৭	৪৫৭	৪৫৩	৪৬০	৪৬৭
কৃষিতে কর্মরত	২৩৮	২৫৯	২৬৩	২৪৫	২২৮
	(৫৯.৯%)	(৫৬.৭%)	(৫৮.০%)	(৫৩.৩ %)	(৪৯.০%)

Source: NSSO (61st & 68th Round) {FICCI Research Report}

কিন্তু এই তথ্য থেকে কৃষিতে নিযুক্ত মজুরি-শ্রমিক সম্পর্কে কোনও ধারণা করা যায় না। এ থেকে শুধু বোঝা যায় যে, কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা এবং সেইসঙ্গে মোট কর্মরত মানুষ ও কৃষিতে কর্মরত মানুষের অনুপাত ক্রমশ কমেছে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রমদায়ী মানুষের সংখ্যার মধ্যে মজুরি-শ্রমিক, পারিবারিক শ্রমিক, ঋণ-বন্ধকি শ্রমিক, চাষি পরিবার ইত্যাদি নানা প্রকার শ্রমদায়ী মানুষের সংখ্যা ঢুকে আছে। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক বলতে যা বুঝি সেই বিশেষ ধরনটির পরিমাণ বা অনুপাত সম্বন্ধে এখান থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা শক্ত। নীচে কৃষি-শুমারি বিভাগের ‘একনজরে কৃষি পরিসংখ্যান ২০১৬’ থেকে আমরা কৃষিতে কর্মরত মানুষের মধ্যে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক এই দু’টি বিশেষ অংশের ওপর তথ্য পাই

সারণি ৫.২ কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা (মিলিয়ন), মোট কর্মরত মানুষের মধ্যে কৃষিতে কর্মরত মানুষের অনুপাত (শতকরা), কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক (মিলিয়ন) ও কৃষিতে কর্মরত মানুষের মধ্যে এদের অনুপাত (শতকরা)

সাল	কৃষক (মিলিয়ন)*	কৃষি-শ্রমিক (মিলিয়ন)*	কৃষিতে মোট কর্মরত মানুষ (মিলিয়ন)**
১৯৫১	৬৯.৯ (৭১.৯%)	২৭.৩ (২৮.১%)	৯৭.২ (৬৯.৭%)
১৯৬১	৯৯.৬ (৭৬.০%)	৩১.৫ (২৪.০%)	১৩১.১ (৬৯.৫%)
১৯৭১	৭৮.২ (৬২.২%)	৪৭.৫ (৩৭.৮%)	১২৫.৭ (৬৯.৭%)
১৯৮১	৯২.৫ (৬২.৫%)	৫৫.৫ (৩৭.৫%)	১৪৮.০ (৬০.৫%)
১৯৯১	১১০.৭ (৫৯.৭%)	৭৪.৬ (৪০.৩%)	১৮৫.৩ (৫৯.০%)
২০০১	১২৭.৩ (৫৪.৪%)	১০৬.৮ (৪৫.৬%)	২৩৪.১ (৫৮.২%)
২০১১	১১৮.৮ (৪৫.১%)	১৪৪.৩ (৫৪.৯%)	২৬৩.১ (৫৪.৬%)

*বন্ধনীর মধ্যে মোট কৃষিতে কর্মরত মানুষের মধ্যে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের অনুপাত (শতকরা)

**বন্ধনীর মধ্যে মোট কর্মরত মানুষের মধ্যে কৃষিতে কর্মরত মানুষের অনুপাত (শতকরা)

উপরের ৫.১ ও ৫.২ সারণি দু'টির তুলনা করলে আমরা দেখি, ২০১১–১২ সালে কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা যেখানে ২২৮ মিলিয়ন, সেখানে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ১৪৪.৩ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকে যেটি অনুমান করা যায় তা হল, ২০১১–১২ সালে কৃষিতে ৮৩.৭ মিলিয়ন কৃষক পারিবারিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। আবার ১৯৯৯–২০০০ সালে কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৩৮ মিলিয়ন। এর সঙ্গে ২০০১ সালের কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যাটি তুলনা করা যেতে পারে– সংখ্যাটি ১০৬.৮ মিলিয়ন। সুতরাং এই সময়ে, অনুমান করা যেতে পারে, পারিবারিক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩২ মিলিয়নের কাছাকাছি। অর্থাৎ সেই সময়ে সারা ভারতে পারিবারিক কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কৃষি-শ্রমিকের চেয়ে বেশি। ১৯৯৯–২০০০ সাল থেকে ২০১১–১২ সাল এই দশ বছরে পারিবারিক শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৩২ মিলিয়ন থেকে ৮৩.৭ মিলিয়নে।

ওপরের সারণি ৫.২ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সাল অবধি কৃষকের সংখ্যা কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যার থেকে বেশি ছিল। ২০১১ সালে প্রথম কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা কৃষকের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সালেও কৃষকের সংখ্যা কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যার ১.১৯ গুণে দাঁড়ায়। কৃষকের সংখ্যার তুলনায় কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যার অপ্রতুলতা থেকে চাষ শ্রমিকনির্ভর হয়ে উঠেছে এই কথা বলা যাচ্ছে না। ২০১১ সালে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা প্রথম কৃষকের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেলেও কৃষকের সংখ্যার তুলনায় কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়েনি। ওই সময় কৃষি-জোতের প্রতিটির জন্য শ্রমিকসংখ্যা ছিল গড়ে ১.২১। ২০১১তে কৃষিজোতের গড় মাপ ছিল ১.১৫ হেক্টর। সেই হিসেবে প্রতি ১.১৫ হেক্টর জমির জন্য গড়ে ১.২১ জন শ্রমিক নিযুক্ত হতে পারত, বা প্রতি একর জমি চাষের জন্য শ্রমিক সংখ্যা ছিল গড়ে মাত্র ০.৩৫। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক ও ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক চাষি পারিবারিক শ্রমনির্ভর চাষব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে, এই চাষিরা অতি ব্যস্ত মরশুমে, অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে, সামান্য পরিমাণে মজুরি-শ্রমিকের শ্রমের ওপর নির্ভর করে থাকে। এই

প্রান্তিক চাষিরা তাদের নিজ জমি চাষ থেকে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে না। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তারা উপরন্তু অন্য জমিতে আংশিক কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। আবার কিছু কৃষি শ্রমিকের যৎকিঞ্চিৎ জমি থাকতে পারে, এই জমি মূলত পরিবারের অন্য সদস্যদের শ্রমে চাষ হয়। আমরা জাতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে ২০১২–১৩ কৃষি-বৎসরে কৃষিতে যে-উৎপাদন ব্যয় হয়েছে তার হিসাব পাই। নীচের সারণিতে রয়েছে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মধ্যে শ্রমিকের ওপর ব্যয়ের হিসাব।

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১ হেক্টরের নীচে পর্যন্ত প্রান্তিক ও অতি-প্রান্তিক চাষিরাও মজুরি শ্রমিক নিয়োগ করেছে। চাষিদের অবস্থার ওপর জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র চাষিরা পশুপালন, অথবা অন্য অ-কৃষি ব্যবসা বা ছোট উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময় চাষবাস ভিন্ন অন্য কাজই এদের আয়ের মূল উৎস। এরা এইসব কাজে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। এদের শ্রমিকের ওপর ব্যয় কৃষি-ভিন্ন অন্য কাজে ব্যয়ের একটি অংশ। যাদের জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের ওপর থেকে ২ হেক্টরের নীচে এবং ২ হেক্টরের ওপর থেকে ৪ হেক্টরের নীচে— এমন ছোট ও আধা-মাঝারি চাষিরা ব্যস্ত মরশুমে যথেষ্ট সংখ্যক ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। সারা বছরই এরা স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে। এই স্থায়ী শ্রমিকরা বছরের যে-সময়ে কৃষিকাজের চাপ কম থাকে তখন কৃষি-ভিন্ন অন্যান্য বাড়ির কাজও করে। কৃষি-শ্রমিক বলতে এই স্থায়ী শ্রমিকদেরও বোঝায়। বড় চাষিরা কৃষি-শ্রমিকের ওপর সম্পূর্ণত নির্ভরশীল বলেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু কৃষিতে যন্ত্রনিবেশের ফলে শ্রমের নিয়োগ নিশ্চয়ই কিছুটা হ্রাস পেয়ে থাকবে। যন্ত্রের ওপর খরচ যথেষ্ট বেশি হওয়ার কারণে মোট উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে শ্রমিকের ওপর ব্যয়ের অনুপাত অপেক্ষাকৃত ছোট চাষিদের তুলনায় কম। এই একই কারণে পঞ্জাবের কৃষিতে শ্রমের ওপর খরচের অনুপাত অন্যান্য সব রাজ্য থেকে কম।

সারণি ৫.৩ শ্রমের খরচ ২০১২–১৩ কৃষিবর্ষ

জোতের মাপ (হেক্টর)	মোট খরচে শ্রমের খরচের অনুপাত (%)	বিভিন্ন প্রদেশ	মোট কৃষি উৎপাদনের খরচে শ্রমের খরচের অনুপাত (%)
<.০১,	২২%	অন্ধ্রপ্রদেশ	২৫%
.০১< .৪০	১৮%	বিহার	২১%
.৪১< ১.০০	২১%	গুজরাত	২০%
১.০১<২.০০	২২%	কর্ণাটক	২৭%
২.০০ <৪.০০	২২%	কেরালা	৪৭%
৪.০০<১০.০০	২০%	মধ্যপ্রদেশ	১৩%
১০.০০+	২০%	মহারাষ্ট্র	১৯%
		ওড়িশা	৩০%
		পঞ্জাব	১৩%
		রাজস্থান	১৫%
		তামিলনাড়ু	২৮%
		উত্তরপ্রদেশ	১৫%
		পশ্চিমবঙ্গ	৩৫%
		ভারত	২১%

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Household in India (NSSO 70^{th} Round)

পঞ্জাব ভারতে কৃষি উৎপাদনের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাজ্য। এখানে সবচেয়ে বেশি আধুনিকীকরণ হয়েছে এবং পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়েছে। এই রাজ্যের কৃষিতে মজুরি শ্রমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য থেকে আমরা ভারতের গড়পড়তা কৃষি উন্নয়ন হয়েছে যেসব অঞ্চলে, সেখানকার মজুরি-শ্রমিক নিয়োগের কিছুটা আন্দাজ পেতে পারি। ১৯৮৫–৮৬ থেকে ২০০৬–০৭ সালের মধ্যে পঞ্জাবের কৃষিতে ধানের চারা পুনঃরোপণের কাজটি ছাড়া অন্য সমস্ত ধরনের কাজে যন্ত্রপ্রয়োগের মাত্রা যথেষ্ট বেড়েছে। পরিণামে কৃষিতে নিয়োগের মাত্রা কমেছে। সেই তথ্য থেকে এই সময়ে কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের নিয়োগের মাত্রা সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। পঞ্জাবে কৃষিতে যথেষ্ট যন্ত্রপ্রয়োগ সত্ত্বেও ২০০৬–০৭ সালে কী পরিমাণে পারিবারিক শ্রমিক নিযুক্ত হত সে সম্বন্ধে তথ্য পাই।

নীচের সারণি ৫.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের সবচেয়ে বড় অংশই পারিবারিক শ্রম। যদিও ’৮৫–’৮৬ সাল থেকে ২০০৬–০৭ সাল– এই ১০/১১ বছরে পঞ্জাবের কৃষিতে যন্ত্রপ্রয়োগের মাত্রা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সামগ্রিক ভাবে শ্রমনিবেশ কমেছে, ফলে পারিবারিক শ্রমের অনুপাতও

কমেছে। তবুও ২০০৬–০৭ সালেও এই অনুপাতটি যথেষ্ট বেশি – শতকরা ৩৮ ভাগ। বাকি শতকরা ১৮ ভাগ স্থায়ী শ্রমিক – এরা সবসময় মুক্ত শ্রমিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়, অনেক সময়েই এরা ঋণ-বন্ধকি শ্রমিক, যারা শ্রমের বাজারে স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারে না।

সারণি ৫.৪ পঞ্জাবের কৃষিতে গম ও ধান চাষের ক্ষেত্রে সংযুক্ত শস্য কাটার যন্ত্র ব্যবহারের পরিণতিতে মনুষ্য শ্রম ব্যবহারের সংকোচন

মনুষ্য শ্রম (শ্রম-ঘণ্টা)/প্রতি হেক্টরে

শ্রমের বিভিন্ন ধরন	শ্রম-ঘণ্টা ১৯৮৫–৮৬	শতকরা অনুপাত ১৯৮৫–৮৬	শ্রম-ঘণ্টা ২০০৬–০৭	শতকরা অনুপাত ২০০৬–০৭	শ্রম-ঘণ্টার শতকরা পরিবর্তন
পারিবারিক শ্রম	৫১১ শ্রম-ঘণ্টা	৪৬.৮৮	৩১৯ শ্রম-ঘণ্টা	৩৮.০০	–৩৭.৫৭
স্থায়ী শ্রম	১৯৩ শ্রম-ঘণ্টা	১৭.৭১	১৫৩ শ্রম-ঘণ্টা	১৮.২১	–২০.৭৩
ঠিকা শ্রম	৩৮৫ শ্রম-ঘণ্টা	৩৫.৩৫	৩৬৮ শ্রম-ঘণ্টা	৪৩.৮০	–৪.৪২
মোট শ্রম	১০৮৯ শ্রম-ঘণ্টা	১০০	৮৪০ শ্রম-ঘণ্টা	১০০	–২২.৮৭

Source: Dynamics of Labour Demand and its Determinants in Punjab Agriculture; Punjab Agriculture University 2013

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৫–৮৬ সালে কৃষি-উৎপাদনে অন্যান্য সব ধরনের শ্রমের তুলনায় পারিবারিক শ্রমের অনুপাত যথেষ্ট বেশি। ২০০৬–০৭ সালে এই অনুপাত কমেছে, ও সেই তুলনায় অস্থায়ী শ্রমের মাত্রা বেড়েছে। কিন্তু তবুও, যন্ত্রীকরণের মাত্রা যথেষ্ট বাড়া সত্ত্বেও, পারিবারিক শ্রমের তুলনামূলক অনুপাত ২০০৬–০৭ সালেও যথেষ্ট বেশি ছিল।

কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থার নিরিখে ভারতের সবথেকে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হল পঞ্জাব। ২০০৬–০৭ সালে যন্ত্রায়ণের মাত্রা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং পঞ্জাবে জোতের গড় আয়তন সারাদেশের গড় আয়তনের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যে-পরিমাণে পারিবারিক শ্রমের উপস্থিতি ছিল তা থেকে অনুমান করা যায়, এদেশের তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে যেখানে যন্ত্রীকরণের মাত্রা কম, এবং কৃষি-জোতের গড় মাপ সারা দেশের তুলনায় কম, সেখানে পারিবারিক শ্রমের উপস্থিতি আরও বেশি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠনের ১৯৮৩–'৮৪, ১৯৯৩–'৯৪, ১৯৯৯–২০০০ এবং ২০০৪–'০৫-এর নিয়োগ সংক্রান্ত নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায়, এই সময়কালে সারা ভারতে কৃষিতে নিয়োগের অনুপাত শতকরা ৬৩ ভাগ থেকে কমে শতকরা ৫৪ ভাগে এসে দঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২১ বছরের দীর্ঘ সময়ের তুলনায় শতকরা মাত্র ১০ ভাগ নিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের পরিমাণ ও হ্রাসের গতিবেগ চিন ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় যথেষ্টই কম। এই তথ্যসূত্র থেকে আরও দেখা যায়, এই মাপ অনুযায়ী ভারতে সমস্ত কর্মক্ষম শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা

১৪ ভাগ 'নিয়মিত নিযুক্ত' হিসাবে কর্মে নিয়োজিত, এবং অর্ধেক কর্মক্ষম মানুষ (শতকরা ৫৩ ভাগ) স্বনিযুক্ত। এর মধ্যে স্বনিযুক্ত মানুষদের বড় অংশ কৃষিতে নিযুক্ত। অর্থাৎ ভারতীয় কৃষির মজুরি-শ্রমিক নির্ভরতার বিষয়টি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পারিবারিক শ্রম কৃষি উৎপাদনের একটি বহুমাত্রিক উপাদান, এই অর্থে যে, কোনও পারিবারিক শ্রম পুরোপুরি নিজ জমিতে স্বনিযুক্ত শ্রম, আবার কোনও পারিবারিক শ্রমের জোগানদার অন্যের জমিতে মজুরি শ্রমিক, আবার পারিবারিক জমিতেও তারা চাষের যে-কোনও ধরনের কাজে অংশ নেয় না। পারিবারিক শ্রমিক বাইরের জমিতে বা অন্য কোনও কাজে মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে কি না, অথবা সে চাষের কোন কাজে অংশ নেবে বা কোন কাজে অংশ নেবে না তা সাধারণত জাতপাত, ধর্ম, চিরাচরিত প্রথা বা সামাজিক আচরণবিধির ওপর নির্ভর করে। চাষের বিভিন্ন কাজে নারীশ্রমের অংশগ্রহণ যতটা না বাজার দ্বারা প্রভাবিত, তার থেকেও বেশি প্রভাবিত জাতপাত ও সামাজিক আচরণবিধি ইত্যাদি বাজার-বহির্ভূত উপাদানের দ্বারা। পারিবারিক শ্রমিকের জোগান ও চাহিদা মজুরি শ্রমিকের জোগান ও চাহিদার মতো মজুরির ওঠানামার সঙ্গে বাড়ে কমে না। মজুরি শ্রমিকের নিয়োগ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও মজুরির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু পারিবারিক শ্রমের নিয়োগ বিষয়ে প্রান্তিক উৎপাদন ও মজুরির তফাতের কোনও প্রভাব নেই। এর কারণ পারিবারিক শ্রমিক বাজার-চলতি মজুরির হারকে তার মজুরির পরিবর্ত ব্যয় হিসেবে মনে করে না। বর্তমান কাজটি না করলে তাকে ওই সময়ের জন্য বিনা কাজেই থাকতে হত। এর একাধিক কারণের মধ্যে প্রধান হল: ক) বাজারে পরিবর্ত কাজের অভাব, খ) অর্থনীতির নিয়ম-বহির্ভূত নানা বিষয়ের ওপর মজুরির হারের নির্ভরশীলতা, গ) সনাতন সামাজিক বাধানিষেধ, জাতপাত ইত্যাদি নানা বিবেচনায় ঘরের বাইরে পারিবারিক শ্রমিকের কাজ নেওয়ার অপারগতা। এইসব নানা কারণে পারিবারিক শ্রমিক ও মজুরি শ্রমিকের জোগান ও চাহিদা সংক্রান্ত রেখা এক হয় না। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও পারিবারিক শ্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উৎপাদন-সম্পর্কের অধীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদন ক্রিয়া সাধারণত মজুরি শ্রমিকের শ্রমেই চলে। এই শ্রম জোগান-চাহিদার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বাজার-নির্ধারিত মজুরিতে কেনা-বেচা করা হয়। বাজারে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরি ন্যূনতম জীবিকানির্বাহের স্তরে থাকে এবং এই স্তরের মজুরিতে মালিক উৎপাদনের উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শ্রমশক্তি ক্রয় করে যে-উৎপাদন কাজ চালায় সেই প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত উৎপাদনের মোট মূল্য হল শ্রমিকের পূর্ণ শ্রমশক্তি ব্যয়ের অবদান। এই অবদানের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশের অর্থমূল্য শ্রমিকের কাছে মজুরির আকারে ফিরে যায়। বাকি অংশ উদ্বৃত্ত মূল্যের আকারে মালিকের হাতে থাকে, যা সে আবার উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করে এবং আবার শ্রমিকের শ্রমশক্তির মোট অবদানের বড় অংশের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখার সুযোগ পায়। প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের আওতায় উদ্বৃত্ত মূল্য সর্বাধিক শোষণ করার এই প্রক্রিয়াটি চালু হয় না। প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের নানা রূপ থাকতে পারে। প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের একটি বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে; এমনকী পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের সরল পুনরুৎপাদন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি আংশিক ভাবে অর্জিত হলেও বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির প্রাধান্য থাকতে পারে। এর অর্থ, এই স্তরে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির প্রাধান্যের কারণে উদ্বৃত্তকে ক্রমাগত উৎপাদন ক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রমশক্তির অবদানের

ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করার যে-প্রক্রিয়াটি থাকতে পারত, তা অনুপস্থিত। ফলে মুনাফাকে সর্বাধিক করার উপায় সীমিত হয়, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার গতিময়তা থাকে অনুপস্থিত এবং উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলির প্রসারের পথও হয়ে পড়ে সীমিত। উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি পুঁজির শক্তিতে সমৃদ্ধ হতে পারে না, বাণিজ্যিক পুঁজি মহাজনি পুঁজির দাপটের নীচে খর্ব হয়। পুঁজিবাদী েস সম্পর্কের চলমানতার বৈশিষ্ট্য হল, ক্রমাগত মুনাফার সর্ববৃহৎ অংশ পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রমশক্তির মোট অবদানের একটি বড় অংশের ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করা। সেই চলমানতা প্রাক্‌পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে অনুপস্থিত। পুঁজির একটি বড় অংশ উৎপাদনে বিনিয়োজিত না হয়ে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির আকারে অনুৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকে। অপর পক্ষে মুনাফাকে সর্বাধিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার এবং ক্রমাগত পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রমশক্তির অবদানের ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়াই পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তিম লক্ষ্য। মজুরি শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়েই একমাত্র এই লক্ষ্যটি পূরণ করা যায়। ভারতের কৃষি কী পরিমাণে মজুরি শ্রমিক-নির্ভর হয়ে উঠেছে তা বুঝতে হলে ভারতীয় কৃষি উৎপাদনে কতটা মজুরি শ্রমিকের অবদান আছে সেটি একটি জরুরি তথ্য হয়ে দেখা দেয়। ভারতীয় কৃষিতে যত বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের অবদান রয়েছে তার মধ্যে পারিবারিক শ্রমিকের অবদান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কারণ উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট শ্রমের মধ্যে পারিবারিক শ্রমের অবদান প্রান্তিক স্তরের থেকে অতিরিক্ত হয়ে পড়লে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের সর্বাধিক সঞ্চয়ের পথ ব্যাহত হয়। নীচের সারণিগুলি ভারতীয় কৃষিতে পারিবারিক শ্রম ব্যবহারের অনুপাতের ওপর আলোকপাত করবে:

সারণি ৫.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি হেক্টর জমিতে ব্যবহৃত মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার শতকরা ভাগ কেরল রাজ্যে সবচেয়ে কম, যদিও কেরালায় সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা অত্যল্প, হাজারে ৫টির কম। এর পরই গুজরাতের স্থান। গুজরাত রাজ্যে মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার অনুপাত শতকরা ২২.৯০ ভাগ। গুজরাত রাজ্যে সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা হাজারে ১০টির কম। যে-রাজ্যগুলিতে মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার অনুপাত শতকরা ৩০-এর বেশি, ৪০-এর কম, সেই রাজ্যগুলি হল মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কর্ণাটকে বৃহৎ জোতের সংখ্যা মোট জোতের প্রতিহাজারে ১০টির নীচে; মহারাষ্ট্রে ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৫টিরও নীচে। যে-রাজ্যগুলিতে মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার অনুপাত শতকরা ৪০-এর বেশি, ৫০-এর কম, সেগুলি হল বিহার, পঞ্জাব ও হরিয়ানা। এদের মধ্যে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় মোট জোতে সর্ববৃহৎ জোতের ভাগ হাজারে ২০ বা তার বেশি। অর্থাৎ এই দু'টি রাজ্যেই সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা অন্য সব রাজ্যের থেকে বেশি, অথচ বিহারে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত হাজারে মাত্র ৫-এর নীচে। অর্থাৎ যেসব রাজ্যে মোট জোতে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত সবচেয়ে কম তাদের মধ্যে বিহার একটি হলেও বিহারে মোট ব্যবহৃত শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রমের অনুপাত পঞ্জাব হরিয়ানার মতো সর্ববৃহৎ জোত অধ্যুষিত রাজ্যের মতোই, শতকরা ৪০-এর বেশি, ৫০-এর নীচে। যেসব রাজ্যে মোট ব্যবহৃত শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার অনুপাত ৫০-এর বেশি এবং ৭০-এর কম তাদের মধ্যে বেশির ভাগ রাজ্যেই বড় জোতের শতকরা অনুপাত সবচেয়ে নীচে, অর্থাৎ হাজারে ৫-এর কম। এরা হল ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রমের অনুপাত শতকরা ৫০-এর বেশি, ৭০-এর কম এমন আরও দু'টি রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে মোট জোতে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত হাজারে ৫-এর বেশি ও

১০-এর কম। মোট ব্যবহৃত শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রমের অনুপাত যথেষ্ট বেশি— শতকরা ৭০-এর বেশি ও ৯০-এর কম এমন মাত্র দু'টি রাজ্য রয়েছে, এগুলি হল অসম ও মধ্যপ্রদেশ। কিন্তু অসমে যেখানে মোট জোতের মধ্যে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত হাজারে ৫ বা তার নীচে, সেখানে মধ্যপ্রদেশে মোট জোতে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত ১০-এর বেশি এবং ১৫-র নীচে। সবথেকে বেশি পারিবারিক শ্রম ব্যবহৃত হয় যে-রাজ্যটিতে সেটি হল হিমাচল প্রদেশ, এখানে মোট ব্যবহৃত শ্রমে পারিবারিক শ্রমের অনুপাত শতকরা ৯৩.৭০ ভাগ। এই রাজ্যে মোট জোতের মধ্যে সর্ববৃহৎ জোতের অনুপাত হাজারে ৫-এর কম। মোট ব্যবহৃত শ্রমে পারিবারিক শ্রমের অনুপাত সবথেকে কম কেরালায়, শতকরা মাত্র ১৩.৮২ ভাগ। এখানে সর্ববৃহৎ জোতের উপস্থিতি হিমাচল প্রদেশের মতোই, হাজারে মাত্র ৫টি বা তার থেকে কম।

সারণি ৫.৫ মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার শতকরা ভাগ [শস্য: ধান]

প্রতি হাজার জোতে সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা	রাজ্য	২০০৪–০৫	২০০৬–০৭	২০০৮–০৯	২০১০–১১	২০১২–১৩	২০১৪–১৫	২০১৫–১৬
০ ≤৫	অন্ধ্রপ্রদেশ	৩২.৩২	২৯.৩৭	২৮.৪৫	২৯.২৮	২৭.১৩	৩৭.৬৫	৩৮.৭৫
	অসম	৭১.৭১	৭৬.১৮	৬৬.৯৮	৬৮.৮৯	৭৪.৮১	৭৬.৫৩	৭৬.৯৫
	বিহার	৩৭.০	৩২.৮৯	৩৬.৪৫	৪১.৭২	৩৮.৩৪	৪৩.৪৪	৪২.৪৪
	হিমাচল প্রদেশ	–	৯৪.৫৭	৯৪.৫২	৯৪.৯১	৯৩.৫৫	৯২.২৮	৯৩.৭০
	কেরল	১৩.১০	১৭.৫৬	১৪.২২	১৩.২৭	৯.৫১	১১.২১	১৩.৮২
	মহারাষ্ট্র	–	৩৪.০১	৩২.১৫	২৯.১৮	৩৯.৫১	৩৯.৬৮	৩৩.২০
	ওড়িশা	৪৯.১১	৪৮.৪০	৪৪.২৭	৪৫.৩৩	৫৬.৩৮	৫৯.৬১	৫৯.৭৮
	তামিলনাড়ু	৩১.৪০	৩১.৮০	৩০.১৪	৩৩.১০	৩৫.৬৮	৩৭.৪৮	৩৪.৪৪
	উত্তরপ্রদেশ	৫৫.৩৩	৫৪.২৩	৫৩.১৩	৫৫.০৫	৬০.৮৪	৫৫.২৫	৫৬.৮৮
	পশ্চিমবঙ্গ	৫৫.৩৪	৫১.৫৯	৪৭.৯৩	৫০.৩৯	৪৯.৬০	৪৯.৭১	৫০.৩৪
৫ থেকে <১০	ছত্তীসগঢ়	৬১.১০	৫৭.০৭	৫৭.৪৫	৫৯.৮২	৬৮.৮৮	৫৫.০০	৫৭.১৭
	গুজরাত	–	২৩.৬৩	২৮.২৩	২২.২০	৩০.২৬	২৫.৪৫	২২.৯০
	ঝাড়খণ্ড	৫৯.০১	৪৪.১০	৪২.১৩	৩৮.৬০	৪৪.১০	৫০.৬০	৫১.৬৬
	কর্ণাটক	২৯.৫১	৩১.৪৮	৩৮.১৪	৩৬.৭৮	২৯.৯১	৪২.২৯	৩২.১৬
১০ থেকে <১৫*	মধ্যপ্রদেশ	৬২.৯১	৬২.০০	৫২.০৪	৪৭.৩২	৬৪.৮৮	৬৭.১৭	৭৩.৩৫
২০ বা ২০-র বেশি	পঞ্জাব	৪১.৯৫	৩৮.৮৬	৩১.৩৪	৩০.৫৪	৩৯.০৬	৩৯.৬৫	৪১.৫৮
	হরিয়ানা	৪২.৯২	৪২.৪৬	৩৫.৩৪	৩৬.৬৬	৪৪.৭২	৪৫.১৬	৪৯.০৬

Source: Directorate of Economics and Statistics, GOI DAC&FE Website

*এমন কোনও রাজ্য নেই যেখানে মোট জোতের প্রতি হাজারে সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা ১৫ থেকে <২০-এর মধ্যে

দেখা যাচ্ছে, বড় জোতের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব রাজ্যেই ধান চাষে পারিবারিক শ্রমের ব্যবহার যথেষ্ট। পঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো এগিয়ে থাকা রাজ্যে যেখানে কৃষিতে আধুনিক উন্নত ধরনের সার, বীজ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথেষ্ট বেশি, সেখানেও মজুরি-শ্রম নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। কারণ শতকরা ৪০ ভাগ বা তারও বেশি পারিবারিক শ্রমের ব্যবহার। সেই সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত স্থায়ী শ্রমিকের ব্যবহারও পঞ্জাবের কৃষিতে মুক্ত মজুরি-শ্রমিকের ব্যবহার যথেষ্ট কমিয়ে রেখেছে। শুধু পঞ্জাবে নয়, সব রাজ্যেই ধান গম আলু তুলা সব ধরনের চাষে পারিবারিক শ্রমের বিপুল ব্যবহার মুক্ত মজুরি-শ্রমিকের চাহিদা কমিয়ে রাখে, তার প্রভাব অবশ্যই কৃষি-শ্রমিকের মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে, কৃষি-মজুরির নিম্ন হার

শ্রমের প্রকৃত চাহিদাকে প্রতিফলিত করে না। গম চাষের ক্ষেত্রেও যেসব রাজ্যে বড় জোতের সংখ্যা বেশি, এমনকী সেই সব রাজ্যেও পারিবারিক শ্রমের প্রাধান্য। পঞ্জাবের ক্ষেত্রে ২০১৫–১৬ সালে পারিবারিক শ্রমের অনুপাত শতকরা ৫৮.৮৬ ভাগ।

অন্যদিকে মজুরি-শ্রমিকের মধ্যেও নানা ধরন আছে। মজুরি-শ্রমিক নিয়োগের চুক্তিতে বিভিন্ন শর্ত থাকে: কাজের স্থায়িত্ব (দিন, মাস, বছর) অনুযায়ী স্থায়ী শ্রমিক বা অস্থায়ী শ্রমিক; এদের মধ্যে মজুরির ধরন অনুযায়ী পার্থক্য (যেমন, কাজের ধরন-বিশেষে একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য কাজের ওপর মজুরি), বিভিন্ন ধরনের কাজে কাজের সময় (ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর) অনুযায়ী মজুরি, দ্রব্যের মাধ্যমে মজুরি (যেমন খাদ্যের বিনিময়ে কাজ অথবা ধান-চালের বিনিময়ে কাজ); অথবা টাকার অঙ্কে মজুরি। আবার নিয়োগকর্তার সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্কের তফাত থাকতে পারে। যেমন নিয়োগকর্তার ওপর তার নির্ভরতা থেকে জন্ম নেওয়া কর্তৃত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, যার ফলে অন্য নিয়োগকর্তার কাছে কাজ করার স্বাধীনতা না থাকা। উল্টো দিকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনও হতে পারে, সেক্ষেত্রে বাজার-নির্ধারিত মজুরির শর্তে তার নিযুক্তি ঘটবে; এরকম বিভিন্ন শর্তেই শ্রমিক নিয়োগ হতে পারে। শ্রমিকের নিয়োগের নানা প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার গুরুত্বের তফাতটি উল্লেখযোগ্য। টাকার অঙ্কে মজুরি— যে-মজুরি নির্ধারিত হচ্ছে বাজারে শ্রমিকের জোগান ও চাহিদার টানাপোড়েনের মাধ্যমে, সেই মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক মালিকের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও অধীনতার সম্পর্কের কোনও গুরুত্ব থাকে না। বাজার নামক একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানই এখানে মজুরির হার ও শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলি স্থির করে দেয়। পুঁজিবাদী কৃষিতে বাজারের সর্বব্যাপক প্রাধান্য; মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিকের দক্ষতা ও শ্রম-সময় ভিন্ন অন্য কোনও মানদণ্ড কার্যকর নয়। এখানে শ্রমিকের শ্রমশক্তি বাজারে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। ভারতীয় কৃষিতে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক মালিকের মধ্যেকার বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া ও পূর্বনির্ধারিত কর্তৃত্ব ও অধীনতার সম্পর্কের প্রভাব থাকে। শ্রমশক্তি এখানে একটি সমসত্ত্ব বাজারে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে শ্রমিকের অধিকারে থাকে না, যা সে শ্রমের বাজারে শুধুমাত্র বাজার-নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারে।

সারণি ৫.৬ মোট শ্রম-ঘণ্টায় পারিবারিক শ্রম-ঘণ্টার শতকরা ভাগ [শস্য: গম]

প্রতি হাজার জোতে সর্ববৃহৎ জোতের সংখ্যা	রাজ্য	২০০৪–০৫	২০০৬–০৭	২০০৮–০৯	২০১০–১১	২০১২–১৩	২০১৪–১৫	২০১৫–১৬
৫ বা ৫-এর কম	বিহার	৫৪.৭৮	৫৩.৮	৪৯.৫৮	৫৫.৬০	৫৩.৫০	৫৫.৯৩	৫৬.১৯
	হিমাচল প্রদেশ	৯৫.৬২	৯৬.১২	৯৫.৯৪	৯৩.৭৯	৯২.৬৩	৯৩.৮০	৯৮.৫৬
	মহারাষ্ট্র	–	–	৪৯.৪৮	৫৫.৩৮	৫০.১৭	৫৬.৯৭	৬১.৪৫
	উত্তরপ্রদেশ	৬৩.৩৫	৬৫.৩৬	৭১.৪২	৬৫.৭২	৬৬.৪৩	৬৮.১১	৬৮.০২
	পশ্চিমবঙ্গ	–	৪৯.৬৬	৫০.২৩	৬৮.৬৬	৪৫.৭৪	৩৪.৪৭	৩৪.২৪
৫ থেকে ১০	ছত্তীসগঢ়	৭১.২৩	৩৬.৭৩	৪৯.৮৩	৭৬.৫৪	৭৩.০৩	–	–
	গুজরাত	৫১.৩২	৪৮.৮৩	৫৭.০৭	৫৫.৫৯	৫০.৩৬	৫৮.৮৫	৫৮.৮৬
	ঝাড়খণ্ড	৭৪.৮৯	৫১.৩৪	৮৫.৩২	৯১.৮২	২৫.০৭	৪৯.৮৩	৫৪.৬৯
	কর্ণাটক	–	–	–	–	–	৪২.৮০	৪১.৮১
১০ থেকে ১৫	মধ্য প্রদেশ	৬৩.৬৪	৫৮.৮৯	৬৩.১১	৬৩.৬২	৭১.২২	৭০.২৮	৬৭.৪১
২০ বা ২০ এর বেশি	পঞ্জাব	৪০.৮১	৩৩.২৯	৪০.৪৩	৪০.৮৬	৫০.০২	৫২.৬৯	৫৮.৮৭
	হরিয়ানা	৭৩.৭১	৬৬.৫৪	৬০.১৬	৬৩.৩৩	৬১.০৯	৭১.৩৪	৬৩.৩৫
	রাজস্থান	৭৮.৭৩	৭৯.৬৩	৮১.০৯	৮১.১৬	৭৮.৩১	৮০.৬৫	৮১.৩০

Source: Directorate of Economics and Statistics, DAC&FW website

স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক

আমরা দেখেছি ভারতীয় কৃষি-শ্রমের বাজারের চরিত্র শিল্প-শ্রমের বাজারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে শ্রম বা শ্রমিক এমন কোনও সমসত্ত্ব পণ্য নয় যা শুধুমাত্র দক্ষতার পরিমাণ অনুযায়ী বা কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এখানে কৃষি-শ্রম একটি বহু ভাগে বিভক্ত পণ্য। আবার কৃষি-শ্রমের একটি বড় অংশ পণ্যের রূপ নেয় না, নানা কারণে ভারতীয় কৃষিতে কৃষি-শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই বাজারে স্বাধীনভাবে কেনাবেচা হয় না। যেমন, কৃষি-শ্রমের বড় অংশ পারিবারিক শ্রম, অনেক সময় শ্রমিক পারিবারিক ভাবে মালিক পরিবারের সঙ্গে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে থাকে। ফলে কৃষি-শ্রম আবদ্ধ শ্রম হিসেবে মালিক বা ঋণদাতার চাপানো শর্তাবলির অধীনে এবং বাজার-চলতি মজুরির তুলনায় কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। এইসব ক্ষেত্রে কৃষি-শ্রমের বাজারের একটা অংশ নৈর্ব্যক্তিক বাজার-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে শ্রমিক-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখে ঠিক হয়।

এছাড়া মজুরি-শ্রমিক দু’ধরনের হতে পারে, অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক ও স্থায়ী শ্রমিক। অস্থায়ী ঠিকা মজুরি-শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সরকার আইন করে নির্দিষ্ট করে দেয়। অবশ্য ব্যস্ত মরশুমে মজুরি-শ্রমের চাহিদা বাড়ার ফলে খোলাবাজারে মজুরি বাড়ে। কিন্তু বাস্তবে ভারতের মতো দেশের কৃষি-শ্রমিকের মজুরি শ্রমের মুক্ত বাজারে চাহিদা-জোগানের ওঠাপড়ার ওপর সবসময় নির্ভর করে না। ঋণ-বন্ধকি শ্রমিক ব্যস্ত সময়ের বর্ধিত মজুরি পায় না। ঋণের শর্ত অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত কম মজুরিতে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। আবার স্থায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রে মজুরির একটা অংশের মধ্যে শ্রমিকের খাওয়া-পরা-থাকার খরচ লুকানো থাকে, অপর অংশটি টাকায় দেওয়া হয়। স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়োগের অনিশ্চয়তা কম; নিয়োগের তুলনামূলক স্থায়িত্বের কারণে স্থায়ী শ্রমিকরা ঠিকা শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকতে পারে। কিন্তু এ

বিষয়ে তথ্য ও অর্থনীতিবিদদের পর্যবেক্ষণগুলি বিভিন্ন। এই শ্রমিকদের একটি অংশ ঋণ-বন্ধকি শ্রমিকও হতে পারে।

ঠিকা শ্রমিক ও স্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে কাজের ও দায়িত্বের চরিত্র ভিন্ন। ঠিকা শ্রমিকরা সাধারণত এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে যার ফল সহজেই চোখে পড়ে। এর কারণ তাদের কাজের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফসল ওঠার পরই সাধারণত তারা কতটা ভালভাবে কাজ করেছে তা বোঝা যায়। তাদের কাজের ত্রুটি বা কাজে অবহেলা তাদের কাজের সময়কালের মধ্যে না-ও ধরা পড়তে পারে। ফলে কাজে ত্রুটির জন্য তাদের কোনওভাবে শাস্তি পেতে হয় না। এই কারণে সাধারণ রুটিনমাফিক কাজই তাদের দিয়ে করানো হয়। তাই অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের আগাছা পরিষ্কার, বা ফসল কাটার মতো কাজগুলি দেওয়া হয়। অন্যদিকে স্থায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ীভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে তাদের আরও দায়িত্বের কাজগুলি করতে দেওয়া হয়। যেমন সার দেওয়া, জমিতে জলসিঞ্চন করা, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি যেসব কাজের ওপর ফসলের পরিমাণ নির্ভর করে সেগুলিই তাদের করতে দেওয়া হয়। এছাড়া স্থায়ী শ্রমিক মালিকের সঙ্গে ঠিকা শ্রমিকের নিয়োগ ও ঠিকা শ্রমিকের কাজের তদারকিতে যুক্ত থাকে।

ঠিকা শ্রমিকরাও কোনও সমসত্ত্ব বিভাজন নয়। এরা কাজ ও দায়িত্বের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋতুতে কাজের চরিত্র বিভিন্ন। ফলে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষি-শ্রমিকের মজুরিও বিভিন্ন।

মজুরিও নানা রূপ নেয়। কখনও কখনও মজুরির একটা অংশ টাকায় ও অন্য অংশ খাদ্যের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই মজুরি নির্ধারণে বাজারের চাহিদা-জোগানের প্রভাবের তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ভারতের কৃষিতে কৃষি-শ্রমিকের বাজারের ওপর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে কৃষি-শ্রমের বাজারের এইসব বৈশিষ্ট্য প্রায়শই অবহেলিত থাকে। পারিবারিক শ্রমিক ও মজুরি শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিক, এই বিভিন্ন বিভাগগুলির অন্তর্ভুক্ত শ্রমের মজুরি-হারের সঙ্গে জোগান ও চাহিদার পরিবর্তনের ধরন ভিন্ন। অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে-পদ্ধতি চালু আছে তাতে এই ভিন্নতাকে বিবেচনায় আনা হয় না। সমস্ত ধরনের শ্রমিক বা শ্রমকে একই বাজারি পণ্য হিসাবে ধরা হয়। প্রথমত, শ্রমের নিয়োগের সময়কালের গুরুত্ব বিবেচনায় আনা হয় না। দ্বিতীয়ত, এই বিশ্লেষণে শ্রম-ঘণ্টা ও শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয় না। অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের সেই কাজেই যুক্ত করা হয় যে-কাজগুলি সহজে দেখা যায়, কিন্তু স্থায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘ সময়ের কাজগুলি করার শর্তে নিয়োজিত হয় বলে তারা অনেক সময়ে চুক্তি অনুযায়ী কাজ না-ও করতে পারে। সনাতন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এই চুক্তি ফাঁকি দেওয়ার মতো অনৈতিক আচরণজনিত সমস্যাগুলি বিবেচনার বাইরে থেকে যায়। একজন শ্রমিক তার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে ফাঁকি দিলে শ্রমের জোগানের ওপর তার যে-প্রভাব পড়ে তা বিবেচনায় আনা হয় না। এই আলোচনায় ধরে নেওয়া হয় যে, যা-ই চুক্তি করা হোক না কেন, শ্রমিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই চুক্তি অনুযায়ী দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করবে। তৃতীয়ত কৃষি উৎপাদন ঋতুগত অনিশ্চয়তার শিকার। মজুরি ও শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক, অর্থাৎ শ্রমিকের চাহিদা-রেখা ঋতু অনুযায়ী পালটায়। কৃষি-উৎপাদনের ব্যস্ত সময়ে একই পরিমাণ

শ্রম পাওয়ার জন্য বেশি মজুরি দিতে হয়। এই কারণে ঋতু অনুযায়ী উৎপাদন ধরনের থেকে কৃষিশ্রমিকের যে চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় তাতে এবং মজুরির ওঠানামায় এই অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়ে। সনাতন তত্ত্বে এই অনিশ্চয়তার প্রভাবকে বিবেচনায় আনা হয়, কিন্তু এর কারণে যে শ্রমিকের শ্রমের জোগান প্রভাবিত হয় সনাতন আলোচনায় তাকে স্থান দেওয়া হয় না। শ্রমিক এমন একটি চুক্তি পছন্দ করতে পারে যেখানে মজুরি ঋতু অনুযায়ী বা অন্য কোনও অনিশ্চয়তার কারণে ওঠানামা করবে না, বরং সারা বছর ধরে একটি গড় মজুরির সমান মজুরি নিশ্চিত থাকবে। যে-নিয়োগকর্তা এই ধরনের মজুরি দিতে স্বীকৃত হবে শ্রমিক তার কাছেই কাজ করতে রাজি থাকতে পারে। সনাতন আলোচনা পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলি আলোচনায় আনা হয় না।

কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার ও প্রকৌশলগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশ্রমের বাজারের চরিত্রে ও বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যে মজুরির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে যেমন একদিকে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকের নিয়োগে তুলনামূলক গুরুত্বের পরিবর্তন হয়েছে ও বারে বারে একই জমিতে চাষ সম্ভব হওয়ায় শ্রমিকের মোট চাহিদা বেড়েছে, তেমনই আবার নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সাধারণ কৃষি-শ্রমিকের বিশেষ ধরনের দক্ষতা থাকা জরুরি হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ ভাবে অদক্ষ কৃষি-শ্রমিকের চাহিদা ও নিয়োগ কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে কৃষি-মজুরির ওপর। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন শস্যের তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়ের ওপর এর প্রভাব লক্ষণীয়।

ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ও কৃষিতে শ্রমের চাহিদা ঋতু ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাছাড়া চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার শ্রমিকের চাহিদা বিভিন্ন। কোনও শ্রমিক বছরের সবসময় নিযুক্ত নাও থাকতে পারে, কম সময়ের জন্য বা বেশি সময়ের জন্য নিযুক্ত থাকতে পারে। এই কারণে কৃষিতে বেকারত্ব ও শ্রমের নিযুক্তির ধারণা ও পরিমাণ মাপার পদ্ধতিটি বেশ জটিল।

কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা অনুমানের ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। কৃষি-শ্রমের বাজারে নিয়োগকর্তাই ঋণদাতা হিসেবে হাজির হলে কীভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণদান ও শ্রমের নিয়োগের যুক্ত প্রক্রিয়া একই সঙ্গে সুদ ও মজুরি নির্ধারণ করতে পারে, বিভিন্ন অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক মডেল নির্মাণ করে তা দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ

ক) স্থায়ী শ্রমিক ও অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ

মজুরি-শ্রমিকও কোনও সমসত্ব বিভাগ নয়। মজুরি-শ্রমিকের দু'টি প্রধান উপবিভাগ হল স্থায়ী শ্রমিক ও অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিক। এই দু'টি উপবিভাগের মধ্যে প্রধান তফাত হল, স্থায়ী শ্রমিকরা বাৎসরিক ভিত্তিতে নিযুক্ত হয় আর অস্থায়ী শ্রমিকরা দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। স্থায়ী শ্রমিকের মজুরির একটি বড় অংশ বছর শেষে দেওয়া হয়, আর একটি অংশ বছরের বিভিন্ন সময়ে চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া হয়। অপরপক্ষে ঠিকা শ্রমিকরা দিনের হিসেবে নিযুক্ত হয়, মজুরিও পায় দৈনিক হিসেবে। এই দুই ধরনের মজুরি শ্রমিকের মধ্যে

নিয়োগের শর্তাবলিতে একাধিক পার্থক্য থাকে। অন্যদিকে যে-কাজের সঙ্গে এই দুই প্রকার শ্রমিক দায়িত্ববদ্ধ, বড় ফারাক থাকে সেই কাজগুলির ধরনেও।

অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের মজুরি

পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের বাজারে সর্বদা চাহিদা-জোগানের ওঠানামার মধ্য দিয়ে মজুরি নির্ধারিত হয় না। ঠিকা শ্রমিকের মজুরিতে শুধুমাত্র ঋতু অনুযায়ী ও অঞ্চল অনুযায়ী পার্থক্য হয় তা নয়। একই ঋতুতে ও একই স্থানে কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মজুরির বিভিন্ন হার চালু থাকে। মজুরি হারে এই পার্থক্য ঘটার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হল, কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা ও ক্ষমতার চাহিদা।

এছাড়া কৃষি-শ্রমিকের মজুরি সর্বদা টাকার অঙ্কে দেওয়া হয় না, কখনও কখনও বিভিন্ন জিনিসপত্র, বা খাবারের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া হয়। কখনও টাকা এবং খাবার উভয়ের বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণে মজুরি দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য মজুরি দেওয়া হয়, কখনও দেওয়া হয় কাজের সময় অনুযায়ী। এর ফলে মজুরি নির্ধারণের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মগুলি প্রায়শই ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে কাজে লাগে না। কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় পুষ্টির মাপকাঠিতেও মজুরি নির্ধারণের কথা বলা হয়।

স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ

যদি অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের মজুরি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাদের জোগান ও চাহিদার কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি কীভাবে স্থির হয় সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা এই অংশে সেই প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করব। এটা ভাবা যুক্তিসঙ্গত যে, স্থায়ী শ্রমিকের কাজে যেহেতু দায়িত্ব বেশি এবং স্থায়ী শ্রমিককে অনেক বেশি সময় ধরে কাজে লিপ্ত থাকতে হয়, তাই স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। অতিরিক্ত দায় বহন করার জন্য অস্থায়ী শ্রমিকদের চেয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি কতটা বেশি হওয়া উচিত সেটি নির্ধারণ করার জন্য অনেক সময় স্থায়ী শ্রমিকদের চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার সঙ্গে অসৎভাবে ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় থাকে।[১] মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুমান করা হয়, স্থায়ী শ্রমিকরা সবসময় কিছুটা অসততার সুযোগ নিয়ে অন্য কোথাও ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সেই সময়ের জন্য ঠিকা শ্রমিকের মজুরি উপার্জন করতে পারে। তাই স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি ঠিকা শ্রমিকের মজুরির চেয়ে এতটাই বেশি হওয়া প্রয়োজন যাতে তার কাজে ফাঁকি দেওয়ার লাভ স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে অতিরিক্ত আয়ের চেয়ে বেশি না হয়। অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি এমন হতে হবে যাতে তার ভাবনা অনুযায়ী যতটা সময় সে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে যুক্ত থাকবে সেই সময়ে ঠিকা শ্রমিকের চেয়ে যে-অতিরিক্ত আয় সে পাবে, তা যেন তার কাজে ফাঁকি দিয়ে পাওয়ার মতো প্রত্যাশিত লাভ পূরণ করে দিতে পারে। কারণ তার ফাঁকি ধরা পড়ে গেলে সে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজটি হারাবে ও ঠিকা শ্রমিক হিসেবে শ্রমের বাজারে নিজেকে উপস্থিত করতে বাধ্য হবে।

সুতারাং যতটা সময় সে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে লিপ্ত থাকতে পারত বলে তার মনে হবে, সেই সময়ের অতিরিক্ত আয় যেন তার কাজে ফাঁকি না দেওয়ার জন্য সে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে বলে মনে করবে সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারে। যদি বাজারে ঠিকা শ্রমিকের মজুরি বাড়ে তাহলে তার কাজে ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাব্য লাভ একই অনুপাতে বাড়বে, সুতরাং তাকে কাজে ফাঁকি দেওয়া থেকে বিরত করতে হলে তার স্থায়ী কাজের মজুরিকেও তার ঠিকা মজুরির সমান অনুপাতে বাড়াতে হবে।

অসৎভাবে কাজে ফাঁকি দেওয়ার সমস্যাটি বাদ দিয়েও এটা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি সবসময়েই অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকের মজুরির দ্বারা প্রভাবিত হবে। আসলে স্থায়ী শ্রমিকের কাছে ঠিকা শ্রমিকের বাজার সবসময়ই একটি বিকল্প নিয়োগের সুযোগ হিসেবে বিরাজ করে। স্থায়ী শ্রমিকের কাছে ঠিকা শ্রমিকের মজুরি স্থায়ী শ্রমিকের মজুরির পরিবর্ত সুযোগের ব্যয় (অর্থাৎ ওই সময়ে কৃষি-শ্রমিক অন্য কোনও পরিবর্ত কাজে যে-মজুরি পেতে পারত। এটাকে বলে পরিবর্ত বা বিকল্প সুযোগের ব্যয়) হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু ঠিকা শ্রমের বাজারে কাজ পাওয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত। যেহেতু কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে আবহাওয়া-সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা ছাড়াও ঋতুগত ও অন্যান্য নানা ধরনের অনিশ্চয়তা জড়িত থাকে তাই ঠিকা শ্রমিকের চাহিদা বহুল পরিমাণে অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। তাই স্থায়ী শ্রমিকের কাছে ঠিকা শ্রমের বাজারে তার প্রত্যাশিত মজুরি স্থায়ী কাজ ছাড়ার সময় তার ঠিকা শ্রমের বাজারে কাজ পাওয়ার সম্ভাব্যতার ওপর নির্ভর করে। স্থায়ী শ্রমিক কাজ ছাড়ার সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকা শ্রমের বাজারে কাজ পাওয়ার সম্ভাব্যতা বিষয়ে একটা অনুমান করে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রাখলে তার পরের পর্বে এবং পরপর যতদিন সে স্থায়ী কাজে নিযুক্ত থাকতে পারত ততদিন ধরে সব কৃষি-উৎপাদন পর্বগুলিতে তার ঠিকা কাজ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা ক্রমশ কমবে। এই প্রারম্ভিক অনুমানটি সামনে রেখে আমরা স্থায়ী কাজের মজুরি নির্ধারণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি।

ধরি স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি = w_p এবং অস্থায়ী শ্রমের মজুরি = w_c

$$W_p > W_c$$

যেহেতু স্থায়ী কাজে দায়িত্ব বেশি, জটিলতা বেশি, এবং অস্থায়ী কাজের তুলনায় স্থায়ী কাজে দীর্ঘ সময় একজন শ্রমিককে যুক্ত থাকতে হয়, w_p সাধারণত w_c এর তুলনায় অনেক বেশি থাকে। কিন্তু বেশি দায়িত্ব নিতে হয় বলে ও অস্থায়ী শ্রমিকের নিয়োগে ও অস্থায়ী শ্রমের তদারকি করার দায়িত্বের জন্য অস্থায়ী শ্রমিকের তুলনায় তার মজুরি বেশি হলেও একজন স্থায়ী শ্রমিক তার মজুরির সঙ্গে অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি তুলনা করার সময় তার কাজের জটিলতার কথা মাথায় রেখে এই জটিলতা বহনের ক্ষতি হিসেবে সর্বদা তার মজুরি থেকে একটা অংশ বাদ দিয়ে হিসেব করে। আমরা ধরে নিচ্ছি স্থায়ী শ্রমিকরা স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার মূল্য হিসেবে তাদের মজুরি থেকে যে-পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে ধরে তার পরিমাণ হল:

$$\alpha\, w_p \; (0 < \alpha < 1)$$

সুতরাং তার নিট আয় হল: $w_p - \alpha\, w_p$

এখন, ধরি সে ভাবছে তার স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজটির স্থায়িত্ব N $(N \geq 1)$ সময়

সুতরাং যদি তার মোট ধরে নেওয়া আয় $N(w_p - \alpha\ w_p)$ অন্তত পক্ষে তার বিকল্প আয়ের সমান হয়, তাহলে সে তার বর্তমান কাজটি ছেড়ে যেতে চাইবে না। আমরা মনে করি, স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে সে যতদিন কাজ পেতে পারত বলে মনে করে, অর্থাৎ যে-সময় ধরে ছেদহীন ভাবে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে সে কাজ করতে পারবে বলে মনে করবে, অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে সেই সময়ের জন্যই সে ঠিকা কাজ না পেলে তার বর্তমান কাজটি ছেড়ে যেতে চাইবে না। আবার অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে যে-সময়ের জন্য ঠিকা কাজ সে চাইবে, তা যত লম্বা হবে ততই তার কাজ পাওয়ার সম্ভাব্যতা কমতে থাকবে। আমরা মনে করি তার N সময় ধরে বিকল্প অস্থায়ী কাজ পাওয়ার সম্ভাব্যতা = p^N $(p \leq 1)$ সুতরাং স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে তার কাজ ছাড়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হলে তার মজুরি W_p এমন স্তরে স্থির হওয়া প্রয়োজন যাতে করে যতটা পরিমাণ আয় সে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ ছাড়ার ক্ষতি বলে মনে করবে সেই তার মনে করা ক্ষতির পরিমাণ অন্তত পক্ষে তার অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক হিসেবে প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে কম না হয়। এর অর্থ W_p এমন স্তরে বেঁধে দিতে হবে যাতে $N\ (w_p - \alpha\ w_p) \geq P^N\ .\ NW_c$ হয়, অর্থাৎ,

বা $NWp\ (1 - \alpha) \geq N\ P^N\ .\ W_c$

বা $Wp\ (1 - \alpha) \geq P^N\ .\ W_c\ Wp \geq P^N Wc/(1 - \alpha)$

$Wp/Wc \geq P^N/(1 - \alpha)$`

তার স্থায়ী কাজের স্থায়িত্ব (N) যত বেশি বলে তার মনে হবে, স্থায়ী কাজ ছেড়ে অস্থায়ী কাজ নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ রাখার জন্য অস্থায়ী মজুরির তুলনায় তার স্থায়ী মজুরি তত কম বাড়লেও চলবে। তার স্থায়ী কাজের জটিলতা (α) যত বেশি বলে সে মনে করবে, তাকে স্থায়ী কাজ ছেড়ে অস্থায়ী কাজ নেওয়া থেকে বিরত করতে হলে অস্থায়ী মজুরির তুলনায় স্থায়ী মজুরিকে ততই বেশি হতে হবে। অস্থায়ী শ্রমের বাজারে অনিশ্চয়তা যত বেশি, অর্থাৎ অস্থায়ী কাজ পাওয়ার সম্ভাব্যতা যত কম, অস্থায়ী বাজারের মজুরির তুলনায় স্থায়ী মজুরি ততই সামান্য বেশি হলে শ্রমিককে কাজ ছাড়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে। যাই হোক স্থায়ী কাজের জটিলতা, অস্থায়ী কাজের অনিশ্চয়তা ও স্থায়ী কাজের সময় একই থাকলে অস্থায়ী কাজে মজুরি যত বেশি হবে স্থায়ী কাজের মজুরিও ততই বেশি হওয়ার প্রয়োজন হবে। স্থায়ী শ্রমিকের কাজের স্থায়িত্ব যদি খুব বেশি হয় তাহলে অস্থায়ী কাজের তুলনায় তার আয় সামান্য বেশি হলেও সে স্থায়ী কাজ ছাড়তে উৎসাহিত হবে না। কারণ, একটি স্থায়ী কাজ হারানোর ক্ষতি তার কাছে এত বেশি মনে হবে যে, মজুরির সামান্য তফাত কোনও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। স্থায়ী কাজের মজুরি যেমন অস্থায়ী বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, তেমনই, ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে বিরাট পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রমের ও বেকারত্বের উপস্থিতিতে কাজের স্থায়িত্ব একটি বড় বিষয় হিসেবে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে সামান্য মজুরির তফাতেই শ্রমিক দীর্ঘ সময় কাজে টিকে থাকে।

আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার-বহির্ভূত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া শ্রমিকের কাজে অনৈতিক ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রোধ করে। তাছাড়া কাজের চুক্তিতে বিবৃত কাজের নিয়ম-কানুন ও শর্তাবলি অনেক সময়েই ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির নিরিখে বিভিন্ন হয়। যেমন স্থায়ী শ্রমিকের কাজের শর্তে ব্যক্তিগত কাজের জন্য বিশেষ সময়ের ব্যবস্থার কথা বিবৃত থাকতে পারে: শ্রমিকের যদি একখণ্ড জমি থাকে তবে সেই শ্রমিকের কাজের শর্তে জমি চাষ করার মতো সময়ের সুযোগ দেওয়া থাকতে পারে। সেখানে মালিক-শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক তার কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়োজন কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অস্থায়ী ঠিকা শ্রমের বাজারের উপস্থিতি তার কাছে একটি পরিবর্ত কাজের সুযোগ হিসেবে থাকে, তাই স্থায়ী কাজের সঙ্গে শ্রমিককে ধরে রাখতে হলে অস্থায়ী বাজারের মজুরির সঙ্গে সবসময়েই স্থায়ী শ্রমের বাজারের মজুরির ধনাত্মক সম্পর্ক থাকা দরকার। শুধু তাই নয়, অস্থায়ী বাজারের শ্রমিকের মজুরির বাড়ার সঙ্গে স্থায়ী বাজারের মজুরি আনুপাতিক হারে বাড়ানো দরকার।

আমরা আগেই দেখেছি, কৃষিতে বিপুল পরিমাণ পারিবারিক শ্রম ও বিভিন্ন রকম শর্তে নিযুক্ত মজুরি শ্রমিকের উপস্থিতির কারণে মুক্ত কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বাড়তে পারে না। ফলে কয়েকটি রাজ্যে মজুরির হার খুব বেশি বাড়তে পারেনি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিকের আর্থিক মজুরি সবক্ষেত্রেই যথেষ্ট বেড়েছে। যেহেতু মজুরির আর্থিক মূল্য সেই বছরের দামে স্থির হয়, তাই ২০১০–১১ থেকে ২০১৫–১৬ এই পাঁচ বছরের কৃষিপণ্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে এই আর্থিক মজুরির পরিমাণে।

ঋণ-আবদ্ধ শ্রমিক

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী ও ঠিকা, দু'ধরনের শ্রমিকের মধ্যেই ঋণ-আবদ্ধ শ্রমিকেরা উপস্থিত। অনেকেই ঋণ শোধ করতে না পেরে ঋণ-আবদ্ধ স্থায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়। অপ্রতুল সেচ ব্যবস্থার কারণে ভারতের কৃষি এখনও অনেকটা পরিমাণে বৃষ্টিনির্ভর। ফলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলগুলিতে সব ঋতুতে কৃষি শ্রমিকের কাজ থাকে না, তারা ঋণ নেয়। ঋণদাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিয়োগকর্তা চাষি। এই ঋণদাতা সেই সুযোগে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কৃষি-উৎপাদনের ব্যস্ত সময়ে বাজারের বর্ধিত মজুরির তুলনায় স্বল্প মজুরিতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। এই ব্যস্ত সময়ে স্বল্প মজুরিতে কাজ পাওয়ার শর্তই তার ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা, যার ওপর দাঁড়িয়ে চাষি তার মজুরি-শ্রমিককে সারা বছর তার কাছে বেঁধে রাখে। ফলে শ্রমিকটি স্বাধীনভাবে শ্রমের বাজারে অংশ নেওয়ার পথে বাধা পায়। অনেক সময় ঋণ-বন্ধকির পরিণতিতে ঠিকা চাষি দীর্ঘদিন একই মালিকের কাছে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য থাকে। এই পদ্ধতিতেও স্থায়ী শ্রমিকের বাজারের একটি অংশে মজুরি নির্ধারণে নৈর্ব্যক্তিক বাজারের প্রভাবের তুলনায় মালিকের ইচ্ছার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। সেখানে ঠিকা শ্রমিকের বাজার-চলতি মজুরি মালিকের বিবেচনায় কোনও প্রভাব সৃষ্টি করে না। এই বহুধাবিভক্ত শ্রমের বাজার শুধু আদর্শ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়মের বাইরে কাজ করে তাই নয়, পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার অস্তিত্বের ন্যূনতম শর্তগুলি, যেমন শ্রমের চাহিদা ও জোগানের

টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মজুরি নির্ধারণ, এবং শ্রমের বাজারে শ্রমের স্বাধীন চলাচল, কেনা-বেচা, ইত্যাদি শর্তগুলিও এখানে কার্যকর হয় না। এসবের পরিণামে যারা কৃষিতে উদ্যোগী ও বিনিয়োগে উৎসাহী, এমন চাষিদের কাছে বাজারদরে শ্রমের স্বাভাবিক জোগান একটি সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। পুঁজিবাদী বিনিয়োগের পথ অমসৃণ হয়ে পড়ে।

সারণি ৫.৭ কৃষিতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকে মজুরি।

(টাকা, সেই বছরের হিসেবে)

রাজ্য	২০১০–১১			২০১৫–১৬		
	অদক্ষ শ্রমিক		দক্ষ শ্রমিক	অদক্ষ শ্রমিক		দক্ষ শ্রমিক
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬২.০১	১২৩.৭২	১৩১.৫৩	২৯৫.৩৫	১৯৯.৮২	২৬৯.৭৩
অসম	১১৭.৯৪	৯৫.১৫	১৪৭.৩১	২৪৪.৮৯	২০০.০৬	২৯৯.৪২
বিহার	১২৯.৪৮	১১২.০৯	২০৩.৬৪	২১৫.০৫	২০২.৬৫	৩৫৭.২১
ছত্তীসগঢ়	৮৫.২৬	৬৬.৫০	১২৬.৭২	১৮০.৮০	১৩৩.৯৬	২৫৮.৮৮
গুজরাত	১১৮.৪৮	১০৬.৬৩	১৯০.৯৪	১৭৫.৮৮	১৫৫.৫৮	২৭৬.৩০
হরিয়ানা	২২৪.১০	১৮৪.২১	৩১৫.০৫	৩৮৮.২৪	৩২১.৫২	৫০২.৩৫
হিমাচল প্রদেশ	১৫৭.৮৭	১২৭.৭৪	২১০.২০	২৭৬.৩০	২৫২.৪৭	৩৭১.৬৫
ঝাড়খণ্ড	১০৫.৭৯	৯৯.৬৪	১৫০.২৯	১৮১.৫৬	১৬৯.৬৬	২৮৫.৭৬
কর্ণাটক	১৩০.৩৫	১২৫.৩৪	১৫৭.৭০	২৭২.৩১	২৪৪.৯৫	২৮৩.০২
কেরালা	৩০৫.৩৫	২৩৫.৯২	৪১৯.৬২	৫৭৬.৪৭	৪২৭.০৩	৭৫০.৬৪
মধ্য প্রদেশ	১০৩.১৯	৯১.৪২	—	২১৩.০৯	১৮৩.৭৫	২৯৯.৪৯
মহারাষ্ট্র	১০০.০০	৮০.০০	১৫৮.২৮	—	—	—
ওড়িশা	১০২.৩৯	৭৯.৬৭	১৫৪.৭৮	২২৪.৪৩	১৭৩.২৩	৩০৫.৫৫
পঞ্জাব	২০১.০৮	—	২৬৮.৬৭	৩৭৩.৩৮	—	৪৫৬.৫৯
রাজস্থান	১৪৮.১৪	৯০.০৩	২০৬.৮৮	৩৩৪.৫০	১৪১.৮৪	৪০৯.৬০
তামিলনাড়ু	১৬০.৩০	৮৩.২৯	২১০.৫০	৩৩৪.৫০	১৪১.৮৪	-
তেলেঙ্গানা				২৮৩.৭০	১৮৪.১৫	২৮২.৩৫
ত্রিপুরা	১৮৭.৬৩	১৪০.৩৩	২০৪.১৯	২৮৮.০২	২২৫.০৮	৩০২.৩১
উত্তরপ্রদেশ	১২৪.৪৬	—	২২১.৩০	২৩৮.৪০	২১৬.১০	৩৯৫.৯৫
উত্তরাখণ্ড	২১৫.০০	—	—	৩৩৬.৪৬	২৬৮.৫৮	৪৫০.৬১
পশ্চিমবঙ্গ	১৩০.০৪	১১০.১৪	১৪৭.৭০	২৫৯.৪০	২১৯.১৮	২৬৭.৯১

Source: Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Co-Operation, Ministry of Agriculture

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উচ্চফলনশীল সার-বীজের সঙ্গে যন্ত্র ব্যবহারের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আমরা আগেই দেখেছি, পঞ্জাবের কৃষিতে কীভাবে যন্ত্র ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিক নিয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। সারা দেশের কৃষিতে, বিশেষ করে কয়েকটি অঞ্চলে, যেখানে কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহারের মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়েছে, সেখানে কৃষিতে নিযুক্তির পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক জনগণ জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে স্বনিযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন সহায়ক উৎপাদনক্ষেত্র গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। ফলে স্বনিযুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছোট উৎপাদন সংস্থার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ার আগে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বনিযুক্ত সংস্থা গঠন করে কোনওভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, নিযুক্তি হ্রাস শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ২০১২-র পর থেকে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্তির হার চূড়ান্ত কমেছে। তার অর্থ, কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে না। পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যায়ে কৃষি থেকে ও ছোট শিল্পক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষেত্র কৃষিতে ব্যাপক কর্মহীনতাকে ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রকাশ বলে ধরা যাচ্ছে না। কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্ত হতে পারছে না, কারণ ২০০৫ সালের পর থেকে নিযুক্তির হারে যে-মন্দা দেখা যাচ্ছিল, ২০১২-র পর থেকে অসংগঠিত শিল্পের পাশাপাশি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রবণতা বেড়ে চলেছে। কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ বেকার মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, লেবার ব্যুরো ও লেবার ব্যুরোর দ্রুত হিসাব, এই তিন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে ভিনোজ আব্রাহাম এই সামগ্রিক নিযুক্তি-হ্রাসের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। ভারতে বেকারত্বের হারের যে-পরিসংখ্যান তিনি উপস্থিত করেছেন তা আমরা নীচের সারণিতে দেখিয়েছি।

দেখা যাচ্ছে, ২০১১–১২ সালের পর বেকারত্বের হার বেড়েছে এবং পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার আরও বেশি বাড়ছে।

সারণি ৫.৮ প্রতি হাজারে বেকারত্বের হার (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা)

(১৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষের মধ্যে)

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (নিযুক্তি ও বেকারত্ব সমীক্ষা)	গ্রামাঞ্চল পুরুষ	গ্রামাঞ্চল মহিলা	গ্রামাঞ্চল মোট	শহর পুরুষ	শহর মহিলা	শহর মোট	সব পুরুষ	সব মহিলা	সব মোট
১৯৯৯–২০০০	১৮	৫	১২	৩৮	১৩	২৬			
২০০৪–০৫	১৮	১২	১৫	৩৪	১৯	২৭	২২	১৪	১৮
২০১১–১২	১৫	২১	২৯	৩২	৬৬	৩৮	২৪	৩৬	২৭

Source: Abraham, V. (2017) "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly*. 52(38).

সারণি ৫.৯ প্রতি হাজারে ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বের মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার

[লেবার ব্যুরো নিয়ুক্তি ও বেকারত্ব সমীক্ষা]

বছর	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	শহর	শহর	শহর	সব মিলিয়ে	সব মিলিয়ে	সব মিলিয়ে
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০১১–১২	২৭	৫৬	৩৪	৩৪	১২৫	৫০	২৯	৬৯	৩৮
২০১২–১৩	৪০	৫৮	৪৪	৪২	১২৮	৫৭	৪০	৭২	৪৭
২০১৩–১৪	৪২	৬৪	৪৭	৩৯	১২৪	৫৫	৪১	৭৭	৪৯
২০১৪–১৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২০১৫–১৬	৪২	৭৮	৫১	৩৩	১২১	৪৯	৪০	৮৭	৫০

Source: Abraham, V. (2017) "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly*. 52(38).

কৃষিক্ষেত্রে এই বেকারত্বের বৃদ্ধি বিকাশমান অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গঠনগত পরিবর্তনের ফল নয়। কৃষিতে মোট উৎপাদন কমার জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কম পরিমাণে শস্য নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, ফলে কৃষি-উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মানুষের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচিত সময়ের মধ্যে ২০১৩–১৪তে কৃষি থেকে উৎপাদিত মোট মূল্য বছরে শতকরা ৫.৫৭ হারে বেড়েছিল, ২০১৪–১৫ সালে এই হার কমে –০.১৯-এ দাঁড়ায়।

তথ্যসূত্র

১. Roy, Debraj. 1998. *Development Economics*. 1st Edition. Princeton University Press.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতে কৃষি-ঋণের বাজার

পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাক্কালে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজি সঞ্চিত হয়ে আর্থিক পুঁজির আকারে উৎপাদন-ক্ষেত্রে লাভজনকভাবে বিনিয়োজিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সেই পুঁজির মালিক সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে মুক্ত শ্রম, জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলি মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে একত্রিত করে নতুন উৎপাদন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সেই অবস্থায় পুঁজির সরাসরি বাধাহীনভাবে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক শর্ত হল পুঁজিসমেত অন্যান্য সমস্ত উপকরণের মুক্ত বাজার-ব্যবস্থার উপস্থিতি। লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ অনুযায়ী কৃষি-ঋণের বাধাহীন জোগানের ব্যবস্থাই এই বাজার-ব্যবস্থার উপযোগিতা।

এই আলোচনায় প্রারম্ভিক অনুমানটি হল, ভারতের কৃষি-ঋণের বাজারটি সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত ঋণের আওতায় আসেনি। কৃষি-ঋণের বাজার শ্রমের বাজারের মতো অনেকাংশে পুঁজিবাদী নিয়মের বাইরে কাজ করে। এই বাজার বহুধাবিভক্ত। এখানে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে এখন অবধি স্থানীয় ব্যবসায়ী মহাজন, বড় চাষি-মহাজনদের কর্তৃত্বের কারণে কৃষি-উদ্বৃত্ত স্বাধীনভাবে উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হতে পারে না। ফলে কৃষিও অবাধে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার অধীনে আসতে পারে না। এ দেশের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি, কৃষি-অর্থনীতির ওপর বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অবসান ঘটেনি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির উত্তরণও ঘটেনি, তার বদলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ওপর বাণিজ্যিক-মহাজনি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বজায় থেকেছে। এর কারণ, উৎপাদন সংগঠনগুলি দুর্বল ও মহাজনি পুঁজির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতের কৃষি-ঋণের বাজারে আজও অসংগঠিত ঋণব্যবস্থার প্রাধান্য। যথেষ্ট পরিমাণে সহজ সুদে সরকারি ঋণ বা ব্যাংক-ঋণের অভাব। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ও স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে গ্রামীণ বড় চাষি-জোতদার-ব্যবসায়ী মহাজনি কারবারে তাদের উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করে আসছে ও একদিকে তাদের হাতে জমা কৃষি-উৎপাদন থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত, বা বাণিজ্যিক কারবার থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত, চড়া সুদের মহাজনি কারবারেই আবদ্ধ থাকছে। অন্যদিকে সাধারণ ছোট চাষি যেটুকু উদ্বৃত্ত জমিয়ে উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারত তার সবটুকুই এই চড়া সুদের মহাজনি কারবার মারফত শোষিত হচ্ছে। এখানে ঋণ, পণ্য ও উৎপাদনের উপকরণের যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়াকে কার্যকর থাকতে দেখা যায়। দেখা যায়, বড় চাষিরা একই সঙ্গে ধান-চালের ব্যবসা ও মহাজনি কারবার মারফত ছোট বা মাঝারি চাষিদের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে। অনেক সময় অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রেও স্থানীয় ব্যবসায়ী-মহাজন, কিংবা কখনও কখনও বড় জমির মালিক কোনও চাষি মহাজনি কারবার ও ধান-চালের ব্যবসায়ী

টাকা খাটিয়ে প্রান্তিক ও ছোট চাষির উৎপাদিত শস্যের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ নেয়। অনেক সময় ঋণ, পণ্য ও উৎপাদনের উপকরণের বাজারের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাণিজ্য-মহাজনিতে আবদ্ধ থাকে। সাধারণত সরকারি তথ্যে এই ধরনের অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের বাজারের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। এসব বিষয়ে তথ্য পাওয়ার একমাত্র উপায়, বিভিন্ন মাপের জোতের চাষিদের উদ্বৃত্ত বা সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত কীভাবে উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় সেই বিষয়গুলির ওপর তৃণমূল স্তরে সমীক্ষা করা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এই ধরনের সমীক্ষা করেছেন। সেগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে: কৃষি-ঋণের বাজার-প্রক্রিয়া অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কৃষি-উপকরণ ও শ্রমের বাজার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তভাবে ক্রিয়া করে। এই ধরনের যুক্ত-বাজারে স্বাভাবিক বাজার-প্রক্রিয়ার বাইরে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ ও শ্রমের বিশেষ দর স্থির হয়। এইভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজার যত ছোটই হোক না কেন, তা এই বিশেষ ধরনের যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়া মারফত কৃষি-অর্থনীতিতে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। আমরা এই বিষয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনা করার আগে সরকারি তথ্যসূত্র অনুসরণ করে কৃষি-ঋণের বাজারের চরিত্রের একটি আংশিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। অসংগঠিত ঋণের বাজারে এই ঋণের উৎসগুলির উল্লেখ করার সঙ্গে এই ঋণে সুদের পরিমাণ, পরিশোধের সময়সীমা ও ঋণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শর্তাবলি গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্ত ঋণগ্রস্ত চাষির শতকরা ৬৩.৬ ভাগ প্রান্তিক চাষি। শতকরা ৩৬ ভাগ ঋণগ্রস্ত চাষি ২ হেক্টরের বেশি জমি চাষ করে। আবার প্রত্যেক মাপের চাষিদের মধ্যে কতভাগ চাষি ঋণগ্রস্ত তার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, মোট চাষিদের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ চাষি ঋণগ্রস্ত। অতি ক্ষুদ্র চাষিদের শতকরা ৪০ ভাগের বেশি ঋণগ্রস্ত। প্রতি মাপ-সীমার মধ্যে ঋণগ্রস্ত চাষির অনুপাত জমির মাপের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ১—২ হেক্টরের চাষিদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগের বেশি ঋণগ্রস্ত। আবার ২—৪ হেক্টরের চাষিদের মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ ঋণগ্রস্ত।

সারণি ৬.১ প্রত্যেক শ্রেণিতে মোট ঋণী পরিবারের শতকরা ভাগ ও প্রত্যেক শ্রেণির মোট পরিবারের মধ্যে ঋণী পরিবারের শতকরা ভাগ

	প্রত্যেক শ্রেণিতে মোট ঋণী পরিবারের ভাগ (শতকরা)	প্রত্যেক শ্রেণিতে মোট পরিবারের মধ্যে ঋণী পরিবার (শতকরা)
<০.০১	২.১	৪১.৯
০.০১—<.৪০	২৯.০	৪৭.৩
.৪১—১	৩২.৫	৪৮.৩
১.০১—২	১৮.৪	৫৫.৭
২.০১—৪	১২.০	৬৬.৫
৪—১০	৫.৪	৭৬.৫

১০ এবং তার বেশি	০.৬	৭৮.৭
সব	১০০	৫১.৯

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

এই ভাগ জমির মাপের সঙ্গে বেড়ে সবচেয়ে বড় মাপের চাষিদের ৭৮.৭ ভাগে দাঁড়াচ্ছে। এখানে লক্ষণীয়, যদিও জমির পরিমাণের শ্রেণিগুলিতে জোতের আয়তন বাড়ার সঙ্গে ঋণী পরিবারের শতকরা ভাগের ঋণাত্মক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক শ্রেণিতে মোট পরিবারের মধ্যে ঋণী পরিবারের শতকরা অংশের জোতের মাপের সঙ্গে সরাসরি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ জোতের মাপ বৃদ্ধি পেলে জোতের নির্দিষ্ট মাপগুলিতে মোট পরিবারে ঋণী পরিবারের শতকরা ভাগ বাড়ে। আপাত বৈপরীত্যমূলক এই ঘটনার পিছনে যে-বিষয়টি রয়েছে তা হল, ছোট জোতের অসংখ্য চাষির মধ্যে বিরাট সংখ্যক চাষি ঋণী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শতকরা ভাগ কম। কিন্তু বড় চাষিদের সংখ্যা প্রান্তিক ও ছোট চাষিদের তুলনায় নগণ্য, তাই এই বড় জোত-সীমার মোট চাষিদের মধ্যে ঋণী চাষিদের শতকরা ভাগ তুলনামূলক ভাবে বেশি। এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়, যদি আমরা প্রত্যেক জোতের মাপে একর প্রতি ঋণের পরিমাণ দেখি।

সারণি ৬.২ক বিভিন্ন মাপের জোত-শ্রেণিতে একর-প্রতি ঋণের পরিমাণ

রাজ্য	প্রান্তিক	ছোট	অর্ধ-মাঝারি	মাঝারি	বড়
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৭০৯.০৯	৭৪৩.৯৭	৬১৭.১১	৬২৯.৪৯	১৬০.৯০
অসম	৭৬.১৯	৪৮.৫৫	২৬.৩৯	৩৩.৫৯	০
বিহার	১০৮০.০০	২৭২.৮০	১০৭.৭২	৮৩.৩০	১০৩.৩
ছত্তীসগঢ়	৩২০.৪৫	৫৫.৬৩	৭৫.৩৭	৪১.৮৫	০
গুজরাত	৭৪৮.৯৭	২১৪.৪৮	২৯৮.১৯	২৮৩.৯১	৫৪.৯০
হরিয়ানা	২০১৯.৫৬	৬১২.২৪	৫৪৮.০৮	১৯০.৮০	২৬০.৭৭
ঝাড়খণ্ড	২৪৮.৭৮	৬১.৫৯	৩৩.৫৭	৩৫.৫২	০
কর্ণাটক	২৯৩৯.৫৮	৭০০.০০	৪৬৫.৬৭	৪০৭.৯০	২৪৯.৬৯
কেরালা	২৭২০০.০০	২২০৮.২৮	২১৭৫.৬২	১৪১০.৭১	২৪৩.৫১
মধ্যপ্রদেশ	৫৫৩.০৬	১৯০.১৪	২৩০.৪০	২০২.৭৭	১২৩.৭৭
মহারাষ্ট্র	১৪৫৭.৪৪	৩২০.৪২	২১৭.৯৭	৩৬৮.৫০	২৪২.৪১
ওড়িশা	৮৮৪.২১	১১১.০৪	১১০.৫০	২১৭.৩৬	৯৩৯.৩৩
পঞ্জাব	১২৪৯.১৮	১১৮৯.১৩	৮৬৮.১৮	৫৬৮.৯৮	৬২৮.৭৪
রাজস্থান	১৫৬১.২২	৪৭৪.১২	৩৬৪.৩১	২৫২.১১	৮৭.৫৬
তামিলনাড়ু	৫০৪৩.২৪	৮৬৩.৩০	৭৯৫.১৮	৫৭২.৬৪	২২৪.১৪
উত্তরপ্রদেশ	৯৬৯.২৩	৩২৬.৪২	৩৯৫.২২	২২৬.০৮	১৪৫.১০
পশ্চিমবঙ্গ	৭০০.০০	২০৭.৫৪	১২০.৫১	৮৯.৬৯	৮.৭২

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক চাষিদের হেক্টর-পিছু জমে থাকা ঋণের তুলনায় বড় চাষিদের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে জমে থাকা ঋণ নগণ্য। ছোট চাষিদের ক্ষেত্রেও বড় চাষিদের তুলনায় প্রতি হেক্টরে জমে থাকা ঋণ অনেক বেশি। আরও দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, কর্ণাটক, গুজরাট, হরিয়ানার মতো সমস্ত এগিয়ে থাকা রাজ্যেই প্রান্তিক ও ছোট চাষিদের হেক্টর-প্রতি জমা ঋণের পরিমাণ বড় চাষিদের তুলনায় অনেক বেশি। প্রান্তিক চাষিদের একটা অংশ চাষের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন বা গরু-মহিষের পালন ও ডিম-দুধ, মাংস, ইত্যাদির ব্যবসা করে। সুতরাং তারা যে ধার নিয়ে থাকে তার অধিকাংশই চাষবাসের পাশাপাশি কৃষি-সম্পর্কিত অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রয়োজনে লাগতে পারে। কিন্তু যুক্তি হিসেবে এটি ধরে নিলেও যে-ঘটনাটি অস্বীকার করা যাচ্ছে না সেটি হল, সব মাপের জোতেই হেক্টর-প্রতি ঋণের পরিমাণ বড় চাষিদের তুলনায় অধিকাংশ রাজ্যেই অনেক বেশি। শুধু প্রান্তিক চাষিরাই নয়, ছোট ও মাঝারি চাষিরাও বড় চাষিদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ঋণগ্রস্ত। আমরা আগেই দেখেছি, মোট ঋণী চাষিদের শতকরা মাত্র ৬ ভাগের মধ্যে পড়বে যাদের

গড় জোতের মাপ ৪ হেক্টরের বেশি। এদের মধ্যে শতকরা মাত্র ০.৬ ভাগ চাষির গড় জোতের মাপ ১০ হেক্টর বা তার বেশি। অবশ্য এই বৃহত্তম জোতের বিভাগটিতে এত কম সংখ্যক চাষি পরিবার রয়েছে যে, এরা একত্রে বৃহত্তম চাষিদের বিভাগটির চাষিদের শতকরা ৭৬ ভাগের বেশি, যদিও এদের হেক্টর প্রতি ঋণের পরিমাণ অন্য ক্ষুদ্রতর বিভাগের চাষিদের হেক্টর প্রতি ঋণের তুলনায় নগণ্য। আমরা নীচের সারণি ৬.৩-এ দেখব, জোতের মাপ যত বেশি, ততই ঋণের উৎস হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের গুরুত্ব বেশি। অপেক্ষাকৃত ছোট জোতের বেশির ভাগ চাষি ঋণ নিয়ে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি থেকে। ১ হেক্টরের নীচের প্রান্তিক চাষিরা তাদের হেক্টর-প্রতি বিপুল ঋণের অধিকাংশই (শতকরা ৬০ ভাগের বেশি) পায় অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে, যেখানে সুদের হার অস্বাভাবিক বেশি এবং ঋণ শোধের শর্তগুলিও অধিকাংশ সময়েই ছোট ও প্রান্তিক চাষির পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধাজনক। ফলে এই ঋণ শোধ করা তাদের পক্ষে প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমরা নীচের সারণিতে সবচেয়ে বড় চাষিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট বিভিন্ন গড় মাপের আওতার চাষিদের ঋণগ্রস্ততা কতগুণ বেশি তার একটি ধারণা করার চেষ্টা করেছি। সেই উদ্দেশ্যে ৬.২খ সারণিটির সমস্ত বিভাগের চাষিদের ঋণের পরিমাণকে বড় চাষিদের ঋণের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে দেখা যাচ্ছে, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান ও বিহারে প্রান্তিক জোতের চাষিদের গড় হেক্টর-প্রতি ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ বড় জোতের চাষিদের কয়েকগুণ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ ১০০ গুণের বেশি। এবং গড় জোতের মাপ বৃদ্ধির সঙ্গে ঋণগ্রস্ততার তুলনামূলক অনুপাতটি ধীরে ধীরে নেমেছে। বড় চাষিদের তুলনায় ক্ষুদ্রতর চাষিদের ঋণগ্রস্ততার চাপ জোতের মাপ কমার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বড় চাষিদের তুলনায় প্রান্তিক চাষিদের থেকে অপেক্ষাকৃত বড় অর্থাৎ ছোট, আধা মাঝারি ও মাঝারি চাষিদের ঋণগ্রস্ততার গভীরতা প্রান্তিকদের ঋণগ্রস্ততার গভীরতার তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। এই অশোধিত জমা ঋণ শুধুমাত্র কৃষি-উৎপাদনের বর্ধিত ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত হয়ে যায় এমনটা নাও হতে পারে। এই ঋণ প্রথমত কৃষি-উপাদনের বর্ধিত ব্যয় মেটায়। কৃষি-উৎপাদনে অনেক সময়েই দেখা যায় আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি, সে ক্ষেত্রে এই ঋণ জীবনযাত্রার খরচ মেটাতে কাজে লাগে, তাছাড়া জমা ঋণের একটা অংশ হয়তো পুরনো জমা ঋণের ওপর দেয় সুদ। আবার প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে সকলেরই চাষবাস ছাড়া অন্য সূত্রে আয় আছে এমন নয়। একটি অংশ অবশ্যই আছে যাদের চাষবাস ছাড়া আয়ের অন্য কোনও উৎস নেই। এদের বন্ধকি দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত এবং দারিদ্র ও অশিক্ষার কারণে এদের সামাজিক অবস্থানও যথেষ্ট নীচেই। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এদের অধিকাংশেরই নাগালের বাইরে। এদের কাছে ঋণের একমাত্র উৎস অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, যেখানে সুদের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি। ফলে এই অংশটির ওপর জমা হয়ে থাকা ঋণের চাপ অস্বাভাবিক বেশি।

সারণি ৬.২খ বড় চাষিদের তুলনায় অন্যান্য বিভাগের চাষিদের ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ

রাজ্য	প্রান্তিক	ছোট	অর্ধ-মাঝারি	মাঝারি
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৩০৫	৪৬২	৩৮৩	৩৯১
অসম	২২৬*	১৪৪*	৭৮*	—
বিহার	১০৪৪	২৬৩	১০৪	৮০
ছত্তীসগড়	৭৬৫*	১৩২*	১৮০*	—
গুজরাত	১৩৬৪	৩৯০	৫৪৩	৫১৭
হরিয়ানা	৭৭৪	২৩৪	২১০	৭৩
ঝাড়খণ্ড	৭০০*	১৭৩*	৯৪*	—
কর্ণাটক	১১৭৭	২৮০	১৮৬	১৬৩
কেরালা	১১১৬৯	৯০৬	৮৯৩	৫৭৯
মধ্যপ্রদেশ	৪৪৬	১৫৩	১৮৬	১৬৩
মহারাষ্ট্র	৬০১	১৩২	৮৯	১৫২
ওড়িশা	৯৪	১১	১১	২৩
পঞ্জাব	১৯৮	১৮৯	১৩৮	৯০
রাজস্থান	১৭৮২	৫৪১	৪১৬	২৮৭
তামিলনাড়ু	২২৫০	৩৮৫	৩৫৪	২৫৫
উত্তরপ্রদেশ	৬৬৭	২২৪	২৭২	১৫৫
পশ্চিমবঙ্গ	৮০১৯	২৩৭৭	১৩৮০	১০২৭

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)
*চিহ্নিত শ্রেণিগুলিকে মাঝারি শ্রেণি দিয়ে ভাগ করা হয়েছে।

নীচের সারণি ৬.৩ থেকে আমরা জোতের বিভিন্ন মাপের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক দুই ধরনের উৎস থেকে ঋণের বিন্যাস সম্বন্ধে জানতে পারি। দেখা যাচ্ছে, ১ হেক্টরের নীচে পর্যন্ত জমির চাষিরা মোট ঋণের শতকরা ৩৮ ভাগ ঋণ পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। অর্থাৎ বাকি শতকরা ৬২ ভাগ ঋণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে আসে। ২ হেক্টরের নীচে থেকে ১ হেক্টরের ওপরে যাদের জমি, তারা তাদের ঋণের প্রায় শতকরা ৬৪.৮ ভাগ ঋণ পায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। বাকি ৩৫.২ ভাগ ঋণ আসে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে। ২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টরের নীচে যাদের জমি তারা তাদের ঋণের শতকরা ৬৭ ভাগ এই উৎসগুলি থেকে পায়। ৪ থেকে ১০ হেক্টরের নীচের চাষিরাও তাদের ঋণের শতকরা ৬৭ ভাগ ঋণ পায়। ১০ হেক্টর বা তার বেশি মাপের চাষিরা তাদের মোট ঋণের শতকরা ৭৮ ভাগই পায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে।

এখানে জোতের মাপ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। সব চাষিরা একত্রে এদের মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ পায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। এখনও কৃষি-ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ আসে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মহজনরা। এরা মোট ঋণের শতকরা ২৬ ভাগ জোগান দেয়। ১ হেক্টরের নীচের চাষিরা গড়ে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি ঋণ মহাজনদের কাছ থেকে পায়। অতি ক্ষুদ্র চাষিদের কাছে এরাই ঋণের সবচেয়ে বড় একক উৎস। প্রান্তিক চাষিরা (১ < ২ হেক্টর) তাদের মোট ঋণের শতকরা ২৩ ভাগেরও বেশি ঋণ এদের কাছ থেকে পায়। পেশাদার মহাজনদের পরই ঋণের অসংগঠিত বাজারে বড় জোগানদাতা হল আত্মীয়বন্ধু ও অন্যান্যরা।

সারণি ৬.৩ উৎস অনুযায়ী পাওনা ঋণের ভাগ (প্রতি হাজারে)

মাপ অনুযায়ী নিজের অধিকারের জমির ভাগ	সরকার	সমবায়	ব্যাংক	নিয়োগকর্তা মালিক	পেশাদার মহাজন	দোকানদার ব্যবসায়ী	বন্ধু ও আত্মীয় + অন্যান্য
<০.০১	৪	১৬	১২৯	৬	৬৩৭	১৪	১৭৫ + ১৮.
.০১-.৪০	১৩	১৪৬	৩১০	৮	৩২৪	২৫	১৪২ + ৩১
.৪১-১	১৭	১৩৯	৩৭৬	৮	২৭৪	৬৬	১০৬ + ১৪
১-২	২৬	১৪৭	৪৭৫	৭	২৩৩	১৫	৭৬ + ২০
২.০১-৪	১৯	১৫৬	৫০০	১৪	২৩৮	১২	৫৮ + ৩
৪.০১-১০.০০	৩৮	১৭৫	৫০২	৪	১৮৭	১৪	৬৫ + ১৫
১০.০০+	১১	১৪৩	৬৩৫	০	১৬১	৫	৩৮ + ৬
সব	২১	১৪৮	৪২৯	৮	২৫৮	২৯	৯১ + ১৬

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

দেখা যাচ্ছে, অসংগঠিত ঋণের মধ্যে এখনও পেশাদার মহাজন ও আত্মীয়বন্ধু এই দু'টি বিভাগের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মোট অসংগঠিত ঋণের মধ্যে শতকরা ৯৩ ভাগ ঋণ পেশাদার-মহাজন ও আত্মীয়বন্ধুরা দিয়ে থাকে। এই আত্মীয়বন্ধুরা কোন শ্রেণিভুক্ত, এরা বড় চাষি-শ্রেণির অন্তর্ভূত কি না, গ্রামের অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে এদের স্থান কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি নথি থেকে কোনও উত্তর স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে না। এই উত্তরের জন্য গবেষকদের তৃণমূল স্তরে সমীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন তৃণমূল স্তরের সমীক্ষায় পাওয়া পর্যবেক্ষণগুলি আমরা এখানে আলোচনা করব। এছাড়া অসংগঠিত ঋণের বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাইস মিলের ভূমিকা। রাইস মিলগুলি গ্রামের চাষিকে ফসল ওঠার আগেই আগাম টাকা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের বাজারের ওপর পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ জারি রাখে।[১] ফসল ওঠার পর নির্দিষ্ট রাইস মিলেই চাষিরা তাদের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। ফসল ওঠার অব্যবহিত পরে বাজারে দাম নেমে এলে সেই কম দামেই তারা তাদের উৎপাদিত শস্য রাইস মিলকে দেয়।

ঋণদাতা হিসেবে আরও একটি 'শ্রেণি'র উদ্ভব হয়েছে: কমিশন এজেন্ট। কমিশন এজেন্টরা চাষিকে বীজ-সার-কীটনাশক ইত্যাদি নতুন অধিক ফলনশীল উপকরণ জোগায় ভবিষ্যতে ফসল ওঠার পর শস্যের মাধ্যমে তা শোধ দেওয়ার শর্তে। এই নতুন উপকরণগুলি নয়া আর্থিক নীতি চালু হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে এদেশের কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন বাণিজ্যনীতি চালু হওয়ার পর বিদেশি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ওপর থেকে

এদেশে কৃষি উপকরণ নিয়ে ব্যবসা করার বিষয়ে বাধানিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়েছে। ফলে এদেশের কৃষিতে কমিশন এজেন্টদের ক্রিয়াকলাপ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা চাষিকে অধিক পরিমাণে নতুন ও অত্যন্ত দামি কৃষি উপকরণ বিক্রি করে ও এইভাবে তাকে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে। ফলে সুদসমেত চাষির জমে থাকা ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। পাওনা সুদ সমেত আসলের দাম মেটাতে চাষি ফসল ওঠার পরপরই তা অত্যন্ত কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফসলের দাম অত্যন্ত নিচুস্তরে ধার্য করা হয় বলে অনেক সময় তার সমস্ত ফসল দিয়েও ঋণ শোধ হয় না। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথম দশক অবধি চাষিদের আত্মহত্যা ভারতীয় কৃষির এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। চড়া সুদে ঋণ নিতে চাষি কেন বাধ্য হল, কেনই বা সে এই ঋণশোধে ব্যর্থ হল, তার পিছনে আরও যে কারণগুলি ছিল তার মধ্যে রয়েছে বহুজাতিক সংস্থার সরবরাহ করা কৃষি উপকরণের চড়া দাম, যা কৃষি উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে আছে কৃষিপণ্যের সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষিপণ্যের ব্যয় মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়া। নতুন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিপণ্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতিটি প্রয়োগের ফলে আমদানি-শুল্ক হ্রাস ও আমাদের দেশের বাজারে অত্যন্ত কম আমদানি মূল্যের পণ্যের বিপুল সম্ভারেরও এতে ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট। এছাড়া কৃষি-ঋণের বাজার অনেক সময়েই এককভাবে কাজ করে না, কৃষি-পণ্য ও কৃষি-উপকরণের বাজারের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কৃষি-পণ্যের ব্যবসায়ী অনেক সময়েই কৃষি-পণ্য ও কৃষি-উপকরণের ব্যবসা যুক্তভাবে চালায়। তারা চাষের সময় বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার নতুন উন্নত ধরনের বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বিক্রি করে, ধারে। এরা বিদেশি কোম্পানি নিয়োজিত কমিশন এজেন্ট। এই কমিশন এজেন্টরা চাষিকে এইসব উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। তারা এই উপকরণগুলি ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি, সময় এবং পরিমাণ সম্বন্ধে চাষিদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষি যে-পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। এই উপকরণগুলি উপযুক্ত পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহারের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় খরচ অনেক বেশি বাড়ে। শস্য উৎপাদনের আগে চাষির আর্থিক সঙ্গতি যখন একেবারে তলানিতে এসে পড়ে, চাষের খরচ মেটানো চাষির কাছে একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, তখন এই কমিশন এজেন্টরা চাষিকে এই উপকরণগুলি সরবরাহ করে, ফলে চাষির পক্ষে কমিশন এজেন্টদের পরামর্শ নিতে অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকে না। শর্ত অনুযায়ী ফসল ওঠার পর সেই সময়কার কম বাজার-দামে চাষিরা ব্যবসায়ী বা কমিশন এজেন্টকে ফসল বিক্রির মাধ্যমে উপকরণের দাম পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। এইভাবে একদিকে অত্যন্ত বেশি উৎপাদন ব্যয়, অন্যদিকে ফসলের কম দাম, এই অসম বিনিময়ের মাধ্যমে চাষির সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত কমিশন এজেন্টরা আত্মসাৎ করে। গ্রামীণ মহাজন ও ধনী চাষি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে আর-একটি ঋণদাতা শ্রেণি আছে। তারা হল জমির মালিক, যারা তাদের জমি ভূমি-খাজনার বিনিময়ে ভাগচাষ বা স্থির খাজনার বিনিময়ে ঠিকা চাষে লাগায়, অথবা এরা সেই মালিকশ্রেণি, যাদের জমি ঠিকা শ্রমিক বা স্থায়ী শ্রমিক দিয়ে চাষ করানো হয়। এই মালিকরা তাদের ভাগচাষি বা মজুরি শ্রমিকদের ঋণের একমাত্র উৎস। ভাগচাষিদের ক্ষেত্রে এই ঋণ দেওয়া হয় ফসলের মাধ্যমে। বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে বছরের কোনও কোনও সময়ে যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের অভাবে চাষের কাজ ব্যাহত হয়। তাই কৃষি-উৎপাদনের ঋতুভিত্তিক ওঠানামা এইসব অঞ্চলে চাষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয়। চাষবাসে

এই ঋতুভিত্তিক ওঠানামার প্রবণতার কারণে উৎপাদনে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশি। প্রান্তিক চাষি, ছোট চাষি বা ভাগচাষির পক্ষে অনেক সময়ে এই ধরনের ঝুঁকি বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উৎপাদন দ্রুত ওঠানামা করলে চাষির পক্ষে চাষের খরচ, ঋণের ওপর সুদ ও পুরনো জমে থাকা ঋণের ভাগ মেটানোর পর সারা বছরের অন্নসংস্থান করা সম্ভব হয় না। তখন চাষি খাবারের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য মালিকের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় বৃষ্টির অভাবে চাষের কাজ আশানুরূপ না হলে অনিয়মিত শ্রমিকের হাতে কাজ থাকে না। নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে জমির মালিকের কাছে ঋণ নিতে হয়। ভাগচাষির ক্ষেত্রে মালিক এই ঋণ দেয় ফসল ওঠার পর ভাগচাষির অংশ থেকে তা সুদ সমেত কেটে নিয়ে ফেরত পাওয়ার শর্তে। কৃষি-শ্রমিক বা ছোট চাষি, বড় চাষির কাছে অসময়ে শ্রম অথবা ফসলের মাধ্যমে সুদ সমেত শোধ দেওয়ার শর্তে এই ঋণ পেয়ে থাকে। এই ঋণ গরিব ভাগচাষিকে দীর্ঘকালীন ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে, তাকে একটি বিশেষ জোতদারের কাছে আবদ্ধ করে ফেলে। ঠিকা ও স্থায়ী শ্রমিকের কাছে খাদ্যঋণের একমাত্র উৎস অনেক সময়েই তাদের নিয়োগকর্তা জমির মালিক। ব্যস্ত মরশুমে মজুরি বাড়লেও চাষের কাজ শুরুর আগে বাজারে চালু কম মজুরিতেই চাষের কাজ করে দেওয়ার শর্তে শ্রমিকেরা মালিকের কাছ থেকে এই খাদ্যঋণ পেয়ে থাকে। যতটা পরিমাণ ঋণ সে টাকার অঙ্কে নেয়, ব্যস্ত সময়ের বেশি মজুরির পরিবর্তে খরার সময়ের কম মজুরিতে কাজ করলে তাদের যে-আর্থিক ক্ষতি হয় ও মালিকের আর্থিক লাভ হয়, সেই শ্রমিকের ক্ষতি বা মালিকের লাভের পরিমাণই ধার নেওয়া টাকার ওপর সুদ।

অর্থাৎ শ্রমিক যদি Q_1 খাদ্যশস্য খাদ্যঋণ হিসেবে নিয়ে থাকে, তবে তার ঋণের আর্থিক মূল্য যত পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে শোধ হবে তা হল, $L = Q_1P_{1/w1}$ যেখানে P_1 হল ঋণ নেওয়ার সময় খাদ্যশস্যের দাম। এবং w_1 হল শোধ দেওয়ার সময় বাজার-চলতি মজুরি।

এখন, সুদের পরিমাণ হবে, $L\ (w-w_1)$, যেখানে w ব্যস্ত মরশুমে যখন শ্রম দেওয়া হচ্ছে সেই সময়ের বাজার-চলতি মজুরি। এই সুদ প্রকাশ্যে ঘোষিত সুদ নয়, এই সুদ ঋণের শর্তের মধ্যে লুকনো থাকে। এই সুদ ছাড়াও যে-শর্তের ওপর দাঁড়িয়ে এই ঋণ দেওয়া-নেওয়া সংঘটিত হয় তা হল, ব্যস্ত সময়ে যখনই মালিকের প্রয়োজন হবে তখনই মালিকের নির্দেশমতো শ্রমিকটি তার জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

ছোট উৎপাদকের ঋণের একটি উৎস হল কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীরা। এই ব্যবসায়ীরা শস্য ওঠার আগেই ছোট উৎপাদককে চাষের খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আগাম বা দাদন হিসেবে দিয়ে থাকে এই শর্তে যে, ছোট উৎপাদক ফসল ওঠার পরপরই এই ঋণ শোধ দেওয়ার জন্য তার উৎপাদিত শস্যের অংশ সেই সময়ের বাজার-দামে ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে। কয়েকমাসের জন্য ফসল ধরে রাখতে পারলে চাষিরা বর্ধিত বাজার-দামের সুযোগ নিতে পারত, কিন্তু আগাম টাকা বা দাদন নেওয়ার কারণে ব্যবসায়ীর কাছে সে সবচেয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। যদিও ফসল ওঠার আগে যে-সময়ে সে দাদন নেয় সেই সময়ে ফসলের বাজার-দাম সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে। অথচ সেই সময়ে দাদনের বিনিময়ে যে-পরিমাণ শস্য তারা কিনতে পারে তার পরিমাণ সারা বছরের তুলনায় সর্বনিম্ন।

যদি দাদনের পরিমাণ L এবং শস্য ওঠার আগে ফসলের দাম p_1 হয়, শস্য ওঠার পরের দাম হয় p_2, তাহলে, $L = p_1Q_1 = p_2Q_2$ যেখানে Q_1 ও Q_2 যথাক্রমে ফসল ওঠার আগে ও পরে যে-পরিমাণ শস্য কেনা যাবে। এখন, $p_1 > p_2$, $Q_1 < Q_2$। দাদনের কারণে সে ফসল ধরে রাখতে না পারায় শস্য ওঠার পরের কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। রাইস মিলগুলি[২] ও কোনও কোনও বড় চাষি এই পদ্ধতিতে আঞ্চলিকভাবে ছোট উৎপাদকের ফসলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার মধ্য দিয়ে শস্যপণ্যের বাজারের একটি অংশের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সাধারণত এইভাবে শস্য ওঠার পরের কম দামে সমস্ত ফসল বিক্রি করে ছোট চাষির সমস্ত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত রাইস মিল মালিক বা বড় ধনী চাষি শোষণ করে। এই ধরনের লেনদেন রাইস মিল বা বড় চাষি চালায় ব্যাংক-ঋণের সাহায্য নিয়েই। এরা ব্যাংকের কাছ থেকে যে-পরিমাণ ঋণ নিয়ে থাকে তার একটি বড় অংশ এই ধরনের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ সময়েই এই ক্রিয়াকলাপ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের চৌহদ্দির বাইরে সংঘটিত হয়ে থাকে। এদের জমির পরিমাণ ও ব্যবসায়িক সক্ষমতার কারণে ব্যাংক ঋণ এদের নাগালের মধ্যেই থাকে। ছোট চাষির পক্ষে বন্ধকি রাখার মতো যথেষ্ট সম্পত্তি থাকে না। তাই তুলনামূলক ভাবে ব্যাংক-ঋণ পাওয়া কিছুটা কঠিন। ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে যে-অংশটি অ-কৃষি কাজকর্মের ব্যবসা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে তারা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড জমির মালিকের ব্যাংক-ঋণ পাওয়ার উপায় থাকে না। তেমনই কৃষি-শ্রমিকদের কাছেও ব্যাংক-ঋণ দুষ্প্রাপ্য। সরকারি তথ্যে অসংগঠিত ঋণের বাজার বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমরা পাইনি। কিন্তু বিভিন্ন গবেষকের তৃণমূল স্তরে সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

অশোক রুদ্র ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে গ্রামস্তরে কৃষি-উৎপাদন সম্পর্ক বিষয়ে সমীক্ষা করেন।[৩] তাঁর সমীক্ষায় ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে অসংগঠিত ঋণের বাজারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এই বাজারে ঋণদাতা বা ঋণের জোগানদাতা হিসেবে যাদের দেখা যায়, তাদের মধ্যে পেশাদার মহাজন, খুচরো দোকানদার ছাড়াও রয়েছে জমির মালিক ধনী চাষিরা। তাঁর পর্যবেক্ষণে এই বিভিন্ন জোগানদাতার মধ্যে মহাজনরা সাধারণত বড় জমির মালিকদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত। এদের মহাজনি মূলধনের উৎস এদের নিজস্ব জমির উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্তের সঞ্চয় মূলত এদের মহাজনি কারবারের মূলধনের আদি উৎস হলেও এদের মালিকানায় থাকা জমি এদের ব্যাংক-ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বন্ধকি হিসেবে কাজ করে, ফলে এদের মহাজনি কারবারের মূলধনের একটি উৎস হিসেবে ব্যাংক-ঋণের ভূমিকাও আছে। ব্যাংক-ঋণের গ্রহীতাদের মধ্যে বড় জমির মালিকদের যে-সংখ্যা পাওয়া যায় তাদের মধ্যেই এরা রয়েছে। অর্থাৎ সংগঠিত ঋণের বাজারে সরবরাহ করা ঋণের একটি অংশ এদের মাধ্যমে মহাজনিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে কোনও একটি অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ বছরে সরবরাহ করা নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগঠিত ব্যাংক-ঋণে গরিব চাষির নাগাল সীমিত হয়ে পড়ে। সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রামীণ মহাজন চড়া সুদে ঋণের কারবারকে অপরিহার্য করে তোলে। অশোক রুদ্রের এই সমীক্ষাটি অনেক পুরনো। ইতিমধ্যে ভারতীয় কৃষিতে যেসব প্রকৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রভাবে ভারতীয় কৃষি কতটা তার পুরনো কাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু পরবর্তীকালে পরপর বিভিন্ন গবেষকের করা রাজ্যভিত্তিক তৃণমূল স্তরের সমীক্ষা থেকে দেখা যায় এজেন্টদের প্রভাব, তাদের চড়া সুদে ঋণ দেওয়ার প্রবণতা এবং বন্ধকি কারবার মারফত জমি গ্রাস করা এবং শ্রমিককে ঋণ-বন্ধকি শ্রমিকে পরিণত করার প্রবণতা হ্রাস পায়নি। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কৃষিকাজের বিভিন্ন স্তরে যন্ত্রপাতির ব্যবহার একদিকে কৃষিতে বেকারত্ব বাড়ায়, অন্যদিকে অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে জলস্তর নেমে যাওয়ার ফলে সেচের ব্যয় বাড়ে ও কৃষি-উৎপাদনের নতুন আধুনিক উপকরণগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে উৎপাদন-ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে বহুদিন ধরে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তির ক্ষয় হয়। এসবের মিলিত প্রভাবে কৃষি-উৎপাদন ক্রমশ উদ্বৃত্তহীন বন্ধ্যা একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত হতে থাকে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে পঞ্জাবের কৃষির ওপর সুখপাল সিং এবং অন্যান্যরা (২০০৮)[৪] যে-সমীক্ষাভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে এই পর্যবেক্ষণের সমর্থন মেলে। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যদিও নতুন উচ্চফলনশীল বীজ ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন নতুন উপকরণের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জোগান সরকারি তরফে বাড়ানো হয়েছে, বিশেষত কো-অপারেটিভ ঋণদাতা সংস্থার তরফে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, তবুও প্রয়োজনের তুলনায় এই ঋণ যথেষ্ট না হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির প্রভাবও বেড়েছে যথেষ্ট। দেখা যায়, কমিশন এজেন্ট এইসময় আবার নতুন রূপে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের যে-ব্যবস্থা আছে তা যে কেবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তা-ই নয়, তার নাগাল পাওয়া সবসময় চাষির পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, নিরক্ষর চাষির নিরিখে এই ঋণ পাওয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং ঋণ পেতে গেলে চাষিকে অনেকটা ব্যয় বহন করতে হয়। সে সব কারণে ৯০-এর দশক অবধি ক্রমাগত অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ভূমিকা হ্রাস পেলেও ৯০-এর দশক এবং তার পর থেকে আবার নতুন করে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির ভূমিকা বাড়তে থাকে। শেরগিল(১৯৯৭)[৫] তাঁর তৃণমূল স্তরে সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখান যে, ওই সময়ে পঞ্জাবের চাষিদের মোট ঋণ ছিল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূল্যের শতকরা ৩২ ভাগ। তাঁর সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, দীর্ঘকালীন ঋণে সংগঠিত বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভূমিকা বেশি হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রাধান্য স্বল্পকালীন ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা ৬১.৩১ ভাগ। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দেওয়া তথ্য থেকে আমরা পাই, ১৯৭০–৭১ থেকে মোট ঋণ বৃদ্ধির কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল উৎপাদনশীলতা হ্রাস, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি এবং চাষের স্থির পুঁজির ওপর ব্যয়বৃদ্ধি, কিছু অ-কৃষি ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি। পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাবার্ড চেয়ার ইউনিট-এর পক্ষ থেকে ১৯৯৮–'৯৯ সালে পঞ্জাবের সুতি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে করা সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পঞ্জাবের চাষিদের ঋণগ্রস্ততা বাড়ার কারণগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান কারণ ছিল, কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস, তুলা উৎপাদনের ব্যয়ের অস্বভাবিক বৃদ্ধি, মুনাফার হারের হ্রাস, এবং অ-কৃষিঘটিত ক্ষেত্রে, যেমন বাড়ি তৈরির খাতে বিপুল ব্যয়। সরকারি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০০৮ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ঋণগ্রস্ততার কারণে পঞ্জাবের চাষিদের ২১১৬জন আত্মহত্যা করেছে। কৃষক ইউনিয়নের হিসাবে পঞ্জাবের চাষিদের ঋণগ্রস্ততার কারণে আত্মহত্যার সংখ্যাটি ১৩০০০। সুখপাল সিং এবং অন্যান্যরা পঞ্জাবের ১১টি জেলার ৬০০জন চাষির ঋণগ্রস্ততার নানা দিক নিয়ে একটি নমুনা সমীক্ষা চালিয়ে নানা পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি মোট ঋণের শতকরা ৬১.৯ ভাগ ঋণ সরবরাহ করে, আর অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস সরবরাহ করে বাকি শতকরা ৩৮.১ ভাগ। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির মধ্যে কমিশন এজেন্টদের ভূমিকা

সবচেয়ে বেশি। এরা মোট অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের শতকরা ৮৪.০৪ ভাগ সরবরাহ করত এবং প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে মোট ঋণের শতকরা ৩২ ভাগ সরবরাহ করত।[৬]

এর আগে ২০০৬ সালে সৃজিত মিশ্র মহারাষ্ট্রে চাষিদের ঋণের কারণে আত্মহত্যা প্রসঙ্গে একটি বিশ্লেষণমূলক লেখাতে[৭] মহারাষ্ট্রের তুলাচাষিদের দুর্দশার যে কারণগুলি উল্লেখ করেন তা হল, প্রথমত কৃষিক্ষেত্রে ক্রমশ নেমে আসা মুনাফার হার, দ্বিতীয়ত বিশ্ব-বাজারে সস্তায় আমেরিকার তুলার অঢেল জোগান, আমদানি শুল্কের নিম্ন হার, সরকারি সংগ্রহনীতির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগের ক্রমাবনয়ন, সরকারি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্রমহ্রাসমান ভূমিকা। এখন চাষিরা সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শের জন্য কৃষি উপকরণ-বিক্রেতার ওপর নির্ভর করে। তার ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাজারে জোগানদাতাদের চাপে তৈরি চাহিদা এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহারের প্রবণতা। অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অর্থ অধিক সুদ। অনেক সময় চাষিকে একশো টাকায় মাসে ১০/১২ টাকা সুদ দিতে হয়। এর সঙ্গে বন্ধকি ব্যবস্থার শর্তও যুক্ত থাকে। বন্ধকি ব্যবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঋণের দায়ে চাষির জমি মহাজনের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এই মহাজন অনেক সময়ে একই সঙ্গে ব্যবসায়ী বা কমিশন এজেন্ট, যে সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির ব্যবসা করে। অনেক সময়েই ভবিষ্যতে ফসল বিনিময়ের শর্তে কৃষি উপকরণ কেনার আগাম ব্যবস্থা চালু থাকে। এই ব্যবস্থায় চাষি দু'দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, তাকে ফসলের বিনিময়ে সার, বীজ, কীটনাশকের দাম চোকাতে হয় বাজার-দামের তুলনায় বেশি দামে, দ্বিতীয়ত, সে যখন ফসল বিনিময়ের মাধ্যমে এই উপকরণগুলির দাম মেটায় তখন ফসলের বাজার-দাম সর্বনিম্ন স্তরে থাকে। চাষি ইচ্ছা করলেও পরে বাজারে দাম উঠলে বেশি দামের সুযোগ নেওয়ার আশায় ফসল ধরে রাখতে পারে না। এই ফসলের সর্বনিম্ন দামের হিসাবে উপকরণগুলির বর্ধিত দাম দিতে সে বাধ্য হয়। এইভাবে দামের হেরফেরের মাধ্যমে ব্যবসায়ী চাষির কাছে অনেক বেশি পরিমাণ ফসল দাবি করে ও এই অসম বিনিময়ের মাধ্যমে তার সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত মূল্যের অনেকটা অংশ আত্মসাৎ করে। চাষের ব্যয় অস্বাভাবিক বাড়ে। জোগানদাতার ওপরেই তার সরবরাহ করা আধুনিক উপকরণগুলি কখন কতটা পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে সে-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকায় এই ব্যবস্থায় জোগানদাতার প্রত্যক্ষ মদতে উপকরণের বাজারে একধরনের কৃত্রিমভাবে বর্ধিত চাহিদা তৈরি হয়। অত্যধিক সার প্রয়োগের পরিণামে কালক্রমে জমির উৎপাদনশীলতার ওপর ক্ষতিকারক চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে সর্বত্রই একদিকে কৃষি-জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাসের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদন-ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি চাষে মুনাফার হার কমিয়ে দিচ্ছে।

এ ছাড়া গ্রামে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বড় উৎস হল মহাজনেরা, যারা যথেষ্ট বেশি হারে সুদ নিয়ে টাকা ধার দিয়ে থাকে। এই ঋণ স্বল্পকালীন ঋণ এবং সুদের হার অস্বাভাবিক। ১০০ টাকার বিনিময়ে চাষিকে অনেক সময়ে ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ১৫০ টাকা ফেরত দিতে হয়। গ্রামের সামাজিক জীবনে এই মহাজনদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে সবথেকে বেশি। সৃজিত মিশ্র ৯৮টি গ্রামের মানুষদের নিয়ে ৬জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে যে-দলভিত্তিক আলোচনা করেছেন তা থেকে এই তথ্য উঠে আসে। মহারাষ্ট্রের মতো একটি এগিয়ে থাকা রাজ্যেও সৃজিত মিশ্র এই পিছিয়ে পড়া পরিস্থিতির উপস্থিতি লক্ষ করেছেন ২০০৬ সালে। ওড়িশা,

বিহার, ঝাড়খণ্ডের মতো অন্যান্য তুলনায় অনগ্রসর রাজ্যগুলিতে গ্রামাঞ্চলের সমাজব্যবস্থা ও চাষিদের অবস্থা সম্পর্কে সহজেই অনুমেয়।

গ্রামাঞ্চলের ১০/১২ বছর আগের এই চিত্র ২০১৭ সালেও খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। আমরা জ্ঞান সিং এবং অন্যান্যদের (২০১৭) সমীক্ষা থেকে জানতে পারি, ২০১৭ সালেও পঞ্জাবের কৃষি একই ধরনের সমস্যার শিকার। কৃষি-উৎপাদন হ্রাস, কৃষি-উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দীর্ঘদিন একই স্তরে থেকে যাওয়া, এইসব কারণে চাষি দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফলে তার পক্ষে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, সে জীবন চালানোর জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হয়। গরিব চাষি ও কৃষি-শ্রমিক যথেষ্ট বন্ধকি রাখার মতো সংগতির অভাবে ব্যাংক-ঋণের নাগাল পায় না, ঋণের জন্য তাদের অসংগঠিত উৎসগুলির ওপরই নির্ভর করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে চাষিদের জন্য যা-কিছু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থাকে, সে সবই বড় চাষিরা তাদের অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে করায়ত্ত করে। ফলে ছোট চাষি বা কৃষি-শ্রমিকের নাগালে কোনও সুযোগই থাকে না। ঋণের জন্য এদের বড় চাষির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত ঋণ, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক-ঋণ অনেক সুলভ হয়েছে, তবুও কোনও কোনও দুর্বলতর শ্রেণির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক-ঋণ যথেষ্ট লভ্য নয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ ও সমবায় ব্যাংক-ঋণ সংগঠিত ঋণের প্রধান দু'টি মাধ্যম। কিন্তু তৃতীয় প্রধান মাধ্যম হিসেবে কমিশন এজেন্টদের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো। এদের পরই প্রাধান্যের দিক থেকে রয়েছে বড় চাষির ভূমিকা। বড় চাষি গ্রামসমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে সমস্ত সরকারি আর্থিক সুবিধা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তারা ব্যাংক-ঋণের একটি বড় অংশ করায়ত্ত করে, ও অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণির পক্ষে ঋণ পাওয়ার কাজকে করে তোলে কঠিনতর।

অসংগঠিত ঋণের বাজারে ঋণের দাম, অর্থাৎ সুদ কীভাবে নির্ধারিত হয় সেটি একটি বড় প্রশ্ন। আমরা দেখেছি, সুদের পরিমাণ অনেক সময়েই টাকার অঙ্কে প্রকাশ পায় না, অনেক সময়েই ঋণের লেনদেন প্রক্রিয়ার মধ্যে সুদ প্রচ্ছন্ন থাকে। অনেক সময়ে সুদ টাকার অঙ্কে দেওয়া হয় না, উৎপাদিত শস্যের আকারে দেওয়া হয়। কিন্তু অসংগঠিত ঋণের বাজারে সুদ সবসময়েই সংগঠিত বাজারের সুদের তুলনায় বেশি। অসংগঠিত ঋণের বাজারে সুদ কেন সংগঠিত বাজারের সুদের তুলনায় সর্বদা বেশি হয় আমরা এখন সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব।

অসংগঠিত ঋণের বাজারে সুদ বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে সাধারণত এই যুক্তিটি দেওয়া হয়ে থাকে যে, অসংগঠিত বাজারে ঋণের ওপর সুদের পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধ বিষয়ে শর্তাবলি সাধারণত লিখিতভাবে স্থির হয় না। ফলে সর্বদাই সময়মতো ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। মৌখিকভাবে যে-চুক্তি করা হয় প্রকৃতপক্ষে সেই চুক্তি প্রায়ই লঙ্ঘিত হয় এবং প্রকৃত সুদ যেটি ঋণদাতা ফেরত পায় তা চুক্তি অনুযায়ী সুদের পরিমাণের তুলনায় কম। এই কারণে প্রকৃত সুদের একটি গ্রহণযোগ্য হার বজায় রাখার জন্য চুক্তি করার সময় সুদের হার অনেকটা বেশি রাখা হয়। এই যুক্তির স্বপক্ষে যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা আমরা নীচে আলোচনা করেছি।

ধরি সংগঠিত বাজার থেকে r সুদের হারে b পরিমাণ ঋণ নেওয়া হল এবং এই ঋণ আবার অসংগঠিত বাজারে i $(i > r)$ সুদে ঋণ দেওয়া হল। মনে করি অসংগঠিত বাজারে ঋণ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি, অসংগঠিত বাজারে খাটানো b পরিমাণ ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা p এবং তার প্রতি একক ঋণ থেকে প্রত্যাশিত আয় $E > 0$

$$E = \{(1 + i)\, pb - (1 + r)b\}/b$$
$$= (1 + i)\, p - (1 + r)$$
$$E = ip - (1 - p) - r$$
$$E < i$$
$$r \geq 0$$

যে-ক্ষেত্রে তার ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে, অর্থাৎ যে-ক্ষেত্রে $p = 1$, $E = i - r$, অসংগঠিত বাজারে সুদ বা সংগঠিত বাজারের সুদ বা তার সংগঠিত বাজার থেকে ঋণ নিয়ে মহাজনি ব্যবসা চালানোর খরচ বাদ দিয়ে অসংগঠিত বাজারের সুদের সমান। সংগঠিত বাজারে সুদের পরিমাণ যত বেশি অসংগঠিত বাজারে মহাজনি বা ব্যবসা থেকে আয় তত কম। দু'টি পৃথক অবস্থানে, যখন $p = 1$ ও যখন $p < 1$, তখন এ দুয়ের মধ্যে আয়ের পার্থক্য হল

$$i - r - [ip - (1 - p) - r] = i - ip + (1 - p)$$
$$i - ip + (1 - p) = (1 + i) - p(1 + i)$$
$$= (1 + i)(1 - P)>0$$

অর্থাৎ যখন ঋণ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি, তখন তা মহাজনি থেকে তার আয় ফেরত পাওয়ার পূর্ণ-নিশ্চয়তার অবস্থার তুলনায় $(1 + i)(1 - P)$ পরিমাণ কম। যতই ফেরত পাওয়ার অনিশ্চয়তা বাড়বে ততই ঋণ-ব্যবসা থেকে তার আয় কম হবে। ফেরত পাওয়ার পূর্ণ-নিশ্চয়তার অভাব থাকায় অসংগঠিত বাজারের সুদ বাড়িয়ে রাখা হয়। এবং সংগঠিত বাজারে সুদের হার বাড়লে অসংগঠিত বাজারে সুদের হারও বাড়ে।

তবে, এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সপক্ষে যে-অনুমানটি রয়েছে সেটি বাস্তবে কতটা সঠিক সে-বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও অসংগঠিত বাজারে ঋণ ফেরত না-পাওয়ার সম্ভাবনা দিয়ে অসংগঠিত ঋণের অত্যধিক সুদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করা হয় কিন্তু বাস্তবে তেমন কোনও প্রমাণ নেই যে, অসংগঠিত ঋণ ফেরত না-পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অসংগঠিত ঋণের বাজারটি খণ্ডিত। অসংগঠিত বাজারের এক-একটি অংশে ঋণ ফেরতের শর্তাবলি ভিন্ন ভিন্ন এবং এক-একটি বাজারে ঋণপ্রত্যাশী মানুষের ঋণের প্রয়োজনও ভিন্ন ধরনের। এক-একটি বাজারে ঋণপ্রত্যাশী মানুষ তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ এক মহাজনের মুখোমুখি হয়। কখনও ঋণপ্রত্যাশী মানুষটি একজন শ্রমিক, যে তার নিয়োগকর্তার কাছে ঋণ চাইছে, কখনও

সে একজন ভাগচাষি, যে জমির মালিকের কাছে অসময়ে খাদ্যঋণ প্রত্যাশা করছে। এইভাবে প্রতিক্ষেত্রে ঋণপ্রত্যাশী লোকটি ঋণের জন্য একজন একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী মানুষের কাছে হাত পাতছে। ফলে অনেক সময়েই অসংগঠিত বাজারে ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসা একচেটিয়া বাজারের নিয়মে চলে। একচেটিয়া বাজারের নিয়মেই অসংগঠিত বাজারে ঋণদান প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে সংগঠিত বাজারের চলতি সুদকে প্রকৃত ব্যয় অথবা বিকল্প সুযোগটি গ্রহণ না করার ব্যয় হিসেবে ধরে অসংগঠিত বাজারে ঋণদান থেকে তার নিট আয় সর্বোচ্চ হতে পারে।

ধরি সে b পরিমাণ টাকা সংগঠিত বাজার থেকে r সুদে ধার নেয় বা তার জমা টাকা সংগঠিত ক্ষেত্রে না খাটিয়ে সে প্রতি টাকায় r হারে ক্ষতির বিনিময়ে ওই টাকা অসংগঠিত ক্ষেত্রে i সুদে ধার দেয়, যেখানে এই সুদের পরিমাণ নির্ভর করে সুদের বিভিন্ন পরিমাণ অনুযায়ী কত পরিমাণ টাকা ধার দেওয়া যেতে পারে তার ওপর। অর্থাৎ, অসংগঠিত বাজারে ওই ঋণের ওপর সে কতটা সুদ চাইবে তা নির্ভর করবে ঋণের চাহিদার ওপর । অর্থাৎ $i = i(b)$ সেক্ষেত্রে তার নিট আয় হবে:

$$i(b).b - br$$

তার লক্ষ্য হবে এমনভাবে b-এর পরিমাণ স্থির করা যাতে তার এই আয় সর্বোচ্চ হতে পারে। b-এর পরিমাণ ঠিক হলে সেখান থেকে i-এর পরিমাণ ঠিক হয়ে যাবে, যেহেতু $i = i(b)$

$$[i(b).b]/b - r = 0 \qquad ১$$

$$i^{'}(b)b + i(b) = r$$

উপরের ১নং সমীকরণটির বাম পক্ষ ঋণের প্রান্তিক চাহিদা হিসেবে ধরা যেতে পারে এবং r প্রান্তিক ব্যয়। এই সমীকরণের সমাধান থেকে b-এর মান পাব, যাতে

$b = b^*$, এবং $i = i^* = i(b^*)$ পাওয়া যাবে।

চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্কটি জানা থাকার অর্থ আমরা b-এর বিভিন্ন মানের জন্য i-এর পরিমাণ অর্থাৎ i(b) রেখাটি জানি। প্রান্তিক চাহিদারেখাটি একটি নিম্নগামী রেখা অর্থাৎ ঋণের দাম বা সুদের সঙ্গে ঋণের চাহিদার বিপরীতগামী সম্পর্ক রয়েছে। গড় আয় রেখা বা $i = i(b)$ একটি নিম্নগামী রেখা। যেহেতু প্রান্তিক চাহিদারেখা একটি নিম্নগামী রেখা এবং $b = b^*$ স্তরের জন্য প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের বা r-এর সমান যেহেতু গড় আয় সব b-এর জন্যই প্রান্তিক আয়ের থেকে বেশি, তাই যে b^*-এর জন্য r প্রান্তিক খরচের সমান সেই পরিমাণটির সঙ্গে $i = i(b)$ রেখা বা গড় আয়রেখা থেকে যে i^* পাওয়া যাবে সেই i^*, r-এর থেকে বড় হবে। অর্থাৎ $i^* > r$।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতো দেশের কৃষি-ঋণের সংগঠিত বাজার এতটা সুসংবদ্ধ নয় যে, অর্থনীতির একচেটিয়া বাজারের তত্ত্বটি নিয়মমাফিক অনুসরণ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একচেটিয়া মহাজন

সুদের এত বেশি চড়া হার ধার্য করে যে, ছোট ও মাঝারি চাষির পক্ষে সময়মতো সুদ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, ফলে সুদের পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে জমে ওঠে। মহাজন চুক্তি করার সময়েই সুদের সঙ্গে অন্যান্য যে-শর্তাবলি যুক্ত করে তার মধ্যেই থাকে বন্ধকির শর্ত। সময়মতো সুদ সমেত আসল ফেরত না পেলে চাষির সম্পত্তি মহাজন অধিকার করে নেয়। এটি বিশেষ করে তখনই ঘটে যখন বন্ধকি রাখা বস্তুটি মহাজনের কাছে বিশেষ মূল্যবান ও আকর্ষণীয় মনে হয়। মহাজনের লক্ষ্য থাকে ওই সম্পত্তির প্রতি এবং প্রথম সুযোগেই সে সম্পত্তিটি গ্রাস করে। অথবা নিঃস্ব চাষি শেষপর্যন্ত ঋণ-বন্ধকি শ্রমিকে পরিণত হয়। এই মহাজন সবসময়ে পেশাদার মহাজন নাও হতে পারে। তারা বড় জমির মালিক, বড় চাষি হতে পারে। তারা আত্মীয় ও বন্ধু নামেও থাকতে পারে। অথবা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী বা বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ীও হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. Harriss-White, B. 2008. *Rural Commercial Capital Agricultural Markets in West Bengal.* 1st Edition. Oxford University Press.

২. তদেব

৩. Rudra, A. 1975. “Loan as a part of Agrarian Relations – some Results of a Preliminary Survey In West Bengal.” *Economic and Political Weekly*. vol 10 no 8.

৪. Kingra, H. S. M.Kaur, S. Singh. 2008. “Indebtedness among Farmers in Punjab.” *Economic and political Weekly*. vol 43 no 26–27.

৫. Shergill, H. S. 1997. *Rural Credit and indebtedness in Punjab*. Chandigarh: Institute of Development and Communication.

৬. তদেব

৭. Mishra, S. 2006. “Farmers’ Suicides in Maharashtra.” *Economic and Political Weekly*. vol 41, no 26.

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিপণ্যের বাজার

কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণের যুক্ত বাজার প্রক্রিয়া

ঐতিহাসিক ভাবে এদেশে কৃষিপণ্যের বাজার গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ও স্থানীয় ব্যবসায়ী-ছোট উৎপাদকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। পরবর্তী কালে ভারতীয় কৃষি-পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে দেশীয় বড় ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্টদের প্রাধান্য বাড়ে। তুলার মতো বাণিজ্যিক পণ্যে দীর্ঘদিন এই অবস্থা চালু ছিল। স্বাধীনতার পরেও বৈদেশিক বাণিজ্য অনেকাংশে বিদেশি বণিক ও দেশি এজেন্টদের হাতেই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই একটি বণিক-মহাজন শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা বাংলা দেশে ধান-চালের মতো খাদ্যপণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব ছোট বিক্রেতাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ বৃহৎ ও মাঝারি চাষিদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গম উৎপাদনের অঞ্চলে গমের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা তৈরি হয়। যদিও চাষিরা মূলত নিজ পরিবারের ভোগের জন্যই তা উৎপাদন করত, বাজারের উদ্দেশ্যে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন প্রায় হতই না, তবুও কর দেওয়া, ঋণ পরিশোধ করা বা ভোগের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার প্রয়োজন থেকেই ধান, চাল, গম ইত্যাদির স্থানীয় ছোট বাজার গড়ে ওঠে ও এই ব্যবসায় স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীদের ভূমিকা বাড়ে। ব্রিটিশযুগেই জমিদাররা সরাসরি বাজারে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করত না। কারণ তারা খাজনা নিত টাকার অঙ্কে, সেই টাকা থেকে ব্রিটিশরাজকে কর দিত টাকার অঙ্কে। ফলে ছোট-বড়-মাঝারি সব চাষিকেই খাজনা দেওয়ার জন্য বাজারে শস্য বিক্রি করতে হত। রায়তওয়ারি জায়গাগুলিতে সরাসরি কর দেওয়ার জন্য ফসল বিক্রি করতে হত। ফলে ফসলের একটা ভাল অংশ বাজারে বিক্রি হত, আবার ছোট চাষিকে অসময়ে হয় মহাজন-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ধার করতে হত বা টাকা ধার নিয়ে বাজার থেকে ফসল কিনতে হত। ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগই একই সঙ্গে মহাজনি কারবারে টাকা খাটাত, কেউ কেউ এর সঙ্গে সার ইত্যাদি কৃষি-উপকরণের ব্যবসা করত, সবক্ষেত্রেই ব্যাপক মহাজনি কারবার চলত। বড় ব্যবসায়ী-মহাজনরা ছোট ব্যবসায়ীদের পণ্য একত্রিত করে তুলনামূলক বড় আকারে অন্যান্য জায়গায় চালান দিত। দেশের মধ্যেই অতিরিক্ত উৎপাদনের অঞ্চলগুলি থেকে যে-অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন কম হয়, সেখানকার সঙ্গে কেনা-বেচা চলত। বাণিজ্যিক পণ্যগুলির মতো অত বৃহৎ আকারে অবশ্যই বাণিজ্য চলত না। তার কারণ বাণিজ্যিক পণ্যের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকদের যোগাযোগ ছিল, অনেক সময় দেশি বণিকরা বিদেশি বণিকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে জোগানের শৃংখলটি অত বিস্তৃত ছিল না।

ধীরে ধীরে খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে বড় পাইকার-দালালদের উদ্ভব হয়। এক-একটি খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য বাজারে আলাদা আলাদা জোগান-শৃংখল তৈরি হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ক্রমে চালকল মালিকরা স্থানীয় পণ্যের বাজারে অনুপ্রবেশ করে। এরা ছোট-মাঝারি উৎপাদকদের মধ্যে ফসল ওঠার পরপরই সেই সময়কার কম বাজার-মূল্যের হিসাবে ফসলের বিনিময়ে শোধ করার শর্তে আগাম টাকা বিতরণ করে। এই ভাবে গ্রামীণ ছোট-মাঝারি উৎপাদকের উৎপাদিত সমস্ত শস্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে। গ্রামের বড় জমির মালিক অনেক ক্ষেত্রেই ধান চালের ব্যবসা করে, এরাই চালকল মালিকের কমিশন এজেন্টের কাজও করে। সেইসঙ্গে এরা অনেক ক্ষেত্রেই সার-বীজ-কীটনাশকের ব্যবসাও করে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সার-বীজ-কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অত্যন্ত দামি উৎপাদনের উপকরণ অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বহুল পরিমাণে। চাষির পক্ষে চাষের খরচ মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতে ফসল ওঠার পর শোধ করার শর্তে টাকা বা উৎপাদনের উপকরণগুলি তখন কমিশন এজেন্টের কাছ থেকে ধার নেওয়ার জন্য নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় থাকে না। এর ওপর যেহেতু নতুন কৃষি-উপকরণ ব্যবহারের পদ্ধতি, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়েও তাকে কমিশন এজেন্টের পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে হয়, ফলে এই জোগানদাতার পরামর্শ অনুযায়ীই চাহিদা নির্ধারিত হয়। উপকরণের বাজারে জোগানদাতার সিদ্ধান্ত ও বিচারবিবেচনা অনুযায়ী বিক্রির পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে, গ্রহীতার কোনও স্বাধীন ভূমিকা থাকে না। বিশেষ করে এই বাজারটি ঋণের বাজার ও পণ্যের বাজারের সঙ্গে যুক্তভাবে ক্রিয়া করে বলে এখানে পণ্য ও উপকরণের দামের ওপর ঋণদাতা, উপকরণ জোগানদারের একাধিপত্য কাজ করে। বাজার-ব্যবস্থার স্বাভাবিক ক্রিয়াকে তা বিকৃত করে। গ্রামের অপেক্ষাকৃত ছোট উৎপাদকের ওপর একদিকে বড় ব্যবসায়ী চাষি-মহাজন, অন্যদিকে কমিশন এজেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উৎপাদিত উদ্বৃত্তকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে লাগানো যায় না। যা কিছু উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় তা বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির যৌথ ক্রিয়ায় কমিশন এজেন্ট বা বণিক মহাজন—বড় চাষির হাতে জমা হয় এবং ওই ব্যবসা-শৃংখলের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। বিক্রি সংক্রান্ত সরকারি হিসাবে অনেক সময়েই পণ্যের বাজারে এই কমিশন এজেন্ট বা বড় চাষি-মহাজনরা পণ্যের ক্রেতা হিসেবে বা রাইস মিলে পণ্যবিক্রেতা হিসেবে যে-ভূমিকা পালন করে তা উল্লিখিত হয় না।

সারণি ৭.১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৩-র মধ্যে প্রতি ১০০০ জন কৃষকের কয়েকটি নির্দিষ্ট ফসল বিক্রির বিবরণ (বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে)

শস্য	স্থানীয় ব্যবসায়ী	মান্ডি	কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ী	সমবায় ও সরকারি সংস্থা	প্রক্রিয়াকারক	অন্যান্য	সমস্ত
ধান	৪৬০	৯৫	৪৭	২৮	৬	১২	৬৩৮
ভুট্টা	৫১৪	১৩৬	৬১	১৯	০	৫	৭১৯
গম	১৮১	১২৮	৩৪	২৫	১	৪	৩৬৮
ছোলা	২২৩	২৪৯	৫৮	২	০	৩	৫৩২
অড়হর	১৫৬	১২২	৩৬	০	০	২	৩১৭
মুগ	৩৯১	৩৮	৪	৬	০	৩	৪৪২
মুসুর	২১৯	৮৪	৯১	০	০	০	৩৯৩
আখ	২১৫	৪৯	১০	৪১৭	২৫৫	৭	৯৪৩
আলু	৩৮৩	১২৬	৩২	১	১	২	৫৩৪
তুলো	৪১৫	২২৯	২৩৪	১১	৩৫	১	৯২৩

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

সারণি ৭.২ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৩-র মধ্যে বিক্রি হওয়া ফসলের বিভিন্ন এজেন্সি অনুযায়ী শতকরা বিভাজন

শস্য	স্থানীয় ব্যবসায়ী	মান্ডি	কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ী	সমবায় ও সরকারি সংস্থা	প্রক্রিয়াকারক	অন্যান্য	সমস্ত
ধান	৬৪	১৭	১১	৬	১	১	১০০
ভুট্টা	৬৩	১৬	৫	১৫	০	১	১০০
গম	২৯	৪৪	৭	১৯	০	০	১০০
ছোলা	৩০	৬৪	৫	১	০	০	১০০
অড়হর	৪৪	৪৯	৬	১	০	০	১০০
মুগ	৭৯	১৮	০	৩	০	০	১০০
মুসুর	৫০	৩৮	১২	০	০	০	১০০
আখ	১৬	২	২	৫৭	২৩	০	১০০
আলু	৭৩	২১	৪	০	০	১	১০০
তুলো	৫১	১৬	৩০	১	২	০	১০০

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

উন্নত কৃষি-অর্থনীতিতে শিল্পজাত দ্রব্যের মতোই কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হল বাজার। এবং কোনও বছরে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদনে জমির বণ্টন ও উৎপাদিত শস্যের বাজারজাত অংশের তুলনামূলক পরিমাণ আগের কয়েক বছরে বিভিন্ন শস্যের দামের অনুপাতের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতের কৃষিতে প্রান্তিক ও ছোট চাষিদের প্রাধান্য থাকলেও কৃষিপণ্যের একটা বড় অংশ বাজারজাত হয়। চাষি তার মোট উৎপাদিত ফসলের সব অংশই যে বাজারজাত করে এমন নয়। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে একটা অংশ সে নিজের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগায়। বিশেষ করে আমরা দেখেছি, ভারতের কৃষিতে পারিবারিক শ্রম এখনও অনেকটা পরিমাণে শ্রমের চাহিদা মেটায়, তাই স্বাভাবিকভাবেই শস্যের একটা বড় অংশ পারিবারিক ভোগে সরাসরি কাজে লাগে। ফলে শস্যের যতটা অংশ বাজারজাত করা যেত, এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না। বাকি অংশের খানিকটা ক্ষেত্রবিশেষে বীজের জন্য রাখে। অনেকসময় ঋণের শর্ত অনুযায়ী পুরনো ঋণ ফসলের মাধ্যমেই শোধ দিতে হয়। এই অংশ রেখে দেওয়ার পর বাকি অংশ সে বাজারজাত করে। এই বাজারজাত করার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে সংসারের ভোগ্য পণ্য কেনা। আবার কখনও কখনও অর্থের মূল্যেও ঋণ পরিশোধ করার শর্ত থাকে। সে ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত অনুযায়ী ফসল ওঠার ঠিক পরে আর্থিক মূল্যে ঋণ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতার জন্য ফসল বাজারজাত করার দরকার হয়। এছাড়া উৎপাদনে সার, কীটনাশক, সেচের জল ইত্যাদির ব্যয় মেটানোর জন্য ফসল বাজারজাত করার দরকার হয়। চাষি তার ফসলের কতটা অংশ রেখে কতটা অংশ বিক্রি করবে তা সবসময় বাজার-দামের ওপর নির্ভর করে

না। জোতের আয়তন, চাষি পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ, চাষির ঋণগ্রস্ততা, ঋণ পরিশোধের শর্ত, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ ও দাম ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ওপর এটি নির্ভর করে। অনেক সময় প্রান্তিক ও ছোট চাষি এই সব নানা প্রয়োজনে ফসল ওঠার ঠিক পরেই ফসলের একটা বড় অংশ কম দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর সারা বছর ধরে সে তার পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য বাজার থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য থাকে। প্রান্তিক ও ছোট চাষি যে-পরিমাণ ফসল বাজারজাত করে, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ফসল বাজার থেকে কেনে। অর্থাৎ তার নিট বিক্রির পরিমাণ প্রায়শই ঋণাত্মক। ফলে ছোট ও মাঝারি গোত্রের নানা আয়তনের জোত আছে যে-চাষিদের, তাদের মোট উৎপাদনের নিট বাজারজাত শস্যের পরিমাণ শতাংশের হিসেবে প্রায়ই ঋণাত্মক। এর থেকে বড় আয়তনের জোতের চাষিদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি শুধু যে ধনাত্মক তাই নয়, জোতের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট উৎপাদনে বাজারজাত পরিমাণের শতাংশ বাড়তে থাকে। জোতের আয়তনের সঙ্গে ফসলের বাজারজাত অংশের সম্পর্ক নিয়ে কোনও কোনও কৃষি অর্থনীতিবিদ এই পর্যবেক্ষণটিকে ভারতীয় কৃষিতে সাধারণভাবে প্রযুক্ত একটি নিয়ম হিসেবে দেখেছেন।

বাজারজাত কৃষিজের একটা অংশ খোলা বাজারে বিক্রি হয় ও একটা অংশ সরকার ফসল ওঠার পর সহায়ক মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারে। উৎপাদনব্যয় অনুযায়ী সহায়ক মূল্য স্থির হয়। এই অংশটি রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছয়। রেশন ব্যবস্থার নতুন নীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র দারিদ্ররেখার নীচে অবস্থিত মানুষকে রেশন ব্যবস্থার পূর্ণ সুবিধা দেওয়ার কথা, দারিদ্রসীমার ওপরে বাসকারী মানুষদের জন্য রেশনব্যবস্থার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। পণ্যের এই সরকার-সংগৃহীত অংশটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ খোলা বাজারে বিক্রির প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট দীর্ঘ। ছোট ব্যবসায়ী থেকে আড়তদার ও তার থেকে ছোট বিক্রেতা – এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় বহু স্তরে বহু ব্যক্তি যুক্ত থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই বড় চাষি, পণ্য ব্যবসায়ী, জল ও কৃষি উপকরণের জোগানদার ও মহাজনরা তাদের যুক্ত-বাজারের কার্যকারিতা মারফত একই সঙ্গে পণ্যের বাজার, ঋণের বাজার ও কৃষি-উপকরণের বাজারের একটি অংশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এইসব কারণে শস্যের বাজার-দাম ও চাষির প্রাপ্ত দামের মধ্যে তফাত ঘটে এবং তা বিভিন্ন মাপের জোতের চাষিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। এই তফাতের পরিমাণ স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজার প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়মে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের বিপরীত যুক্তি ও তথ্যগত ভিত্তি অত্যন্ত জোরালো।

এই ধরনের যুক্ত-বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই সঙ্গে কীভাবে ঋণ, কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের বাজার ক্রিয়া করে, তার বিস্তারিত বিবরণ মেলে তৃণমূল স্তরে সমীক্ষাতে। এই বিষয়টি দেখার জন্য আমরা ১৯৮৯–৯০ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোসাল সায়েন্স রিসার্চের আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার পাঁচটি গ্রামের একটি অঞ্চলে জোত স্তরে সমীক্ষা চালাই।[১] ওই অঞ্চলের মোট ৪৮০টি কৃষক পরিবারের মধ্য থেকে ১ হেক্টরের ওপর জমি চাষ করে এমন ৩৩০টি চাষি পরিবারকে বেছে নিয়ে এদের উৎপাদন, ফসল বিক্রি, সেইসঙ্গে কৃষি-উপকরণ কেনা ও ঋণের উৎস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করি। যে-তথ্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল, ক) যদিও সমস্ত ধরনের চাষিই অল্পবিস্তর ব্যবসায়ী বা আঞ্চলিক ছোট ব্যবসায়ীদের তাদের ফসল বিক্রির চ্যানেল হিসেবে ব্যবহার করে, ছোট ও আধা-মাঝারি চাষিরা এই চ্যানেলের ওপর সবচেয়ে

বেশি নির্ভরশীল। খ) উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম চাষিদের মধ্যে একটি বড় চাষি-মাঝারি চাষির গ্রুপকে চিহ্নিত করা যায়, যাদের ওপর অন্য মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত ছোট চাষিরা চাষের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য নির্ভর করে। আগাম উপকরণগুলি নিয়ে তারা চাষে ব্যবহার করে এবং শর্ত থাকে ফসল ওঠার পর সেই সময়কার বাজার-দামের হিসেবে উপকরণের দাম ফসলে শোধ দেওয়া হবে। অথবা টাকার অঙ্কে আগাম নিয়ে তারা চাষের খরচ মেটায় ও ফসল উঠলে সেই সময়কার বাজার-দামের হিসেবে ফসলের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ করে থাকে। গ) মাঝারি ও বড় চাষিরা প্রায় প্রত্যেকেই সরাসরি চাল-কলে তাদের ফসল বিক্রি করে থাকে। বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ফসলের বেশিরভাগই এই চ্যানেলটির মাধ্যমে বাজারজাত হয়। অথচ ছোট ও আধা-মাঝারি চাষি, চাষবাসই যাদের একমাত্র পেশা হওয়ার কারণে সঙ্গতি অল্প, তাদের মধ্যে একজনও সরাসরি রাইসমিলে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারে না। এর কারণ, ঋণে উপকরণ কেনা বা টাকার অঙ্কে ঋণ নেওয়ার জন্য ফসল ওঠার আগেই তা বড় চাষি-ব্যবসায়ী-মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়ে থাকে। ঘ) কৃষি-উপকরণ ধারে নেওয়ার সময় উপকরণের চড়া দাম হিসেব করেই দাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, যদিও যে-ফসলের মাধ্যমে এই দাদন পরিশোধ করা হয় তার দাম হিসাব করা হয় ফসল ওঠার পরের কম দামে। ঙ) ধান-চালের ব্যবসায়ী বড় চাষিরা তাদের নিজ জমিতে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যথেষ্ট উৎসাহী নয়, বরং তারা তাদের হাতে জমা পণ্য বাজারজাত করে যে-আর্থিক পুঁজি আসে, তা বাণিজ্য-মহাজনি খাতে ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী। চ) এই বিভিন্ন ধরনের চাষিদের পাশাপাশি বড় চাষিদের আর-একটি ছোট দলকে চিহ্নিত করা যায়, যারা স্বাধীনভাবে তাদের পণ্য বাজারজাত করে, যারা তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী, তাই তারা ব্যবসায়িক বা মহাজনি কারবারে তাদের আর্থিক পুঁজি ব্যয় করতে আগ্রহী নয়। এই বড় চাষির দলটিকে অবশ্যই প্রগতিশীল চাষি দল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বড় চাষিদের মধ্যেকার ব্যবসায়ী-মহাজন গোষ্ঠীটি অপ্রগতিশীল। এদের কাজকর্মের কারণে শুধু এদের জোতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথ বন্ধ হয় না, আধা-মাঝারি ও ছোট চাষি, যারা তাদের ওপর ঋণের জন্য ও উপকরণের জন্য নির্ভর করে, তাদের সম্ভাব্য উদ্বৃত্তও উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পথ থেকে অনেক দূরে চলে যায়, এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মহাজনি পুঁজির আকারে অনুৎপাদনশীল খাতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষির প্রগতিশীল বিবর্তনের প্রক্রিয়া বাধা পায়। আমাদের সমীক্ষায় আমরা দেখেছি, নমুনা দলটির মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ চাষি চাষ শুরু হওয়ার সময় যে-স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছে সার ধার নিয়েছিল, তার কাছেই সারের দাম মেটানোর জন্য উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে। শতকরা ১২জন চাষি ধারে সার কিনেছিল টাকায় ধার শোধ দেওয়ার শর্তে, ফলে সেই সার ব্যবসায়ীর কাছেই তারা ধান বিক্রি করে। বাকি শতকরা ৪৭ ভাগ চাষি ধার শোধের কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নগদে স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছেই ধান বিক্রি করে। শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ চাষি দূরে শহরের বাজারে তাদের ধান বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিক থেকে নমুনাভিত্তিক অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, যে-চাষিরা ধান বিক্রি করে, তাদের মধ্যে ২০.৮০ ভাগ তা বিক্রি করে সরাসরি চাল-কলে, শতকরা ৬৯.১২ ভাগ চাষি তাদের ফসল বিক্রি করে বড় চাষি-এজেন্টদের কাছে, শতকরা ১২.০৮ ভাগ বিক্রি করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে। এদের মধ্যে আমাদের নমুনা দলের শতকরা ৪৩.৬২ ভাগ ব্যবসায়ী মহাজনদের কাছে চাষের শুরুতে নেওয়া ধার শোধ করার জন্য ধান বিক্রি করে, শতকরা ২০.৮১ ভাগ চাষি চাষের শুরুতে ধারে নেওয়া সারের দাম শোধ করার জন্য ধান বিক্রি করে থাকে।

এই অনুসন্ধানটি অনেক পুরনো, প্রায় তিন দশক আগের। তবু এটি ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির একটি অংশের বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত অন্য একটি গবেষণামূলক কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১১ সালে করা অনুরূপ একটি সমীক্ষা[২] থেকেও এই অঞ্চলের কৃষিতে উপকরণ, ঋণ ও পণ্য-বাজারের একই ধরনের যৌথ ক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। এই সমীক্ষায় দেবজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও বীরভূম এই দু'টি জেলার দুই ভিন্ন স্তরের পরিকাঠামো ও সেচের ব্যবস্থা মনে রেখে ৪৫০টি চাষি পরিবার নিয়ে জোত স্তরে চাষের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমীক্ষা করেন। এই ৪৮০টি জোতের মধ্যে ৩৬৮টি জোতের চাষি পরিবার কোনও না কোনও ধরনের ঋণের ওপর নির্ভরশীল ও ৮২টি জোতের চাষি পরিবার চাষের জন্য কোনও ঋণ করে না। ৩৬৮টি ঋণী পরিবারের মধ্যে ৫৭টি পরিবার শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়, ২৭৯টি পরিবার শুধুমাত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়, এবং ৯২টি পরিবার উভয় উৎস থেকেই ঋণ নিয়ে থাকে। অর্থাৎ দেবজিতের নমুনাটিতে ১৪৯ জন, বা ঋণী পরিবারের শতকরা ৪০.৫ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়, এবং এই ১৪৯ জনের মধ্যে শতকরা ৬১.৭ ভাগ আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণও নিয়ে থাকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলি হল ধানের ব্যবসায়ী যারা একই সঙ্গে সারের ব্যবসাও করে, শুধু ধানচালের ব্যবসা করে, শুধু সারের ব্যবসা করে, জমির মালিক যে খাজনায় জমি চাষের জন্য লিজ দেয়, বড় জমির মালিক, চাল-কল, খুচরো দোকানদার, সোনা-রুপার দোকানদার ও স্থানীয় ব্যবসায়ী। ধার নেওয়া হয় টাকা, উপকরণ, টাকা ও উপকরণ। ঋণ শোধ দেওয়ার সময় শোধ দেওয়া হয়, টাকায়, ধান-চালের মাধ্যমে, অথবা শ্রমের বিনিময়ে। দেবজিতের নমুনাটিতে টাকায় ধার নিয়ে শতকরা ৭০ ভাগ চাষি টাকাতেই ধার শোধ দেয়, শতকরা ২৮ ভাগ শোধ দেয় শ্রমের বিনিময়ে, শতকরা ৩৬ ভাগ শোধ দেয় ধান-চালের মাধ্যমে। কৃষি-উপকরণ যারা ধার নেয়, তাদের শতকরা ৬৩ ভাগ শোধ দেয় ধান-চালের মতো উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পঞ্জাবে জোত-স্তরে সমীক্ষা চালিয়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনিতা গিল (২০০৪) কৃষি-ঋণের বাজারে অনুরূপ পণ্য ও উপকরণ-বাজারের সংযুক্ত এক প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন।[৩] পাতিয়ালা ও অমৃতসরের কৃষিতে কৃষক ও জমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর এই অনুসন্ধান থেকে দেখা যায়, জমিহীন কৃষি-শ্রমিকরা বছরের যে-সময়ে যথেষ্ট কৃষি-কাজ থাকে না সে সময়ে ঋণের জন্য জমির মালিক ও কমিশন এজেন্টদের ওপর নির্ভর করে। জমির মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ তারা ব্যস্ত মরশুমে কম মজুরিতে শ্রমের বিনিময়ে শোধ করে। জমি আছে এমন চাষিরা ঋণ শোধের জন্য অনেক সময়ে জমি বন্ধকি হিসেবে রেখে বড় চাষির কাছে ঋণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ছোট চাষির জমি যথাসময়ে সুদ সমেত ঋণ শোধ করতে না পারার জন্য বড় মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

মহারাষ্ট্রের কৃষি-ঋণের বাজারেও কৃষি উপকরণের ও পণ্যের ব্যবসায়ীরা যে একই সঙ্গে ঋণ, পণ্য ও উপকরণ জোগানদাতার ভূমিকায় কাজ করে তা উল্লেখ করেছেন সৃজিত মিশ্র (২০০৬)।[৪] টাকা যখন ঋণ শোধের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তখন সুদের অত্যুচ্চ হার চাপানো হয়। এর পাশাপাশি অনেক সময়েই কৃষি-উপকরণের জোগানের বিপরীতে কৃষিপণ্যের মাধ্যমে ঋণ শোধিত হয়। ঋণের অর্থমূল্য হিসাবের সময়

উপকরণের দামের ওপর জোগানদাতার একচেটিয়া সিদ্ধান্ত কাজ করে, ফসল ওঠার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের কম দামের ওপর ভিত্তি করে ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে তৃণমূল স্তরে অনুরূপ যে-সমীক্ষা করেছেন ভি নরসিমা রাও ও কে সি সুরি (২০০৬) এবং ভি শ্রীধর (২০০৬), সেগুলিও একই ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। প্রথমত, চাষে শস্যবৈচিত্র আনার ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে খাদ্যশস্যের জন্য বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমেছে এবং তার জায়গায় অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের চাষ বেড়েছে, কিন্তু তা গরিব ছোট চাষি বা বড় চাষি কারও পক্ষেই কল্যাণকর হয়নি। বাণিজ্যিক চাষের অতিরিক্ত ব্যয় অথচ উৎপন্ন ফসলের চাহিদা ও দামের অনিশ্চয়তার কারণে চাষের ব্যয় মেটাতে গিয়ে শুরুতেই চাষিকে যে-ঋণ নিতে হয়, তার পক্ষে সেটা শোধ দেওয়া হয়ে ওঠে অসম্ভব। এই ঋণ সুদে-মূলে জমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না থাকায় চাষিকে আত্মহত্যার পথ নিতে হয়। পি নরসিমা রাও ও কে সি সুরি ২০০৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের দু'টি গ্রামে সমীক্ষার যে-ফল বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আমরা দেখি, বিটি তুলা হোক বা উচ্চফলনশীল সাধারণ তুলা, কোনও ক্ষেত্রেই চাষি বাজারে প্রাপ্ত তুলার দাম থেকে চাষের বিপুল খরচ তুলতে পারে না। দু'টি গ্রামেই, বিশেষ করে বড় ও মাঝারি চাষির, চাষ থেকে আয় ঋণাত্মক। এটি শুধু তুলা চাষের ক্ষেত্রেই নয়, ধান চাষেও ঋণাত্মক আয় খুবই দেখা যায়, কারণ ফসল ওঠার পর চাষি যে-দাম পায় তা অধিকাংশ বছরেই চাষের বিপুল খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাষের বিপুল ব্যয়বৃদ্ধির কারণ প্রথমত চাষের উপকরণগুলি, বিশেষ করে বীজ ও সারের দামের বিপুল বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত, উপকরণের জোগানদাতা যারা, সেই ব্যবসায়ী-মহাজন, কমিশন এজেন্টরাই চাষের ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষি ব্যয়বহুল আধুনিক উপকরণগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ভি শ্রীধর অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রামে সমীক্ষা করে চাষিদের আত্মহত্যার প্রসঙ্গে অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসেন। নয়া উদারীকরণ নীতির কুফলগুলি আলোচনা করে এই নীতিগুচ্ছের প্রভাব ভারতীয় কৃষিকে কীভাবে সংকটে ফেলছে সে-বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। প্রথমত, এই নীতির নির্দেশ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের মূল্যকে বিশ্ব-বাজারের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়েছে, যা চাষির জীবনে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। এই নীতির নির্দেশে কৃষিতে সবরকম সরকারি সহযোগিতার নীতি পরিহার করতে হয়েছে, ফলে সরকার আগে যে-ভরতুকিতে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ, বিশেষ করে সার, সরবরাহ করত তা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে। সরকার-ঘোষিত ন্যূনতম উৎপাদন-মূল্যের স্তর এতই কম থাকে যে তা অনেক সময়ে বাজার-দামেরও নীচে নেমে যায় এবং মোট উৎপাদনের ব্যয় পূরণ করতে পারে না। সরকারি বিনিয়োগ কমার ফলে কৃষিতে স্থির পুঁজিগঠনের মাত্রা যথেষ্ট কমেছে, বেসরকারি পুঁজিগঠন বাড়লেও তা মোট পুঁজিগঠনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্থির পুঁজির গঠনে, হ্রাসের মাত্রা কমাতে পারেনি। এসবের মিলিত কারণে কৃষি উৎপাদন কমেছে, কৃষি থেকে আয় ঋণাত্মক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তুলা চাষে এই ঋণাত্মক আয়, অর্থাৎ ক্ষতি, চাষিকে শেষপর্যন্ত মহাজনের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। আসলে অন্ধ্রপ্রদেশে বহুদিন ধরেই কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হারে নিম্নগতি লক্ষ করা যাচ্ছিল। তার ওপর খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিযুক্ত জমির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার ফলে রাজ্যে গরিব কৃষকের খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি কৃষকের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এস মহাননকুমার ও আর কে শর্মার (২০০৬) কেরালা সম্পর্কিত সমীক্ষাও অনুরূপ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। নয়া উদারীকরণ নীতির ফলে রফতানি পণ্যগুলির উপর নির্ভরশীল কৃষকদের আয় বিশেষ ভাবে

ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-বাজারে দামের ওঠানামা ও অনিশ্চয়তার কারণে কেরালার নারকেল, রাবার, গোলমরিচ, বড় এলাচ, কফি, চা ইত্যাদি বাণিজ্যিক রফতানিপ্রধান পণ্যগুলি চাষির জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে আনছে। বিশ্ব-বাজারে এইসব রফতানিমুখী পণ্যের দাম সর্বদাই ওঠানামা করে। চাষিদের পক্ষে এই অনিশ্চিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলে তাদের আত্মহত্যা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যখনই বিশ্ব-বাজারে দাম নেমে যায় এবং তাদের আয় উৎপাদন-ব্যয় মেটাতে পারে না, তারা দেশের বাজারে মহাজন-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এই ঋণ তারা পরে শোধ করতে পারবে এমন কোনও নিশ্চয়তাও থাকে না, কারণ সেটা নির্ভর করে তারা চাষ শুরু করার জন্য কতটা মূলধন জোগাড় করতে পারল এবং পরের উৎপাদন-চক্রে তারা বিশ্ব-বাজারে কী দাম পাবে তার ওপর। প্রায়শই একবার ঋণ নিলে ঋণের ফাঁদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, শেষপর্যন্ত জমা ঋণের ভার থেকে উদ্ধার না-পাওয়া চাষি আত্মহত্যার পথ নেয়।

২০১৭ সালে জ্ঞান সিং ও অন্যান্যরা[৫] পঞ্জাবের তিনটি অঞ্চলের ২৭টি গ্রাম থেকে ১০০৭টি কৃষক পরিবার ও ৩০০টি কৃষি-শ্রমিক পরিবার নিয়ে একটি নমুনাদল গঠন করে কৃষি-ঋণের বাজারের বর্তমান অবস্থা সমীক্ষা করেন। তাঁরা দেখেছেন, কৃষি-শ্রমিকরা তাদের মোট ঋণের শতকরা ৯১ ভাগের বেশি অংশ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে নিয়ে থাকে। কৃষি-শ্রমিকের কাছে ঋণের প্রধান উৎস বড় চাষিরা। প্রান্তিক চাষি তাদের মোট ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে নিয়ে থাকে। চাষির কাছে অসংগঠিত ঋণের প্রধান উৎস হল কমিশন এজেন্ট। তার পরই বড় জমির মালিকের ভূমিকা। বড় জমির মালিক এবং কমিশন এজেন্টরা তাদের অধিক ক্ষমতার জোরে কোনও অঞ্চলের ব্যাংকে কৃষকদের জন্য ধার্য ঋণের পরিমাণের বড় অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। প্রান্তিক চাষি, ছোট চাষিরা নানা শর্তে এই বড় চাষি, যারা অনেক সময় কমিশন এজেন্ট বা ব্যবসায়ীর কাজও করে, এদের কাছে কখনও চড়া সুদে টাকা, কখনও কৃষি-উপকরণ নেয়। দেখা যায় সুদের হার কখনও কখনও শতকরা ২২ থেকে ২৮ ভাগ বা তারও বেশি, এমনকী শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি হতে পারে। কৃষি-শ্রমিক ও প্রান্তিক চাষিরা সবচেয়ে বেশি সুদে ধার করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন শ্রেণির চাষি, উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে ধার শোধ দেওয়ার শর্তে ঋণ নেয়। কৃষি-শ্রমিকরা ঋণ শোধ করতে না পারলে আবদ্ধ শ্রমিকে পরিণত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসংগঠিত ঋণের বাজারের এই শর্তগুলি, এদের চাপানো সুদের হার, আবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা ইত্যাদি আইন অনুযায়ী ঘটে না। তাই সাধারণত সরকারি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় বা গবেষকের সমীক্ষায় এগুলি যথাযথ উঠে আসে না। আমাদের নিজেদের সমীক্ষা ছাড়াও উল্লিখিত বেশ কিছু সমীক্ষায় এই বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণ ও পণ্য-বাজারের একটি অংশ এই প্রকারে যৌথভাবে ক্রিয়া করে ও বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে চালু থাকে। এই বাজার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক পুঁজি একই সঙ্গে কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণ ও কৃষি-উপকরণের বাজার ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে ও তার মারফত জোগান ও চাহিদা এবং দামের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাষির সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে। ঋণ নিলে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ কেনার কাজে চাষির খরচ করার ক্ষমতা বাড়ে ঠিকই কিন্তু দামের হেরফের করে ব্যবসায়ীরা চাষির সমস্ত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। এটা ব্যবসায়ীর পক্ষে করা সম্ভব কারণ অসংখ্য ছোট ও প্রান্তিক চাষির উৎপাদন ও সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত বাজারজাত

করার প্রক্রিয়াটি থাকে ব্যবসায়ীরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এই কারণেই আমরা দেখি এমনকী অতি ছোট ও প্রান্তিক চাষিও তাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ বাজারজাত করছে। কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতি, অধিক ফলনশীল বীজ ও সারের ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতীয় কৃষি দীর্ঘকালীন স্থবিরত্বের মধ্যে পড়েছে তার অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এর প্রতিকারের জন্য আমাদের সুপারিশগুলো হল, কৃষিতে ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে উৎপাদন কাঠামোর পুনর্গঠন; একই সঙ্গে অ-কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধির অবস্থা সৃষ্টি করে কৃষি থেকে অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে অন্য উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সরিয়ে নিয়ে কৃষিতে উৎপাদন-কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে চালু রাখার অবস্থা বজায় রাখা; এবং সেই সঙ্গে কৃষি-উপকরণ, কৃষি-ঋণ ও কৃষি-পণ্যের বাজারকে পরস্পর থেকে বিযুক্ত করে তাদের স্বাধীন ক্রিয়ার রাস্তা অবাধ রাখা।

ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের একটি অংশ সরকারি ব্যবস্থায় বাজারজাত করা হয়। সরকার চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তুলা, আখ ইত্যাদি পণ্যের জন্য একটি সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে। এই সহায়ক মূল্যটি নির্ধারণ করার সময় শস্য উৎপাদনের ব্যয়ের ওপর একটি বাড়তি মূল্য যোগ করা হয়। উৎপাদন-ব্যয় হিসাবের সময় পারিবারিক শ্রমের মূল্যও বাজার-দামে হিসাব করে এতে যোগ করা হয়। বাজারে পণ্যের দাম শস্য ওঠার পরপরই খুব নীচে নেমে যায়। শস্য ওঠার পর দাম অনেক সময় এত নীচে নেমে যায় যে, চাষিদের উৎপাদন ব্যয়ের ওপর জীবনধারণের মতো কোনও উদ্বৃত্তই অবশিষ্ট থাকে না। বাজার-দামের অস্থিরতা-জনিত ক্ষতির হাত থেকে চাষিদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকার সহায়ক মূল্যে চাষিদের উৎপাদিত শস্যের একটি অংশ কিনে নেয়, এবং রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরিব ভোক্তাদের তা বিক্রি করে। কিন্তু ১৯৯১ সালের নয়া আর্থিক নীতি অনুযায়ী খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারি কার্যকলাপকে অনেক সীমিত গণ্ডিতে বাঁধা হয়েছে, শস্যসংগ্রহের নীতিতে সরকারি প্রভাব কমিয়ে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি-সংক্রান্ত নীতিতেও সরকারি সংগ্রহের গুরুত্ব ও রেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব কমিয়ে ফেলার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। ফলে শুধুমাত্র দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মানুষদের রেশন ব্যবস্থার আওতায় রাখার এবং সাধারণ রেশন ব্যবস্থার ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে তাকে এই বিশেষ লক্ষ্যে ঢেলে সাজানোর নীতি অনুসৃত হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, সরকারি সহায়ক মূল্যে সরকারি সংস্থাকে বিক্রির সুযোগ সম্বন্ধে সচেতন কৃষকের সংখ্যা (প্রতি হাজার কৃষক বিক্রেতার মধ্যে) অতি নগণ্য। ধান, গম ও আখের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি হলেও প্রতি হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে যথাক্রমে ৩১২, ৩৯২ ও ৪৫৪ জন, অর্থাৎ মোট কৃষকের সংখ্যার অর্ধেকও নয়। এদের মধ্যে আবার সচেতন কৃষকদের যে-অংশটি সরকারি সহায়ক সংস্থায় সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রি করে, তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১০০, ১৬২ ও ৩৬৬, অর্থাৎ মোট কৃষক জনগণের একটি ছোট অংশ মাত্র। যে-কোনও কারণেই হোক, দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কৃষক এই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারছে না। অধিকাংশ কৃষককে কোনও সহায়তা ছাড়াই ঋণের জন্য অসংগঠিত বাজারে কমিশন এজেন্ট ও মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের ফসল বিক্রির ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি রেখে ও ফসলের দামের হেরফের ঘটিয়ে কমিশন এজেন্টরা চাষিদের তৈরি উদ্বৃত্ত কৃষিক্ষেত্র থেকে বাণিজ্য-মহাজনিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ভারতের কৃষির বাজারে মহাজন-কমিশন এজেন্টদের এই ক্ষতিকারক ভূমিকা দেশের নীতি নির্ধারকদের অনেকের কাছেই গভীর উদ্বেগের বিষয়।

সারণি ৭.৩ প্রতি ১০০০ জন কৃষক পরিবারের মধ্যে যতজনের সরকারি সহায়ক মূল্য ও সংগ্রহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা আছে (জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৩-র মধ্যে সংগৃহীত তথ্য)

শস্য	প্রতি ১০০০ জন কৃষক পরিবারে		সরকারি সংগ্রহ সংস্থাতে বিক্রি (শতকরা)	
	সরকারি সংগ্রহ-মূল্য সম্পর্কে সচেতন কৃষকের সংখ্যা	সরকারি সংগ্রহ সংস্থায় ফসল বিক্রয় করে এমন চাষির সংখ্যা	মোট বিক্রির সাপেক্ষে সরকারি সহায়ক মূল্যে সরকারি সংস্থাকে বিক্রির শতকরা ভাগ	গড় বিক্রির মূল্যহার (টাকা)
ধান	৩১৫	১০০	১৪	১৩.১৫
ভুট্টা	১১৮	২৯	৪	১১.৪৫
গম	৩৯২	১৬২	৩৫	১৩.৯৯
ছোলা	১২৬	৩৯	৫	২৯.৯৬
অড়হর	১৪২	৪৭	১	৪৭
মুগ	৯১	১৯	২	৫৮
মুসুর	১৮১	২০	০	৩৬
আখ	৪৫৪	৩৬৬	৩৩	৩.২৫
আলু	১২১	৬	২	৮.৮৩
তুলো	২২৬	৮৪	৩	৩৪.১৫

Source: Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India (NSS 70th Round)

কৃষিপণ্যের বাজারের সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা এবং সেই লক্ষ্যে কৃষি-বাজারের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা নীতি নির্ধারকদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। পঞ্জাব সম্বন্ধে রমেশ চাঁদ উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্জাবে প্রতিটি কৃষিপণ্যের বাজারে ২২০০০ কমিশন এজেন্ট ও অসংখ্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী মহাজন রয়েছে, এটা কৃষিপণ্য বিক্রির বাজারে কৃষকের আয় কমে আসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কৃষি উৎপাদন-ব্যয় ও কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ বিষয়ক সংস্থার (Commission for Agricultural Costs and Marketing) প্রাক্তন সভাপতি অশোক গুলাতি উল্লেখ করেছেন, কমিশন এজেন্টরা কৃষিপণ্যের বাজারে অতিরিক্ত উচ্চ হারে কমিশন বসায়, চাষিদের আয়ের একটি বড় অংশ তারা কেটে নেয়।[৬]

এইভাবে অসংগঠিত বাজার-ব্যবস্থার কারণে কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন বাড়লেও আয় আশানুরূপ বাড়তে পারে না। ফলে কৃষকের হাতে বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্ত থাকে না, সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনের ওপর তার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে।

তথ্যসূত্র

১. Mukherjee, A. *The New Agricultural Strategy and Uneven Rural Development*. Research Project Sponsored by Indian Council of Social Science Research, 1988–89.

২. Roy, D. 2012. Some Aspects of Indian Agriculture Under New Agricultural Policy Regime: a Case study of some District of west Bengal, unpublished PhD thesis.

୩. Gill, A. 2004. “Interlinked Agrarian Credit markets.” *Economic and Political Weekly*. vol. 39 no 33.

୪. Mishra, S. 2006. “Farmers’ Suicides in Maharashtra.” *Economic and Political Weekly*. vol 41 no 26.

୫. Singh, G., Anupama, G. Kaur, R. Kaur, S. Kaur. 2017. “Indebtedness among Farmers and Agricultural Labourers in Rural Punjab.” *Economic and Political Weekly*. vol 52 no 6.

୬. Narayanamoorthy, A. & P. Ali. 2018. “Agriculture Market Reforms are must.” *The Hindu Businessline* 1st Jan 2018.

অষ্টম অধ্যায়

সবুজ বিপ্লব ও ভারতীয় কৃষির অবস্থা

ষাটের দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় ভারতীয় কৃষি-উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু লভ্য কৃষিপণ্যের পরিমাণ ছিল কম। এর ফলে একদিকে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়, খাদ্যমূল্য বাড়ে এবং প্রকারান্তরে তা শিল্পে আর্থিক মজুরির হারকে ঠেলে বাড়ায়। পরিণাম শিল্পে বিনিয়োগের হার নেমে আসা। এই অবস্থায় ভারত সরকার কৃষিতে প্রকৌশলগত উন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যেই মেক্সিকোতে উদ্ভাবিত নতুন উন্নত ধরনের গম ও ফিলিপাইনসে সফলভাবে প্রযুক্ত নতুন ধরনের চাল ভারতের কৃষিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সফল এই নতুন প্রযুক্তিও কাজে লাগানো হল। বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত অনুপাতে উন্নত ধরনের অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও জলের একটি মিলিত প্যাকেজের ব্যবহারই ছিল এই প্রযুক্তির মূলকথা। এই কর্মসূচি সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত। এই প্রযুক্তি থেকে আশানুরূপ ফল পেতে গেলে নতুন উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার আবশ্যিক, এবং বীজ থেকে চারাগাছ বেরনোর পর ও শস্য জন্মানোর আগে অবধি চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে যথোপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত পরিমাণ জলের প্রয়োগ দরকার। ফলে যে সব শুষ্ক অঞ্চলে সেচের যথেষ্ট সুযোগ নেই, সেখানে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও যথাযথ ফল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এই প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে তিন রাসায়নিক সারের একটি মিশ্রণের ব্যবহার জড়িত। এই সারের বাজার-দর ও প্রতি একক জমিতে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যে-ফসল পাওয়া যায় তার বাজার-দরের অনুপাত চাষির পক্ষে কতটা লাভজনক সেটা নির্ভর করে জোতের আয়তন, চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জলের জোগান ও চাষের অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবস্থার ওপর। ফলে সব অঞ্চলে সব চাষির পক্ষে এই প্রযুক্তির যথাযথ ও লাভজনক প্রয়োগ সম্ভব হয় না। প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিটি গম চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করলেও তা ভারতের কয়েকটি উন্নত ও সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও জলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কাজেই এতে অধিক শ্রমের নিয়োগ আবশ্যিক। ফলে যথাযথ সময়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিকের জোগান না থাকলে এই প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয় না। যন্ত্রপাতির ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ফলে ভারতের কৃষিতে এই প্রযুক্তি নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগের সূচনা করে। কৃষিতে স্থির পুঁজির ব্যবহারে বড় আকারের মূলধনি বিনিয়োগ আবশ্যিক হয়। ফলে বড় জোতের সম্পন্ন চাষি ছোট জোতের ছোট চাষির তুলনায় এই প্রযুক্তির সাহায্যে অধিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। ফলত এই প্রযুক্তি বিভিন্ন মাপের জোতের চাষির মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য আরও বাড়িয়ে তুলল।

আমরা দেখেছি, ভারতীয় কৃষি তার কাঠামোর অন্তর্গত পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আমূল ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে তার সনাতন পশ্চাদগামী শক্তিগুলির কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি। অ-কৃষি ক্ষেত্রের যথেষ্ট বিস্তার ও যথাযথ উন্নয়নের অভাবে কৃষি থেকে যথেষ্ট বেশি সংখ্যক মানুষ বাইরে বেরতে পারেনি ও বিকল্প উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিয়োগের পথ প্রসারিত হয়নি। অন্যদিকে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ও কৃষির উৎপাদন-ব্যবস্থায় নানা ভাবে বৈচিত্র এনে কৃষিক্ষেত্রকে ক্রম-প্রসারিত করে উৎপাদনশীল কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্র হিসেবে তার যথেষ্ট প্রসার ঘটানোও সম্ভব হয়নি। অথচ ইতিমধ্যে কৃষিতে নানাদিক থেকে পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়েছে। ভূমিসংস্কারের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সার্থক না হতেই, অথবা কৃষি-শ্রম, কৃষি-ঋণ, কৃষিপণ্য ও কৃষি-উপকরণের বাজারের অপ্রগতিশীল ও পশ্চাদগামী বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর না করেই কৃষিতে সবুজ বিপ্লব তথা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কর্মসূচি আনা হয়।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি দেশে কৃষি-উৎপাদনে বিপর্যয়ের কারণে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সেই সময় দ্বিতীয়-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল ভারী শিল্প ও শিল্পোন্নয়নের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দেয়, তারই পরিণামে একদিকে খাদ্য আমদানির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রের কিছুটা প্রসার ঘটায় কৃষিজ পণ্য, বিশেষত খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার এই বর্ধিত চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। দেশে একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে অন্তর্বর্তী চাহিদার স্বল্পতার কারণে ’৬৫ পরবর্তী সময়ে শিল্পক্ষেত্রে মন্দার সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব ও খাদ্যাভাব-মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আশা করা হয়েছিল, উৎপাদনের হারে বৈপ্লবিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে এই নতুন প্রযুক্তি ভারতীয় কৃষিকে তার দীর্ঘকালীন জড়ত্ব থেকে মুক্ত করবে। নতুন প্রযুক্তির চাহিদাগুলো, যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, তার সবক’টি যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে একই জমিতে বছরে একাধিকবার চাষ করা সম্ভব। একই জমিতে একাধিক চাষের সুবিধা নেওয়ার জন্য চাষে ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণের ব্যবহার বাড়ানো দরকার। নিয়ন্ত্রিত জলের ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পাম্পসেট ও বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ে। ঝাড়াই-পেষাই ইত্যাদি কাজের জন্য বাড়ে অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার। একেবারে প্রথমে সেচের সুবিধাযুক্ত কয়েকটি বাছাই করা অঞ্চলে এই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে চাষ শুরু হয়। গম চাষে কয়েকটি অঞ্চলে প্রথমে বিপুল উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সর্বত্র এই প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। এছাড়াও এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে কয়েকটি সমস্যা যুক্ত ছিল। এই প্রযুক্তি জোতের মাপ-নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা গেলেও যেহেতু এর সঙ্গে যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি সব কিছুই যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ, তাই বাস্তবে শুধুমাত্র সম্পন্ন চাষির পক্ষেই এর ব্যবহার সম্ভব ছিল। ফলে এই প্রযুক্তি কৃষিতে জমির কেন্দ্রীভবনের পক্ষে অনুকূল ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রমশ অলাভজনক হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার জমির উৎপাদনশীলতার ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত জল ব্যবহারের জন্য এই প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ নীচে নামে ও জলের খরচ বাড়ে। এছাড়া দেখা গেছে, এই প্রযুক্তিতে তৈরি চারাগাছ বেশি রোগপ্রবণ, এতে সহজেই পোকা লাগতে পারে। তাই এই প্রযুক্তির আর-একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান কীটনাশক। উৎপাদনের সঙ্গে কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অঙ্গাঙ্গী জড়িত, তবু চারাগাছ বেড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত পরিমাণে

জলের নিয়ন্ত্রিত জোগানের যেমন দরকার, তেমনই দরকার সার ও কীটনাশকের যথাযথ প্রয়োগ। তাই প্রথমদিকে শ্রমের নিয়োগও বাড়ে। কিন্তু অন্যান্য কাজগুলিতে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বাড়ায় শ্রমনিয়োগের ওপর এর নিট প্রভাব হয় ঋণাত্মক, অর্থাৎ মোট মিলিয়ে শ্রমিকের নিয়োগ কমে। এই প্রযুক্তিতে উৎপাদিত চারাগাছ অত্যন্ত রোগপ্রবণ, ফলে উৎপাদনের পরিমাণেও থাকে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি। ফলে প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ আদর্শ অবস্থার তুলনায় সর্বদাই কম থাকে। তাছাড়া কৃষি-উপকরণগুলি প্রায়ই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় উপাদানটি বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করলে সব সময় এক-একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য উপাদানটির বাজার দামের তুলনায় কম হয়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত পরিমাণ বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় কম হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উৎপাদন পাওয়া যায় না। উৎপাদন ক্রমশ অলাভজনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চফলনশীল গমের ক্ষেত্রে পঞ্জাব ও হরিয়ানার উদাহরণ বাদ দিলে আর কোনও রাজ্যেই উচ্চ ফলনশীল চাষ উল্লেখযোগ্য অনুপাতে বিস্তার লাভ করেনি, বিশেষ করে উচ্চফলনশীল গমের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র মোটেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। নীচের সারণিতে আমরা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গম উৎপাদক রাজ্যে মোট কর্ষিত জমির মধ্যে উচ্চফলনশীল গমের শতকরা ভাগ দেখিয়েছি।

সারণি ৮.১ মোট কর্ষিত এলাকার মধ্যে উচ্চফলনশীল গম এলাকা (শতকরা ভাগ)

	২০০৩–’০৪	২০০৭–’০৮	২০১২–’১৩
বিহার	২৭.০০	৩০.০০	৩০.০০
গুজরাত	৭.০০	১১.৮৬	১১.৯৭
হরিয়ানা	৬৪.০৯	৬৬.৮৯	৬৭.৪৭
মধ্যপ্রদেশ	১৪.৭০	১৬.০০	২৪.৪৪
মহারাষ্ট্র	৩.৫৮	৭.২০	৫.০৫
পঞ্জাব	৮৪.০০	৮৪.০০	৮৫.০০
রাজস্থান	৮.৭২	১২.৫৫	১৫.১৫

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

সারণি ৮.২ মোট কর্ষিত জমির মধ্যে উচ্চফলনশীল ধান চাষের অধীন জমি (শতকরা ভাগ)

	২০০৩–’০৪	২০০৭–’০৮	২০১১–’১২	২০১২–’১৩
অন্ধ্রপ্রদেশ		১৮.৮২	১৫.০২	–
অসম				৩.৮১
বিহার	১৯.৭৪	২২.৩০	২১.১৭	২৫.৭৩
ছত্তীসগড়	১২.৮৯	১৫.৭৭	৪৪.৯৫	৪৭.৬৮
গোয়া	২০.৭১	২০.০০	১৮.৯০	১৯.০১
গুজরাত	৪.০১	৪.৯৪	৩.৯০	৪.০৫
হরিয়ানা	১০.৮০	১২.৭৫	৬.৫৪	৮.৩৯
কর্ণাটক	৬.৪৮	৬.৮৪	৮.২০	৭.৭৭
কেরালা	৩.১৪	২.৬৪	২.৫১	২.৩৯
তামিলনাড়ু			৫.৬৩	৩.৯৮

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

শুধু গমের ক্ষেত্রেই নয়, ধানের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও সীমিত। গম এবং চাল উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি বিশেষ রাজ্য বাদ দিলে সর্বত্র প্রযুক্তির ব্যবহার যথেষ্ট বিস্তৃতি পায়নি। এই চাষের উৎপাদনশীলতা অনেকটা বাড়ার পর তা তার ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে গেছে। বহু অঞ্চলে উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীলতার হার কম হওয়ায় চাষির কাছে এই চাষ অনেক ক্ষেত্রেই অলাভজনক হয়ে পড়েছে। সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও উৎপাদন খরচ মিটিয়ে চাষির হাতে আশানুরূপ আয় সৃষ্টি করতে পারছে না। পঞ্জাবে চাষিদের উচ্চফলনশীল চাষের ক্ষেত্রে নানা বিপরীত ক্রিয়ার তথ্য সামনে আসছে।

উচ্চফলনশীল গম ও ধানের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যে একটা সময়ে বৃদ্ধির হারে নিম্নগতি দেখা যাচ্ছে। নীচের সারণিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে উৎপাদনশীলতার নিরিখে রাজ্যগুলির বিভাজন করা হয়েছে এভাবে: ২৫০০ কেজি/হেক্টরের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীলতা যেসব রাজ্যে, সেগুলি সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। ২০০০ কেজি/হেক্টরের বেশি কিন্তু ২৫০০ কেজি/হেক্টরের কম উৎপাদনশীলতাকে মাঝারি ধরা হয়েছে। ২০০০ কেজির কম উৎপাদনশীলতার রাজ্যগুলি সর্বনিম্ন উৎপাদনশীল।

সারণি ৮.৩ উচ্চ ফলনশীল ধানের উৎপাদনশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি

	রাজ্য	>২৫০০ কেজি/হে বৃদ্ধি/হ্রাস	২০০১–<২৫০০ কেজি/হে বৃদ্ধি/হ্রাস		সবচেয়ে কম উৎপাদনশীলতা <২০০০ কেজি/হেক্টর	
২০০৩–০৪ থেকে '০৭–'০৮	পঞ্জাব	৯.১৫	পশ্চিমবঙ্গ	–০.৯৯	মহারাষ্ট্র	–৩.০১
২০০৭–০৮ থেকে '১১–'১২	পঞ্জাব	–৬.৮৯	পশ্চিমবঙ্গ	৭৬.৯৮	মহারাষ্ট্র	৩.৬১
'০৩–'০৪ থেকে '০৭–'০৮	তামিলনাড়ু	২১.৮২	কেরালা	–১.২৯	মধ্যপ্রদেশ	–৯.০৮
'০৭–'০৮ থেকে '১১–'১২	তামিলনাড়ু ২	৩.১৫	কেরালা	১৪.৪৪	মধ্যপ্রদেশ	১৫.৫২
'০৩–'০৪ থেকে '০৭–'০৮	গোয়া	–২৮.৩	গুজরাত	৫০.০০	বিহার	– ১১.৮২
'০৭–'০৮ থেকে '১১–'১২	গোয়া	১০.৩২	গুজরাত	৪.১৮	বিহার	৭৮.৫৭
'০৩–'০৪ থেকে '০৭–'০৮	অন্ধ্রপ্রদেশ	–			অসম	–১৮.৩৯
'০৭–'০৮ থেকে '১০–'১১	অন্ধ্রপ্রদেশ	–১০.৬৩			অসম	৩৯.৯০
'০৩–'০৪ থেকে '০৭–'০৮	হরিয়ানা	১৮.৭০			রাজস্থান	১৪২.৮২
'০৭–'০৮ থেকে '১২–'১৩	হরিয়ানা	১৬.৯৪			রাজস্থান	–৩৯.৩৮
'০৩–'০৪ থেকে '০৭–'০৮	কর্ণাটক	৯.৬৩			ছত্তীসগঢ়	৬৯.৩০
'০৭–'০৮ থেকে '১১–'১২	কর্ণাটক	১.৮৬			ছত্তীসগঢ়	৭.১৩

Source: Agricltural Statistics at a Glance 2017, GOI

উপরের সারণিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমত, পনেরোটি চাল উৎপাদনকারী রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যে উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টরে ২৫০০ কেজির বেশি, তিনটি রাজ্যে উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টরে ২০০০ কেজির বেশি এবং ২৫০০ কেজির কম, ছয়টি রাজ্যে উৎপাদনশীলতা ২০০০ কেজির কম। দ্বিতীয়ত, সব ধরনের উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদনের রাজ্যগুলিতে একটা সময়ের পর উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

কোথাও কোথাও উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদনশীলতা ২০০৩–০৪ থেকে '০৭–'০৮ এই চার বছরের মধ্যে কমে গেছে। পরবর্তী চার বছরে আবার উৎপাদনশীলতা বাড়লেও ২০০৩–০৪ সালের স্তরে পৌঁছাতে পারছে না। কোথাও কোথাও উৎপাদনশীলতা প্রথম চার বছরের ব্যবধানে বাড়লেও পরবর্তী চার বছরে কমে অনেকটা নীচে নেমে আসছে। গমের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার একই স্তরে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

গমের ক্ষেত্রে চারটি রাজ্যে উৎপাদনশীলতা হেক্টর-প্রতি ২৫০০ কেজির বেশি, দু'টি রাজ্যের উৎপাদনশীলতা ২০০১ কেজি থেকে ২৫০০ কেজির মধ্যে, বাকি চারটি রাজ্যে উৎপাদনশীলতা ২০০০ কেজিরও নীচে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা সীমার পর কমার প্রবণতা দেখা যায়। কোনও কোনও রাজ্যে উৎপাদনশীলতা চূড়ান্তভাবে হ্রাস পায়। পঞ্জাব ও হরিয়ানা চাল ও গম উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতার দিক থেকে সব থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে পড়ে। তার মধ্যে পঞ্জাব চাল ও গম উভয়ক্ষেত্রেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সবথেকে এগিয়ে। কিন্তু আমরা দেখেছি, পঞ্জাবের চাষিরা আজ চূড়ান্তভাবে ঋণগ্রস্ত। পঞ্জাব চাষবাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সংকটে পড়েছে। চাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্যের তুলনায় তুলার মতো বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও তীব্র। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি।

পঞ্জাবে চাষ অতিরিক্ত ব্যয়বহুল। একই সঙ্গে এখানে জমির উৎপাদনশীলতার উচ্চ হার বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে চাষি চাষের খরচ মিটিয়ে সংসারের খরচ মেটাতে পারছে না, তার ঋণগ্রস্ততা বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে। এর ফলে চাষিরা সংগঠিত উৎস থেকে বেশি বেশি ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অসংগঠিত ঋণের কবলে পড়ছে, বিশেষ করে, ফসলের উৎপাদন ও তার বাজারজাত-করণ, দু'ক্ষেত্রেই মহাজন ও কমিশন এজেন্টদের কবলে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।[১] উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু শস্যের বিক্রি-ব্যবস্থা ও কৃষি-উপকরণের ওপর এজেন্টদের একাধিপত্য, ঋণের বাজারের সঙ্গে উপকরণ ও পণ্যের বাজারের সংযুক্তি এই উদ্বৃত্তকে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে বাণিজ্যিক ও মহাজনি কারবারে বদ্ধ রাখছে। এর ওপর নয়া আর্থিক নীতির অঙ্গ হিসেবে সরকারের খোলা-বাজার নীতি অনেক ক্ষেত্রেই দেশীয় কৃষি উৎপাদনকারীকে দেশের বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দিচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিপুল ভরতুকি-যুক্ত সস্তার পণ্য দেশি বাজার ভাসিয়ে দেওয়ার ফলে দেশি পণ্যের বাজার সীমিত হয়ে পড়ছে। ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় বহু চাষি আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সারণি ৮.৪ উচ্চফলনশীল গমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা

	সবথেকে বেশি উৎপাদনশীলতা >২৫০০ কে/হে	বৃদ্ধির হার %	মাঝারি উৎপাদনশীলতা ২০০১–<২৫০০ কে/হে	বৃদ্ধির হার %	সবথেকে কম উৎপাদনশীলতা <২০০০ কে/হে	বৃদ্ধির হার %
২০০৩–০৪ – '০৭–'০৮	পঞ্জাব	৯.২০	পশ্চিমবঙ্গ	৫.৯২	বিহার	২৯.৮০
'০৭–'০৮ – '১১–'১২	পঞ্জাব	১৩.২০	পশ্চিমবঙ্গ	৬৫.৫৫	বিহার	৩০.৫৭
'০৩–'০৪ – '০৭–'০৮	হরিয়ানা	৫.০৩	মধ্যপ্রদেশ	–৬.৬০	মহারাষ্ট্র	৫৭.৫৩
'০৭–'০৮ – '১১–'১২	হরিয়ানা	২৪.১৯	মধ্যপ্রদেশ	১৮.০৫	মহারাষ্ট্র	–৯.৭৭
'০৩–'০৪ – '০৭–'০৮	রাজস্থান	–৩.৭০			মধ্যপ্রদেশ	১১.৮২
'০৭–'০৮ – '১১–'১২	রাজস্থান	২৭.৯০			মধ্যপ্রদেশ	–১১.৯৩
'০৩–'০৪ – '০৭–'০৮	গুজরাত	১২.৭২			কর্ণাটক	৭১.৯২
'০৭–'০৮ – '১১–'১২	গুজরাত	০.৮১			কর্ণাটক	–২৩.২৫

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

শুধু পঞ্জাব নয়, সারা দেশেই এই ব্যবসায়ী-মহাজন শ্রেণি সার, বীজ, যন্ত্রপাতির জোগানের সঙ্গে কৃষিপণ্য ও কৃষি-ঋণের বাজারকে যুক্ত করে সমগ্র সম্ভাব্য কৃষি উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশের ওপর কর্তৃত্ব করছে। সরকারি সহায়ক মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করার নীতি যথোপযুক্ত কার্যকর না হলে চাষির সমস্যা সমাধানের আর কোনও উপায় থাকে না। চাষির উদ্বৃত্ত উৎপাদকের হাত দিয়ে উৎপাদনশীল ভাবে বিনিয়োজিত হয় না, ফলে কৃষিতে বর্ধিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়। কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার-ব্যবস্থা ও ঋণের বাজারের যৌথ ক্রিয়া চালু থাকায় বিপুল উদ্বৃত্ত কৃষি-উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা গতিহীন হয়ে পড়ে।

নীচের সারণি ৮.৫-এ ভারতীয় কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতির একটি বিবরণ দেওয়া হল।

দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে যন্ত্র ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে এবং প্রযুক্তির চাহিদামাফিক তিনটি উপাদানের যথাযথ আনুপাতিক মিশ্রণে তৈরি অধিক উৎপাদনশীল সারের প্রয়োগ মোট কর্ষিত এলাকায়

ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ কি ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে আশানুরূপ গতি আনতে পেরেছে? আমরা গম, চাল ও মোট খাদ্যশস্যের দশক অনুযায়ী গড় বাৎসরিক উৎপাদন ও দশক অনুযায়ী বৃদ্ধিহার নিয়ে আলোচনা করেছি। কোনও দশকের প্রথম ও শেষবছরের উৎপাদনের মাপ যেহেতু বৃদ্ধিহারের মাপের হিসাবকে প্রভাবিত করে, সেই কারণে দশকওয়ারি বৃদ্ধি-হার ছাড়াও গোটা দশকের গড় উৎপাদন এবং এই গড় উৎপাদনের বৃদ্ধি-হারও বিবেচনায় রেখেছি। (এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তারিত আলোচনা করব)। নীচে আমরা প্রতি হেক্টর জমিতে গমের উৎপাদনশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানোর চেষ্টা করেছি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে – যথা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ-প্রক্রিয়া চালু রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রকৌশলগত উন্নয়নের কর্মসূচি, যেমন সবুজ বিপ্লব, অথবা পরবর্তী অধ্যায়ে দেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় নয়া আর্থিক নীতির মতো পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকার পরিবর্তন।

সারণি ৮.৫ ভারতীয় কৃষিতে নতুন উপকরণের ব্যবহার

	১৯৬২–৬৩	১৯৮২–৮৩	১৯৯২–৯৩	১৯৯৯–২০০০	২০০৪-০৫	২০০৯–১০	২০১২–১৩	২০১৩–১৪	২০১৪–১৫
ট্রাক্টরের সংখ্যা (প্রতি হাজার হেক্টরে)	০.৩০	৩.৬৮	১১.৭৩	১৮.৬		৩৫.৯	৪১.৫		
প্রতি হাজার ট্রাক্টরে কর্ষিত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	৩৫৯২ (১৯৬০)	৯৪৯ (১৯৭০)	২৬১ (১৯৮০)	১২৩ (১৯৯০)	৫৩ (২০০০)	২৭ (২০১০)	২৪ (২০১২–'১৩)		
পাম্পসেটের সংখ্যা (প্রতি হাজার হেক্টরে)	৪.৫৮	৪৯.১৬	৬৪.৯৪						
পাওয়ার টিলার (প্রতি হাজার হেক্টরে)	০.০০৬ (১৯৭০)	০.০১ (১৯৮০)	০.০২ (১৯৯০)	০.০৮ (২০০০)		০.১৮ (২০১০)	০.২২ (২০১২–'১৩)		
প্রতি হাজার পাওয়ার টিলারে কর্ষিত জমির পরিমাণ	১৪৪৪৭ (১৯৭০)	৮৫৭৪ (১৯৮০)	৪৪০৬ (১৯৯০)	১২২৯ (২০০০)		৫৩৬ (২০১০)	৪৪৭ (২০১২–১৩)		
সার (কেজি/হেক্টরে)	৪.৩৩	৪২.৬২	৮৯.০৮		৯৬.২৭		১৩১.৪৬	১২১.৮৩	১২৮.৯৩
গ্রস কর্ষিত এলাকায় সেচের ভাগ %	১৯.০০	২৯.২৯	৩৫.৬৬		৪২.৪২		৪৭.৪৮	৪৭.৬৫	৪৮.৬২
চাষের নিবিড়তা (গ্রস কর্ষিত এলাকা/নিট রোপিত এলাকা	১১৫.০০	১২৪ .০০	১৩০ .০০		১৩৮.৮০		১৪২.১ ০	১৪২.০৮ ০	১৪১.৫৫

Source: পাওয়ার টিলার ও ট্র্যাক্টরের সংখ্যাগুলি Singh, R. S., S. Singh, S. P. Singh (2015) "Farm Power and Machinery availability on Indian Farms, Agriculture Engineering Today" পেপার থেকে নেওয়া হয়েছে।
নিট কর্ষিত এলাকার তথ্যগুলি Agricultural Statistics at a Glance-এর বিভি ন্ন রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে।

নীচের সারণি ৮.৬ এবং অন্যান্য সারণিতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরুর আগে ও পরে সারা দেশে চাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্যের এই বৃদ্ধি-হারের প্রবণতা কেমন ছিল সেটি দেখার জন্য দশক অনুযায়ী বৃদ্ধি-হার নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি।

সারণি ৮.৬ চালের ক্ষেত্রে দশকওয়ারি উৎপাদন বৃদ্ধির হার

দশক	গড় বাৎসরিক উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	আগের দশকের গড় উৎপাদনের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন	দশকওয়ারি গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি হার (%)
'৫০–'৫১ – '৬০–'৬১	২৯.০৮	–	৬.৮০
'৬০–'৬১ – '৭০–'৭১	৩৬.৪৪	৩৪.৭৫	২.২০
'৭০–'৭১ – '৮০–'৮১	৪৫.৫৭	২৫.০৫	২.৯০
'৮০–'৮১ – '৯০–'৯১	৬১.০৯	৩৪.০৮	৩.৮৫
'৯০–'৯১ – '০০–'০১	৮০.৫৪	৩১.৮৩	১.৪৪
'০০–'০১ – '১০–'১১	৮৯.৭৫	১১.৪৩	১.২২

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2016, GOI

দেখা যাচ্ছে প্রতি দশকের গড় উৎপাদন হার '৮০-র দশকে কিছুটা বাড়ে। '৮০-র দশকে দশকওয়ারি বার্ষিক গড় উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার যথেষ্ট বাড়লেও '৯০-এর দশক এবং এই শতকের প্রথম দশকের মধ্যে গড় বৃদ্ধির হার নেমে আসে। আমরা সবসময় সবক্ষেত্রে '৬০-এর দশকের ঠিক পরে সবুজ বিপ্লবের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাইনি। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের সূচনা হওয়ার পর থেকে উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার হঠাৎ অনেকটা পড়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সারণি ৮.৭ চালের ক্ষেত্রে গড় বাৎসরিক উৎপাদনশীলতা, গড় উৎপাদনশীলতার শতকরা পরিবর্তন এবং দশকওয়ারি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার

দশক	বাৎসরিক গড় উৎপাদনশীলতা (দশকওয়ারি, কেজি/প্রতি হেক্টর)	আগের দশকের তুলনায় গড় উৎপাদনশীলতার শতকরা বৃদ্ধি	প্রতি দশকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার
’৫০–’৫১ – ’৬০–’৬১	৮৪৭		৫.১৬
’৬০–’৬১ – ’৭০–’৭১	১০১০	১৯.৩৪	১.০৯
’৭০–’৭১ – ’৮০–’৮১	১১৭২	১৬.০৩	১.৮৯
’৮০–’৮১ – ’৯০–’৯১	১৪৯২	২৭.২৪	৩.০২
’৯০–’৯১ – ’০০–’০১	১৮৫৬	২৪ .৪৩	০.৯২
’০০–০১ – ’১০–’১১	২০৬৯	১১.৪৩	১.৭৮
’১১–’১২ – ’১৬–’১৭	২৩৮১	১৫.০৪	২.৩১

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

চালের ক্ষেত্রে ’৭০-এর দশকে মোট উৎপাদন বা উৎপাদনশীলতার উন্নতিহারে তেমন চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি-প্রবণতা দেখা যায়নি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশির দশকটি বেশ আশার সঞ্চার করেছিল, কিন্তু নব্বইয়ের দশকের নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চাপানো খোলা-বাজার নীতি এবং সরকারি সহযোগিতা হ্রাসের নীতি উৎপাদন বা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করেনি। নব্বইয়ের দশকে উৎপাদন বৃদ্ধির হার চোখে পড়ার মতো কমেছে।

গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশক থেকে গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হারে এবং দশকওয়ারি বৃদ্ধি-হারে চোখে পড়ার মতো হ্রাস ’৯০–’৯১ সালের নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের একটি পরিণতি বলে মনে হয়। গমের ক্ষেত্রে কৃষি-উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বা হ্রাসের ঘটনাকে কতটা সবুজ বিপ্লব বা নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় সে প্রশ্নটি অবশ্যই এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনায় উঠেছে। আমরা এই অধ্যায়ে আলাদা ভাবে গমের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের মতো ধান ও মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হারের পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি।

সারণি ৮.৮ প্রতি দশকে গমের গড় বাৎসরিক উৎপাদন, আগের দশকের তুলনায় গড় বাৎসরিক উৎপাদনে শতকরা বৃদ্ধি এবং দশকওয়ারি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার

দশক	প্রতি দশকের গড় বাৎসরিক উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	আগের দশকের তুলনায় গড় উৎপাদনের শতকরা বৃদ্ধি	প্রতি দশকের উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার
’৫০–’৫১ – ’৬০–’৬১	৮.৬০		৭.০৩
’৬০–’৬১ – ’৭০–’৭১	১৪.২৬	৬৫.৭৬	১১.৬৬
’৭০–’৭১ – ’৮০–’৮১	২৮.৫৫	১০০.২৪	৫.২৪
’৮০–’৮১ – ’৯০–’৯১	৪৫.৭০	৬০.০৫	৫.১৮
’৯০–’৯১ – ’০০–’০১	৬৪.৪৩	৪০.৯৮	২.৬৪
’০০–’০১ – ’১০–’১১	৭৪.৬৪	১৫.৮৪	২.৪৭
’১০–’১১ – ’১৬–’১৭	৯২.৬১	২৪.০৮	২.২১

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

সারণি ৮.৯ গমের উৎপাদনশীলতা

দশক	প্রতি দশকে গড় বাৎসরিক উৎপাদনশীলতা	আগের দশকের তুলনায় গড় উৎপাদনশীলতার শতকরা বৃদ্ধি	দশকওয়ারি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার
’৫০–’৫১ – ’৬০–’৬১	৭৩৯.০০		২.৮৪
’৬০–’৬১ – ’৭০–’৭১	৯৭০.৯৩	৩১.৩৫	৫.৩৬
’৭০–’৭১ – ’৮০–’৮১	১৩৯৮.০৯	৪৪.০৩	২.৪৭
’৮০–’৮১ – ’৯০–’৯১	১৯৫০.৯১	৩৯.৫৪	৩.৯৯
’৯০–’৯১ – ’০০–’০১	২৫১৪.৯১	২৮.৯১	১.৮৭
’০০–’০১ – ’১০–’১১	২৭৫০.৭৩	৯.৩৮	১.০৩
’১০–’১১ – ’১৫–’১৬	৩০৬১.১৪	১১.২৮	০.৭৬

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

গমের উৎপাদনশীলতায় হ্রাস-বৃদ্ধির একই রকম প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ’৯০-এর দশক থেকেই গমের গড় উৎপাদনশীলতার শতকরা বৃদ্ধি এবং দশকওয়ারি উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হার ক্রমাগত কমেছে।

চাল, গম এই দু'টি প্রধান খাদ্যশস্যের বাইরে অন্যান্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও একইরকম কমার প্রবণতা দেখা যায়। আমরা বিষয়টি বোঝার জন্য মোট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবস্থাটি কেমন তা দেখেছি। মোট খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান খাদ্যশস্য চাল ও গম ছাড়াও রয়েছে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও অন্যান্য মোটা, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শস্যদানা। আমরা সমস্ত ধরনের শস্যদানা একত্রে বিচার করে আলোচ্য সময়ে প্রকৌশলগত উন্নয়ন ও নীতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারে হ্রাস-বৃদ্ধি বিচার করেছি।

নীচের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গম ও চালের মতো ওঠানামার একই নিয়ম মেনে চলেছে। মোট খাদ্যশস্যের প্রতি দশকের গড় উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা অনুপাত সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে কমেছে। দশকের মোট উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার ৫০-এর দশক থেকে কমে, আবার ৮০-র দশকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে নব্বইয়ের দশক থেকে কমতে থাকে এবং কখনওই ৮০-র দশক বা ৫০-এর দশকের হার স্পর্শ করতে পারে না।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ বৃদ্ধির হারে হ্রাস-বৃদ্ধির যে-প্রবণতা আমরা দেখেছি সেটি শুধু চাল বা গমের ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে এমন নয়। '৮০র দশকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির যে-হারে পৌঁছানো গিয়েছিল, '১৫-'১৬ সাল অবধি সমগ্র সময়ে সেই অবস্থায় আর পৌঁছানো যায়নি। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট।

আমরা সবুজ বিপ্লবের প্রভাব আলাদাভাবে ও আরও স্পষ্টভাবে দেখার জন্য সবুজ বিপ্লব-পূর্ববর্তী ও সবুজ বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের তুলনা করার জন্য ওই দুই সময়ের (যথাক্রমে '৫০–'৫১ থেকে '৬৫–'৬৬ এবং '৬৬–'৬৭ থেকে '৮১–'৮২) ধান, গম খাদ্যশস্য, আখ ও তুলার ক্ষেত্রে প্রবণতা সমীকরণের সাহায্য নিয়েছি ও এই কালপর্ব দু'টিতে এই সমস্ত শস্যের বৃদ্ধি-হার আলাদাভাবে মাপার চেষ্টা করেছি। পরিসাংখ্যিক সমীকরণগুলি অষ্টম অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

সারণি ৮.১০ মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার প্রতি দশকের গড় বাৎসরিক পরিমাণ, প্রতি দশকের গড়ের শতকরা পরিবর্তন এবং দশকওয়ারি বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার

	গড় বাৎসরিক উৎপাদন	গড় উৎপাদনের শতকরা পরিবর্তন	দশকওয়ারি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার	গড় বাৎসরিক উৎপাদনশীলতা	গড় উৎপাদনশীলতার শতকরা পরিবর্তন	দশকওয়ারি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার
'৫০–'৫১ –'৬০–'৬১	৬৬.৯৭		৬.১৪	৬১৬		৩.৫৯
'৬০–'৬১ –'৭০–'৭১	৮৭.১৩	৩০.০৯	৩.২১	৭৩১.৯৮	১৮.৮৭	২.২৯
'৭০–'৭১ – '৮০–'৮১	১১৩.১৭	২৯.৮৯	১.৯৫	৯০৪.১৮	২৩.৫২	১.৭৩
'৮০–'৮১ – '৯০–'৯১	১৪৯.১৬	৩১.৮৯	৩.৬১	১১৭৬.০৪	৩০.০৭	৩.৪৯
'৯০–'৯১ '০০–'০১	১৮৯.৩০	২৬.৮৩	১.১৬	১৫৩৪.৫৩	৩০.৪৮	১.৭৮
'০০–'০১ –'১০–'১১	২১৩.৩৪	১২.৭০	২.২৭	১৭৪৮.০০	১৩.৯৪	১.৮২
'১০–'১১ –'১৫–'১৬	২৩৮.৩৩	১১.৬২	২.৩৫	২০২১.৪৮	১৫.৬২	২.০০

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

সবুজের বিপ্লবের আগে ও পরে বৃদ্ধি

		সবুজ বিপ্লবের আগে (১৯৫০–৫১ থেকে ১৯৬৫–৬৬)	সবুজ বিপ্লবের পরে (১৯৬৬–৬৭ থেকে ১৯৮১–৮২)
উৎপাদন	শস্য	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধির হার
	ধান	৩.৬৯%	২.৭১%
	গম	৩.৮০%	৬.৩৯%
	খাদ্যশস্য	২.৯৬%	২.৮৩%
	আখ	৬.৪%	৪.৩৩%
	তুলা	৩.৭০%	২.৬৫%
উৎপাদনশীলতা	ধান	২.২৯%	১.৮৭%
	গম	১.৪৫%	৩.০৯%
	খাদ্য শস্য	১.৭১%	২.৩০%
	আখ	২.৯০%	১.৭৪%
	তুলা	২.০১%	২.৫৪%

উৎস: নিজস্ব গবেষণা।

দেখা যাচ্ছে, সবুজ বিপ্লবের আগে ও পরে ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হারের পার্থক্য যথেষ্ট। দু'টি ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি-হার সবুজ বিপ্লবের পর কমে গেছে। ধানচাষে সবুজ বিপ্লবের নতুন প্রযুক্তিটি কোনও ফল দিতে পারেনি, শুধু তাই নয়, হয়তো এই প্রযুক্তিটি ধান চাষ করে এমন রাজ্যগুলিতে সেভাবে প্রযুক্তই হতে পারেনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের জন্য যেমন একদিকে সুনিয়ন্ত্রিত জলের ব্যবহার প্রয়োজন, তেমনই চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ সার ও কীটনাশকের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য চাষের পর্যায় অনুযায়ী অভিজ্ঞ শ্রমিকের জোগান অত্যাবশ্যক। এই প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যা এড়ানোর জন্য এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকারী চাষি কৃষিতে পাম্পসেট ছাড়াও শ্রম-সাশ্রয়কারী নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এর জন্য প্রধানত প্রয়োজন যথেষ্ট কম ব্যয়ে কৃষি-ঋণের জোগান। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, বিনিয়োগযোগ্য যথেষ্ট মূলধনের অভাব কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ সীমিত করে রেখেছে, ফলে নতুন প্রযুক্তি থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। আমরা গম, খাদ্যশস্য, আখ ও তুলার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কতটা সত্যি তার আলোচনা করেছি।

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার সবুজ বিপ্লবের পর লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, গমের চাষে নতুন প্রযুক্তির যতটা বিস্তৃত ব্যবহার হয়েছে, চাল বা অন্য কোনও

শস্যের চাষে সবুজ বিপ্লবের নতুন প্রযুক্তি ততটা পারেনি। পঞ্জাবের মতো গমচাষের অঞ্চলে এই প্রযুক্তির সূচনা হওয়ার আগেই সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা ছিল। ফলে পঞ্জাব আগে থেকেই অধিক উৎপাদনশীল কৃষিপ্রধান অঞ্চল ছিল। পঞ্জাবের মোট অধিক ফলনশীল উন্নত সেচ ব্যবস্থার অঞ্চলগুলিতে গমচাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। কিন্তু গম ছাড়া অন্য কোনও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি মোটেই কার্যকর হয়নি। আমরা দেখছি, খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার সবুজ বিপ্লবের পর কমেছে। তেমনই আখ ও তুলা চাষের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি তেমন কোনও উন্নতি ঘটাতে পারেনি। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে-প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন তা হল, সবুজ বিপ্লবের পর এইসব শস্যের বৃদ্ধি-হারে হ্রাস ঘটার কারণ কী? আমাদের মনে হয়, নতুন প্রযুক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী। এই প্রযুক্তির ব্যবহার অধিক বিনিয়োগের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, তাই অপেক্ষাকৃত বড় জোতের চাষিরাই এই প্রযুক্তি থেকে লাভ করতে পারত। ছোট চাষিরা মহাজনের কাছে অধিক সূদে টাকা ধার নিয়ে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিপুল ব্যয় বহন করলেও এর সাহায্যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট চাষিরা প্রায়শই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই কারণে ১৯৬৬ সালের পর এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ছোট চাষিরা আর উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে পারে না। সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। আমরা উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র পাই। আমরা আগেই দেখেছি, ধানের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও সবুজ বিপ্লব বিরাট কোনও আশাব্যঞ্জক ফল দিতে পারেনি। আমরা গম, আখ ও তুলার চাষে উৎপাদনের বৃদ্ধির প্রবণতা দেখেছি।

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র আখ বাদে অন্য সব শস্যের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের ফলে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হার বেড়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্য ও তুলা, এই দু'টি ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হার কখনওই উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছয়নি। আমরা আগেই দেখেছি, বিভিন্ন শস্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার কমেছে। কিন্তু মোট খাদ্যশস্যের মধ্যে জমির পরিমাণের দিক থেকে গমের প্রাধান্য যথেষ্ট বেশি থাকায় এবং গমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি হওয়ায় মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হারে গমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হারের প্রভাব পড়ে থাকবে। উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হার বাড়া সত্ত্বেও উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার কমার পিছনে আর একটি কারণ হয়তো এই যে, আলোচ্য কালপর্বে তুলা চাষের ও কোনও কোনও খাদ্যশস্যের চাষে জমির পরিমাণ কমেছে। তবে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার গম ও অন্যান্য কোনও কোনও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার হার অবশ্যই বাড়িয়েছে।

বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন হার বাড়া-কমার প্রবণতা থেকে আমরা এই পর্যবেক্ষণে আসতে পারি যে, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে হলে একদিকে যেমন দেশের আর্থিক নীতিগুলিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের উপযুক্ত অবস্থা তৈরির উপযোগী হয়ে উঠতে হবে ও উৎপাদন হার বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হতে হবে, অন্যদিকে পণ্য, ঋণ ও উপকরণের বাজার-ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে হবে একচেটিয়া চড়া সুদে ঋণের জোগানদার, পণ্য ও উপকরণ-ব্যবসায়ীদের মিলিত নিয়ন্ত্রণ থেকে।

তথ্যসূত্র

১. Gill, A. 2004. “Interlinked Agrarian Credit Markets.” *Economic and Political Weekly*. vol 39 no 33.

২. Singh, G., Anupama, G. Kaur, R. Kaur, S. Kaur. 2017. “Indebtedness among Farmers and Agricultural Labourers in Rural Punjab.” *Economic and Political Weekly*. vol 52, no 6.

৩. Suri, K. C. 2006. “Political Economy of Agrarian Distress.” *Economic and Political Weekly*. vol 41, no 16.

সংযোজন

ক। বিভিন্ন শস্যের পরিসাংখ্যিক পরিমাপসিদ্ধ রিগ্রেশন

		সবুজ বিপ্লবের আগে ১৯৫০–’৫১ থেকে ১৯৬৫–’৬৬			সবুজ বিপ্লবের পরে ’৬৬–’৬৭ থেকে ’৮১–’৮২		
	শস্য	সমীকরণ	Adj R^2	বৃদ্ধির হার	সমীকরণ	Adj R^2	বৃদ্ধির হার
উৎপাদন	ধান	Logy = 3.06 + 0.03t T = (63.40) (7.26)	0.77	৩.৬৯%	Logy = 3.11 + 0.02t T = (24.88) (5.33)	0.64	২.৭১%
	গম	Logy = 1.90 + 0.37t T = (35.51) (6.37)	0.74	৩.৮০%	Logy = 1.70 + 0.06t T = (9.88) (8.96)	0.84	৬.৩৯%
	খাদ্য শস্য	Logy = 4.00 + 0.02t T = (86.87) (6.10)	0.70	২.৯৬%	Logy = 4.0 + 0.02t T = (36.33) (6.34)	0.72	২.৮৩%
	আখ	Logy = 3.81 + 0.06t T = (57.16) (9.03)	0.84	৬.৪%	Logy = 3.90 + 0.04t (19.66) (5.33)	0.64	৪.৩৩%
	তুলা	Logy = 1.20 + 0.03t T = (18.25) (5.36)	0.64	৩.৭০%	Logy = 1.20 + 0.02t T = (8.98) (4.86)	0.60	২.৬৫%
উৎপাদনশীলতা	ধান	Logy= 6.60 + 0.02t T = (145.59) (4.84)	0.59	২.২৯%	Logy = 6.58 + 0.01t T = (61.92) (4.37)	0.54	১.৮৭%
	গম	Logy = 6.51 + 0.01t T = (162.04) (3.46)	0.42	১.৪৫%	Logy = 6.44 + 0.03t T = (63.90) (7.53)	0.78	৩.০৯%
	খাদ্য শস্য	Logy = 6.31 + 0.01t T = (190.20) (4.96)	0.61	১.৭১%	Logy = 6.20 + 0.02t T = (71.06) (6.51)	0.73	২.৩০%
	আখ	Logy = 10.28 + 0.02t T = (282.47) (7.60)	0.79	২.৯০%	Logy =10.39 + 0.01t T = (121.45) (5.04)	0.61	১.৭৪%
	তুলা	Logy = 4.45 + 0.01t T = (91.30) (3.96)	0.49	২.০১%	Logy = 4.32 + 0.03t T = (39.19) (5.68)	0.67	২.৫৪%

Source: Directorate of Economics and Statistics, DAC&FW website

t এর সহগ গুলি দশমিকের পর দুটি স্থান অবধি দেখানো হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধির হার নির্ণয় করার সময় সহগ গুলির দশমকের পর সবকটি স্থানের মানই বিবেচনায় রেখে হিসেব করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

কৃষি-উন্নয়নে শিল্প ও কৃষির আন্তঃসম্পর্ক

আধুনিক যুগেও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখতে গেলে অ-কৃষি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে কৃষিতে উন্নতি ঘটানো জরুরি। কৃষি-উদ্বৃত্ত শুধু যে অ-কৃষি ক্ষেত্রকে খাদ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের জোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তাই নয়, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও তৈরি করে। সামগ্রিকভাবে শিল্পের ওপর বিনিয়োগ করলে শ্রমের নিয়োগ বাড়ে, ফলে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বাড়ে। এই অতিরিক্ত চাহিদা ভোগ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়ানোর অবস্থা তৈরি করে। ফলে দ্বিতীয় স্তরে শ্রমের নিয়োগ বাড়ে। এই দুই স্তরের মিলিত ক্রিয়ায় একদিকে শিল্পজাত পণ্যের বিপুল জোগান বাড়ে, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন না বাড়াতে পারলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। ন্যূনতম খাদ্য কিনতেই শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের আয়ের বড় অংশ চলে যায়। ফলে শিল্পজাত পণ্যের ওপর মানুষের ব্যয় করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে, বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে, শিল্পে বিনিয়োগ কমে, উৎপাদন কমে যায়। উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে হলে একদিকে শিল্পজাত পণ্যের বাজারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন, অন্যদিকে খাদ্যের জোগানও যথেষ্ট বাড়ানো দরকার। কিন্তু খাদ্যের জোগান বাড়ার ফলে খাদ্যের দাম কমে গেলে কৃষকের আয় কমে যেতে পারে, ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা কমার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে শিল্পোৎপাদন বাড়লে সেই শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য ও শিল্পে উন্নয়ন আনার জন্য দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা যে-সমস্যা তৈরি করে তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি-আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোই যথেষ্ট নয়, এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপণ্যের যথাযথ বিপণন দরকার যাতে কৃষিপণ্যের দাম কমার প্রবণতা ও কৃষকের আয় কমার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে বিশাল সংখ্যক মানুষের আয় আসে কৃষি থেকে। তাই এইসব দেশে কৃষি শিল্পজাত পণ্যের বাজার তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। উন্নয়নশীল আধুনিক অর্থনীতিতে কৃষি-উন্নয়নের প্রক্রিয়া, কৃষিতে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে কৃষি-আয়ের বণ্টন ও এর সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদার আন্তঃসম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়।

দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজার হিসেবে কৃষির গুরুত্ব নির্ভর করে কৃষি-উন্নয়নের ফলে কোন শ্রেণির হাতে কৃষি-আয়ের অধিকাংশ জমা হচ্ছে, তার ওপর। কৃষি-আয়ের অধিকাংশ যদি একটি মুষ্টিমেয় সম্পন্ন শ্রেণির হাতে জমা হয় তাহলে এই উন্নয়ন সাধারণ শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা যথেষ্ট বাড়াতে পারে না। এর কারণ, আয় বাড়লেও এই শ্রেণিটি তার সামান্য অংশই সাধারণ ভোগ্যপণ্যের ওপর ব্যয় করে। অন্যদিকে

কৃষির বর্ধিত আয়ের বেশির ভাগ যদি অসংখ্য ছোট চাষির আয় বাড়ায় তাহলে সাধারণ শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হতে পারে, কারণ এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা তাদের আয়ের অধিকাংশই সাধারণ ভোগ্যপণ্য কিনতে ব্যয় করে। উন্নয়নশীল দেশে বিশাল সংখ্যক মানুষের আয় আসে কৃষি থেকে, তাই এইসব দেশে শিল্পজাত পণ্যের বাজার তৈরিতে কৃষি এক বিশেষ ভূমিকা নেয়।

অর্থনীতির অনুন্নত স্তরে থাকা কোনও দেশে অর্থনীতিতে শিল্পায়নের সূচনা হওয়ার আগে, সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে, কৃষি যে-ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন ডবলিউ এ লুইস।[১] লুইস অবশ্য উন্নয়ন বলতে আধুনিক শিল্পায়নকেই বুঝেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন শুরুর আগে দেশটি প্রধানত সনাতন ন্যূনতম বেঁচে থাকার সামগ্রী উৎপাদনের উপযুক্ত অনুন্নত উৎপাদন কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। সনাতন উৎপাদন-ক্ষেত্র বলতে প্রধানত কৃষি ও ছোট অ-কৃষি ক্ষেত্র বোঝানো হয়েছে। এই উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মতো সর্বনিম্ন মজুরি-হারে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মজুরি শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। অর্থাৎ এই সনাতন ক্ষেত্রে শ্রমিকের মাথাপিছু গড় উৎপাদনের পরিমাণ তার মজুরির হারের সমান। এই মজুরি-হার একটি শ্রমিকের ন্যূনতম বেঁচে থাকার প্রয়োজনের সমান। শিল্পায়ন শুরু হওয়ার স্তরে স্বল্প বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি নিয়ে দেশটি উন্নয়নের পথে যায়। নতুন কিছু শুরু করার জন্য শিল্পোৎপাদন-ক্ষেত্র সনাতন উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে তার প্রয়োজনীয় মজুরি শ্রমিক পায়। সনাতন ক্ষেত্র থেকে শিল্পোৎপাদন-ক্ষেত্রে মজুরি শ্রমিক টেনে আনার জন্য এই নতুন গড়ে উঠতে থাকা শিল্পক্ষেত্রের মজুরি-হার রাখা হয় ন্যূনতম স্তরের তুলনায় সামান্য উঁচুতে। উৎপাদন-প্রক্রিয়া শুরু হলে আধুনিক শিল্পক্ষেত্র সনাতন ক্ষেত্র থেকে মজুরি-শ্রমিক ও অত্যন্ত কম মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পেতে পারে। আধুনিক শিল্পক্ষেত্র সনাতন ক্ষেত্র থেকে ততক্ষণই শ্রমিক টেনে এনে নিয়োগ করে, যতক্ষণ না শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন তার মজুরির সমান হয়। এই বিশ্লেষণ প্রাথমিক যে-অনুমানের ওপর তৈরি হয়েছে তা হল, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের নিয়োগ স্থির রেখে যদি শ্রমিকের নিয়োগ বাড়ানো হতে থাকে, তাহলে প্রতি এককে উৎপাদন তার পূর্ববর্তী এককের উৎপাদনের থেকে কম হতে থাকে। এইভাবে পরপর শ্রমিক নিয়োগ করে যেতে থাকলে একসময় প্রতি এককে উৎপাদন কমতে কমতে শ্রমিকের মজুরির সমান হয়ে গেলে আর বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না, কারণ সেই স্তরের উৎপাদন-মূল্য শ্রমিকের মজুরির থেকে কম। এই স্তরে পৌঁছানোর ঠিক আগের স্তর, যেখানে শ্রমিকের উৎপাদন তার মজুরির সমান, সেই স্তরের উৎপাদনকে বলে প্রান্তিক উৎপাদন। এই প্রান্তিক উৎপাদনের স্তরে পৌঁছানোর আগের প্রত্যেক এককে শ্রমিকের মজুরির থেকে তার উৎপাদন বেশি থাকে। ফলে শ্রমিককে মজুরি দেওয়ার পর মালিকের হাতে উদ্বৃত্ত জমা হয়। মালিক সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। এইভাবে শ্রমিকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পুঁজিতে পরিণত হয়, যা কাজে লাগিয়ে মালিক শুধু যে উৎপাদন সম্প্রসারণ করে তাই নয়, মালিক উৎপাদনে ব্যবহারের যন্ত্রপাতিও তৈরি করতে পারে। এইভাবে সনাতন ক্ষেত্র থেকে আধুনিক ক্ষেত্রে শ্রমিকের বহির্গমন হতে থাকলে একসময় সনাতন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত উদ্বৃত্ত শ্রমিক ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং সনাতন ক্ষেত্রের পক্ষে আর সস্তায় শ্রমিক জোগান দেওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে সনাতন ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে। সনাতন ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি ও নিয়োগ আর আগের মতো শ্রমিকের গড় উৎপাদন দিয়ে ঠিক হয় না, ঠিক হয় প্রান্তিক উৎপাদনের নিরিখে। অর্থাৎ কৃষিতেও শিল্পের অনুরূপ পুঁজিবাদী

উৎপাদন-সম্পর্ক চালু হয়। অন্যদিকে শিল্পও আরও বেশি পুঁজিঘন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে, শিল্পেও আরও আধুনিক, কম শ্রমনির্ভর, বেশি মাত্রায় মূলধনি উপাদান-নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ে।

এইভাবে লুইস দেখিয়েছেন, প্রাক্‌পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ওপর দাঁড়ানো কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিও কৃষিতে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত শ্রম উৎপাদনশীল ভাবে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারে ও কৃষিতেও উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সূচনা করতে পারে। কিন্তু লুইসের এই বিশ্লেষণটি স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রাথমিক অনুমানের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়েছে, সেই অনুমানগুলি স্বল্পোন্নত দেশের প্রাক্‌শিল্পায়ন যুগের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। একটি স্বল্পোন্নত দেশ, যেখানে বেশির ভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি ও ক্ষুদ্র পারিবারিক শিল্প, সেখানে শিল্পায়নের অভাবে অর্থনীতিতে নানা পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। এই সমস্ত পিছিয়ে-পড়া অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, জমি ও উৎপাদনের উপকরণের সুসংগঠিত বাজার-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও উৎপাদন-কাঠামোতে নানাপ্রকার পিছিয়ে পড়া বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ। এইসব অর্থনীতিতে প্রায়শই দেখা যায়, ছোট উৎপাদকরা জমি ও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। শিল্পায়নের একেবারে প্রাথমিক স্তরে শিল্পে ন্যূনতম মজুরির ওপর স্বল্প বেশি মজুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সহজে গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের বহির্গমন ঘটাতে পারে না। শ্রমের ও জমিসহ অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে, ও তার সাবেক বাসস্থানের সঙ্গে, শ্রমিকের অভিন্ন আত্মিক যোগ কেবলমাত্র অর্থনীতির এই নিয়মে ছিন্ন হয় না। এর জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদের অনুকূলে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক-সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা, যা কৃষকের পূর্বতন আয়ের উৎস থেকে ছোট চাষিকে উচ্ছেদ করে, এবং এই উপকরণগুলিকে পুঁজিবাদ বিকাশের স্বার্থে নতুন ভাবে কাজে লাগানোর পরিস্থিতি তৈরি করে। আমরা দেখেছি ইংল্যান্ডে ১৬৮৮-’৮৯-এর বিপ্লব তার মূল চরিত্রের দিক দিয়ে ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা নতুন একটি রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল এবং পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত মেটানোর অবস্থা তৈরি করেছিল। জমি ও আদি বাসভূমি থেকে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্ত শ্রমিকশ্রেণিতে পরিণত করার উপায় ছিল বলপ্রয়োগ ও সেই পদ্ধতির অনুকূলে বিস্তৃত আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। লুইস স্বল্পোন্নত প্রাক্‌শিল্পায়ন যুগের যে-অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই দেশগুলির অধিকাংশই দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনতা কাটিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ। শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় কৃষির যে-ভূমিকা লুইস তাঁর তত্ত্বে অনুমান করেছেন, এইসব দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে বিদ্যমান নানা ধরনের প্রাক্‌-পুঁজিবাদী উপাদান ও জাড্যর কারণে বাস্তবে কৃষি সেই ভূমিকা পালন করতে পারে না। আমূল ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি-সম্পর্ক পরিবর্তনের যথাযথ কর্মসূচি তৈরি করা হলেও তার রূপায়ণের মাধ্যমে ভূমি-সম্পর্কে কেবল ততটুকুই পরিবর্তন আনা সম্ভব, যেটুকুতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা শ্রেণিগুলির স্বার্থ বিপন্ন না হয়। অনেকসময় কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় কৃষিতে উদ্বৃত্ত মানুষের চাপ অত্যধিক বেড়ে গেলে দেখা যায় কৃষি ছেড়ে মানুষ শহরাঞ্চলে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বহির্গমন করে। কিন্তু শিল্প-উন্নয়নের স্বল্প বিকাশের দরুন কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন এই অতিরিক্ত মানুষের জন্য শিল্প যথেষ্ট অর্থকরী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে না। এই বিশাল সংখ্যক উদ্বৃত্ত মানুষ হয় শহরে বেকারত্বের পরিমাণ বাড়ায়, অথবা অসংগঠিত সংস্থা বা স্বনিযুক্তি সংস্থার বিপুল প্রসার ঘটায়। এই অবস্থা ভারতের মতো অর্থনীতির বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে।

পোল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ এম কালেস্কি[২] (M Kalecki) এরকম এক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে বিচারে এনে স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে যে-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তা আমাদের মতো দেশের সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমরা এখানে কালেস্কি-র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি আলোচনা করে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশকের সামগ্রিক উন্নয়নে, বিশেষ করে কৃষি-উন্নয়নে, যে-নীতি নেওয়া হয়েছিল তার পর্যালোচনা করেছি।

কালেস্কি (Kalecki) তাঁর বিশ্লেষণের ক্ষেত্র হিসেবে একটি উন্নয়নশীল দেশের উদাহরণ নিয়েছেন। এখানে শিল্পক্ষেত্রে হয় অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা উপস্থিত, অথবা স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। সুতরাং শিল্পে স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমেই অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা ব্যবহার করে সহজে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে-পড়া উৎপাদন-সম্পর্ক ও বহু ধরনের কাঠামোগত পশ্চাদপদ প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকায় কৃষি-উৎপাদনে স্বল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

কালেস্কি তাঁর বিশ্লেষণে এমন একটি অর্থনীতির কথা বলেছেন যেখানে তিনটি শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। প্রথমত, ধনী মালিক-শ্রেণি। দ্বিতীয়ত, ছোট উৎপাদক, যাদের মধ্যে রয়েছে ছোট চাষি যারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে, ও ছোট কারিগর। এবং তৃতীয়ত, শ্রমিক-শ্রেণি। সমগ্র অর্থনীতিটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। বিনিয়োগযোগ্য মূলধনি দ্রব্য ও এই মূলধনি দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে-দ্রব্যগুলি কাজে লাগে সেই সব কিছুর উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ে রয়েছে প্রথম বিভাগ। এই বিভাগে অন্তিম স্তরে পণ্যদ্রব্যগুলির মোট মূল্য দেশের মোট বিনিয়োগের সমান। দ্বিতীয় বিভাগে উৎপন্ন হয় ভোগ্যপণ্য, যার মধ্যে কৃষি-উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন-ক্ষেত্রটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এই বিভাগে অন্তিম স্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য দেশের মোট ভোগের সমান। প্রত্যেক বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ভোগ ও সঞ্চয় এই দু'ভাগে ভাগ হয়। প্রথম বিভাগের মালিক-শ্রেণি ও শ্রমিক-শ্রেণি মোট যত মূল্যের ভোগ্যপণ্য ভোগ করে সেটি দ্বিতীয় বিভাগের মোট সঞ্চয়ের মূল্যের সমান, কারণ দ্বিতীয় বিভাগে উৎপন্ন ভোগ্যপণ্যের মূল্যের যে-অংশ দ্বিতীয় বিভাগ সঞ্চয় করে, প্রথম বিভাগ সেই মূল্যের সমান ভোগ্যপণ্যই তার ভোগের জন্য পেতে পারে। অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু উৎপন্ন হচ্ছে না ধরে নিলে আমরা বলতে পারি, প্রথম বিভাগের মোট ভোগের মূল্য দ্বিতীয় বিভাগের মোট সঞ্চয়ের মূল্যের সমান। এই অবস্থা অর্থনীতির ভারসাম্য বোঝায়। কারণ দ্বিতীয় বিভাগের মোট সঞ্চয়ের সঙ্গে প্রথম বিভাগের সঞ্চয় যোগ করলে দেশের মোট সঞ্চয় পাওয়া যাবে, যার মূল্য প্রথম বিভাগের মোট ভোগের মূল্য ও মোট সঞ্চয়ের মূল্যের যোগফল, অর্থাৎ তা প্রথম বিভাগের মোট উৎপাদন-মূল্যের সমান হবে। অর্থাৎ দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের মূল্যের সমান হবে। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছি (বস্তুত চিহ্নগুলি কালেস্কি নিজেই তাঁর বইতে এইভাবে ব্যবহার করেছেন)।

ধরা যাক, প্রথম বিভাগের ভোগ ও সঞ্চয়ের মূল্য যথাক্রমে

$$C_1 \text{ এবং } S_1$$

ও দ্বিতীয় বিভাগের মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের মূল্য যথাক্রমে

C_2 এবং S_2

এবার, যেহেতু প্রথম বিভাগের মোট ভোগের মূল্য দ্বিতীয় বিভাগের মোট সঞ্চয়ের মূল্যের সমান, আমরা লিখতে পারি:

$$C_1 = S_2$$

সমীকরণটির বাম, ডান উভয় পার্শ্বে S_1 যোগ করে পাই

$$C_1+S_1 = S_1+S_2$$
$$=> I = S$$

অর্থাৎ প্রথম বিভাগের মোট উৎপাদনের মূল্য দেশের মোট সঞ্চয়ের মূল্যের সমান। আবার, আমরা জানি, প্রথম বিভাগের মোট উৎপাদনের মূল্য দেশের মোট বিনিয়োগের মূল্যের সমান। সুতরাং উপরোক্ত শেষ সমীকরণটি বিনিয়োগ-মূল্যের সঙ্গে সঞ্চয়-মূল্যের সমতা বোঝাচ্ছে, যা স্বল্পকালের মেয়াদে দেশের মোট চাহিদার সঙ্গে মোট জোগানের ও সার্বিকভাবে আর্থিক ভারসাম্যের অবস্থা বোঝায়। এবার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যদি বিনিয়োগ বাড়ানো হয় তাহলে প্রথম বিভাগে উৎপাদন ও শ্রমিকের নিয়োগ বাড়বে। এর ফলে প্রাথমিকভাবে খাদ্যের চাহিদা বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ কৃষিবিভাগ খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে পারবে না। কারণ দ্বিতীয় বিভাগ, যার মূল অংশ কৃষি, নানারকম কাঠামোগত পশ্চাদপদতার শিকার। ভূমি-সম্পর্কে রয়ে গেছে নানা জাড্য, যার ফলে খাদ্যের উৎপাদন স্বল্পকালে বাড়ানো সম্ভব হয় না। খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যের জোগানে এই জাড্যের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যের চাহিদা বাড়তে থাকলে খাদ্যের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা দেবে। ফলে শ্রমিকের প্রকৃত আয় কমবে। কিন্তু খাদ্যের চাহিদা কমবে না, কারণ খাদ্য নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী তাই খাদ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, গরিব মানুষ খাদ্য কেনা কমাতে পারে না। ফলে তাদের খাদ্যের ওপর ব্যয় বাড়বে, যদিও তাদের প্রকৃত আয় কমেছে। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ছোট উৎপাদকের আয় বাড়বে না, বরং বড় উৎপাদক ও কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে, ফলে সামগ্রিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা কমবে, কারণ বড় চাষি ও ব্যবসায়ীরা তাদের আয়ের সামান্য অংশই এই ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্য কিনতে খরচ করে থাকে। খাদ্যের ওপর খরচ বাড়ার ফলে ছোট উৎপাদক, কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিকরা খাদ্য ছাড়া অন্য যেসব সাধারণ ভোগ্যপণ্য ভোগ করে থাকে সেগুলির ওপর খরচ কমাতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ এইসব সাধারণ অ-কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমবে এবং সেসবের উৎপাদন কমাতে হবে, ফলে এইসব সাধারণ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যেসব মূলধনি দ্রব্য দরকার হয়, তাদের চাহিদাও কমবে। ফলে উৎপাদন-চক্রের দ্বিতীয় স্তরে মূলধনি পণ্যের উৎপাদন, যা মূলত প্রথম বিভাগে উৎপাদিত হয়, সেগুলির চাহিদা কমে যাবে। একদিকে খাদ্যের দাম বাড়ার প্রতিক্রিয়ায় সব বিভাগে শিল্প-শ্রমিকের আর্থিক মজুরি বাড়বে, ও অন্যান্য সামগ্রীর দামও বাড়বে, অন্যদিকে একই সঙ্গে ভোগ্যপণ্য, এমনকী মূলধনি পণ্যেরও উৎপাদন কমবে ও উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকের নিয়োগ কমবে। এই অবস্থাকে কালেস্কি ‘স্ট্যাগফ্লেশন’ বলে বর্ণনা করেছেন, যা মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির মতো বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক অবস্থার

সহাবস্থান। এই পরিস্থিতির উদ্ভব রোধ করতে হলে কৃষিকে কাঠামোগত জড়ত্ব থেকে মুক্ত করে কৃষিপণ্যের জোগানে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো প্রয়োজন। কালেস্কির মতে, এইসব দেশে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কৃষিকে তার যথাযথ ভূমিকায় স্থাপন করতে হলে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমূল ভূমিসংস্কার কর্মসূচির প্রণয়ন চাই, একই সঙ্গে তার যথাযথ রূপায়ণও চাই। কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে অনেক সময়েই প্রকৌশলগত উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৌশলগত উন্নতির সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর রাস্তায় কৃষিপণ্যের অসম বন্টন ঘটে। এই পদ্ধতিতে বড় চাষি ও কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীর আয় বাড়ে, অন্যান্য শ্রেণিগুলির আয় বাড়ে না। উপরন্তু কৃষি উৎপাদন কম শ্রমনির্ভর হয়ে পড়ায় শ্রমিকের নিয়োগ কমে। এইভাবে শ্রমিক ও ছোট উৎপাদকের বিপক্ষে ও বড় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সপক্ষে কৃষি-আয়ের পুনর্বন্টন ঘটবে। অন্যদিকে পুরনো অ-সংস্কৃত কৃষি-কাঠামো বজায় রেখে প্রকৌশলের উন্নয়ন কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। যাই হোক, প্রকৌশলের উন্নতি তাৎক্ষণিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বাড়াবে ঠিকই, কিন্তু ছোট চাষি ও ছোট উৎপাদকের আয় না বাড়ায় প্রকৌশলগত উন্নতির সাহায্যে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর এই পদ্ধতিতে সাধারণ শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদার সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি বা স্ট্যাগফ্লেশনের সমস্যাকে রোধ করতে পারবে না। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে স্ট্যাগফ্লেশনের মতো সমস্যা এড়িয়ে উন্নয়নের কার্যক্রম সফল করতে হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমূল ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষি-আয়ের পুনর্বন্টন মারফত সাধারণ শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়াতে হবে। শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর কর্মসূচি রূপায়ণের আগে কৃষিতে আমূল কাঠামোগত সংস্কার করে ছোট উৎপাদক ও কৃষি-শ্রমিকের পক্ষে আয়ের বন্টন সুনিশ্চিত করে কৃষি আয়ের অপেক্ষাকৃত সুষম বন্টনের মাধ্যমে কৃষিতে শিল্পপণ্যের অন্তর্দেশীয় বাজার প্রসারিত করা যায় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়ণ করা যায়।

একথা ঠিক, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের প্রসার ঘটে। উন্নত দেশে যেমন জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষির তুলনামূলক অবদান, উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়, যথেষ্ট কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে শিল্পোন্নয়নের পথে অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা যে সমস্যা তৈরি করে তা অনেকটা কমে। তখন শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের দেশীয় বাজার গড়ে তোলা ও প্রসারিত করা ও এ জন্য কৃষি-আয় বৃদ্ধির ভূমিকা আর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষ করে খাদ্যশস্য ও ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদির চাহিদায় যে-বৃদ্ধি ঘটে তার জন্য এবং সেইসঙ্গে বহির্বাণিজ্যে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যও উন্নত দেশগুলিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নত দেশগুলির নিয়ন্ত্রক ভূমিকা লক্ষ করলেই এই দেশগুলিতে কৃষির বিশাল গুরুত্বের আঁচ মেলে। চাল-গমের মতো অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে অতি উন্নত দেশগুলিই প্রধান রফতানিকারক দেশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু দেশ, যেমন ফ্রান্স, কিছুকাল যাবৎ খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতায় রত। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আজকের ইউরোপে উন্নত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে কৃষির তুলনামূলক গুরুত্ব কমে গেলেও এসব দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রফতানি-দ্রব্য হিসেবে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মোট ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগে রয়েছে কৃষিজমি, শতকরা বাইশ ভাগ জঙ্গল। ২০১৫ সালে ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন ছিল ৩২৯ মিলিয়ন হেক্টর, এর মধ্যে নিট কর্ষিত জমির পরিমাণ ১৪১ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ শতকরা ৪২.৮৫ ভাগ। একই জমিতে একাধিক বার চাষের হিসেবকে ধরলে গ্রস কর্ষিত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫ মিলিয়ন হেক্টর। ১৯৫০ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যা। কৃষিতে কর্মরত মানুষের অনুপাত ছিল মোট কর্মরত মানুষের শতকরা ৭০ ভাগ। ২০১৩ সালে এই সংখ্যাগুলি নেমে এসেছে যথাক্রমে শতকরা ৬৬ ও ৫০ ভাগে। কৃষিজমির প্রায় আশি ভাগে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান বাদ দিয়েও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ধারা লক্ষ করলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়ানো হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরিকল্পনা-মডেলটি রূপায়িত করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য ১৯২১ সালে ফেল্ডম্যান একটি পরিকল্পনা মডেল নির্মাণ করেন। অধ্যাপক মহলানবিশের পরিকল্পনাটি অনেকাংশে ফেল্ডম্যান মডেলের অনুরূপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সোভিয়েত দেশকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন-মডেলের এই বিশেষ রূপটি অনুসরণ করা হয়, যা অচিরে সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। অধ্যাপক মহলানবিশ ফেল্ডম্যান মডেল সংক্রান্ত ধারণা ব্যতিরেকে আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলার যে-মডেলটি নির্মাণ করেন তার মূল বৈশিষ্ট্য হল, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পে অধিক বিনিয়োগ, যেখানে এই বিনিয়োগের বড় অংশ যাবে সাধারণ ভোগ্যপণ্যের তুলনায় ভারী মূলধনি শিল্প ও পরিকাঠামো নির্মাণ-শিল্পে। তুলনায় সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন-শিল্পে, ও কৃষিতে, মোট বিনিয়োগের সামান্য অংশই ধার্য করা হয়। এসবের ফলে ’৬০ থেকে ’৬৫ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদনে অভূতপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে। ওই সময়ের মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ। মূলধনি দ্রব্যে বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় শতকরা ১২ ভাগেরও বেশি। অপরদিকে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্য শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তেমন বাড়েনি। ভারতের মতো দেশে যেখানে ব্যাপক বেকারত্ব ও তীব্র দারিদ্র মানুষের জীবন অস্থির করে তুলছিল, সেখানে শিল্পদ্রব্যের বিনিয়োগে ও জোগানে যে-বৃদ্ধি ঘটানো হয় তা অন্তর্দেশীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছিল না। এর সঙ্গে ষাটের দশকে তীব্র খাদ্যাভাবের ফলে খাদ্যের দাম অভূতপূর্ব মাত্রায় বাড়ে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিপণ্যের ও অন্য ভোগ্যপণ্যের জোগান বৃদ্ধি না পাওয়ায় সমস্ত ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ে। শিল্পক্ষেত্রে এই ভারসাম্যহীন বিনিয়োগে বৃদ্ধির ফলে ’৬৫ থেকে ’৭০ সালের মধ্যে শিল্পোৎপন্নের হার কমে শতকরা ৪-এ এসে দাঁড়ায়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশক জুড়ে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেয়। তার একটা বড় কারণ, শিল্প-বিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর কাজে যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব। শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কৃষিজাত পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। এর সঙ্গে তাল রেখে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন স্বল্পকালের ব্যবধানে বাড়ানো সম্ভব হয় না। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি অবধি কৃষি-উৎপাদনের হার যথেষ্ট নীচে থাকায়

চাহিদা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। দরিদ্র কৃষকের প্রকৃত আয় কমে যায় কিন্তু খাদ্যের মতো অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অ-স্থিতিস্থাপক হওয়ার কারণে খাদ্যের চাহিদা সেই তুলনায় কমে না। ফলে গরিব ছোট উৎপাদক ও কৃষি-শ্রমিকের মোট আয়ের যে-অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় হয় সেই অংশ পরিমাণে বাড়ে। তাদের অ-কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের ওপর ব্যয় করার ক্ষমতা কমে। ফলে সাধারণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন-শিল্পে চাহিদার অভাবের কারণে কালেস্কি বর্ণিত 'স্ট্যাগফ্লেশন' নামক বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়। এইসময় শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূলধনি দ্রব্যেরও চাহিদা কমে ও উৎপাদন কমানো হয়। মধ্য ষাটের দশকে শিল্পোৎপাদনের হার নেমে আসে। শিল্পে একই সঙ্গে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা তৈরি হয়। মুদ্রাস্ফীতি হয়ে ওঠে ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। গোটা '৭০-এর দশক 'স্ট্যাগফ্লেশন'-এর কবলে পড়ে। কৃষিতে উন্নয়ন বৃদ্ধি ও বেকারত্ব কমানো তখন আশু কর্তব্য হিসেবে দেখা দেয়। যে-মূলধনি ভারী শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছিল সেইসব ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়লেও এইসব শিল্পগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করা অত্যন্ত বেশি মূলধন-ঘন প্রকৌশলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে শ্রমে নিয়োগবৃদ্ধির হার ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, বেকারত্বের পরিমাণে হ্রাসের হার ছিল অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন। কালেস্কি দেখিয়েছেন, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রকৌশলের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে মোটেই কার্যকর নয়। কারণ এই পদ্ধতিতে কৃষি-আয়ের পুনর্বণ্টনে দরিদ্র মানুষের পরিবর্তে অবস্থাপন্ন বড় চাষি ও কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীদের আয় বাড়ে অনেক বেশি। ফলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পের বাজার তৈরির সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। আমরা দেখেছি, ভারতের কৃষিতে ভূমিসংস্কারের কাজটি যথাযথ সম্পন্ন না হওয়ায় কৃষি-উৎপাদনের পশ্চাদপদ বৈশিষ্ট্যগুলি তার দ্রুত বৃদ্ধির পথে কঠিন অন্তরায় হিসেবে থেকে গেছে। কিন্তু কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জরুরি ছিল যেটা, সেই ভূমি-সংস্কারের অসমাপিত কাজ সম্পন্ন না করেই মধ্য-ষাটের পর কৃষিতে প্রকৌশলগত উন্নতির জন্য সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সত্তরের দশকে সেই কর্মসূচি রূপায়ণের সময় থেকেই চাল ও গমের হেক্টর-পিছু উৎপাদন বাড়ে। কৃষিপণ্যে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমে। ফলে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে কৃষিখাতে ব্যয় কমে ও উন্নয়নের জন্য অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রার ব্যবহার সহজ হয়। একই সঙ্গে খাদ্যশস্যের জোগান বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দেশীয় বাজারের কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু এই বৃদ্ধিও শিল্পের চাহিদা সংক্রান্ত সংকট নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কৃষিতে প্রকৌশলগত উন্নয়নের ফলে নিয়োগ কমে, নতুন কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টি হয় না, গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সমস্যা বা বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের উপায় সৃষ্টি হয় না। অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিযুক্তির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়লেও কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ কমাতে পারে না, ১৯৫০–'৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি মোট গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অংশ শতকরা ৫২ ভাগ থেকে শতকরা ১৪ ভাগে নেমে এলেও না। এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য উৎপাদন-ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষির উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট কম। ওই সময়ের মধ্যে মোট কর্মনিযুক্তিতে কৃষির অংশ কমেছে তুলনায় সামান্যই, শতকরা ৭০ থেকে শতকরা ৫৫ ভাগে। অ-কৃষি অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে মোট নিযুক্তির অনুপাত ১৯৮৫–'৮৯-এ ছিল মোট অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তির শতকরা ৭৬ ভাগ, তা ২০০৫–'১০

সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮৪ ভাগে। একুশ শতকের প্রথম দশকে এই অ-কৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদন ছিল মোট অ-কৃষি উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ।

সারণি ৯.১ গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে ও কৃষিতে মোট নিযুক্তির ভাগ

	মোট নিযুক্তিতে গ্রামীণ অসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে নিযুক্তির ভাগ	মোট নিযুক্তিতে গ্রামীণ অসংগঠিত স্বচালিত সংস্থায় নিযুক্তির হার	মোট নিযুক্তিতে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্তির ভাগ	মোট নিযুক্তিতে অন্যান্য* ক্ষেত্রে নিযুক্তির ভাগ
১৯৯৯–২০০০	০.০১৩৪	০.০৮৪০	০.৬১০১	০.১৭৮৮
২০১০–১১	০.০২৫১	০.০৯১৬	০.৫১৯৩	০.২২২৭

Source: Charms, Jacques. 2012. "The Informal Economy Worldwide; Trends and Characteristics." *Margin: The Journal of Applied Economic Research*. 6;2(2012) 103–132

গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১৯৯৯–২০০০ থেকে ২০১০–'১১-র মধ্যে গ্রামীণ অসংগঠিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে কর্মনিযুক্তি ছিল মোট কর্মনিযুক্তির শতকরা ১.৩৪ ভাগ, যা ২০১০–'১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২.৫১ ভাগে। ওই সময়ের মধ্যে অসংগঠিত স্বচালিত ছোট সংস্থায় নিয়োগ মোট নিয়োগের ৮.৪০ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৯.১৬ ভাগে দাঁড়ায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কৃষি-উৎপাদনে ওই সময়ে নিযুক্তি মোট নিযুক্তির শতকরা ৬১.০১ থেকে কমে শতকরা ৫১.৯৩-এ নেমে আসে। উল্লেখ্য, ওই সময়ের মধ্যে গ্রাম-শহর মিলিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মোট নিযুক্তি শতকরা ১৯ ভাগ থেকে বেড়েছে শতকরা ২২ ভাগে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে কি কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ হওয়া গ্রামীণ মানুষ শহরে সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত না হয়ে গ্রামীণ অসংগঠিত স্বনিযুক্তি ক্ষেত্র গড়ে তুলছে, বা অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হচ্ছে? এই অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক কম, যা আমরা মোট গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অংশ ও অসংগঠিত শিল্পের অংশের মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারি।

সারণি ৯.২ গ্রামীণ অসংগঠিত সংস্থা ও কৃষিতে মোট নিট আয়ের ভাগ

	অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে মোট নিট জাতীয় আয়ের ভাগ	অসংগঠিত গ্রামীণ নিজস্ব উৎপাদন-ক্ষেত্রে মোট নিট জাতীয় আয়ের ভাগ	কৃষিক্ষেত্রে মোট নিট জাতীয় আয়ের ভাগ
১৯৯৯–২০০০	০.০০৯১	০.০৩০৪	০.২৮০৫
২০১০–২০১১	০.০১২৯	০.০২২২	০.১৮২০

Source: Charms, Jacques. 2012. "The Informal Economy Worldwide; Trends and Characteristics." *Margin: The Journal of Applied Economic Research*. 6;2(2012) 103–132

এইভাবে কৃষি থেকে মানুষ সরে গিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার অর্থ সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতার হ্রাস, মানুষের দুর্দশা ও দারিদ্র বৃদ্ধি। অন্যদিকে এটাও লক্ষ করতে হবে যে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যতই নিয়োগ বাড়ুক কৃষিক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে থাকা বাড়তি মানুষদের এই ক্ষেত্র থেকে খুব বেশি সরিয়ে আনা যায়নি। কৃষিতে এখনও অনেক সংখ্যায় উদ্বৃত্ত মানুষ থেকে গেছে। কৃষি থেকে সরে গিয়ে যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে তাদের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট কম। ফলে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা-বৃদ্ধির সমস্যা ও বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের দিক থেকে বড় কোনও সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি-উৎপাদন হারের হ্রাস-বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের আমদানি ও রফতানির বৃদ্ধি নানাভাবে ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে। সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি রূপায়ণের সময় ১৯৬২–৬৫ থেকে '৭০–'৭৩-এর মধ্যে গড় বার্ষিক কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধি হার ছিল শতকরা ২.০৮, ১৯৭০–৭৩ থেকে ১৯৮০–৮১-র মধ্যে ওই হার দাঁড়ায় শতকরা ২.৩৮, '৮০-র দশকে তা শতকরা ৩-এর সীমা অতিক্রম করে শতকরা ৩.৪০-এ এসে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সালে চাল পাওয়া যেত গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক ৫৮.০ কেজি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর পরিণামে '৫১ সাল থেকে '৬১ সালের মধ্যে চাল লভ্য হয় গড়ে মাথাপিছু ৭৩.৪ কেজি, মোট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এর মান ছিল ১৭১.১ কেজি। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর থেকে '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি চালের মাথাপিছু পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৫৯.১ কেজি, সমস্ত খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় পরিমাণ হয় ১৪৯.০ কেজি। পরবর্তীকালে হ্রাস-বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে ২০০১ সালে এই দু'টি গড় রাশি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৬৯.৫ কেজি ও ১৫১.৯ কেজিতে, এবং ২০১১ সালে যথাক্রমে ৬৬.৩ কেজি ও ১৭০.৯ কেজিতে। অর্থাৎ খাদ্যশস্য সুলভ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। '৬১ সালের পর থেকে এত বছর পেরিয়ে এসেও খাদ্যশস্যের সুলভতা কখনও ওই বছরটির মান অতিক্রম করতে পারেনি, ব্যতিক্রম কেবল '৮০-র দশক। যদিও গমের সুলভতার ক্ষেত্রে এই সময়ে খুব ধীরে কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যান্য নিকৃষ্টতর খাদ্যশস্য যা দরিদ্র মানুষ ভোগ করতে অভ্যস্ত ছিল, সেসব খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে মাথাপিছু লভ্য পরিমাণ অবশ্যই কমেছে। ফলত সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু সুলভতায় কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচির যথাযথ প্রণয়ন ও রূপায়ণ ছাড়া কৃষিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হয় না, কৃষি তার সামন্ততান্ত্রিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে কৃষিতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি যথাযথ প্রণয়ন ও রূপায়ণ সম্পন্ন হয়নি। পুরনো ভূস্বামীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। বিপুলসংখ্যক মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। কৃষিতে প্রান্তিক চাষির সংখ্যা বাড়তে থাকে, প্রান্তিক কৃষি-খামারের আওতায় জমির পরিমাণ ও অনুপাত বাড়ে অথচ প্রান্তিক চাষে নিযুক্ত খামারগুলির গড় আয়তন কমে। ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি আরও ক্ষুদ্র হয়, তার দুর্দশা আরও বাড়ে। এই কাঠামোগত অবস্থার ওপরই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। ভারতের বিস্তীর্ণ কৃষিনির্ভর অঞ্চলে দেশীয় পদ্ধতিতে সনাতন সেচ-প্রযুক্তির তুলনায় এই নতুন প্রযুক্তির কার্যকারিতা কতটা তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। ছোট জোতে দরিদ্র চাষির পক্ষে সঠিক মাত্রায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অসুবিধা, এবং এই প্রযুক্তিতে উৎপন্ন

ফসলের অতিরিক্ত রোগপ্রবণতা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মতো নানা বিষয় আমাদের দেশের কৃষিতে এর কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে রাসায়নিক সারের অধিক প্রয়োগ জমির উর্বরতার ওপর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, ফলে প্রাথমিকভাবে এই প্রযুক্তি সুফল দিলেও দীর্ঘদিন তা ধরে রাখা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে রাসায়নিক সারের অধিক প্রয়োগ পরিবেশের ওপর কুপ্রভাব ফেলছে দেখে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বদলে জৈব সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি আনা হয়। সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে একর-পিছু উৎপাদন বাড়ায়, দেশ খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন করে। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি ভারতীয় কৃষির দীর্ঘকালীন স্থবিরত্ব দূর করতে পারেনি। পরিসাংখ্যিক রিগ্রেশন সমীকরণটি নবম অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

সারণি ৯.৩ক দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির হার (১৯৫০ থেকে ২০১৭)

	উৎপাদন	উৎপাদনশীলতা
শস্য	বৃদ্ধির হার%	বৃদ্ধির হার%
ধান	২.৪২%	১.৮৮%
গম	৪.৩৭%	২.৬৪%
আখ	২.৮৮%	১.২৪%
তুলা	৩.২৩%	২.৬২%

সারণি ৯.৩খ খাদ্যদ্রব্যের লভ্য পরিমাণ (গ্রাম, মাথাপিছু প্রতিদিন) [দশকের গড়]

বছর	চাল	গম	অন্যান্য শস্য	মোট খাদ্যশস্য	দানা শস্য	ডাল	মোট খাদ্যশস্য ও ডাল
১৯৫১—৬০	১৭৮.১১	৬৫.৮৫	১১৯.৪৪	৩৬৩.৪০	২৭.৫১	৬৬.৪৩	৪২৯.৮৩
১৯৬১—৭০	১৮৮.৩১	৯১.০৭	১১৩.৫০	৩৯২.০৮	২২.৫৫	৫৪.৬৫	৪৪৭.৫৩
১৯৭১—৮০	১৮৩.০৩	১১৪.৮০	১০০.৯০	৩৯৮.৭৩	১৭.০৪	৪৩.৪৭	৪৪২.২০
১৯৮১—৯০	১৯৮.০৭	১৪৩.৩১	৮৩.২৪	৪২৪.৬৩	১৩.১৮	৩৯.৫৮	৪৬৪.২০
১৯৯১—০০	২০৯.৩০	১৬২.৬৭	৬৭.৭২	৪৩৯.৭১	১২.৩৪	৩৫.৮০	৪৭৫.৫১
২০০১—১০	১৯১.১	১৫৭.৯	৫৮.০	৪০৭.১	১০.৯	৩৪.৪	৪৪৩.৮
২০১১—১৭	১৮৯.৬	১৭৮.২	৬৭.৪	৪৩৫.২	১৪.৯	৪৫.২	৪৮১.৭

Source: Directorate of Economics and Statistics, DAC&FW website

সারণি ৯.৪ মাথাপিছু খাদ্যশস্যের দৈনিক লভ্য পরিমাণের প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার

বছর	চাল	গম	অন্যান্য শস্য	মোট খাদ্যশস্য	দানা শস্য	ডাল	মোট খাদ্যশস্য ও ডাল
১৯৫০–৬০	২.৩২	২.৪৫	১.২০	১.৭৭	৪.৩০	১.৬২	১.৭১
১৯৬০–৭০	০.৭২	২.৮৫	–০.২৮	০.৬৯	১.০৫	–০.৬২	০.৩৯
১৯৭০–৮০	–০.৫৭	৩.৭৬	–১.৫৯	–০.৩৩	–৪.৯১	–৪.০১	–০.৭৪
১৯৮০–৯০	৩.০৩	০.৭১	০.৭৩	১.৪৮	০.২৭	৩.৪৯	১.৬২
১৯৯০–০০	–০.২৮	২.৫৩	–১.৯৬	–০.০৩	১.৯৭	–১.৯৬	–০.২১
২০০০–১০	–০.৪৫	১.০৪	০.৫৪	–০.১৭	৪.১২	২.০০	–০.০৪
২০১০–১৭	০.৬৬	২.৩৪	৮.১০	১.৭৪	৪.৪৯	৬.৮৭	২.১৯

Source: Directorate of Economics & Statistics

তথ্যসূত্র

১. Lewis, W. A. 1954. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour." *Manchester School*. 22(2).

২. Kalecki, M. 1976. *Essays on Developing Economies*, Humanities Press.

সংযোজন

ক। দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির হার (১৯৫০ থেকে ২০১৭)

শস্য	উৎপাদন			উৎপাদনশীলতা		
	প্রবণতা সমীকরণ	Adj R^2	বৃদ্ধির হার%	প্রবণতা সমীকরণ	Adj R^2	বৃদ্ধির হার%
ধান	Log y = 3.187 + 0.023t T = (128.4) (37.7)	0.95	২.৪২%	Log y = 6.611 + 0.018t T = (357.4) (38.4)	0.96	১.৮৮%
গম	Log y = 2.035 +0.042t T = (39.6) (32.6)	0.94	৪.৩৭%	Log y = 6.506 +0.026t T = (218.2) (34.2)	0.94	২.৬৪%
আখ	Log y = 4.16 + 0.028t T = (101.5) (27.1)	0.91	২.৮৮%	Log y = 10.47 + 0.012t T = (453.3) (20.8)	0.86	১.২৪%
তুলা	Log y = 1.11 + 0.031t T = (19.3) (21.6)	0.87	৩.২৩%	Log y = 4.33 + 0.025t T = (107.6) (25.1)	0.90	২.৬২%

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশ্বায়ন ও ভারতীয় কৃষি

অর্থনৈতিক সংস্কার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বড় ইউরোপীয় দেশগুলি ১৯৪৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ব্রেটনউডস সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধই প্রমাণ যে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদনির্ভর ক্ষমতাগুলির মধ্যে বাজারের জন্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা এত বিপজ্জনক চেহারা নিতে পারে যে তা শেষপর্যন্ত হিংস্র বিরোধিতার রূপ নেয়, চরম রাজনৈতিক বিরোধ ও সশস্ত্র উপায় ছাড়া সমাধানের অন্য কোনও পথ থাকে না। এই অভিজ্ঞতা এটাও দেখিয়েছিল যে, যুদ্ধ হোক বা শান্তি, কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নীতিগুলি মূলত সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষের স্বার্থরক্ষার্থেই রচিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলি এবং জাপান বিরাট ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে, আমেরিকা বৃহত্তম শক্তিধর দেশ হিসেবে পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্বব্যঞ্জক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। একটি শক্তিশালী, দৃঢ়সংযুক্ত, অধিক ভারসাম্য যুক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। তখন মাঝারি অর্থনৈতিক অবস্থায় থাকা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে বা প্রাক্‌পুঁজিবাদী, সদ্য স্বাধীন হওয়া এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রেখে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টি করা এবং তাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত অবস্থার দাবি মেটাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি' বা 'গ্যাট' তৈরি হয়। বিশ্বায়ন কর্মসূচির দু'টি প্রধান দিক আছে। প্রথমত এটি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা ও অর্থনীতির কাঠামোগত উদারীকরণ কর্মসূচি। এটি অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটায় ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে খোলা-বাজার নীতিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়। এর দ্বিতীয় অঙ্গ হল বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা নীতি, যার প্রণেতা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, এবং তা এর অন্তর্ভুক্ত সভ্য দেশগুলির ওপর প্রযোজ্য। এর মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ বিশ্বায়ন কর্মসূচি এবং কৃষির ওপর এই নতুন বিশ্বায়ন কর্মসূচির প্রভাব নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব,

দ্বিতীয় দিকটি অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিগুচ্ছ এবং ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা থাকবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

ভারতে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম চার দশকের উন্নয়ন ছিল সরকারি সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পিত উন্নয়নের নীতি মেনে ভারী ও বুনিয়াদি শিল্প, মূলধনি দ্রব্য-উৎপাদন শিল্প, মূল ধাতু প্রক্রিয়া-করণ শিল্প এবং তার সঙ্গে শিল্পের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ, কাঁচামাল প্রস্তুত ইত্যাদি যা-কিছু শিল্প উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, সেসবের উন্নতিতে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি বিনিয়োগ চালু ছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে প্রথম পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে ভূমিসংস্কারেরও সূচনা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সরকারি বিনিয়োগে ও সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্পগুলির পত্তন ও সম্প্রসারণ হয়। এর সঙ্গে কৃষি-উন্নয়নের জন্য ভারী সেচ প্রকল্পগুলির সূচনা ও উন্নয়নের কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হতে থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ভারী সেচ এলাকাগুলির বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকা চাষের জন্য বৃষ্টির ওপরই নির্ভরশীল থাকে। এরপর ষাট ও সত্তরের দশকে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হতে থাকে। পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের স্বার্থে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজন পড়ে ও নানা প্রকার আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল: একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আইন ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, দেশের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্যের স্বাভাবিক চলাচলের ওপর বাধানিষেধ, বিভিন্ন কৃষিপণ্যের – বিশেষ করে খাদ্যের, বাজার-চালিত কেনা-বেচার ওপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ রেখে সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যপণ্যের সংগ্রহ, তাকে গুদামজাত করে রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, শুল্ক আইন ইত্যাদি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানোর জন্য নানা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রূপায়িত হয়েছিল, যেমন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যবস্থার সাহায্যেই ভেতরকার চাহিদা মেটানোর জন্য দেশে জোগান আছে এমন পণ্যের আমদানির ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়, বিশেষ বিশেষ পণ্য আমদানির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়। দেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে কৃষি-সহ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণদানের পদ্ধতি সহজতর করা হয়। এইভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় উন্নয়নই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম চার দশকের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বন্ধ-দ্বার অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণের ওপর গড়ে ওঠা অর্থনীতিতে প্রথমে অতিরিক্ত জোর ছিল মূল ও ভারী শিল্পের ওপর। পরে '৮০-র দশক থেকে, ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে আমদানি করা হত যেসব বিলাসদ্রব্য সেগুলির উৎপাদনের ওপর জোর পড়ে। এগুলি উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর, উচ্চ আয়ের মানুষের ব্যবহারের জন্য নির্মিত এবং তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। একই সঙ্গে কৃষি ও সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন অবহেলিত হতে থাকে। এর পরিণামে দেশে খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়, পরপর সরকারি বাজেটে বিপুল ঘাটতি প্রকট হয়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারেও ঘাটতি ধরা পড়ে। এই পরিস্থিতি সরকারের বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলে। সুদ ও ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত '৯০-এর দশকের গোড়ায় দেশের অর্থনৈতিক পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিগুলির মূল বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটানোর শর্তে এবং ঘাটতি ব্যয় কমানো, টাকার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কয়েকটি শর্ত

মেনে নিয়ে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে বিপুল ঋণ নেয়। ভারতে এতদিন ধরে মেনে আসা নীতিগুলো আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে বদলে ফেলার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে এসে পড়ল তা বোঝার আগে আমরা দেখব অভ্যন্তরীণ কোন পরিস্থিতিতে এই নতুন নীতিগুচ্ছ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে-বৈচিত্রপূর্ণ ও বিস্তৃত সনাতন শিল্পভিত্তি গড়ে উঠেছে তার মূলে ছিল পূর্ববর্তী বন্ধ-দ্বার নীতির সঙ্গে গৃহীত সরকারি বিনিয়োগ ও সহযোগিতার নীতি। কিন্তু দেশে যে-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তা দেশের অবস্থার সাপেক্ষে আদৌ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। ইস্পাতশিল্পের মতো বুনিয়াদি ধাতুশিল্পগুলি এবং ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারের ফলে কৃষি থেকে কিছু পরিমাণ মানুষের বহির্গমন ঘটে ও শহরে কিছু মাত্রায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু বেকারত্বের বিপুলতার তুলনায় এর সুযোগ এতটাই কম ছিল যে, তা বেকারত্ব নিরসনে তেমন ফল দেয়নি। দ্বিতীয়ত, একটি শ্রমিক-উদ্বৃত্ত দেশে, যেখানে পুঁজির অভাব আছে, যেখানকার বাজারে শ্রমিকের মজুরি কম, তুলনায় পুঁজির দাম বা সুদ বেশি, সেখানে শ্রম ও পুঁজির আনুপাতিক ব্যবহার কাম্য, এবং শ্রম-ঘন উৎপাদন-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শ্রমনির্ভর উৎপাদন-কাঠামো গড়ে তোলার নীতিই শ্রেয়। আমাদের দেশের সরকার এই শ্রম-ঘন উৎপাদন-কাঠামো গড়ার কোনও পরিকল্পনা নেয়নি। পরিবর্তে তারা একদিকে অত্যন্ত পুঁজি-ঘন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পুঁজিনির্ভর মূলধনি পণ্য উৎপাদন করতে নামে, সে জন্য বিশাল উৎপাদন-কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় ও পাশাপাশি গ্রামীণ ছোট উৎপাদন-ক্ষেত্র গড়ে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করতে চায়। দেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মূলধনি পণ্যগুলির জোগান সস্তায় সুনিশ্চিত করার জন্য আমদানি শুল্ক কমিয়ে মূল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-কাঠামোর অংশ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানির কর্মসূচি নেওয়া হয়। অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের ওপর বিশাল ভরতুকির বোঝা চাপে। এসবের পরিণামে একদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয় ও বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে চাপ পড়তে থাকে। অন্যদিকে সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি পূরণের ব্যয় বাড়তে থাকে, ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। একই সঙ্গে শিল্পোৎপাদনে অতিরিক্ত জোর দেওয়া ও কৃষি-উৎপাদনের সমস্যাগুলির দিকে তুলনায় কম নজর পড়ায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সাযুজ্যের অভাব ঘটে, কৃষিজ পণ্যের চাহিদার তুলনায় জোগান অপ্রতুল হয়ে পড়ে। একদিকে বিদেশ থেকে আমদানি করা পুঁজি-ঘন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে তৈরি বুনিয়াদি স্থির পুঁজি-কাঠামো (Basic fixed plant and machinery), অন্যদিকে দেশে পাওয়া যায় এমন যন্ত্রাংশ বা ছোট যন্ত্রপাতির ব্যবহার। 'দেশে পাওয়া যায় সুতরাং বিদেশ থেকে আমদানি করা যাবে না'— এই নীতির ফলে দেশে ক্ষুদ্রায়তনে তৈরি প্রতি ইউনিট যন্ত্রপাতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। এর ফলে দেশে একটি ব্যয়বহুল শিল্প-কাঠামোর সৃষ্টি হল, এবং সেই শিল্পে তৈরি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে লভ্য পণ্যের তুলনায় অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় সেসব রফতানির সুযোগও সীমিত হয়ে থাকল। দেশের ভেতর ব্যবহারের ফলে ব্যয়বহুল উৎপাদন কাঠামোটি আরও অদক্ষ কাঠামোতে পর্যবসিত হল। আবার বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিশাল মূল শিল্প-কাঠামোর ভারী যন্ত্রপাতিগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, অথচ আমাদের দেশে তখনও অবধি ভারী ইস্পাতশিল্পে প্রস্তুত বড় বড় পণ্যের চাহিদা তৈরি হওয়ার মতো যথেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে না ওঠায় বড় বড় মূল ভারী শিল্পগুলিতে যে-স্থির পুঁজি-কাঠামো তৈরি হল তার

উৎপাদন-ক্ষমতার বেশির ভাগ অংশই রইল অব্যবহৃত। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ব্যবহারের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি তৈরি হত সেগুলির ক্ষেত্রে একক-পিছু স্থির ব্যয় দাঁড়াত অত্যন্ত বেশি। এই যন্ত্রগুলোর বাজার-দাম ছিল বেশি, এবং বন্ধ-দ্বার নীতির কারণে এই ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতিগুলোই শুধু ব্যবহার করা যেত, বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব কোনও অপেক্ষাকৃত সস্তার যন্ত্র আমদানি করা যেত না। এইভাবে ভারতে সামগ্রিকভাবে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল শিল্পকাঠামো তৈরি হল। অনেকে মনে করেন এটি ভুল আমদানি নীতি এবং শিল্পনীতি অনুসরণ করার ফল। অন্যদিকে ভারী শিল্পে ব্যবহারের মূল কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ভারী যন্ত্রগুলি বিদেশ থেকে আনতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে জমে ওঠে বিশাল ঋণ। প্রতিবছর ঋণের ওপর সুদ ও আসলের অংশ মেটানোর বাধ্যবাধকতার ফলে দেশ থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে চলে যেতে থাকল।

অতি দ্রুত একটি শক্ত শিল্পভিত্তির ওপর ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যকে রাখা হয়েছিল সবার সামনে। ফলে একদিকে কৃষি-উৎপাদনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়ে গেল অবহেলিত, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ল। এইসময়েই আমেরিকার পিএল ৪৮০ নীতি অনুসারে সাহায্য হিসেবে যে-খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল তা বন্ধ হয়, ফলে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এসবের পরিণামে দ্রুত খাদ্যের দাম বাড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি আংশিকভাবে কিছু বিশেষ শস্য, যেমন গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ালেও প্রাথমিকভাবে এর প্রভাব ছিল সীমিত। দেশের সব অঞ্চলে সব শস্যের ক্ষেত্রে এর কোনও প্রভাব ছিল না। ’৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ’৭০-এর দশকের মধ্যভাগ অবধি শিল্পক্ষেত্রে একই সঙ্গে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে দ্রুত ক্ষয় শুধু ভারত নয় গোটা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। অবশ্য ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতের রফতানি বাড়ায়, বিশেষ করে ভারতের শ্রমিকেরা ওই দেশে প্রচুর সংখ্যায় পাড়ি দেওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে প্রচুর পেট্রো ডলারের আগমন ঘটে। ’৭০ দশকের গোড়ায় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দেনা-পাওনার খাতে আমাদের দেশ বহুদিন পর অপেক্ষাকৃত সুবিধার জায়গায় এসেছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুসৃত শিল্পনীতির প্রধান উপাদান বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে কিছু বিদেশি মুদ্রা এসেছিল বটে, কিন্তু বিদেশ থেকে বড় শিল্প-কাঠামোর যে-অংশগুলি আমদানি করা হয়েছিল পরবর্তী অনেক বছর ধরে, সেই খাতে বিদেশি মুদ্রা বেরিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে বাণিজ্য-ঘাটতি বিপুল আকার ধারণ করলেও দেশে যেহেতু ইতিমধ্যে আমদানি-নির্ভর উৎপাদন-কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে, তা সচল রাখার স্বার্থেই বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার কমানো সম্ভব ছিল না। ফলে বিপুল পরিমাণ ডলারের সংস্থানের জন্য দেশকে নির্ভর করতে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কাছে। এর পরিণাম হল এই যে, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে দেশের মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বদলে ফেলে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হল এবং ’৮০-র দশকের গোড়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কাছ থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার বিপুল পরিমাণ ‘সাহায্য’ এবং তার সঙ্গে যুক্ত শর্তাবলি দেশে অনুসৃত শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতিকে প্রভাবিত করল। ’৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে এমনকী রাসায়নিক এবং ইলেকট্রনিক বিলাসপণ্যগুলি, বা এইসব শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলিও বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে বাধানিষেধ শিথিল করা হয়। দেশে মূল ও ভারী শিল্পগুলির জায়গায় মোটর গাড়ি উৎপাদন এবং রেফ্রিজারেটর, বা টেলিভিশনের মতো বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বাড়ানো হয়, এইসব শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ

বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ’৭০-এর দশকের শেষ থেকে ’৮০-র দশক জুড়ে সবুজ বিপ্লবের বহু বিলম্বিত ফল পাওয়া যেতে থাকে, ফলে কৃষি-উৎপাদনে লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটে। এর আগেই ভারত কৃষিতে স্বয়ংভরতা অর্জন করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করল, কিন্তু সরকারি বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি এড়ানো সম্ভব ছিল না। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার আবার দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। ’৫০, ’৬০, ’৭০-এর দশকে যদিও মূলধনি উৎপাদনশীল ভারী শিল্পে বিনিয়োগের ফলে দেশের শিল্পভিত্তি নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু ’৮০-র দশকের মূল বিনিয়োগ ঘটল ভারী বিলাস-দ্রব্য, মোটর গাড়ি, ইলেকট্রনিক দ্রব্যের নির্মাণে। এই শিল্পগুলি পুনরায় বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার মতো মূলধনি পণ্যের জোগান বাড়ায় না। উচ্চবিত্ত ধনীর ভোগ্যপণ্য বাড়ায় কেবল। এই নতুন প্রসারিত শিল্পকাঠামো অধিক আয়ের মানুষের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে থাকল। দেশের উৎপাদন-উপকরণ এবং দুর্মূল্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা উপাদান ব্যবহার করে তৈরি এই শিল্প-কাঠামোতে অধিক শ্রম ও দেশীয় সাধারণ যন্ত্রপাতি-নির্ভর পণ্যের উৎপাদন অবহেলিত থেকে গেল, যে-পণ্য হয়তো দরিদ্র মানুষের ভোগের উপযোগী হত। ভারী শিল্প-কাঠামোটি দেশের ব্যবহার্য সম্পদের তুলনায় অত্যধিক মূলধনি বিনিয়োগ-নির্ভর বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদনে অত্যধিক জোর দেওয়ায় সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য পণ্যের চাহিদাও থাকে সীমিত। নতুন শিল্পপণ্যগুলির অধিকাংশের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কেমিক্যালস ও ইলেকট্রনিক্স এবং তা বিদেশি মূলধন ও প্রযুক্তি-কাঠামোনির্ভর, ফলে তা দেশের অভ্যন্তরে শ্রমের যথেষ্ট নিয়োগ ঘটায় না। এর ফলে এইসব পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে চাহিদা-কাঠামোও বিস্তৃত হয় না। একদিকে, মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির চাহিদার বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ মানুষের ভোগের উপযোগী পণ্যের চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধির পথও থাকে সীমাবদ্ধ। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয় না, এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা একটি বড় বাধার সৃষ্টি করে। কৃষিতে উদ্বৃত্ত মানুষ নিযুক্ত থাকায় মাথাপিছু আয় খুব কম থাকে, ফলে কৃষিক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রির মতো অবস্থা তৈরি হয় না এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটে না। আবার শিল্পোৎপাদিত পণ্যগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি, কাজেই আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের শিল্পপণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের নতুন শিল্পজাত পণ্যগুলি বিক্রির সুযোগও সীমিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্র থেকে মানুষকে শিল্পক্ষেত্রে সরিয়ে আনার সুযোগ সীমিত। কৃষিপণ্যের দাম বাড়তে পারে না, অথচ কৃষিতে ব্যবহৃত শিল্পোৎপাদিত উপকরণের দাম বাড়ে। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ব্যবসায়ীদের প্রভাব বাড়ে। এই অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই বিপুল সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধি ও স্থায়ী ভোগ্যপণ্য বা ভারী বিলাস-দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধির ফলে একদিকে সরকারি বাজেটে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণে, অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির পরিমাণে বিপুল বৃদ্ধি ঘটে। সরকারকে নানা উৎস থেকে ঋণ নিয়ে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতে হয়। সমস্ত সরকারি উৎসগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় এমনকী বাণিজ্যিক উৎসগুলি থেকেও সরকার চড়া সুদ ও অসুবিধজনক শর্তে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ক্রমে ঋণের পরিমাণ এত বাড়ে যে, দেখা যায় কোনও উৎস থেকেই ঋণ পাওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে ভারত সরকার আবার দেশি মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য হয় এবং দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক

ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে নতুন শর্তাবলি মেনে নেওয়ার শর্তে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ পায়। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যে-বিশ্বায়নের কর্মসূচি চালু করার শর্ত জারি করে তার মূল কথা ছিল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রতিটি বিভাগে বেসরকারিকরণের নীতি ও খোলামেলা বাজার-অর্থনীতির প্রয়োগ। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির ক্ষেত্রে মুক্ত-বাণিজ্যের আবহাওয়া এনে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের বাধানিষেধের অবসান ঘটানো এবং তার মাধ্যমে একটি রফতানিমুখী অর্থনীতি চালু করা।

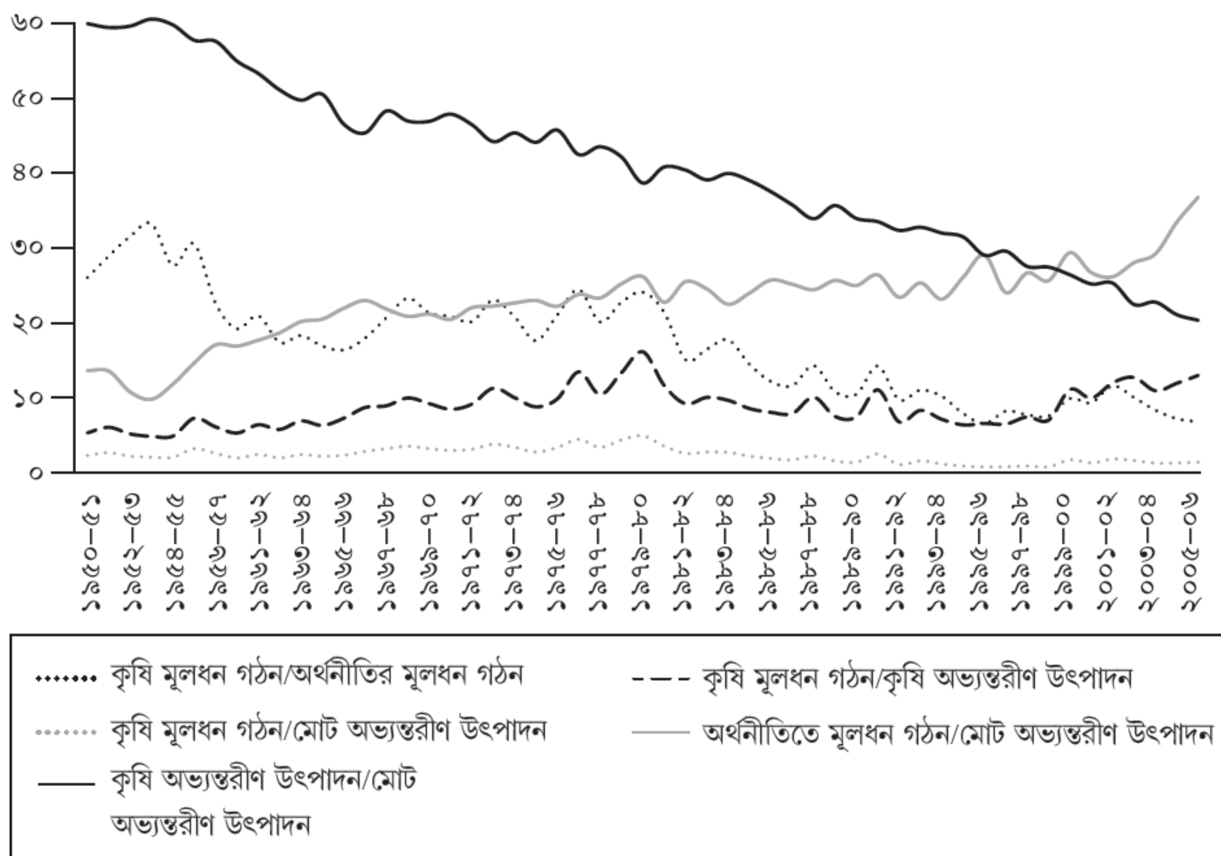
'৮০-র দশক থেকেই সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি 'ওয়াশিংটন মতৈক্য' নামক নতুন নীতিগুচ্ছ অনুসরণ করে আসছিল। তাদের প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকেও এই নীতিগুচ্ছ চালু করার পক্ষে আনার উদ্যোগ চলেছিল। এই নীতির মূল কথা ছিল, অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগের রাস্তা খুলে দেওয়া, বাজার-অর্থনীতির ভূমিকাকে আরও ব্যাপক ও গভীর করে তোলা। ভারতের অর্থনীতি '৮০-র দশকের শেষে যে-সংকটের মধ্যে পড়েছিল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি কিছু সময়ের ব্যবধানে একইরকম অবস্থায় পড়ে। এইসব দেশ তাদের অর্থনীতির কাঠামোর সবদিকে পরিবর্তন আনার জন্য যে-সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছিল তারও মূল কথা একই: সরকারি উদ্যোগ কমিয়ে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগের পথ খুলে দেওয়া। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করা, বিদেশি পুঁজির যাতায়াতের রাস্তার বাধাগুলি দূর করে এই আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব মসৃণ করা এবং এইভাবে উদারীকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে অর্থনৈতিক উদারীকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের কর্মসূচি রূপায়িত করার এই পথটি পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই প্রভাবিত করে। ভারতে ১৯৯১ সালে এই নীতি গৃহীত হয় ও তারপর তা বিভিন্ন দফায় রূপায়িত হতে থাকে। অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতীয় কৃষিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই সংস্কারের দু'টি প্রধান কর্মসূচি ছিল, কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচি ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার সূচি। প্রথম কর্মসূচিটির মূল নীতি ছিল, প্রথমত সরকারি ব্যয় হ্রাস, দ্বিতীয়ত অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কমানো ও বেসরকারি উদ্যোগের ওপর বাধানিষেধ ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে বেসরকারি উদ্যোগকে মদত দেওয়া। তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বাধানিষেধ কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া। সেইসঙ্গে ব্যাংক-ব্যবস্থাকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য ব্যাংকগুলিকে কৃষক ও জনগণের সহায়ক হিসেবে কাজ করার চেয়েও এক-একটি লাভজনক দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে এই নতুন নীতির অর্থ ছিল, কৃষির উন্নয়নে সরকারের মূলধনি ব্যয় কমিয়ে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর বেশি জোর দেওয়া। কৃষির ওপর সরকারি ভরতুকি ও নানাপ্রকার কৃষি-উন্নয়নের কাজে সরকারের ব্যয় কমানো। সরকারি উদ্যোগে বীজ উৎপাদন ব্যবস্থার সংকোচন ঘটানো। এসবের পরিণামে কৃষি-উপকরণের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সার কারখানার ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার ফলে কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ কমার ফলে সেচের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, জলের দাম

বাড়ে। চাল-গম ইত্যাদি অধিক জলনির্ভর শস্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে জলের দাম বাড়ায় উৎপাদন-ব্যয় বিশেষভাবে বাড়ে।

অর্থভাণ্ডার-বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত পথে সরকারি ব্যয়হ্রাসের কর্মসূচি কৃষির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কৃষিতে পুঁজি-গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক দশক উৎপাদন-ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতির সূচনা করেছিল। পুঁজিগঠনে মোট পরিমাণ হ্রাস, বিশেষ করে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস, কৃষির উৎপাদন-ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। সেচের উন্নতিতে সরকারি উদ্যোগ ও সরকারি ব্যয় কমানোর ফলে অধিক জলনির্ভর সনাতন খাদ্যশস্য, যেমন চাল-গম ইত্যাদির উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব পড়ে। যদিও পুঁজিগঠনে সরকারি ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি মূলধনি ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের হ্রাস মূলধন গঠনের চাহিদার তুলনায় যে-অভাব সৃষ্টি করেছে, বেসরকারি বিনিয়োগ দিয়ে এই অভাব পূর্ণ হতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে কৃষিতে পুঁজিগঠন কমেছে, ফলে কৃষি থেকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে।

১৯৫০–৫১ থেকে ২০০৫–০৬ অবধি মোট মূলধন গঠনের পরিমাণের মধ্যে কৃষি থেকে মোট মূলধন গঠনের শতকরা ভাগটি ১৯৫০–৫১ সালে ২৬ থেকে ১৯৫৩–৫৪ সালে ৩১.১০-এ দাঁড়ায়, কিন্তু তারপর ক্রমাগত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৯৬৫–৬৬ সালে তা মোট মূলধন গঠনের শতকরা ১৫.৯৮ ভাগে নেমে আসে। এরপর গোটা সময়ের মধ্যে ক্রমাগত কমতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত ২০০৫–০৬ সালে শতকরা ৭.৩৬ ভাগে দাঁড়ায়। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্যে কৃষিতে গঠিত হওয়া মূলধনের মূল্য সমস্ত সময় জুড়ে শতকরা ৩–৪ ভাগে থাকার পর ২০০০ সালের পর থেকে লক্ষণীয় ভাবে কমে ও ২০০৫–০৬ সালে শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। মোট মূলধন গঠনের মধ্যে কৃষিতে গঠিত মোট মূলধনের শতকরা-ভাগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে নেমে আসার কারণ সহজেই বোঝা যায়। এই ঘটনার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ। এই নতুন নীতি অনুসরণ করে ভারত সরকার কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে কমিয়েছে। সরকারি উদ্যোগ ও সরকারি ব্যয় কমানোর নীতি গ্রহণ করে তা কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে দেখা যায় দেশের মোট উৎপাদন-মূল্যে সরকারি ব্যয়ে কৃষিতে মূলধন গঠনের শতকরা-ভাগ ১৯৮০–৮১-তে ২.০৫ থেকে '৯৮–'৯৯-এ দাঁড়ায় শতকরা ০.৪৭ এবং এরপর সামান্য বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে ২০০৫–০৬-এ শতকরা ০.৬০-এ পৌঁছয়। এইসময়ে দেশের মোট উৎপাদন-মূল্যে বেসরকারি ব্যয়ে মূলধন গঠনের শতকরা ভাগ ১৯৮০–৮১-তে ২.৩৯ থেকে ২০০৫–০৬ এ শতকরা ১.৯১-এ দাঁড়ায়। দেখা যায়, ২০০৫–০৬ সালে কৃষিতে গঠিত মোট মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি বেসরকারি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এবং শতকরা ২৫ ভাগের কম হয়েছে সরকারি ব্যয়ে।



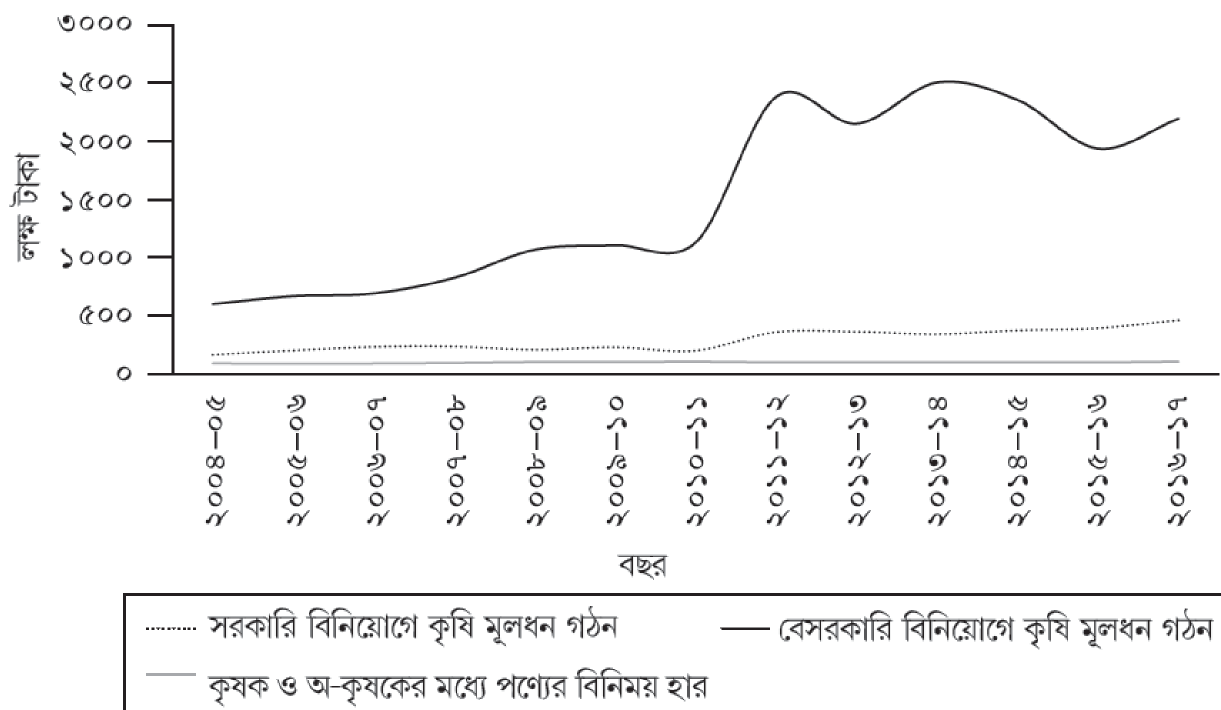
চিত্র ১০.১ কৃষিতে মোট মূলধন গঠনের সঙ্গে, কৃষির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা।

Source: Central Statistics Office (CSO)

সারণি ১০.১ কৃষিতে সরকারি ও বে-সরকারি স্তরে পুঁজিগঠন

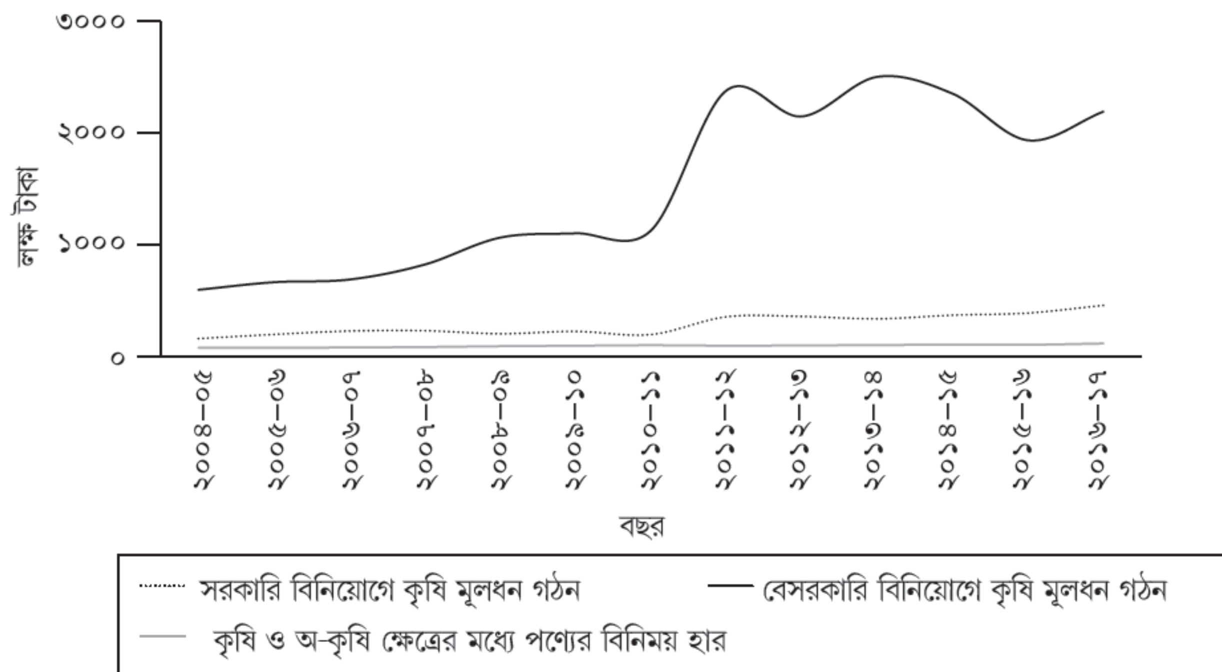
বছর	গড় বাৎসরিক সরকারি স্তরে কৃষিতে পুঁজিগঠন	গড় বাৎসরিক বেসরকারি স্তরে কৃষিতে পুঁজিগঠন	গড় বাৎসরিক সরকারি স্তরে কৃষিতে পুঁজিগঠন বৃদ্ধির হার	গড় বাৎসরিক বেসরকারি স্তরে কৃষিতে পুঁজিগঠন বৃদ্ধির হার
২০০৫–০৭	১৯৭০৪.৬৬	৬৫২১৪.৩৩		
২০০৭–০৯	২২২৭২.০০	৮৬০৩৬.৩৩	৪.৩৪	১০.৬৪
২০০৯–১১	২১০৩৯.৬৬	১০৯৯৬৮.০০	–১.৮৪	৯.২৭
২০১১–১৩	৩০৫২৩.০০	১৮৮৭১০.০০	১৫.০২	২৩.৮৬
২০১৩–১৫	৩৫৭০৫.৩৩	২৩৩৬৮৮.৩০	৫.৬৫	৭.৯৪
২০১৫–১৭	৪০৭৫২.৬৬	২১৬১৯৮.৭০	৪.৭১	–২.৪৯

Source: Central Statistics Office (CSO)



চিত্র ১০.২ কৃষক ও অ-কৃষকের মধ্যে পণ্যের বিনিময় হার, সরকারি ও বেসরকারি কৃষি মূলধন গঠন।

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017



চিত্র ১০.৩ কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে পণ্যের বিনিময় হার, সরকারি ও বেসরকারি কৃষি মূলধন গঠন।
Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

ওপরের সারণি ও ছবি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২০০৪–০৫-এর পরবর্তী সময়ে কৃষিতে বেসরকারি স্তরে পুঁজিগঠনের পরিমাণ সরকারি স্তরে পুঁজিগঠনের তুলনায় অনেকটাই বেশি এবং সরকারি পুঁজিগঠন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেসরকারি পুঁজিগঠন বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। ১৯৮০–৮১ সাল থেকে ’৯৮–’৯৯ সাল অবধি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এইসময়ের মধ্যে বেসরকারি স্তরে পুঁজিগঠনের পরিমাণ পরপর প্রতি বছর বেড়েছে, এবং একই সঙ্গে সরকারি স্তরে ওই বছরগুলিতে পুঁজিগঠনের পরিমাণ কমেছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিময় হার কৃষির বিপক্ষে থাকার পর ’৮৮–’৮৯-এর পর থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা কৃষির পক্ষে উন্নীত হয়। ২০০৪–০৫ অবধি প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সরকারি স্তরে কৃষিতে পুঁজিগঠনের পরিমাণ কমেছে ও বেসরকারি স্তরে বেড়েছে। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির ওই কালপর্বের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে কোনও কোনও পর্যবেক্ষক মনে করেছেন, ওই সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পিছনে যে-উৎসাহব্যঞ্জক উপাদানটি কাজ করেছিল তা হল, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিনিময়-হারে কৃষির অনুকূলে উন্নতির প্রবণতা।[১] কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ’৮৮–’৮৯ থেকে ’৯৮–’৯৯ অবধি কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের পণ্যের বিনিময়-হার আগের তুলনায় কৃষির অনুকূলে এলেও ওই সময়ের মধ্যে কখনই তা ১ বা ১-এর বেশি ছিল না। অর্থাৎ বিনিময়-হার তুলনামূলক ভাবে কৃষির বিপক্ষে, অকৃষি ক্ষেত্রের পক্ষেই ছিল। ২০০৫–০৬ ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে ২০১৫–১৬ সাল অবধি কৃষক ও অ-কৃষকের কেনা-বেচার পণ্যে বিনিময়-হার দু’/একটি বছর বাদে সব বছরেই কৃষকের বিপক্ষে ছিল। কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে যে-পণ্য বিনিময় ঘটে সেখানেও ২০১২–১৩ সাল অবধি এই হার ছিল কৃষির বিপক্ষে। অবশ্য ’১৩–’১৪, ’১৪–’১৫ ও ’১৫–’১৬, এই তিন বছরেই বিনিময়-হার কৃষির পক্ষে ছিল। ২০১৬–১৭-র প্রাথমিক হিসাবেও দেখা যায়, এই হার কৃষির পক্ষে।

কিন্তু ২০০৫–০৬ থেকে প্রথম আট বছর এই হার কৃষির বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও সরকারি-বেসরকারি উভয় দিকের উদ্যোগেই কৃষিতে পুঁজিগঠন বাড়তে থাকে, অর্থাৎ কৃষিতে মোট পুঁজিগঠনের পরিমাণ বেড়েছে, এবং একই সঙ্গে সরকারি পুঁজিগঠনের পরিমাণও বেড়েছে। যদিও বেসরকারি পুঁজিগঠনের পরিমাণ সর্বদাই সরকারি পুঁজিগঠনের তুলনায় অনেকটা বেশি ছিল। ’৮০–’৯০-এর দশক থেকে ২০০৪–০৫ অবধি সরকারি বিনিয়োগের সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগের যে-বিপরীতগামী সম্পর্ক ছিল, ২০০৫–০৬ ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে এই দু’টি ক্ষেত্রে পুঁজিগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে তা দেখা যায়নি। কৃষি ও অ- কৃষি ক্ষেত্রের অথবা কৃষক ও অ-কৃষকের ব্যবহৃত পণ্যের বিনিময়-হারের সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনও নিশ্চিত সরাসরি সম্পর্ক দেখা যায় না। বেসরকারি ও সরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পিছনে অন্য কোনও উৎসাহ প্রদানকারী উপাদানের প্রভাব ছিল কি না সেটা আলাদাভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আমরা পরবর্তী একাদশ অধ্যায়ে দেখব, কৃষিতে প্রতি হেক্টর জমিতে নতুন বীজ, সার ইত্যাদির প্রয়োগ বাড়ার ফলে, এবং একই সঙ্গে এইসব উপকরণের দাম বাড়ার ফলে, প্রতি হেক্টর চাষের খরচ ও প্রতি কুইন্টাল উৎপাদনের খরচ অত্যধিক বেড়েছে। চাষির হাতে নিজস্ব পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকছে যথেষ্ট কম, ফলে চাষির পক্ষে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করার ক্ষমতা যথেষ্ট কমেছে। আমরা দেখেছি, কৃষিতে মোট পুঁজিগঠনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ অতি দ্রুত উচ্চহারে বেড়েছে। এই বাড়ার পিছনে আছে খোলা-বাজারে উৎপাদনশীল কৃষি-উপকরণগুলির দামের অত্যধিক বৃদ্ধি। কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি নতুন অত্যধিক দামি বীজ, সার ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আবার এই উপকরণগুলির জোগান অনেকাংশেই কমিশন এজেন্টের ওপর নির্ভরশীল। চাষি ঋণের জন্য ও পণ্য বিক্রির জন্যও এদের ওপর অনেকসময়ে নির্ভর করে। ফলে ঋণ, কৃষি উপকরণ ও পণ্যের সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে চাষি অত্যধিক উৎপাদন-ব্যয় বহন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই অত্যধিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য চাষিকে বিপুল পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিক ও বিশেষ করে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে চড়া সুদে ধার নিতে হচ্ছে এবং ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সরকারি নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রধান শস্যগুলির জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা, ও সহায়ক মূল্যে সরকারের তরফে শস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা। সেইসঙ্গে আছে কৃষি-উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, সার, কৃষিতে ব্যবহার্য বিদ্যুৎ ও সেচের জলের ওপর ভরতুকি। বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ করে উচ্চফলনশীল বীজ আসার পর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতীয় বীজ শিল্প গঠিত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার দ্বারা। জাতীয় বীজ উৎপাদন সংস্থা গঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। এরপর রাষ্ট্রীয় বীজ উৎপাদন সংস্থা ১৯৬৯ সালে সবুজ বিপ্লবের সূচনার পর গঠিত হয়। এছাড়াও বহুসংখ্যক বেসরকারি কোম্পানি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ করে। বীজ পরীক্ষার জন্য বীজ প্রত্যয়িত করণের এজেন্সি তৈরি হয়েছে, বীজ পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার তৈরি হয়েছে। অনেক ক’টি বেসরকারি বীজ কোম্পানিই বহুজাতিক সংস্থার অঙ্গ, তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিগুচ্ছ এই বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতীয় বীজের বাজারে আরও বেশি করে সহজে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

সরকারি হস্তক্ষেপে ভরতুকি সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি নতুন অর্থনৈতিক নীতি বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে খুব বেশি প্রভাবিত হয়নি, কারণ কৃষির ওপর সরকারি ভরতুকির সামগ্রিক পরিমাণ এতই কম যে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত ছাড়ের সীমা লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের ফলে সার ও বীজের উৎপাদন ও তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সরকারি প্রভাব কমে বেসরকারি প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অবশ্যই কৃষি-উপকরণের দাম বাড়ে। অন্যদিকে ১৯৯১ সালের আগে অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষিক্ষেত্রে প্রস্তুত পণ্যের সঙ্গে অ-কৃষি ক্ষেত্রে প্রস্তুত পণ্যের বিনিময়-হার কৃষির বিরুদ্ধে ছিল। এর কারণ ’৮০-র দশকে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোয় উৎসাহ দিতে গিয়ে শিল্পপণ্যগুলি বেশি বাজার-দাম রাখার কাজে সরকারি সহযোগিতার সুবিধা পেয়েছিল, অথচ কৃষিপণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও কৃষিপণ্যগুলিকে যে সরকারি সহযোগিতা জোগানো হচ্ছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প। শুধু তাই নয়, সরকারের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের হারও ছিল অত্যন্ত কম। ফলে শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে বিনিময়-হারে কৃষি যথেষ্ট অলাভজনক অবস্থায় ছিল। ’৮০-র দশকে সরকার শিল্পপণ্যের দাম ঊর্ধ্বসীমায় বজায় রাখার জন্য যে-সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করেছিল, ১৯৯১-এর পর তা বর্জন করে এবং শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে কৃষি-শিল্পের বিনিময় হার আবার তুলনামূলক ভাবে কৃষির পক্ষে বাড়তে থাকে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, কৃষিতে মূলধন গঠনে বেসরকারি বিনিয়োগ যে বেড়েছে, তার পিছনে হয়তো আছে কৃষি-শিল্পের বিনিময়-হার কৃষির অনুকূলে যাওয়ার ঘটনা।

কিন্তু ’৯০-এর দশকে কৃষিতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি-হারে যে ক্রমাবনতি ও দীর্ঘকালীন স্থবিরত্ব দেখা যায়, কৃষি-উৎপাদনের তুলনামূলক দামের ক্ষেত্রে এই সুবিধাজনক অবস্থানের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ওপরের চিত্র ১০.১-এ দেখা যাচ্ছে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মোট কৃষি-উৎপাদনের শতকরা-ভাগের দীর্ঘকালীন ক্রমাবনতি অতি স্পষ্ট। ভারতের কৃষি-উৎপাদনের দীর্ঘকালীন জাড্য নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের সময়ে আরও স্পষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা দেখেছি, ১৯৯১-এর নয়া আর্থিক নীতি প্রযুক্ত হওয়ার আগে ও পরে মোট অভ্যন্তরীণ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন প্রবণতার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩.০২ (১৯৮১–৯২) ও ২.৫৯ (১৯৯৩–২০০৬)। অর্থাৎ স্পষ্টতই দু’টি কালপর্বের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে।

সারণি ১০.২ নয়া আর্থিক নীতি ও কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধি/হ্রাসের হার

শস্য	নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের আগে (১৯৬৯–৭০ থেকে ১৯৯২–৯৩)	নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের পরে (১৯৯৩–৯৪ থেকে ২০১৬–১৭)
	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধির হার
ধান	২.৯১	১.৩১
গম	৪.৬০	১.৯২
খাদ্যশস্য	২.৬৭	১.৬৮
আখ	২.৯০	১.৩০

তুলা	২.৫৮	৬.৪৪

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, Own Calculation

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগের ২৩ বছরের তুলনায় নয়া আর্থিক নীতির পরের ২৩ বছরে খাদ্যশস্য, গম, ধান ও আখ উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার কমেছে, একমাত্র তুলার উৎপাদন-বৃদ্ধির হার বেড়েছে। নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগের তিরিশ বছরে তুলার বৃদ্ধি-হার অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি-হারের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। আমরা জানি, '৯০-এর দশকের শেষ থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে গম ও তুলার ক্ষেত্রে চাষিরা যে-আত্মহত্যার পথ নিয়েছিল তার কারণ একদিকে ছিল তুলাচাষে উৎপাদন-ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি, অন্যদিকে এই উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় সরকারের ঘোষিত সহায়ক মূল্যের অপ্রতুলতা। গমের ক্ষেত্রে আমেরিকা ভরতুকি-যুক্ত সস্তার পণ্য এদেশের বাজারে অঢেল পরিমাণে জোগান দিয়ে এদেশের চাষিকে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে এদেশের তুলাচাষিরা আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য হয়। নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের সময় তুলাচাষে যে-প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানো হয়েছিল তার ফলে তুলার উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আমরা বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনে উৎপাদনশীলতা বা হেক্টর-পিছু উৎপাদন-বৃদ্ধির হারে কয়েক বছরের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিসাংখ্যিক রিগ্রেশন সমীকরণগুলি দশম অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

সারণি ১০.৩ নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগে ও পরে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদনশীলতায় হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা

শস্য	নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগে ('৭০–'৯৩)	নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের পরে ('৯৩–'৯৪–২০১৬–'১৭)
	%বৃদ্ধি হার	%বৃদ্ধি হার
ধান	২.৩৫	১.৩৬
গম	৩.১৩	১.০১
খাদ্যশস্য	২.৬১	১.৬০
আখ	১.৪০	
তুলা	২.৭৮	৪.৪৩

উৎস: নিজস্ব হিসাব

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই ফল ও সবজি চাষে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রসারিত হয়, শস্য বৈচিত্রকরণের মাত্রা বাড়ে। ২০০১–০২ থেকে ২০১৭–১৮ অবধি সবজি ও ফল উৎপাদনের বৃদ্ধি-হারটি আমরা নীচের প্রবণতা সমীকরণের সাহায্যে মাপার চেষ্টা করেছি, পরিসাংখ্যিক রিগ্রেশন সমীকরণগুলি দশম অধ্যায়ের সংযোজনে দেওয়া হল।

সারণি ১০.৪ সবজি ও ফল উৎপাদনে বৃদ্ধির হার

শস্য	২০০১–০২ থেকে ২০১৭–১৮
	বৃদ্ধির হার
সবজি উৎপাদন	৫.১৭%
ফল উৎপাদন	৫.৪১%

দেখা যাচ্ছে, যেখানে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রযুক্ত হওয়ার শুরু থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি মূল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে, সেখানে ফল-সবজির মতো উচ্চমূল্যের হালকা ফসলের উৎপাদন অতি উচ্চহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা আগে দেখেছি, ধান, গম ও খাদ্যশস্যের মতো প্রধান কৃষিজাত পণ্যগুলির উৎপাদনশীলতায় দীর্ঘকালীন ক্রমাবনতির প্রবণতা অত স্পষ্ট না হলেও ১৯৯১ সালের আগে যে-বৃদ্ধি-হার ছিল, পরে তা কমেছে। বৃদ্ধির হার কমার পিছনে একটি বড় কারণ হতে পারে সরকারি বিনিয়োগের অধোগতি। কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগের একটি বড় অংশ বৃহৎ সেচপ্রকল্পগুলিতে ব্যয় হয়। সরকারি মূলধনি ব্যয় কমার অর্থ, বড় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবহেলা, যার অর্থ ধান-গমের মতো অধিক জলনির্ভর শস্যগুলির ক্ষেত্রে সীমিত বিকাশের সম্ভাবনা। যদিও সরকার এইসব অধিক জলনির্ভর শস্যের পরিবর্তে ফল-সবজির মতো উৎপাদন-ক্ষেত্রকে বেশি উৎসাহ দিচ্ছে এবং তার ফলে খাদ্যের চাহিদা ও জোগানে বৈচিত্র সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এর ফলে কৃষিতে উৎপাদিত জাতীয় উৎপাদনের অংশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখার মতো পরিবর্তন এখনও আসেনি। এছাড়া সনাতন খাদ্যশস্যের মতো পণ্যগুলির উৎপাদনশীলতায় স্থবিরত্বের আর একটি কারণ, কৃষকরা একদিকে মহাজন-ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্ট-ব্যবসায়ীদের এড়িয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে অধিক দামের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে এবং অন্তর্দেশীয় বাজারেও উন্নত দেশগুলির জোগান দেওয়া অতিরিক্ত ভরতুকি-যুক্ত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। বিশ্বের উন্নত খাদ্যশস্য রফতানিকারী দেশগুলি বিশাল ভরতুকির সাহায্যে কৃষিপণ্যের দাম যথেষ্ট কমিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাধান্য করে। এর ফলে বিশ্বায়নের বাধ্যবাধকতায় আমাদের মতো দেশগুলিকেও চাল, গম, তুলা ও সুতি বস্ত্রের মতো পণ্যের ক্ষেত্রে দাম কম রাখতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সরকারের ধার্য করা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও কৃষকের চাষের খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে না। এই বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে কৃষিতে দীর্ঘকালীন স্থবিরত্বের সৃষ্টি করেছে।

আমরা অভ্যন্তরীণ কৃষি-উৎপাদনে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি-হারে হ্রাস দেখতে পাচ্ছি। উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, বাৎসরিক গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যথেষ্ট বাড়লেও ১৯৯২-এর পর প্রতি বছরের বৃদ্ধি-হার গড়ে কমেছে। ২০০২-এর পর এই কমার প্রবণতা আরও বেড়েছে। কাজেই আমাদের প্রবণতা সমীকরণে বৃদ্ধি-হার কমার যে-প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা আমাদের সারণিতে উপস্থিত তথ্যেরই প্রতিফলন। আমাদের এই পর্যবেক্ষণটি গুলাতি ও বাথলা (২০০১)-র পর্যবেক্ষণ থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। গুলাতি ও বাথলা যে কালপর্ব দু'টি তুলনার জন্য বিবেচনা করেছেন, সেগুলি হল ১৯৮০/৮১ থেকে ১৯৮৯/৯০ এবং

’৯০/’৯১ থেকে ’৯৮/’৯৯ । তাঁরা এই দু’টি পর্বের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মোট কৃষিজ উৎপাদনে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে সামান্য উন্নতি দেখেছেন [যথাক্রমে শতকরা ৩.০৩ (’৮০-র দশকে) ও শতকরা ৩.৩১ (৯০-এর দশকে)]। আমরা ১৯৮১–৮২ সাল থেকে ’৯১–’৯২ সাল ও ’৯২–’৯৩ সাল থেকে ২০05–০৬ সাল, এই দু’টি কালপর্ব নিয়েছি। সংস্কার-পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি-হারে উন্নতি বা অবনতির বিষয়টি দেখার উদ্দেশ্য, মোট কৃষি-উৎপাদনের ওপর সংস্কারের প্রভাব দেখা। ১৯৯০–৯১ সাল এবং ’৯১–’৯২ সাল সংস্কারের নীতিগুচ্ছ সরকারি স্তরে ঘোষণার বছর। সংস্কার চালু হওয়া ও অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব পড়তে অবশ্যই অন্তত একবছর লাগতে পারে। সুতরাং সংস্কারের প্রভাব দেখার জন্য আমরা সংস্কার-পরবর্তী পর্বটি ধরেছি ’৯২–’৯৩ সাল থেকে। এই বছর থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্বে কৃষি ও সহকারী উৎপাদন-ক্ষেত্রে একত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার দেখা হয়েছে। আমাদের হিসাবে সংস্কার-পরবর্তী বছরগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার সংস্কার-পূর্ববর্তী কালপর্বের তুলনায় অনেকটাই নেমে এসেছে। এর কারণ হতে পারে, আমরা আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, প্রথমত কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে শুধু শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রটিকে অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, শস্যবিভাগ ছাড়াও কৃষি-উৎপাদন বলতে কৃষির নানা সহায়ক শাখার কথাও ধরা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি, বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উন্নতিহারে নিম্নমুখী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং মোট কৃষিপণ্যের একটি বড় অংশ যেহেতু উৎপন্ন শস্য, তাই মোট কৃষিপণ্যের বৃদ্ধি-হারে শস্যের বৃদ্ধি-হারে হ্রাসের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। যাই হোক, অন্যান্য পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে আমাদের পর্যবেক্ষণের কতটা পার্থক্য হচ্ছে সেটি বোঝার জন্য আমরা অভ্যন্তরীণ কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি/হ্রাস বিষয়টি ওই একই কালপর্বে রেখেছি, অর্থাৎ ১৯৭৮–৭৯ থেকে ১৯৮৮–৮৯ পর্যন্ত ও পরে ১৯৮৯–৯০ সাল থেকে ’৯৮–’৯৯ সাল পর্যন্ত। এই দুই কালপর্বের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মোট কৃষি ও সহায়ক উৎপাদন-ক্ষেত্রে বৃদ্ধি-হার শতকরা ৩.৩ ও শতকরা ৩.২। অর্থাৎ বৃদ্ধিহারে সামান্য হ্রাস ঘটেছে। আমরা এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য ধান, গম, অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং আখ ও তুলা চাষের বৃদ্ধি-হার দেখেছি। আমরা দেখেছি, একমাত্র তুলা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি-হার দু’টি পর্বের মধ্যে কমেছে। বিভিন্ন প্রধান খাদ্যশস্য এবং মোট খাদ্যশস্যের (অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কম মূল্যের খাদ্যশস্য সমেত) উৎপাদনের ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি-হার কমেছে। যদিও ফল-সবজি উভয় ক্ষেত্রে এবং তুলার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পর্বে উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার যথেষ্ট বেশি ছিল। এছাড়া এই পর্বে সম্ভবত কৃষির সহায়ক অর্থাৎ পোলট্রি ও দুধ, মাংস ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ওপরে ওঠার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ কৃষিজ ও সহায়ক ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র সনাতন শস্য-উৎপাদন ক্ষেত্রকে আলাদা করে দেখলে সেখানে প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে বৃদ্ধি-হার যথেষ্ট কমেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকছে না।

সারণি ১০.৫ কৃষি-উৎপাদনের দীর্ঘকালীন প্রবণতা

সাল	কৃষিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দশকওয়ারি বৃদ্ধি	দশকওয়ারি গড় বার্ষিক কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থেকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গড় শতকরা পরিবর্তন	দশকওয়ারি বৃদ্ধির হার (কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)	গড় শতকরা পরিবর্তন (কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)
১৯৭২–১৯৮২	২.৩০	২২৪৮০০		–১.২৭	৩৯.৯৫৯৯৯	
১৯৮২–১৯৯২	৩.৬৮	২৯৪৮১৬	৩১	–১.৭৪	৩৪.০১৬৮৩৮৬৫	–১৪.৮৭
১৯৯২–২০০২	৩.২০	৪০৪৬৫৪	৩৭	–০.২৫	২৭.৩১৮৬০৬৭	–১৯.৬৯
২০০২–২০০৫	২.৯২	৪৬৯৪৫০	১৬	–৩.৭৭	২১.৮৩৮২৪	–২০.০৬

Source: CSO

সারণি ১০.৬ অভ্যন্তরীণ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন

	১৯৮১–৮২ থেকে ১৯৯১–৯২	১৯৯১–৯২ থেকে ২০০৫–০৬
	%বৃদ্ধির হার	%বৃদ্ধির হার
মোট অভ্যন্তরীণ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন	৩.০১%	২.৫৯

সামগ্রিক ভাবে কৃষি-অ-কৃষির বিনিময়-হার এবং কৃষক ও অ-কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে কেনাবেচা হয় এমন পণ্যের বিনিময়-হারে ২০১৩-র পর সুনির্দিষ্টভাবে উন্নতির প্রবণতা স্পষ্ট। এমনকী কৃষি-অ-কৃষি ক্ষেত্রের বিনিময় হার '১৩–'১৪-র পর কৃষির পক্ষে চলে এসেছে, যদিও কৃষক ও অ-কৃষকের ব্যবহৃত পণ্য সামগ্রীর বিনিময়-হার কৃষকের পক্ষে আগের তুলনায় উন্নত হলেও এবং হারটি মাঝে দু'-এক বছর অ-কৃষকের বিপক্ষে, কৃষকের পক্ষে গেলেও, বাকি সব সময়েই কৃষকের বিরুদ্ধে, অ-কৃষকের পক্ষে থেকেছে। কৃষিতে এই সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির সঙ্গে বিনিময় হারে হ্রাস/বৃদ্ধির তেমন কোনও স্পষ্ট সম্পর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের মনে হচ্ছে, কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ-বৃদ্ধির যে-তথ্য আমরা পাচ্ছি, তা নতুন উচ্চফলনশীল অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বীজ সার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপাদান সামগ্রীর খাতে কৃষকের ওপর অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝাকেই প্রতিফলিত করছে। আমরা উপরের সারণিগুলিতে দেখেছি অনেক সময়েই এই ব্যয়ের বোঝা মিটিয়ে কৃষকের নিট আয় ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জমিতে কৃষকের পরিশ্রমের ওপর আরোপিত আর্থিক মূল্যকে মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করলে কৃষকের হাতে তার ওপর কোনও উদ্বৃত্তই থাকে না। শুধু তাই নয়, কৃষকের হাতে তার পরিশ্রমের দামটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এই বিশাল ব্যয়ভার বহন করার জন্য তাকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নিতে হয়। সংগঠিত ঋণের বাজারে জটিল ঋণ প্রদানের নিয়মকানুন ও জমি বন্ধক রাখার ব্যবস্থার কারণে তার পক্ষে অনেকসময় সংগঠিত ঋণ নাগালের বাইরেই থেকে যায়। বেসরকারি পুঁজিগঠনের দ্রুত বৃদ্ধির পিছনে যে-তথ্যটি লুকানো রয়েছে তা এই বিনিয়োগের উৎস-সংক্রান্ত। বিপুল যে-অসংগঠিত ঋণ প্রান্তিক, ছোট ও মাঝারি চাষিদের একটি অংশের হাতে জমা হয় তা তাদের চাষের অস্বাভাবিক খরচ মেটাতে কাজে লাগে এবং এই তথ্যই বেসরকারি বিনিয়োগ হিসেবে উপস্থিত হয়। এই অসংগঠিত ঋণের একটি বড় উৎস হল কমিশন এজেন্ট, ও কৃষি উপাদানের বিক্রেতারা। এবং অসংগঠিত

ঋণের বাজারের একটি অংশ কৃষি-উপাদান ও কৃষিপণ্যের বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। এই বাজারে কমিশন এজেন্টরা ও কৃষি-উৎপাদনের উপকরণের জোগানদাররা উৎপাদনের অত্যন্ত ব্যয়বহুল উপকরণগুলি প্রয়োজনের তুলনায় আরও অধিক পরিমাণে জোগান দেওয়ার সুযোগ পায়। এইসব উপকরণের জোগান অনুযায়ী 'জোগান তাড়িত বাজার'[২] তৈরি হয়, যার ফলে এই জোগানদাতা কমিশন এজেন্ট বা ব্যবসায়ীর ওপরেই তাকে শেষপর্যন্ত ঋণের জন্য নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরতাকে কাজে লাগিয়ে দামের হেরফের করে, অথবা চড়া সুদের সাহায্যে, ব্যবসায়ী-কমিশন এজেন্টরা কৃষি উদ্বৃত্তের বড় অংশ আত্মসাৎ করে।

কৃষি-উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বায়নের কর্মসূচি কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। সাধারণ খাদ্যশস্য ও আখের ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণটি সত্যি। নয়া আর্থিক নীতি প্রযুক্ত হওয়ার পর একমাত্র তুলার ক্ষেত্রে উৎপাদন-হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব, বিশেষ করে '৯০-এর দশকের পর কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্রের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ফল-সবজি চাষ ছাড়াও কৃষির অন্যান্য দিকে, যেমন পশুপালন, ও পোলট্রির ক্ষেত্রে উৎপাদনের অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি ও সহায়ক উৎপাদনের বিভাগে একত্রে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার নেমেছে।

সারণি ১০.৭ সরকারি ও বেসরকারি স্তরে পুঁজি গঠন ও কৃষি-পণ্য ও অ-কৃষি পণ্যের বিনিময় হার

বছর	সরকারি স্তরে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজিগঠন	বেসরকারি স্তরে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজিগঠন	মোট কৃষিতে ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজিগঠন	পণ্যের বিনিময় হার (কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে)	পণ্যের বিনিময় হার (কৃষক ও অ-কৃষকের কেনাবেচার পণ্যে)
২০০৪–০৫	১৬১৮৭	৫৯৯০৯	৭৬০৯৬	৮১.৫২	৮৭.৭৮
২০০৫–০৬	১৯৯৮০	৬৬৬৬৪	৮৬৬০৪	৭৯.৮০	৮৪.৭৭
২০০৬–০৭	২২৯৮৭	৬৯০৭০	৯২০৫৭	৮২.৮১	৮৭.০৫
২০০৭–০৮	২৩২৫৭	৮২৪৮৪	১০৫৭৪১	৮৬.৭৬	৯২.২২
২০০৮–০৯	২০৫২৭	১০৬৫৫৫	১২৭১২৭	৯৩.৮৬	৯৯.৯৮
২০০৯–১০	২২৬৯৩	১১০৪৬৯	১৩৩১৬২	৯৮.৩৩	১০০.১৩
২০১০–১১	১৯৮৫৪	১১২৮৮০	১৩২৭৩৪	১০২.৯০	১০২.৯৫
২০১১–১২	৩৫৬৯৬	২৩৮১৭৫	২৭৩৮৭১	৯৮.৮১	৯৭.২৭
২০১২–১৩	৩৬০১৯	২১৫০৭৫	২৫১০৯৪	১০০.৯৭	৯৭.৪০
২০১৩–১৪	৩৩৯২৫	২৫০৪৯৯	২৮৪৪২৪	১০৪.৬২	৯৮.৬০
২০১৪–১৫	৩৭১৭২	২৩৫৪৯১	২৭২৬৬৩	১০৬.৯৬	৯৭.৫৮
২০১৫–১৬	৩৯১০৫	১৯৩৭৩৪	২৩২৮৩৯	১০৬.৭৬	৯৬.৯৬
২০১৬–১৭*	৪৫৯৮১	২১৯৩৭১	২৬৫৩৫২	১১৮.৮৫	১০৩.৯৬

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

* Estimated

তথ্যসূত্র

১. Gulati, A. and Seema Bathla. 2001. "Capital Formation in Indian Agriculture: Re-visiting the debate." *Economic and Political Weekly*. vol 36 no 20.

Hoda, A., A. Gulati. 2008. *WTO Negotiations on Agriculture and Developing Countries*. Oxford University Press.

২. Mishra, S. 2006. "Farmers' Suicides in Maharashtra." *Economic and Political Weekly*. vol 41 no 16.

"The farmer now depends on the input dealer for advice leading to supply-induced demand and on informal sources of credit which result in a greater interest burden. In short, farmer is faced with yield, price and weather uncertainties"

সংযোজন

ক। নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের আগে ও পরে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের হ্রাস/বৃদ্ধি।

	নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগে 69–70–92–93			নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের পরে 1993–94–2016–17		
	প্রবণতা সমীকরণ	$AdjR^2$	% বৃদ্ধি হার	প্রবণতা সমীকরণ	$AdjR^2$	% বৃদ্ধি হার
ধান	Logy = 3.069528 + .028733t T = (37.98) (11.47)	(0.8502)	2.91	Logy = 3.782432 + .0130278t T = (35.17) (6.77)	0.6612	1.31
গম	Logy = 2.17354 + .0619441t T = (30.47) (20.33)	0.9472	4.60	Logy = 3.28103 + .019016t T = (33.30) (10.79)	0.8412	1.92
খাদ্যশস্য	Logy = 4.042989 + .0264325t T = (65.55) (13.81)	0.8921	2.67	Logy = 4.55543 + .0167246t T = (46.54) (9.77)	0.8042	1.68
আখ	Logy = 4.238582 + .0286629t T = (35.44) (7.731)	0.7186	2.90	Logy = 4.983922 + .012960t T = (29.38) (4.27)	0.4287	1.30
তুলা	Logy = 1.197657 + .025452t T = (9.38) (6.43)	0.6367	2.58	Logy = .5576373 + .0623901t T = (–1.46) (9.11)	0.7808	6.44

Agriculture Statistics at a Glance (GOI) এর পরিসংখ্যান থেকে গৃহীত নিজস্ব পরিমাপ।

খ। নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগে ও পরে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতার হ্রাস/বৃদ্ধি

শস্য	নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগে ১৯৭০–৯৩			নয়া আর্থিকনীতি প্রয়োগের পরে ১৯৯৪–২০১৭		
	প্রবণতা সমীকরণ	$AdjR^2$	%বৃদ্ধি হার	প্রবণতা সমীকরণ	$AdjR^2$	%বৃদ্ধি হার
ধান	Logy = 6.4642 + .023251t T = (97.24) (11.29)	0.84	২.৩৫	Logy = 6.897599 + .0134818t T = (93.71) (10.24)	0.81	১.৩৬
গম	Logy = 6.448958 + .0309054t T = (128.72) (19.90)	0.94	৩.১৩	Logy = 7.366815 + .0100727t T = (101.710) (7.78)	0.72	১.০১
খাদ্যশস্য	Logy = 6.139063 + .0257777t T = (121.18) (16.41)	0.92	২.৬১	Logy = 6.598266 + .0158863t T = (95.10) (12.81)	0.87	১.৬০
আখ	Logy = 10.48702 + .0139978t T = (276.61) (11.91)	0.85	১.৪০	No significant trend		
তুলা	Logy = 4.248312 + .0274138t T = (41.54) (8.65)	0.76	২.৭৮	Logy = 3.376909 + .0433878t T = (10.20) (7.39)	0.69	৪.৪৩

Agriculture Statistics at a Glance (GOI) এর পরিসংখ্যান থেকে গৃহীত নিজস্ব পরিমাপ।

গ। ফল ও শাকসবজির বৃদ্ধি-হার।

শস্য	২০০১–০২ থেকে ২০১৭–১৮		
	সমীকরণ	AdjR^2	বৃদ্ধির হার
সবজি উৎপাদন	Logy = 11.33437 + .0504894t T = (39993) (18.26)	0.95	৫.১৭%
ফল উৎপাদন	Logy = 10.65245 + .0527039t T = (432.18) (21.91)	0.96	৫.৪১%

ঘ। মোট অভ্যন্তরীণ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন।

শস্য	১৯৮১–৮২ থেকে ১৯৯১–৯২			১৯৯২–৯২ থেকে ২০০৫–২০০৬		
	প্রবণতা সমীকরণ	AdjR^2	%বৃদ্ধির হার	প্রবণতা সমীকরণ	AdjR^2	%বৃদ্ধির হার
মোট অভ্যন্তরীণ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন	logy = 11.57963 + .0296725t T = (112.00) (9.67)	0.89	৩.০১%	Logy = 11.77 + 0.02557 T = (126.15) (12.79)	0.92	২.৫৯

একাদশ অধ্যায়

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি সংক্রান্ত নতুন নীতিগুচ্ছ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক অবস্থা ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পশ্চাদপট

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংক ছাড়াও তৃতীয় যে-আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তৈরি হয়েছিল সেটি 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি', বা 'গ্যাট' [General Agreement on Tariff and Trade (GATT)]। এই সংগঠনটি গড়ে তোলার পিছনে মূল ঘোষিত কারণ ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের আবহাওয়া গড়ে তোলা। বিভিন্ন সভ্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত মতবিরোধগুলিকে মিটিয়ে ফেলে মুক্ত বাণিজ্যের পথের বাধা দূর করা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুক্ত বাণিজ্য-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। এই সংগঠনের অষ্টম দফার অধিবেশন উরুগুয়েতে শুরু হয় ১৯৮৫ সালে, শেষ হয় ১৯৯৪-তে। এই সংস্থাটি একটি নতুন স্থায়ী রূপ পায় ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা [World Trade Organisation (WTO)] প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এরপর নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় দোহা-তে, ২০০১ সালে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম অধিবেশন। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশনেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় এসেছিল। এর মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি হল: ক) কৃষি-উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাণিজ্যের আওতায় পড়ে এমন পণ্যের ওপর সরকার যে-ভরতুকি দিয়ে থাকে সেই অন্তর্দেশীয় সরকারি সহায়তা সংক্রান্ত, খ) খাদ্যের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং রেশনিং সংক্রান্ত, গ) সেবামূলক কাজে বাণিজ্য সংক্রান্ত, ঘ) কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত, ঙ) মেধা-স্বত্ব সংক্রান্ত। এই প্রথম কৃষি-উপকরণ ও কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাভুক্ত করে আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক আলাপআলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা হল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পর যে-বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক আলাপ আলোচনার বিষয়ভুক্ত করা হল সেগুলিও উল্লেখ্য: ১) উন্নত দেশগুলিকে সংগঠিত শিল্পে নির্মিত পণ্য আমদানির ওপর গড়ে মোট শতকরা ৪০ ভাগ শুল্ক কমাতে হবে, পাঁচটি সমান বার্ষিক কিস্তিতে। দশটি পণ্যের ওপর শুল্ক একেবারেই বিলোপ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল বিয়ার, নির্মাণশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বিশুদ্ধ স্পিরিট, কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, চিকিৎসা

সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কাগজ, ঔষধপত্র, ইস্পাত ও খেলনা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শুল্কের হার আর না বাড়িয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত হারে বেঁধে রাখা। কিন্তু এইসব নিয়মাবলি প্রণীত হলেও দেখা গেল উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির বাজারে তাদের পণ্য বিক্রির বিষয়ে একইরকম শুল্কের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে শুল্ক-হার আন্তর্জাতিক গড় শুল্কের থেকে অনেক বেশি ছিল এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম চালু হওয়ার পরেও উন্নত দেশগুলি একই হার বজায় রাখে। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিও উন্নত দেশের বাজারে যে-শুল্কহারের মুখোমুখি হচ্ছে তা বিশ্ব-গড়ের তুলনায় শতকরা ৩০-এরও বেশি। খ) কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আলোচ্য বিষয়ের আওতাভুক্ত করে ধীরে ধীরে এই পণ্যগুলির আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানির ওপর থেকে বাধানিষেধগুলি লঘু করে দিতে হবে। উন্নত দেশগুলি কৃষিপণ্যের আমদানির ওপর শুল্ক ছাড়া আরও যেসব শুল্কহীন বাধানিষেধ আরোপ করেছিল, তা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষণের নীতি মেনে নেওয়া বা না-মেনে চলা সংক্রান্ত। এই ধরনের শর্তগুলি যথাযথ না মানলে আমদানির পরিমাণের ওপর বা পুরোপুরি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞার নীতির বদলে স্থির হয়েছিল এই নিষেধাজ্ঞাকে শুল্কে পরিণত করে শুল্কের প্রকরণটি ব্যবহার করে এসব পণ্যের আমদানিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শুল্কের পরিমাণ '৮৬—'৮৮ স্তরের গড়ের ৩৬% স্তরে বেঁধে রাখতে হবে। গ) মুক্ত বাণিজ্যের পথ বাধামুক্ত রাখার জন্য ভরতুকি-যুক্ত পণ্যের রপ্তানি ২১% কমাতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের বাণিজ্যের ওপর বাধানিষেধ শিথিল করলেও উন্নত দেশগুলি তাদের বাণিজ্য-পণ্যগুলির উৎপাদনে এত বেশি ভরতুকি দেয় যে, সেসবের প্রকৃত উৎপাদন-ব্যয় বেশি হলেও বিশ্ব-বাজারে দাম কম রাখা সম্ভব হয়। এইভাবে উন্নত দেশগুলি ভরতুকি-যুক্ত পণ্যগুলির দাম কম রেখে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুক্ত-বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর প্রয়োগ করার পর উন্নত দেশগুলি নিজদেশে ভরতুকি কমানোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখায়। প্রকৃতপক্ষে তারা ভরতুকি কমাতে রাজি ছিল না বরং ভরতুকির পরিমাণ অস্বাভাবিক বাড়িয়ে বিশ্ব-বাজারে তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রেখেছিল। ঘ) নানাপ্রকার বুনটের বস্ত্র ও পোশাক উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে আমদানির ওপর এর আগে কিছু পরিমাণগত সীমা বেঁধে দিয়েছিল উন্নত দেশগুলি। নতুন ব্যবস্থায় ২০০৫ সালের মধ্যে এই সীমা ধীরে ধীরে বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাস্তবে দেখা গেল, উন্নত দেশগুলি এইসব পণ্য আমদানির ওপর যে-শুল্ক জারি করেছে তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে উন্নত দেশের বাজারে এইসব পণ্য বিক্রি করা দুষ্কর। ঙ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক্তিয়ারে থাকা অন্যান্য নানা বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি হল: বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধা-স্বত্ব আইন, বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগের নিয়ম, সেবামূলক কাজকর্ম বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের সরকারি বিতরণ ও রেশনিং ব্যবস্থা। শেষোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধা-স্বত্ব আইন নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করব। সেইসঙ্গে সেখানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চাপানো কৃষি-বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়মগুলি ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের জীবনযাত্রায় যে প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। তার আগে আমরা সাধারণভাবে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চাপানো নতুন নিয়মগুলি ভারতীয় কৃষির ওপর কী প্রভাব ফেলেছে তা একবার দেখে নেব।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার

বিশ্বায়ন কর্মসূচির একটি দিক হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত নতুন কৃষিপণ্য ও কৃষি-উপকরণের উৎপাদন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শর্তাবলি, যা নীতিগুচ্ছের আকারে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ বাদে এই সংস্থার সভ্য হিসেবে স্বীকৃত প্রায় প্রতিটি দেশের ওপর প্রযোজ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের আগে এই সংস্থার পূর্বতন রূপটি ছিল ‘শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি’ নামক একটি সংস্থা, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তৈরি হয়েছিল পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাজার-সংক্রান্ত দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ খোলা রাখার উদ্দেশ্যে। বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও মতবিরোধ ঘটলে সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান ছিল এই সংস্থার মূল কাজ। ১৯৮৫ সালে এই সংস্থার তৎকালীন সেক্রেটারি-জেনারেল আর্থার ডাংকেল বাধাহীন মুক্ত বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত রাখার উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন, সেগুলি প্রস্তাবিত নতুন বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম কৃষিজ পণ্য ও কৃষি-উপকরণ নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য, অথবা মেধা-স্বত্ব বা পেটেন্ট করা, অথবা সেবামূলক কাজের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ নীতি সংস্থাটির বহুপাক্ষিক আলোচনায় জায়গা পেল। সমস্ত সভ্যের কাছে এই নতুন নীতিগুলি ‘হয় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করো অথবা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করো’ এই শর্তে পেশ করা হয়, আংশিক গ্রহণ-বর্জনের কোনও পথ খোলা থাকে না। ইতিপূর্বে কখনও কৃষি সমেত এই নতুন বিষয়গুলি বিরোধ নিষ্পত্তিকারক সংস্থাটির কাজের আওতায় ছিল না। বহুপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান এক দীর্ঘ প্রক্রিয়াসাধ্য কাজ। বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ও কৃষি-সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক পণ্য এই আলোচনা-মঞ্চের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় বেশিরভাগ দেশই এই মঞ্চের সদস্য হয়ে নিজ নিজ দেশের স্বার্থহানির সম্ভাবনা রোধ করা উচিত বলে মনে করে। তাদের আশা ছিল, কোনও না কোনও সময়ে তাদের স্বার্থসম্পর্কিত কোনও বিষয় আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলে এই মঞ্চের সদস্য হিসেবে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মত যথাযথ পেশ করতে পারবে এবং সম্ভাব্য সিদ্ধান্তকে তাদের নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করার সুযোগ পাবে। কিন্তু কৃষি, আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব অথবা অত্যাবশ্যক পণ্যের (যেমন খাদ্য) সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় দেশের আপামর জনগণের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত, অথবা যা যুক্ত রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ-উন্নয়নের পথ-নির্ধারক অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে, সেগুলিকে কেন একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বহুপাক্ষিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত করা হল সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

এই বিষয়টি কৃষিপণ্য ও কৃষিপণ্য সম্পর্কিত অন্যান্য উপকরণ যেমন, সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা ও এই বাজারে উন্নত দেশগুলির ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। গত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকে কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে কানাডা ও আমেরিকা প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছিল। তারা এই প্রাথমিক পণ্যের বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বাজারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান কমিউনিটি খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে নিট ক্রেতা হিসেবেই বিরাজ করছিল। সত্তরের দশক থেকে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সেই পরিচয় ছেড়ে নিট বিক্রেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ’৮০র দশকে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি খাদ্যশস্যের বিশ্ব-বাজারে তাদের কৃষি-নীতি এবং

বিশেষ করে কৃষিপণ্যের রফতানি-নীতি এমন ভাবে ঢেলে সাজায় যে, অচিরেই তারা খাদ্যশস্যের বিশ্ব-বাজারে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এইভাবে ও ই সি ডি দেশ, অর্থাৎ বিশ্বের বৃহৎ ইউরোপিয়ান পুঁজিবাদী দেশগুলি কৃষিপণ্যের প্রধান রফতানিকারক হিসেবে পরিচিতি পায়। এরা বিশ্ব-বাজারে খাদ্যশস্য রফতানির সবচেয়ে বড় অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। একদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, এই দুই ব্লকের দেশগুলির কৃষির সঙ্গে যুক্ত পণ্যের বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা বিশ্ব-বাজারে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় রত হয়। বাস্তবে '৯০-এর দশকে দেখা যায়, মুষ্টিমেয় সংখ্যক বহুজাতিক বড় বাণিজ্য কোম্পানিগুলি, যাদের শেকড় রয়েছে বিশ্বের প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, বিশেষ করে আমেরিকা ও কানাডায়, তারা খাদ্যশস্যের বিশ্ব-বাজারে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমেরিকা ও কানাডার পরই ফ্রান্স অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য রফতানিকারী দেশ হিসেবে বিকাশ লাভ করলে দুই ব্লকের বহুজাতিক ব্যবসায়ী কোম্পানিদের মধ্যে লড়াই বাস্তবে আমেরিকা ও ফ্রান্স, এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধের আকার নেয়।

বস্তুত '৮০-র দশকেই আমরা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটিকে বিশ্বের শস্য-বাজারে প্রধান দু'টি প্রতিযোগী হিসেবে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতে দেখি। বহুদিন থেকেই এই দুই পক্ষ তাদের নিজ নিজ দেশের শস্যভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি করে আসছে। যখন এই দুই ব্লকের দেশগুলি ভরতুকির সাহায্য নিয়ে তাদের শস্যের উৎপাদন ও রফতানি বাড়িয়ে তুলছিল তখন ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়া কম উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদিকা শক্তি কিছুটা বাড়িয়ে নিয়ে খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনের পথে চলেছিল। ফলে বিশ্ব-বাজারে খাদ্যশস্যের জোগান যখন দ্রুত বাড়ছে তখন বিশ্ব-বাজারে বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ থেকে আসা খাদ্যশস্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই দুই ব্লকের রফতানিকারী দেশগুলোর মধ্যে বাজারের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। যতই জমে থাকা অবিক্রীত খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার দাম কমায় ও ব্যবসায়িক উদ্বৃত্তের হার নামিয়ে আনে, ততই দুই ব্লকের দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর ভরতুকি আরও বাড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বিশ্বের শস্য রফতানির বাজারে নিজেদের দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেক রফতানিকারক দেশের সরকার বিশাল পরিমাণ ভরতুকি দিতে থাকে এবং তার পরিমাণ বাড়াতেই থাকে। এইভাবেই দুই ব্লক তাদের দৈত্যাকৃতি বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে বিশ্বের শস্যবাজারে সীমাহীন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে, ও একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল খাদ্যশস্য রফতানিকারক দেশগুলিকে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বাজারে চাহিদা ক্রমশ কমতে থাকলে দু'টি প্রধান প্রতিযোগী অলিগোপলি কোম্পানি যেমন মোট জোগান কমিয়ে রাখাকেই তাদের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করে, তেমনই বিশ্ব-বাজারে খাদ্যশস্যের চাহিদা কমতে থাকায় এই প্রধান দু'টি রফতানিকারক প্রতিযোগী ব্লকেরও প্রয়োজন পড়েছিল বিশ্বের বাজারে খাদ্যশস্যের মোট জোগান কমিয়ে রাখার। বিশ্ব-বাজারে চাল-গমের মতো খাদ্যশস্য ও তুলার মতো শিল্প-কাঁচামালের জোগানের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার স্বার্থে বৃহৎ শক্তিগুলি এইসব পণ্যের জোগানদাতা তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। একইসঙ্গে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সুরক্ষিত রাখা বা প্রসারিত করার পরম উদ্দেশ্যও ছিল তাদের সামনে। এই উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অভ্যন্তরীণ সহায়তা বা আমদানি সংক্রান্ত নীতিগুলি প্রযুক্ত হয়েছিল। তাই

ভারতে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দ্বারা প্রস্তাবিত ও অনেকাংশে গৃহীত নীতিগুলি এ দেশের কৃষিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সেই প্রশ্নটি আলোচনার আগে একবার কৃষিসম্পর্কিত প্রশ্নে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির সাপেক্ষে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতা রত দু'টি প্রধান রফতানিকারক দেশের অবস্থান বিচার করা জরুরি। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি রফতানিকারী দেশের বৈদেশিক অর্থনীতি বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে যুক্ত, তাই বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটি দীর্ঘদিন ধরে তীব্র প্রতিযোগিতায় রত ছিল। এই দুই বৃহৎ শক্তি কৃষিপণ্যের রফতানি-বাজারটিকে প্রায় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। '৭০-এর দশক বা তার আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ক্রমে ইউরোপিয়ান কমিউনিটির অতিরিক্ত ভরতুকি-যুক্ত পণ্য নিয়ে 'অনুপ্রবেশ' ও বাজারের একটি বড় অংশের ওপর ইউরোপিয়ান কমিউনিটির আধিপত্য বিস্তার তাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। '৮০-র দশকে আমেরিকা তার হৃত বাজার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ভরতুকি ও অভ্যন্তরীণ বাজার-সুরক্ষার নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চেয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পূর্বতন রূপ গ্যাটের অন্তর্গত বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর প্রক্রিয়াকে আবার চালু করতে চায়। সেই অনুসারে শেষপর্যন্ত ইউরোপিয়ান কমিউনিটিকে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি করায় ও ১৯৮৫ সালে উরুগুয়ে অষ্টম অধিবেশন শুরু হয়। আমেরিকা কৃষিতে অভ্যন্তরীণ সরকারি সহায়তা দেওয়ার সমস্ত ধরনের রীতি ১০ বছরে ধীরে ধীরে তুলে নেওয়ার প্রস্তাব আনে ও ৫ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে রফতানি ভরতুকি তুলে নেওয়ার কথা বলে। প্রাথমিকভাবে মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা অধিবেশনটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে ভেস্তে যায় ও কয়েক মাসের জন্য সে-চেষ্টা বাতিল করা হয়। আমেরিকা এবার ইউরোপিয়ান কমিউনিটির ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের দেশে রফতানিতে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মসূচিগুলির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে গ্যাটের ডিলন অধিবেশনে শুল্কের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তার বিপরীতে তৈলবীজের ওপর উৎপাদকের ভরতুকির সূচনা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনার চেষ্টা করলে আমেরিকার প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে। আমেরিকা এইরকম ধারাবাহিকভাবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি ও এই উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ সহায়তা দেওয়ার রীতির তীব্র বিরোধিতা করে আসছিল। অথচ আমেরিকাই উরুগুয়ে রাউন্ডের শেষ বছরে তার পুরনো অবস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসে। আর্থার ডাংকেল ডিসেম্বর ১৯৯১-তে যে-সহজতর প্রস্তাবটি এনেছিলেন, তাকেও তারা নানাভাবে পরিবর্তন এনে আরও সহজ করে তোলে। শেষপর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা আমেরিকার ১০ বছরে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ সহায়তা দেওয়ার রীতি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব, যা উরুগুয়ে রাউন্ডে পেশ করা হয়েছিল, তার থেকে বহুদূরের।[১] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তনের পিছনে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটির মধ্যে ব্যবসায়িক জোট, সেটা তৈরি হয়েছিল কৃষিপণ্যের জোগানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সম্ভাব্য ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। গ্যাট চুক্তির অন্তিম রূপ গৃহীত হওয়ার আগে এই দুই বৃহৎ শক্তি কয়েকটি আলোচনাসভায় মিলিত হয় ও এদের মধ্যে ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালের 'ব্লেয়ার হাউস চুক্তি' সম্পাদিত হয়। এই সূত্রেই আমেরিকা ইউরোপিয়ান কমিউনিটির মতের সঙ্গে কিছুটা একমত হয়ে আর্থার ডাংকেলের দেওয়া প্রস্তাবটিতে নানা রকম সংশোধনী আনে, ফলে সেটিতে অভ্যন্তরীণ সহায়তা বিষয়ে অনেক নরম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটে। শেষপর্যন্ত যেসব নীতি নেওয়া হয়

সেগুলিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কৃষি বাণিজ্যনীতি বিষয়ে এমন কিছু প্রস্তাব ছিল যেগুলি কার্যত আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটির যুগ্ম স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্মিত অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শর্তাবলি। এই দু'টি রফতানি ব্লকের অন্তর্গত শস্য রফতানিকারক অলিগপলি কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসায়িক মুনাফা বজায় রাখার জন্য কেন বিশ্ব-বাজারে খাদ্যশস্যের জোগান কমিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল তা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা '৮০-র দশকের বিশ্ব শস্যবাজারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিই। প্রথমত বিশ্ব-বাজারে শস্যের রফতানি পাঁচটি মাত্র বড় বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে ছিল, যাদের মধ্যে দু'টি কোম্পানির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিশাল ক্ষমতা। এরা হল কারগিল ও কন্টিনেন্টাল গ্রেন। এই দুই কোম্পানি একত্রে মোট রফতানির শতকরা ৪৫ ভাগ জোগান দিত। দ্বিতীয়ত এটা দেখা গিয়েছিল যে, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে মোট উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রফতানি বাজারের জন্যই উৎপাদিত হত। তৃতীয়ত, খাদ্যশস্যের মধ্যে বিশেষ করে গমের ক্ষেত্রে উন্নত রফতানিকারক দেশগুলি মোট রফতানির শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি জোগান দেয়, আর পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে মোট আমদানির প্রধান অংশ আমদানি করে। অর্থাৎ বিশেষ খাদ্যশস্য গমের ক্ষেত্রে জোগানদার ও গ্রাহক হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারের উন্নত ও পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির মধ্যে এই তীক্ষ্ণ বিভাজনের কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উন্নত দেশগুলি পিছিয়ে-পড়া দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে চাইবে যাতে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদার বেশিটাই আমদানি করে মেটায় ও নিজ নিজ দেশের শস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। এর ফলে উন্নত দেশগুলিও তাদের ভরতুকির ভার কমাতে পারবে। '৮০-র দশকে খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারের এই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অষ্টম অধিবেশন ও তার পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত ও গৃহীত নীতিগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেছি।

এইভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আসলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপের মতো বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগী বড় শক্তিগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক নানা প্রশ্নে বোঝাপড়ার জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি বড় শক্তি সেখানে নিজ দেশের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও বোঝাপড়া চালাতে থাকে। আলাপ-আলোচনার যে-অংশে পিছিয়ে-পড়া স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ জড়িত থাকে, সেইসব বিশেষ ক্ষেত্রে তারাও বোঝাপড়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই বোঝাপড়া প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় মুক্ত-বাণিজ্যের কথা সামনে রেখে আসলে স্বল্পোন্নত দেশের সম্পদের ওপর উন্নত দেশের বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের একটি সর্বজনগ্রাহ্য উপায় স্থির করার জন্য এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির কাছে এই উপায়টিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। আমরা একটি একটি করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত ও অনেকাংশে গৃহীত নীতিগুলি আলোচনা করে আমাদের এই পর্যবেক্ষণটির সত্যতা পরীক্ষা করতে পারি।

প্রথমত, বাজারের নাগাল বা আমদানি সংক্রান্ত নীতি: এই নীতির দু'টি প্রধান দিক হল বাজারে প্রবেশের অধিকার সংক্রান্ত নীতি ও বাজারে প্রবেশের ন্যূনতম অধিকার নীতি। প্রথম নীতিটির উদ্দেশ্য কৃষিজাত পণ্য ও কৃষি সম্পর্কিত পণ্যের আমদানি ও রফতানিকে সম্পূর্ণভাবে বাধাহীন করে তোলা। এর জন্য সব ধরনের

পরিমাণগত বাধাকে প্রথমে শুল্কে পরিবর্তিত করা এবং তারপর শুল্কের পরিমাণ ধার্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা। নামমাত্র শুল্কে একটা ন্যূনতম পরিমাণ আমদানির অনুমতি দেওয়া বাধ্যতামূলক করে তোলা। এই নীতিটি উন্নত-স্বল্পোন্নত সবদেশের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। শুল্ক কমানো ছাড়াও **'চলতি সময়ে বাজারে প্রবেশের অধিকার'** নীতিটিতে সভ্য দেশগুলি ১৯৮৬–৮৮ সালে আমদানির পরিমাণ যা ছিল অন্তত সেই পরিমাণ আমদানির অনুমতি দিতে বাধ্য থাকল। যদি এই নীতিটি প্রয়োগের পরও দেখা যায় আমদানির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর তাহলে **'বাজারে প্রবেশের ন্যূনতম অধিকার'** নীতিটি অনুযায়ী এই দেশগুলিকে একটি ন্যূনতম পরিমাণ আমদানির অনুমতি দিতে হবে। এই দুই প্রকার নীতির মধ্যে যে-নীতিটিতে অত্যল্প শুল্কে আমদানির পরিমাণ বেশি, সেই নীতিটিই অনুসরণ করতে হবে। আমদানি সংক্রান্ত নীতিটি প্রয়োগের সুবাদে ভারতের কৃষি-আমদানি সহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিমাণগত বাধানিষেধ শুল্কে পরিণত করা হল এবং শুল্ক-হারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটানো হল। আমদানি শুল্কের হার ক্রমশ কমিয়ে এনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অনুমোদিত হার চালু করা হয়। এর ফলে এদেশের বাজারে বিদেশের পণ্যের প্রবেশ বাধাহীন করে তোলা গেল।

আমদানি সংক্রান্ত নীতির পরই রয়েছে **'অভ্যন্তরীণ সহায়তা'** নীতি। এই নীতিটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সহায়তা ব্যবস্থা মুক্ত-বাণিজ্যের ওপর যে-সম্ভাব্য বাধা সৃষ্টি করে, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই নীতির বলে সভ্য দেশগুলির সরকার সামগ্রিক যে-পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভরতুকি দিতে পারে তার একটি ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হল। কিন্তু ভরতুকির পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতিটি ভিন্ন। কোনও দেশ প্রকৃত কতটা ভরতুকি দিচ্ছে সেটি বিচার্য নয়, বরং ভরতুকির পরিমাণ মাপা হয় অভ্যন্তরীণ সহায়ক মূল্যকে ১৯৮৬–৮৮ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের যা দাম ছিল তার গড়ের সঙ্গে তুলনা করে। এই পদ্ধতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভরতুকি মাপার এই পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক সংস্থাটির এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করে যে, অভ্যন্তরীণ মূল্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের সমান হতে হবে, না হলে দু'টি দামের মধ্যে তফাতকে ভরতুকি বলে ধরে নিয়ে তার পরিমাণ কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কোনও বিশেষ সুবিধা বা ছাড় দেওয়া চলবে না। রফতানি-ভরতুকি যেহেতু মুক্ত-বাণিজ্যের প্রক্রিয়াকে সরাসরি বিঘ্নিত করে তাই রফতানি-ভরতুকি, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সভ্যদের মধ্যে মাত্র ২৫টি দেশের রফতানি-ভরতুকি দেওয়ার এক্তিয়ার আছে। ভরতুকি দেওয়ার পদ্ধতি এতটাই জটিল যে, ভরতুকিগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, যে-ভরতুকিগুলি পরোক্ষভাবে ভোক্তাদের কাছ থেকে উৎপাদকের কাছে মূল্যের একটি অংশের হস্তান্তর ঘটায়— এটা ঘটে যখন আমদানি শুল্ক বা আমদানির ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে দেশের বাজারে জোগান সীমিত রেখে দাম বাড়িয়ে রাখা হয় এবং তার মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছ থেকে উৎপাদকের কাছে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করা হয়। এবং দুই, যে-ভরতুকিগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার থেকে উৎপাদকের কাছে মূল্যের একটি অংশের হস্তান্তর ঘটায়। এই দুই ক্ষেত্রেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি ভরতুকি হ্রাসের নীতি নিয়েছে। উন্নত দেশের কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যও কিছু কিছু ভরতুকি দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলি এমন কিছু ভরতুকি যা সরাসরি কৃষকদের আয় সুরক্ষার জন্য দেওয়া হয়। কৃষি-কাজে বাজারের অনিশ্চয়তা হেতু আয়ের অনিশ্চয়তা থাকে, তা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কৃষকদের এই প্রত্যক্ষ আয়-ভরতুকি দেওয়া হয়।

উৎপাদনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না থাকায় বিশ্ব-বাজারের অভ্যন্তরীণ সহায়তা সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী এই ধরনের ভরতুকিতে সম্পূর্ণভাবে ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক অনেকের মতে এতে উন্নত দেশের পক্ষে পক্ষপাতমূলক প্রভাবের জন্য এই ধরনের ভরতুকিগুলি বিশ্ব-বাজারে উন্নত রফতানিকারক দেশগুলির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দৃঢ়তর করে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির সরকার তাদের কৃষকদের এই ধরনের আয়-সুরক্ষামূলক ভরতুকি দিতে পারে না। কিন্তু কৃষিপণ্য রফতানিকারক উন্নত দেশগুলিতে এই ধরনের ভরতুকি কৃষকদের উৎপাদনের ও বাজারের অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি নিতে সাহায্য করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কম থাকলেও কৃষকদের আয় সুরক্ষিত থাকার জন্য তারা সেই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করতে পারে। আন্তর্জাতিক দাম কমিয়ে রেখে বিশ্ব-বাজারে নিজেদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

এই ভরতুকিগুলি ‘নীল বাক্স’ ও ‘সবুজ বাক্স’ ভরতুকি নামে পরিচিত। ভারত কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ ভরতুকি দিয়ে থাকে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অনুমোদিত হারের তুলনায় যথেষ্ট কম, তাই আমাদের দেশে কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী ভরতুকি হ্রাসের কোনও প্রয়োজন হয় না।

এছাড়াও উন্নত দেশগুলি আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার আরও কয়েকটি পন্থার সাহায্য নেয়। যেমন, **পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত খাদ্যপণ্যের জোগান সুনিশ্চিত রাখার নিয়মকানুন মানার বাধ্যবাধকতা**। এই নিয়মের সাহায্যে উন্নত দেশগুলি পণ্যের গুণমানের অত্যন্ত উঁচু মানদণ্ডে বেঁধে রেখে বিশেষ বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলি থেকে আমদানি কমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধাহীন আমদানি-রফতানির ব্যবস্থা বজায় রাখার কথা বলে তারা আসলে নানাভাবে স্বল্পোন্নত দেশে তাদের পণ্যের বাধাহীন অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত করে, একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যগুলিকে নিজেদের দেশের বাজারে বিক্রির সুযোগ কমিয়ে রাখে। এইভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কয়েকটি নীতি কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নত-অনুন্নত দেশের মধ্যে অসম বাণিজ্য-সম্পর্কের সূচনা করেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলির মধ্যে আমদানি সংক্রান্ত ও অভ্যন্তরীণ সহায়তা সংক্রান্ত প্রশ্নে তখনও সমাধান না হওয়া বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য, এবং একই সঙ্গে বাণিজ্যে অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত-বাণিজ্যের শর্তগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ২০০১ সালে দোহা-তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নবম রাউন্ডের অধিবেশন বসে। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনও নতুন নীতি গ্রহণ করার সমস্ত চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হয়। এর পিছনে ছিল প্রধানত আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটির মধ্যে মতানৈক্য। ফলে ২০০৬ সালে কানকুনে আবার — বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরবর্তী অধিবেশনের আগেই, মুক্ত-বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে অভ্যন্তরীণ সহায়তা ব্যবস্থাকে সীমায়িত রাখা, কৃষি-সম্পর্কিত ও অ-কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত আমদানি নীতি অনুসরণ করা এই বিষয়গুলি নিয়ে ৬টি সভ্য দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আমেরিকা শিল্পসামগ্রী আমদানির ওপর শুল্ক কমানোর শর্তটি মেনে নেওয়ার জন্য ভারত ও ব্রাজিলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমেরিকা নিজে তার অভ্যন্তরীণ সহায়তার নীতি থেকে সরে আসার কোনও লক্ষণ দেখায় না। প্রধানত আমেরিকার এই মনোভাবের জন্যই কানকুন অধিবেশনটিও দীর্ঘ আলোচনার পর কোনও ঐকমত্যে আসতে পারে না। ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভবিষ্যৎ অধিবেশন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

গবেষণা, উদ্ভাবন এবং মেধা-স্বত্ব: বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা

প্রায় ১৮৮০ সাল থেকে গোটা পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, ও আমেরিকার অর্থনীতিতে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। এই পরিবর্তন ঘটেছিল মূলত শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতিতে নয়, উৎপাদন-কাঠামো ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালন পদ্ধতিতেও। একদিকে উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস ঘটানো, অন্যদিকে পণ্য গুণমানে বৈচিত্র আনা, এবং একই সঙ্গে আরও বেশি চাহিদা সৃষ্টি, আরও সস্তায় উৎপাদন করে আরও বেশি বিস্তৃত বাজারের অংশের ওপর অধিকার বিস্তার, এটাই ছিল এই নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদন-কাঠামোর ও পরিচালন পদ্ধতিতে যে-পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার আর-একটি দিক ছিল করপোরেট উৎপাদন সংগঠনের উদ্ভব, ক্রমাগত অধিগ্রহণ ও একাধিক করপোরেট ব্যবসার উৎপাদন-সংগঠনকে সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর দৈত্যাকৃতি উৎপাদন-কাঠামোর জন্ম ও বৃদ্ধি। বাজারের জন্য তীব্র লড়াইয়ে এগিয়ে থাকার উপায় ছিল আরও সস্তায় উন্নত গুণমানসম্পন্ন পণ্যসম্ভার বাজারে নিয়ে আসা। এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয় উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-কাঠামোয় অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানোর জন্য। ক্রমাগত গবেষণা ও উদ্ভাবনার প্রক্রিয়া এই প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুতগামী করে তোলে। প্রতিটি উৎপাদন-সংগঠন বাজারের আরও বড় অংশ অধিকারের তাড়নায় গবেষণা ও উদ্ভাবনার প্রক্রিয়াকে নতুন দিকে চালিত করার চেষ্টা করে। একদিকে যেমন অধিগ্রহণ ও সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে উৎপাদন-কাঠামোর কলেবর বাড়তে থাকে, তেমনই একই সঙ্গে নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য বাজারে আবির্ভূত হয় এবং বিপুল অর্থ ও উৎপাদনশীল সম্পদ এই উচ্চ প্রযুক্তির ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয়। এইভাবে মুষ্টিমেয় দৈত্যাকার করপোরেশনের কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে থাকে, একই সঙ্গে এদের হাতে বিপুল উৎপাদনশীল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। আমেরিকাতে ১৯৪৯ থেকে '৫৪ সালের মধ্যে ১৭৭৩টি সংযুক্তিকরণের ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে '৫৪ সালে '৪৯ সালের তিনগুণ সংযুক্তিকরণ ঘটেছিল—এতটাই বেশি ছিল সংযুক্তিকরণ ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার গতি। একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে, আমেরিকায় ১৯৫২ সালে ৬৭০০০টি বড় ব্যবসায়িক করপোরেশন ছিল, এদের মধ্যে শতকরা ০.১ ভাগের হাতে শতকরা ৫২.২ ভাগ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, এবং শতকরা ৭ ভাগের হাতে ছিল শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি সম্পদ। যেখানে শতকরা ৫৯.১ ভাগের হাতে ছিল মাত্র শতকরা ১.৯ ভাগ সম্পদ। এইভাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা তথাকথিত মুক্ত প্রতিযোগিতার ঘোষিত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকেই উদ্ভব হল বৃহৎ অলিগোপলি শিল্প-কাঠামো, সমগ্র অর্থনীতির ওপর কায়েম হল তার বিশাল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রিয়াশীল বহুজাতিক সংস্থার উদ্ভবে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের এই প্রক্রিয়া আরও বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯৫০ সালে দেখা গেল, অতিকায় আমেরিকান করপোরেশনগুলি বিদেশে এবং দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর বিপুল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সুবাদে আমেরিকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিচ্ছে। আমেরিকার দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে প্রভাবিত করার সময়ে তাদের উদ্দেশ্য শুধু বিদেশের সম্পদ ও বিদেশের বাজারের ওপর তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বিদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও বিদেশে পাওয়া যায় এমন উৎপাদন-উপকরণগুলির ওপরেও তারা তাদের একচেটিয়া

অধিকার জারি রাখার লক্ষ্যে আমেরিকার বহির্বাণিজ্য নীতিকে প্রভাবিত করে। নিজেদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক শর্ত নির্মাণ করে সেই শর্তে তারা সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য করতে চায়, এক দেশের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে পণ্য জোগানের নির্দেশ তুলে নিয়ে তা অন্য দেশের সহযোগীর হাতে দেয়। এরকম সব সিদ্ধান্তই নির্ভর করে কোন দেশে কর আইন, শ্রম আইন ও অন্যান্য নীতি তাদের স্বার্থের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বা কোথায় তাদের মুনাফা সর্বাধিক হবে তার ওপর। এককথায় তারা তাদের নিজেদের শর্তে ব্যবসা করতে চায়। এই কারণে তাদের হাতে এতটাই ক্ষমতা থাকা দরকার, যাতে নিজের দেশের ও বিদেশের নীতিগুলিকে তারা তাদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে। সারা দুনিয়ায় অবশ্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা এই ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্ম চালাতে পারে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং জাপানের মতো এশীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় তাদের। দেখা যায়, এইসব রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় বিশাল বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বের বেশির ভাগ উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কাজকর্মের ওপরেই শুধু নয়, বিশ্বের গবেষণা ও উদ্ভাবনামূলক কাজকর্মের বেশিটাই নিজেদের প্রভাবে রাখে। ১৯৯০ সালে সমস্ত বহুজাতিক সংস্থার বিক্রির পরিমাণ সারা পৃথিবীর মোট রফতানির সমান ছিল। এবং ২০০১ সালে তাদের মিলিত বিক্রির পরিমাণ বিশ্বের মোট রফতানির দ্বিগুণের সমান হয়ে ওঠে। ১৯৮২ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে তাদের মোট উৎপাদন ৬ গুণ বাড়ে, এই সময়ের মধ্যে তাদের হাতে জমে ওঠা মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়েছিল ১২ গুণেরও বেশি।[২]

দেশীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের মূল দেশে অর্থনীতির ওপর বিপুল প্রভাব ফেলে। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মূল্যহ্রাসের উপক্রম ঘটলে বড় অলিগোপলি কোম্পানিগুলি ব্যবসায়িক চুক্তির সাহায্যে তা রোধ করতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে তখন বাজার দখলের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তাই আন্তর্জাতিক অলিগোপলি কোম্পানিগুলি সর্বদা নতুন গুণমানসম্পন্ন পণ্য বাজারে আনার জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাজ চালিয়ে যায়। ক্রমশ দেশের অধিকাংশ গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজগুলিকে তারা সবচেয়ে লাভজনক উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, উন্নত দেশের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের ওপর ওই দেশের বৃহৎ করপোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকে। উন্নত দেশের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজগুলিতে ব্যয়ের ধরনে দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজের ওপর ব্যয় ক্রমশ মূলত বেসরকারি করপোরেট বিভাগের বিনিয়োগের রূপ নেয়। দ্বিতীয়ত, এই বিনিয়োগ দেশের প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে আবশ্যিক প্রযুক্তির বদলে এমন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটাতে চায় যা উচ্চ ক্রয়ক্ষমতার মানুষের জন্য বিলাস-পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে, এমন পণ্য, যা থেকে এদের লাভ হয় সর্বাধিক। করপোরেট সংস্থাগুলি সর্বদা বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে সেই পণ্যগুলিরই চাহিদা নির্মাণ করে চলে।

উন্নত দেশের গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কাজগুলির ওপর ব্যয় যদিও ক্রমশ এই বিশেষ চরিত্র নিচ্ছে, মৌলিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা, যার ওপর দ্বিতীয় ধাপের গবেষণামূলক কাজগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তা এখনও অবধি সরকারি সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল। হয় সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাসংস্থার তত্ত্বাবধানে, সরকারি ব্যয়ে তা সংগঠিত হয়। এর ফলে সেইসব বিশেষ মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা চালানো সম্ভব হয়, যে-সব গবেষণায় করপোরেট সংস্থাগুলির উৎসাহী কম, কেননা বাজারের চালিকা

শক্তির প্রভাব তার ওপর বেশি নয়। কিন্তু মূল সরকারি ব্যয়ে চালিত গবেষণার বড় অংশের ফলগুলি করপোরেট সংস্থা নিজেদের মৌলিক জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবেই কাজে লাগায়, যার ওপর নির্ভর করে তাদের দ্বিতীয় স্তরের গবেষণা। এই প্রয়োজনীয়তার সূত্রেই করপোরেট সংস্থাগুলো সরকারি ব্যয়ে চালিত গবেষণাগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তারা চায় এই গবেষণার বিষয়বস্তু ও অভিমুখকে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্য থেকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর কাজে চালিত করতে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগের পর্যবেক্ষণটি (২০০১) বিশেষ উল্লেখ্য।[৩] রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ (২০০১)-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়-চালিত গবেষণার বাণিজ্যীকরণ ঘটছে ক্রমশ বেশি বেশি করে। বিশেষ করে আমেরিকায় সরকারি ব্যয়ে সংঘটিত গবেষণার ফলগুলিকে পেটেন্ট করা বা লাইসেন্সের আওতায় আনাকে আইনসিদ্ধ করার পর— ১৯৮০ সালের বেল ডোল আইন অনুসারে— আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাও বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে, করপোরেট ব্যবস্থার সঙ্গে অধিক সংযোগের ফলে সরকারি ব্যয়ে চালিত এইসব গবেষণার বিষয়বস্তু ও অভিমুখ সামাজিক প্রয়োজন থেকে সরে এসে বাণিজ্যিক প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে চালিত হচ্ছে। এইসব উদ্দেশ্য মেটানোর জন্য করপোরেশনগুলি ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারি সংস্থার গবেষণাব্যয়ের ভাগ বহন করছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি স্তরের গবেষণা অতি দ্রুত কমে আসছে, বেসরকারি গবেষণা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগের মতে এর কারণ, সরকারি স্তরে মূল বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয় যেগুলি বেসরকারি করপোরেট সংস্থার মালিকানায় পেটেন্ট করা থাকে। ফলে এগুলির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়বহুল, যা সরকারি সংস্থার পক্ষে সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। সরকারি মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ফলগুলি বেসরকারি করপোরেট সংস্থা বিনা খরচে তাদের গবেষণা ও উদ্ভাবন ক্রিয়ার মূল ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ, করপোরেট সংস্থার গবেষণা ও উদ্ভাবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলি সরকারি গবেষণার প্রয়োজনে না পাওয়ার জন্য সরকারি স্তরে গবেষণার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসে। সবচেয়ে বড় বিষয়, সরকারি প্রাথমিক স্তরের মূল গবেষণার ফলগুলিকে কোনও নতুন বস্তুতে পরিণত করতে হলে বেসরকারি স্তরে বিশাল বিনিয়োগকারীর ওপরেই নির্ভর করতে হয়। এই অবস্থার সুযোগ নেয় বেসরকারি করপোরেট সংস্থাগুলি। সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত যেসব মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তুকে তারা তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে করে, সেগুলিতে তারা বাধা দেয়। দেশের প্রাথমিক বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার গতিমুখ নির্ধারণে বহুজাতিক বড় করপোরেট সংস্থার এই নিয়ন্ত্রক ভূমিকার ফলে বিশ্ব-স্তরে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধরনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ (বিশ্ব উন্নয়ন সমীক্ষা ২০০১)-এর সমীক্ষাটির মূল কথা: প্রথমত, গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাজগুলি উন্নত দেশেই কেন্দ্রীভূত। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন যাবৎ গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাজের বিপুল ব্যয় বেসরকারি সংস্থাগুলিই চালিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে গবেষণাগুলি মূলত উচ্চ ক্রয়ক্ষমতার মানুষের ভোগ্যপণ্যের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর বস্তু উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছে। উচ্চআয়ের ভোক্তারাই মূলত বহুজাতিক বড় উৎপাদন সংস্থাগুলির উৎপাদিত পণ্যের বাজার।

সারণি ১১.১ ১/১/১৯৭৭ থেকে ১২/১২/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনুমতিপ্রাপ্ত পেটেন্টের সংখ্যা

পেটেন্ট প্রদানকারী দেশ	২০০২ অবধি প্রাপ্ত পেটেন্টের সংখ্যা	২০০২ অবধি মোট পেটেন্টের শতকরা ভাগ	২০১৫ অবধি প্রাপ্ত পেটেন্টের সংখ্যা	২০১৫ অবধি মোট পেটেন্টের শতকরা ভাগ
আমেরিকা	১৪৩৫৬৬৫	৫৬	৩০, ৩০০, ৮০	৫৩
৮টি প্রধান ইউরোপীয় দেশ	৪০৬৫৯০	১৬	৭, ৯৬৮, ১০	১৪
জাপান	৪৬৪২৪৪	১৮	১০, ৬৯, ৩৯৪	১৯
কানাডা	৫২৪২৯	২.০৫	১২৩৯০৪	২.১৫
মেক্সিকো	১২৬২	০.০৫০	৩০০৬	০.০৫২
চিন প্রজাতন্ত্র	১১৪০	০.০৪	৪৫৩৬৬	০.৭৯
ভারত	৯২৪	০.০৩	১৭৮৬৫	০.৩১
রাশিয়া (ইউ এস এস আর)	৩৯০১	০.১৫	৩৯০২	০.০৭
মোট	২৫৪৮৯১৬		৫৭৩৯৮১৫	

Source: Patent Counts By Country. States, and Year—All Patent Types (December- 2015), Patent Technology and Monitoring Team (PTMT), US Patent and Trademark Office

২০০২ সালে আমেরিকা, ৮টি প্রধান ইউরোপীয় দেশ ও জাপান একত্রে সমস্ত স্বীকৃত পেটেন্টের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি অধিকার করত, এদের পেটেন্টের সঙ্গে কানাডা ও মেক্সিকোর সংখ্যাটি যোগ করে বলা যেতে পারে উল্লিখিত মুষ্টিমেয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশ একত্রে মোট পেটেন্টের শতকরা ৯৩ ভাগ অধিকার করত। ২০১৫ সালে অন্যান্য দেশ পেটেন্টের ক্ষেত্রে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ায় মোট পেটেন্টে নিজেদের ভাগ কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে, কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা, ৮টি প্রধান ইউরোপীয় দেশ ও জাপান, মেক্সিকো ও কানাডা একত্রে ২০১৫ সালে মোট পেটেন্টের শতকরা ৮৮ ভাগের বেশি অধিকার করে আছে। আসলে দেখা যাবে, এই ২০০২ থেকে ২০১৫ এই ১৩ বছরে জাপান তার মোট পেটেন্টের সংখ্যা বাড়িয়েছে শতকরা ১৩০ ভাগ, আমেরিকা বাড়িয়েছে শতকরা ১১১ ভাগ, ৮টি ইউরোপীয় দেশ বাড়িয়েছে শতকরা ৯৬ ভাগ। মোট মেধা-স্বত্বের অধিকার এইভাবে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক পুঁজিবাদী দেশের হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলে এই দেশগুলিই আবিষ্কৃত নতুন প্রযুক্তির সিংহভাগের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে, বিভিন্ন দেশে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির প্রসার অনেকটাই এদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নতুন মেধা-স্বত্ব আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে।

কৃষিতে বৈদেশিক মূলধনের সরাসরি বিনিয়োগ ও বহুজাতিক কোম্পানির প্রবেশ আইনের অনুমতি পাওয়ায় উৎপাদন-ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণের বিনিয়োগ-সহযোগিতা শুরু হয়েছে। কৃষির উৎপাদন ও বাণিজ্যের কোনও কোনও ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশি বিনিয়োগ-সহযোগিতা অনুমতি পেয়েছে। এর ফলে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটেছে তা নীচে সারণি ১১.২-তে দেওয়া হল।

শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি বা গ্যাট-এর অষ্টম দফা অধিবেশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবস্থাকে বাধাহীন মুক্ত-ব্যবস্থায় পরিণত করা। এই অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুচ্ছের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আসলে বাণিজ্যরত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সংক্রান্ত। এই নীতিগুলি হল বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগের নীতি, আন্তর্জাতিক বাজারে সেবামূলক কাজকর্মের বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতি, বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা-স্বত্বের আদানপ্রদান সংক্রান্ত নীতি। বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি-উপকরণ নির্মাণে জড়িত শিল্পে বেসরকারি সংস্থা ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ সংক্রান্ত বাধা সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। একইসঙ্গে বিদেশি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার ওপর থেকে এদেশে সার ও বীজের ব্যবসা করার বাধা অনেকটা দূর করা হয়, ফলে নতুন অধিক ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বাড়ে। অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনে ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগে সরকারি ব্যয় কমিয়ে এনে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের বাধাগুলি কমিয়ে ফেলার নীতি নেওয়া হয়। যে-প্রক্রিয়া নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের আগেই শুরু হয়েছিল তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রস্তাবিত বিনিয়োগ নীতির প্রয়োগে আরও জোরদার হল, বিদেশি কোম্পানিগুলির এদেশে বিনিয়োগের পথ হল আরও মসৃণ। বাজারে বিভিন্ন ধরনের বীজ-সারের জোগান ও ব্যবহার বাড়ল, সরকারের ভূমিকার জায়গায় বাড়ল দেশি ও বিদেশি সার ও বীজ কোম্পানির প্রাধান্য। কৃষিপণ্যের আমদানি-রফতানির ওপর বাধানিষেধ কমার ফলে দুটোই বাড়ল। এছাড়া সেবামূলক উৎপাদনে বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ নীতি প্রয়োগের ফলে নতুন এই পণ্যটির ওপর দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে দেশি-বিদেশি বেসররকারি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য অবাধ হয়ে পড়ল।

সারণি ১১.২ কৃষিতে বৈদেশিক মূলধনের সরাসরি বিনিয়োগ

সাল	বিনিয়োগ	আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি %	বিনিয়োগ সবজি, ফল, ফুল	হাইব্রিড বীজ ও চারা	কৃষিতে সেবামূলক ক্ষেত্রে
২০১৩–১৪ থেকে ২০১৬–১৭	২৫০.৪৮ মিলিয়ন ডলার (মোট বিদেশি কৃষি-বিনিয়োগ) ১০০%		৩.৮ মিলিয়ন ডলার (মোট বিদেশি কৃষি বিনিয়োগের) ১.৫%	৯৪.৭ মিলিয়ন ডলার (মোট বিদেশি কৃষি বিনিয়োগের) ৩৭.৮%	১৫১.২ মিলিয়ন ডলার (মোট বিদেশি কৃষি বিনিয়োগের) ৬০.৪%
২০১৩–১৪	৯১.০১ মিলিয়ন ডলার				
২০১৪–১৫	৫৯.৯৫ মিলিয়ন ডলার	–৩৪.১৩			
২০১৫–১৬	৮৪.৬৫ মিলিয়ন ডলার	৪১.২			
২০১৬–১৭	১৪.৮৬ মিলিয়ন ডলার	–৮৩.৪৪			

Source: Open Government Data (OGD) Platform India, July 12, 2017

কিন্তু বাণিজ্যিক মেধা-স্বত্ব সংক্রান্ত নীতির অন্তর্গত একগুচ্ছ একচেটিয়া আইন কৃৎকৌশলের উদ্ভাবককে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মেধা-স্বত্ব নীতি আসলে পৃথিবীব্যাপী উৎপাদন-ক্ষেত্রে

কৃৎকৌশল প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চাপানো একগুচ্ছ নিয়ন্ত্রক নীতি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জতিক স্তরে পেটেন্ট আইন সংক্রান্ত একগুচ্ছ কড়া শর্ত চাপায়। এর বলে তারা প্রত্যেক সভ্য দেশকে তাদের নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ পেটেন্ট আইন এমনভাবে পরিবর্তন করতে বাধ্য করে যাতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত নতুন নিয়ন্ত্রক শর্তগুলি যথাযথ মানা হয়। এই নতুন মেধা-স্বত্ব-রাজের নীতিগুলি হল: ক) পেটেন্টের কার্যকারিতার মেয়াদ হবে ৪০ বছর। খ) শুধুমাত্র কৃৎকৌশল প্রয়োগপদ্ধতির বা কোনও নতুন উপাদানের ব্যবহার-পদ্ধতির ওপরেই নয়, কৃৎকৌশল ও উপাদানগুলি ব্যবহার করে তৈরি পণ্যটির ওপরেও পেটেন্ট প্রযোজ্য হবে। গ) পেটেন্ট বা লাইসেন্স শুধুমাত্র পেটেন্ট প্রদানকারী দেশেই প্রযোজ্য হবে না, প্রযোজ্য হবে আমদানিকারক দেশেও। অর্থাৎ পেটেন্ট বা লাইসেন্স-যুক্ত কৃৎকৌশল বা সেই কৃৎকৌশল-নির্মিত পণ্য শুধুমাত্র যে-দেশে ওই পেটেন্ট বা লাইসেন্স আইনসিদ্ধ হয়েছে সে দেশেই বলবৎ থাকবে তা নয়, পেটেন্টের ধারক কোম্পানি বা ব্যক্তি যে-কোনও দেশেই এই পণ্য বা কৃৎকৌশল আমদানির মাধ্যমে তা বাজারজাত করার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করবে। ঘ) পেটেন্ট সংক্রান্ত কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী ব্যক্তি বা কোম্পানিকে তার অভিযোগের যাথার্থ্য প্রমাণের দায়িত্ব নিতে হবে না, বরং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ।

গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই নতুন নীতিগুচ্ছ এমন ভাবে প্রণীত হয়েছে যে, কোনও কোম্পানি একবার পেটেন্ট নিতে পারলে প্রায় স্থায়ীভাবে তার ওই পেটেন্ট-কৃত প্রকৌশল বা প্রকৌশল ব্যবহার করে তৈরি পণ্য ব্যবহারের, বিক্রির, অন্যদেশের বাজারে আমদানি করার পূর্ণ ও একচেটিয়া অধিকার সুনিশ্চিত হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ-গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ সীমিত করে। কোনও কোম্পানি দীর্ঘ কুড়ি বছরের পেটেন্ট পাওয়ার পর ওই পেটেন্ট-কৃত প্রকৌশলে বা পণ্যে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে নতুন পণ্য তৈরি করে আবার পেটেন্ট দাবি করতে পারে। এইভাবে তারা চিরকালের জন্য কোনও প্রকৌশলের ওপর একচেটিয়া অধিকার ভোগের সুযোগ পায়। পেটেন্ট আইনের বিশেষ প্রয়োগ করে কোনও বহুজাতিক সংস্থা সারা বিশ্বের বাজারে অনুপ্রবেশের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে, শুধু তাই নয়, পেটেন্ট যুক্ত পণ্যটির সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত অন্য কোনও পণ্য উৎপাদনের পথও বন্ধ করে। এইভাবে কোনও নতুন কোম্পানির পক্ষে ওই বিশেষ ক্ষেত্রে নতুনভাবে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সাহায্যে উন্নততর প্রকৌশল যুক্ত পণ্য তৈরির রাস্তা বন্ধ হয়।

এইভাবে নতুন পেটেন্ট আইন সারা বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘদিনের জন্য ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত, উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রকৌশলগুলির, বা পণ্যগুলির, সুসংরক্ষিত বাজারকে সুনিশ্চিত করে। বড় বড় বাজারে আধিপত্য রাখা বিভিন্ন অগ্রণী দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি বহুদিন ধরেই বিশ্বব্যাপী আধুনিক প্রকৌশলগুলি অনুমতি ছাড়া বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়া ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানোর নীতি দাবি করে আসছিল। যেহেতু মোট পেটেন্টের একটা বড় অনুপাত উন্নত দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থার কুক্ষিগত, তাই এই নতুন নীতিগুলি বাস্তবে উন্নত দেশগুলির হাতে সারা বিশ্বের প্রকৌশলগত গবেষণা-উদ্ভাবনের গতিপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি রাখার একটি শক্তিশালী যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই নীতিগুলি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী বহুজাতিক সংস্থার হাতেও তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণা-উদ্ভাবনার গতিপথ পরিচালিত করার ক্ষমতা তুলে দেয়। অলিগোপলি সংস্থা হিসেবে তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে বেঁধে রাখার

স্বার্থে সর্বদাই গবেষণা ও উদ্ভাবনার মধ্য দিয়ে পুরনো পণ্যের গুণমান ও বৈশিষ্ট্যকে তারা আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। পণ্যের বাজারের বিস্তার ও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে অলিগোপলি কোম্পানিগুলি সর্বদাই নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য উদ্ভাবন করে। একদিকে তারা ধনী ক্রেতা, যাদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি, তাদের রুচি-পছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে পণ্যের বাজার বিস্তৃততর করার চেষ্টা করে, অন্যদিকে ক্রেতার রুচি ও পছন্দে পরিবর্তন আনার জন্য বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় বাড়ানোর খাতে বিশাল অর্থ ব্যয় করে। এই ধরনের কাজে উন্নত দেশের মোট গবেষণা ও উদ্ভাবন খাতে ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ চলে যায়, ফলে অন্যান্য খাতে মোট গবেষণা ও উদ্ভাবনী ক্রিয়া অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা-স্বত্ব নীতি ও ভারতীয় কৃষি: কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা-স্বত্ব চুক্তির একটি শর্ত হল, নতুন ধরনের কোনও চারার সূচনা ঘটালে ওই চারার উৎপাদনকারীকে চারাটির জন্য আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতি সমস্ত সভ্য দেশের ওপরেই প্রযোজ্য। উপরন্তু মেধা-স্বত্ব আইন অণুজীবের (Microorganism) এবং অণুজৈবিক প্রক্রিয়ার (Microbiological process) উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট পাওয়ার অধিকার স্বীকার করে। চারাগাছ উদ্ভাবন করার জন্য এই আইন চারাগাছ নিয়ে গবেষণারত কোম্পানিকে নতুন চারাগাছ উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট পাওয়ার অধিকার দেয়। যদিও কোনও বস্তুর জন্য পেটেন্ট পাওয়ার শর্ত হল বস্তুটির নতুনত্ব, সেইসঙ্গে এটি তৈরির কাজটি উদ্ভাবনমূলক হতে হবে ও বস্তুটিকে শিল্পে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। চারাগাছ বা অণুজীবের জন্য পেটেন্ট পাওয়ার কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথমত, অণুজীব বা চারাগাছটির বৈশিষ্ট্য অনুরূপ চারাগাছ বা অণুজীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন বলে দাবি করা হচ্ছে যে প্রজাতিটিকে তার অন্তর্গত সব ক'টি জীব যেন একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেন অপরিবর্তিত থাকে— যার অর্থ, বৈশিষ্ট্যের সামান্য হেরফের ঘটলে ওই পেটেন্ট প্রযুক্ত হবে না। শুধুমাত্র এই ধরনের প্রাণী অথবা চারাগাছ উদ্ভাবনের জন্যই উদ্ভাবক পেটেন্ট পান তা নয়, এগুলি বিক্রি ও রফতানি করার জন্যও এই একচ্ছত্র অধিকার বজায় থাকে। শুধুমাত্র পেটেন্টধারীই এটি বিক্রি করা বা রফতানি করার অধিকার ভোগ করে, অন্য কেউ বিনা অনুমতিতে ও পেটেন্টধারীকে রয়াল্টি না দিয়ে বিক্রি বা রফতানি করতে পারে না। যদিও আগে থাকতেই উপস্থিত অন্য কোনও বস্তু আবিষ্কারের ওপর পেটেন্ট দেওয়া হয় না, কিন্তু চারাগাছ বা কোনও জীব, যা মানুষের জানার বাইরে থেকে গেছে, তা আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট দেওয়া হয়। চারাগাছ বা অণুজীবের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রক্রিয়াটি পেটেন্টের সুযোগ পায় না, কিন্তু উদ্ভাবিত বস্তুটি পেটেন্টের সুযোগ পায় (অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইনে product patent ও process patent এই দুই ধরনের পেটেন্টই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মাইক্রোঅর্গানিজমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উদ্ভাবিত বস্তুর জন্য পেটেন্টই স্বীকৃত, উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ার জন্য তা স্বীকৃত নয়)। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে যেখানে বিক্রি করার ফলে বস্তুটির ওপর নির্মাতার অধিকার শেষ হয়ে যায়, অণুজীবের ক্ষেত্রে বা চারাগাছের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পেটেন্ট অধিকার বজায় থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বস্তুকণার ওপর পেটেন্টের অর্থ জৈব সারের ওপর পেটেন্ট এবং জীবনপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের জন্য পেটেন্টের অর্থ জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন চারা ও নতুন পশু সৃষ্টির পদ্ধতির ওপর পেটেন্ট। অবশ্য এই আইন চারাগাছ বা প্রাণীদের জন্য পেটেন্ট স্বীকার করে না, এদের উদ্ভাবন পদ্ধতির ওপর পেটেন্ট স্বীকার করে।

২০০১ সাল অবধি ভারতে এই ধরনের আবিষ্কৃত অণুজীব বা অন্যান্য জৈব প্রজাতির ওপর অধিকার রক্ষার স্বার্থে কোনও আইন ছিল না। ২০০১ সালের শস্যবৈচিত্র ও কৃষকের অধিকার আইনটি একটি 'সুই জেনেরি' ব্যবস্থা, অর্থাৎ শুধুমাত্র নতুন ধরনের জন্যই সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, নতুন ধরনের জীবকণা থেকে যেসব ধরনের জীবকণা পাওয়া যেতে পারে বা কৃষকরা নিজেরাই তৈরি করতে পারে সেসবের ওপর পেটেন্ট স্বীকার করে। এই আইনটিতে বিস্তৃতভাবে কৃষকের অধিকার, উৎপাদনকারীর ছাড়, সুরক্ষার জন্য লাইসেন্স ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে। কৃষক এই সুরক্ষিত বীজ বা চারা বিক্রি করার, বপন করার, পুনরায় বপন করার, জমিয়ে রাখার, বিনিময় করার বা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অধিকার ভোগ করে।

পশ্চিমি দেশে সবসময়েই জীবন্ত বস্তু, জন্তু এবং উদ্ভিদবৈচিত্র পেটেন্টের আওতার বাইরে রাখা ছিল, এসব জিনিস পেটেন্ট করা যেত না। ইউরোপিয়ান পেটেন্ট কনভেনশনে এটা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় যে, পেটেন্ট আইনের ৫৩(বি) ধারায় বলা হয়েছে চারা ও জন্তু নতুন করে তৈরি করার জন্য যে-মৌলিক জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, সেই প্রক্রিয়া পেটেন্ট করা যাবে না। কিন্তু বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা-স্বত্ব জিনগত পরিবর্তনের সাহায্যে নির্মিত নতুন চারা ও জীবজন্তু নির্মাণের পদ্ধতিকে পেটেন্টের আওতায় নিয়ে আসে এই যুক্তিতে যে, জিনগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না, এটিতে অণুজীবের জীবনপ্রক্রিয়া ব্যবহার হয়। ইউরোপিয়ান কমিউনিটি নির্দেশ দেয়, এইভাবে জিনগত পরিবর্তন করে নতুন জীববৈচিত্রের সৃষ্টিপদ্ধতির ওপর স্রষ্টার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। এতে পুরনো পেটেন্ট আইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০ সালের পরই মেধা-স্বত্ব আইনের বলে নতুন চারা-বৈচিত্র ও জিনগত পরিবর্তনের সাহায্যে নির্মিত প্রাণীর সৃষ্টি-পদ্ধতিকে পেটেন্টের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এসবের পরিণামে ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর মেধা-স্বত্ব আইনে পরিবর্তন আনা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সব সভ্য দেশকে নির্দেশ দেওয়া হয় ২০০০ সালের মধ্যে সেই পরিবর্তনগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের পেটেন্ট আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

মেধা-স্বত্ব আইনের পরিধিকে এইভাবে বিস্তৃত করার পর অজস্র নতুন ধরনের বীজ, জিন-পরিবর্তিত অথবা বিভিন্ন জিনের সংমিশ্রণে নির্মিত নতুন শস্য ও জৈব সার উৎপাদনের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। উন্নত দেশগুলির বৃহৎ করপোরেট বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক বড় বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি এই ধরনের নতুন বীজ, শস্য, ও জৈব সার উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। আশা ছিল, এইসব বিভিন্ন জিনের সংমিশ্রণে তৈরি নতুন বীজ ও নতুন জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি নতুন চারা কৃষিতে উপকরণের ব্যবহার কমিয়ে উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে, এইসব নতুন প্রজাতি ও কৃষি-উপকরণ কৃষিতে দীর্ঘকালীন উন্নতির রাস্তা খুলে দেবে। এই আশাতেই সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন জৈব প্রযুক্তিতে চাষের উপকরণগুলির বাজার বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই দ্রুত প্রসারণশীল বাজারে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলিই প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। ঔষধ ও জৈব প্রযুক্তিতে তৈরি কৃষি-উপকরণ উৎপাদনে বহুজাতিক সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব দ্রুত বেড়ে চলেছে। সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে তাদের কলেবরও ক্রমবর্ধমান।

ভারতে বীজ ও সারের উৎপাদন ও ব্যবহারে বিদেশি কোম্পানির ভূমিকা

ভারতে কৃষিতে ব্যবহারের জন্য শস্য, বীজ, চারাগাছ ইত্যাদির উৎপাদন হয় বহুলাংশে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। বীজ তৈরির ক্ষেত্রে যুক্ত ৫০টিরও বেশি সরকারি গবেষণাকেন্দ্র আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা করছে, কোনও কোনও সংস্থা চাল, তৈলবীজ, তুলা ইত্যাদি শস্য নিয়ে জিন-ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৫০টি দেশি-বিদেশি কোম্পানি কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে গবেষণার বিপুল গুরুত্ব অস্বীকার না করেও দেখা যাচ্ছে, বিচিত্র জিনের মিশ্রণে নতুন প্রাণসৃষ্টি সংক্রান্ত উচ্চস্তরের গবেষণা ও এই গবেষণার একটি স্তরে এসে বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা সাধারণত বেসররকারি সংস্থার হাতেই সীমাবদ্ধ। ভারতে যদিও বীজ নির্মাণের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরটি সরকারি তত্ত্বাবধানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকে, তবু বীজের বাজার সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি হাতে রয়েছে। ১৯৮৫–’৮৬ সাল থেকে সরকার প্রাথমিক স্তরের বীজ ধান থেকে দ্বিতীয় স্তরের মূল বীজ নির্মাণের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক স্তরের বীজ ধান বিলি করা শুরু করে। তখন থেকেই দেশি কোম্পানিগুলি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বীজ উৎপাদনে অতি দ্রুত প্রাধান্যের জায়গায় চলে আসে এবং বীজ উৎপাদনের বাজার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৯৮৭ সালের পর বহুসংখ্যক ভারতীয় কোম্পানি বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করে বীজের বাজারে প্রাধান্য করতে থাকে। সেগুলি হল, ই আই ডি-প্যারি, হিন্দুস্থান লিভার, আই টি সি, জে কে, রাবিস, স্যান্ডোজ ইত্যাদি। কিছু কিছু বিদেশি কোম্পানি ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে এদেশে বীজের ব্যবসা চালাচ্ছে। এই বিদেশি কোম্পানিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাইওনিয়ার পি জি এস (Pioneer PGS company), এবং কারগিল। বীজশিল্পে এই গঠনগত পরিবর্তনের জন্য সরকারি নীতি বিশেষ সাহায্য করেছে। ১৯৮৭ সালে সংকর বীজ ও জৈবপ্রযুক্তি দিয়ে তৈরি বীজ, সার, চারা প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয় এবং এদেশের বাজারে বিদেশি কোম্পানির ক্রিয়াকর্ম বাধামুক্ত করা হয়। এছাড়া ১৯৮৮ সালে যে সব বীজ-কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতায় বীজ তৈরি করে, তাদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মোটা ধরনের খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজের বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয় এই শর্তে যে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ কোম্পানিগুলি তাদের পেটেন্ট-যুক্ত বিশেষ বীজ সরবরাহ করবে। ১৯৮৯ সালের আইন সবজি, ফুল ও গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত ছোট গাছপালার বীজ বা চারাগাছ বিনা লাইসেন্সে আমদানি করার অনুমতি দেয়।

সারের বাজার

সারা পৃথিবীতে দুই ধরনের সারের বাণিজ্য হয়ে থাকে। ১) ক্রুড সার, যা প্রাকৃতিক ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার নির্মাণে কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগে, ২) শিল্প-কারখানায় তৈরি কৃষিতে ব্যবহৃত সার, যা ক্রুড সার কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ২০০৯ সাল অবধি ক্রুড সারের বাণিজ্যমূল্য বাড়লেও ২০০৯

সাল থেকে ক্রুড সারের রফতানি কমতে থাকে। এর কারণ, ক্রুড সারের মূল রফতানিকারী দু'টি অঞ্চল আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ক্রুড সার রফতানি না করে নিজ দেশেই প্রকরণ করা শুরু করে। এতদিন এই ক্রুড সারের মূল আমদানিকারী দেশ ছিল পশ্চিম ইউরোপ।

কারখানায় তৈরি করা কৃষিকাজে ব্যবহৃত সারের মূল রফতানিকারী দেশগুলি হল, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ, উত্তর আমেরিকা, কানাডা এবং এশিয়ার কিছু দেশ। কিন্তু মূল আমদানিকারী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু দেশ। চিন, ফিলিপাইনস, জাপান ও ভারতের জন্যই সারের ক্ষেত্রে এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিট আমদানিকারী অঞ্চল।

আমরা আগেই দেখেছি, গত কয়েক বছরে ভারতীয় কৃষিতে সার, কীটনাশক, মেশিনারি ইত্যাদি আধুনিক উপকরণের ব্যবহার অত্যধিক বেড়েছে। এর কারণ নানাবিধ, যেমন: এইসব উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে বাধানিষেধ কমে যাওয়া, শুল্ক হ্রাস, এদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্যের পথে বাধানিষেধ কমে যাওয়া, কৃষি-উপকরণের বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের অবাধ যাতায়াতের পিছনে সরাসরি উৎসাহদান ইত্যাদি। আমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য ১৯৮১ সাল থেকে ২০১৬ সাল অবধি ভারতীয় কৃষিতে সারের ব্যবহার, সারের উৎপাদন, সারের আমদানির দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা ও এসবের পরিণামে খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতার দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা মেপেছি রিগ্রেশন পদ্ধতির সাহায্যে। পরিসাংখ্যিক রিগ্রেশন সমীকরণগুলি একাদশ অধ্যায়ের 'সংযোজন' অংশে দেওয়া হল।

সারণি ১১.৩ সারের আমদানি, রফতানি, উৎপাদন ও ব্যবহার

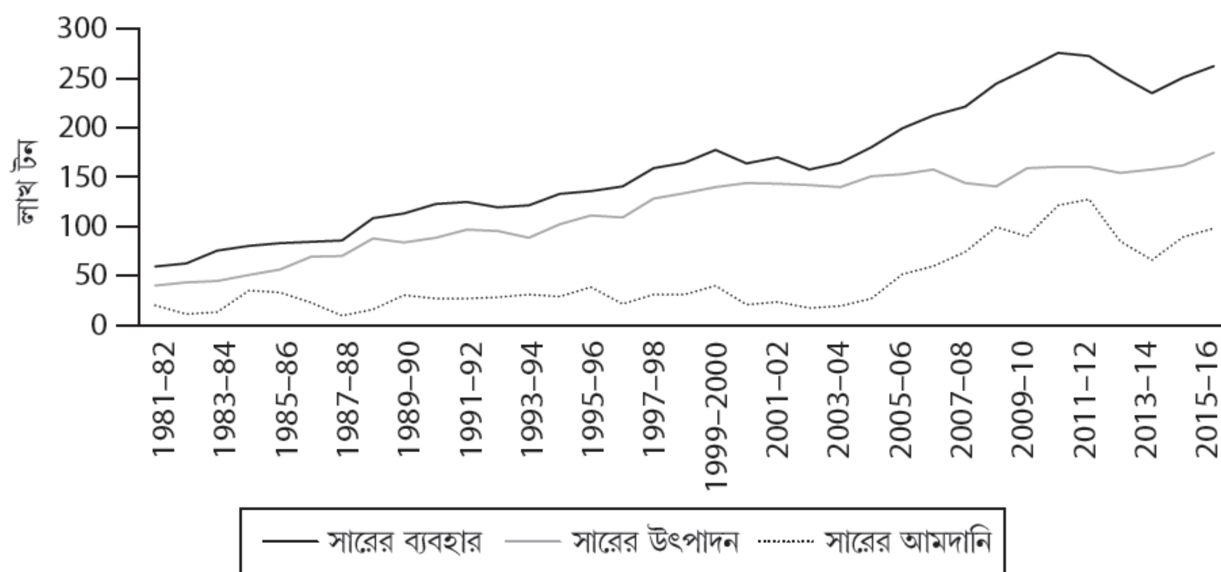
দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি প্রবণতা (১৯৮১–২০১৬)	বৃদ্ধির হার
সারের ব্যবহার	৪.২৮%
সারের উৎপাদন	৩.৯৫%
সারের আমদানি	৫.৪৭%
খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা	১.৯৯%

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

১৯৮১ সালে সারের ব্যবহার হয়েছিল ৬০.৬৪ লাখ টন। ওই বছর উৎপাদন হয়েছিল ৪০.৯৩ লাখ টন, ২০.০১ লাখ টন ঘাটতির বিপরীতে ওই বছর আমদানি করা হয় ২০.৪১ লাখ টন সার। কিন্তু তার পর থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমদানি বৃদ্ধি-হারের প্রবণতা, উৎপাদন-বৃদ্ধিহার ও সারের ব্যবহারের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হার ছাপিয়ে যায়। দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি-হারের তুলনায় সার ব্যবহারের বৃদ্ধি-হার বেশি। অর্থাৎ ঘাটতির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, সুতরাং আমদানি বাড়িয়ে ঘাটতি মেটাতে হয়। সার ব্যবহারের এই বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে খুব সহায়ক হয়নি। দেখা যাচ্ছে, '৮১ সাল থেকে ২০১৫ সাল অবধি খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতার দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হার শতকরা ১.৯৯ স্তরে থেকে গেছে।

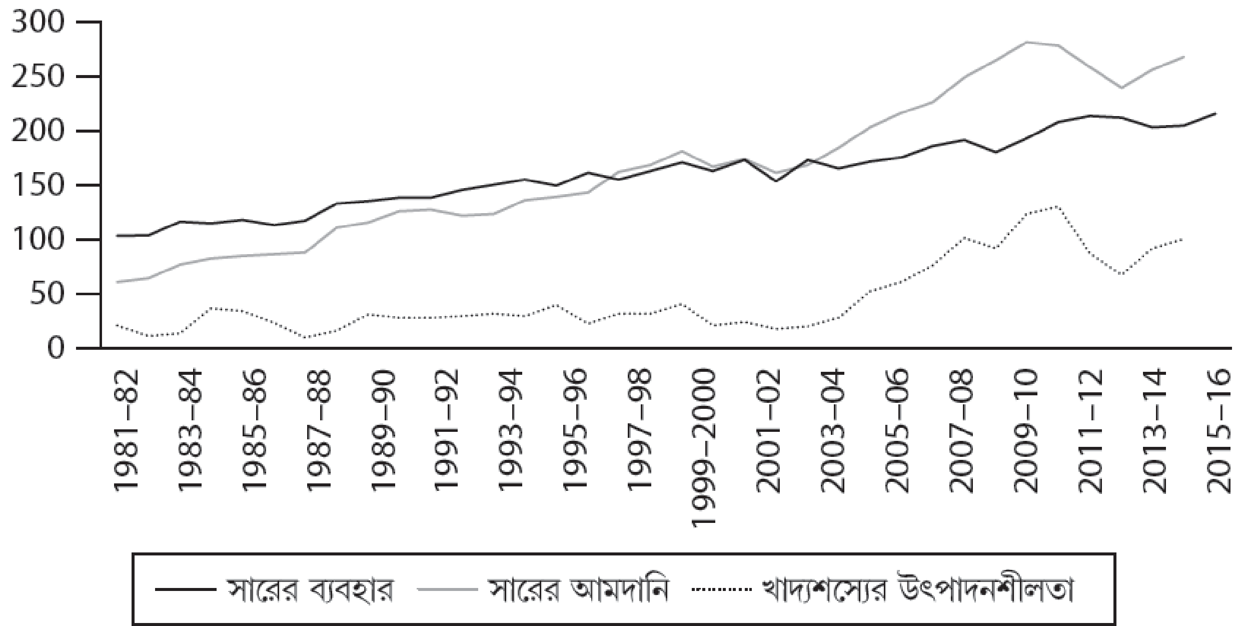
বিভিন্ন শস্যের আমদানি, রফতানি, নিট আমদানি-প্রবণতা বৃদ্ধি/হ্রাসের হার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার খোলা-বাজার বাণিজ্যনীতির ফলস্বরূপ ভারতের কৃষি-উৎপাদন অনেকটাই রফতানিমুখী ও কৃষিপণ্যের বাজার অনেক পরিমাণে আমদানি-নির্ভর হয়ে উঠেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার খোলা-বাজার নীতি অনুযায়ী ভারত কৃষিতে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-শুল্ক কমিয়েছে। খোলা-বাজার নীতির সাধারণ প্রয়োগে রফতানি বেড়েছে ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে আমদানির পরিমাণও বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। আমদানি-রফতানি বিষয়ে কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা স্বস্তিজনক মনে হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান নিট আমদানিকারীর। আমরা কয়েকটি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি দেখার আগে সমগ্র কৃষি-আমদানি ও কৃষি-রফতানির তুলনামূলক অবস্থা দেখার চেষ্টা করেছি।



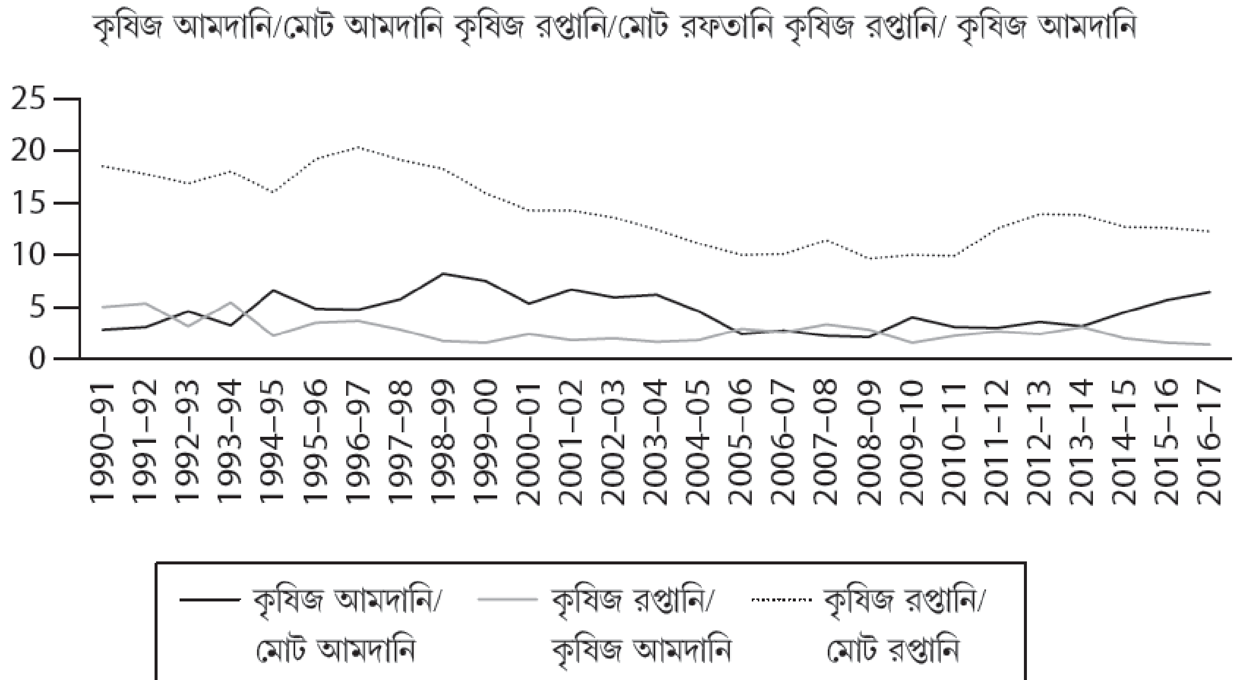
চিত্র ১১.১ সারের ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানি

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017



চিত্র ১১.২ সারের আমদানি, ব্যবহার ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017



চিত্র ১১.৩ কৃষি ও অ–কৃষির আমদানি ও রফতানির অনুপাত

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

আমরা দেখছি, মোট রফতানির তুলনায় কৃষিজ রফতানি সময়ের সঙ্গে কমে আসার দীর্ঘকালীন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৬–৯৭ সালে এই অনুপাতটি সবচেয়ে বেশি মানে পৌঁছানোর পর কমতে থাকে। ২০০৮, ২০০৯, ২০১০-এ সবচেয়ে নিচু স্তরে পৌঁছানোর পর সাময়িকভাবে তুলনামূলক বৃদ্ধির প্রবণতা দেখায়, ২০১২–১৩ সাল থেকে আবার কমতে থাকে। মোট আমদানিতে কৃষিজ আমদানির পরিমাণ ১৯৯৭–৯৮ সালের পর বাড়তে থাকে। ২০০৪–০৫, ২০০৬–০৭ ও ২০০৭–০৮ সালে সবচেয়ে কম স্তরে পৌঁছে আবার বাড়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং ২০১৩, '১৪, '১৫, '১৬, ও ২০১৭ সালে এই অনুপাতটির বৃদ্ধির প্রবণতা স্পষ্ট। অন্যদিকে কৃষিজ আমদানির তুলনায় কৃষিজ রফতানি স্বল্প বাড়া-কমার মধ্যে থাকলেও দু'টি পরিমাণের মধ্যে তফাত খুব বেশি না হওয়ায় '৯০-এর দশকের প্রথম দিকে আমদানির তুলনায় রফতানি বেশি থাকার দরুন অনুপাতটি ৪/৫-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করার পর আরও কমতে থাকে এবং ১/২-এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ২০১৩ থেকে স্পষ্টভাবে কমার প্রবণতা দেখায়। অর্থাৎ রফতানি বাড়লেও তুলনায় আমদানি আরও বাড়ার ফলে অনুপাতটি ১.৩-এর কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, আমদানি ও রফতানি মূল্যের মধ্যে তফাত থাকে মোট রফতানির প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ। অন্যভাবে বলা যায়, ২০১৭ সালে কৃষিজ পণ্যের রফতানি মূল্য থেকে আমদানির মূল্য মিটিয়ে বাণিজ্যখাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ মোট রফতানি মূল্যের শতকরা ২৭ ভাগে নেমে এসেছে।

সারণি ১১.৪ কৃষিজ পণ্যের আমদানি-রফতানি

বছর	কৃষিজ পণ্যের রফতানির প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	মোট রফতানি প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	কৃষিজ পণ্যের আমদানি প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	মোট আমদানি প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	নিট রফতানি মূল্য (রফতানি -আমদানি) প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	কৃষিজ রফতানি/ মোট রফতানি প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার	কৃষিজ আমদানি/ মোট আমদানি প্রতি পাঁচবছর অনুযায়ী গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি-হার
শতকরা ১৯৯১–৯২ থেকে ১৯৯৬–৯৭	৪০.৬২	৩৪.৫৪	৫৬.৫৬	৩৩.৮৫	৩৫.৫১	২.০৬৩	৯.২৮
১৯৯৬–৯৭ থেকে ২০০১–০২	৬.৮১	১৭.৪৬	২৩.১৭	১৭.০৭	–০.৪২	–৫.৬৫	৩.৩৯
২০০১–০২ থেকে ২০০৬–০৭	১৮.২৯	৩০.৬০	৬.৭৭	৪৫.২১	২৯.৫৩	–৫.০১১	–১১.৭২
২০০৬–০৭ থেকে ২০১১–১২	৩৮.৭১	৩০.৩২	৫০.৫২	৩৩.৩০	৩২.৪৯	৩.০৫	৬.০৩
২০১১–১২ থেকে ২০১৫–১৬	৭.৫৮	৭.২২	২৪.১২	৪.১৩	–৪.১৪	০.৬২	১৭.৮০

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

রফতানি ও আমদানির বৃদ্ধি-হারের মধ্যে তুলনায় আমদানি-হার কোনও কোনও সময়ে বেশি থাকছে। '৯০-এর দশকে কৃষিজ আমদানি-বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। এই হার রফতানি বৃদ্ধি-হারের তুলনায় বেশি ছিল। মোট রফতানিতে কৃষিজ পণ্যের রফতানি-ভাগ '৯০-এর দশকের প্রথম পাঁচ বছরে শতকরা ৩৫ ভাগ হারে বাড়লেও পরবর্তী পাঁচ বছরে এই হার শতকরা বাৎসরিক ৫ ভাগের বেশি হারে হ্রাস পায়। পরে,

এই শতাব্দীর প্রথম পাঁচ বছরেও মোট রফতানিতে কৃষিজ রফতানির ভাগ ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম পাঁচ বছর ছাড়া অন্য কোনও সময়ে মোট আমদানিতে কৃষিজ আমদানির ভাগ হ্রাস পায়নি, ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

কৃষিতে '৯১ সাল থেকে ২০১৮ সাল অবধি রফতানি ও আমদানি বৃদ্ধির হারের দীর্ঘকালীন প্রবণতা দেখলে আমরা এই বিষয়ে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। এই প্রবণতা দেখার জন্য আমরা '৯১ সাল থেকে ২০১৮ সাল অবধি ধারাবাহিক রফতানি ও আমদানির মূল্যের (কোটি টাকায়) দু'টি ক্রমের পরিসংখ্যান থেকে বৃদ্ধি-হারের দীর্ঘকালীন প্রবণতা মাপার চলতি পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নোল্লিখিত সমীকরণ দু'টি হিসাব করি, ও তার ভিত্তিতে আমদানি ও রফতানির দীর্ঘকালীন চক্রবৃদ্ধি হারের মাপগুলি পাই। সমীকরণটি একাদশ অধ্যায়ের 'সংযোজন' অংশে দেওয়া হয়েছে।

আমদানি সমীকরণ ও রফতানি সমীকরণ থেকে পাই

আমদানির দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হার = ১৮%

এবং রফতানির দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হার = ১৫%

আমদানির দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হার রফতানি বৃদ্ধি-হারের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

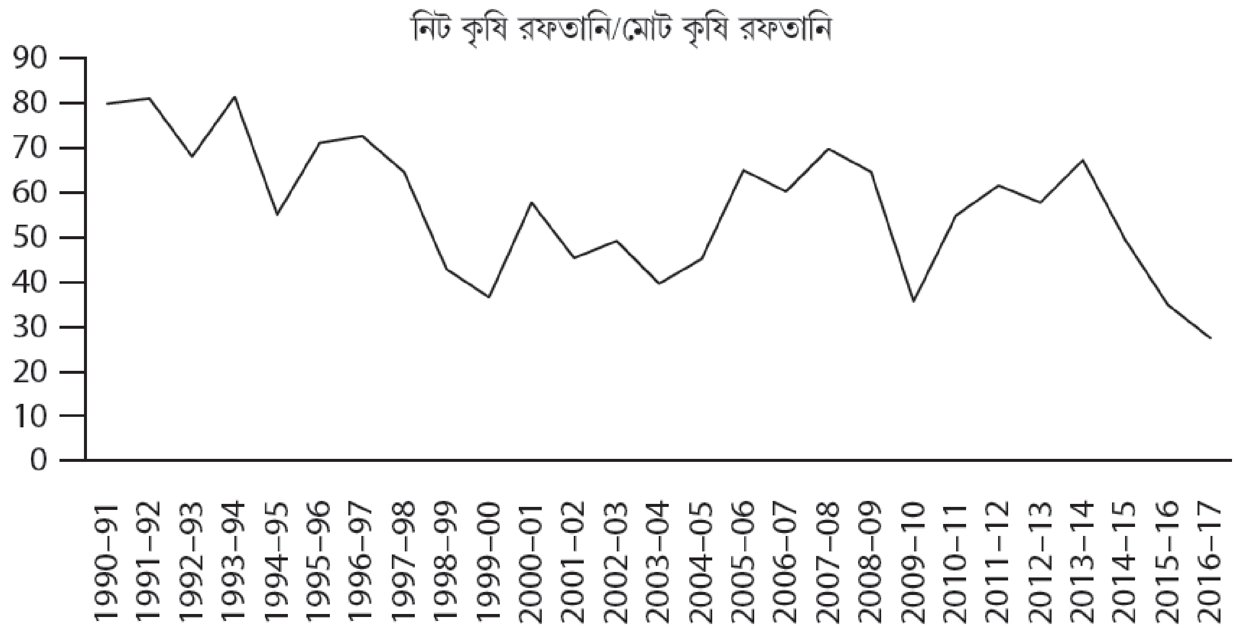
অবশ্য নিট রফতানি বৃদ্ধির গতি অতি ধীর হলেও এবং বিভিন্ন সময়বিন্দুতে ওঠা-নামা করে শেষ পর্যন্ত ২০১২–১৩-তে উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে তার নেমে আসার প্রবণতা দেখা গেলেও প্রারম্ভিক বিন্দুর তুলনায় তা ওপরেই থাকে। কিন্তু মোট রফতানিতে নিট রফতানির ভাগ ওঠানামার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও সব মিলিয়ে একটা দীর্ঘকালীন হ্রাসের প্রবণতা দেখায়। অর্থাৎ, মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের শতকরা ভাগ ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। নীচের ছবিটিতে (চিত্র ১১.৪) আমরা মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ভাগের দীর্ঘকালীন প্রবণতা দেখার চেষ্টা করেছি। সব মিলিয়ে একটা নিম্নগামী রেখা চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সমীকরণ গঠন করে অর্থনৈতিক রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্যে বৃদ্ধির/হ্রাসের প্রবণতার মাপ এবং বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার মাপার চেষ্টা করেছি। নীচের চিত্রটি থেকে '৯২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সমগ্র সময়ে মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের শতকরা ভাগের ধারাবাহিক পরিসংখ্যানের ক্রমটি পর্যবেক্ষণ করে দু'টি ভিন্ন ধরনের প্রবণতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা '৯১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত একটি প্রবণতা-মাপ ও ২০০৫ থেকে ২০১৮ অবধি ভিন্ন প্রবণতা-মাপ অনুমান করেছি এবং দু'টি ভিন্ন সমীকরণ গঠন করে দু'টি কালপর্বের জন্য দু'টি ভিন্ন প্রবণতা-মাপ ও দু'টি ভিন্ন বৃদ্ধি-হার মাপার চেষ্টা করেছি।

মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ভাগে হ্রাসের প্রবণতা একাদশ অধ্যায়ের 'সংযোজন'-এ দেওয়া হয়েছে।

'৯১ থেকে ২০০৫-এ বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের বৃদ্ধির হার = –৪.৮

২০০৫ থেকে ২০১৮-য় বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের বৃদ্ধির হার = –৫.১

দেখা যাচ্ছে, দু'টি ক্রমের প্রবণতাই ঋণাত্মক। অর্থাৎ বৃদ্ধি-হার দু'টি কালপর্বেই ক্রমহ্রাসমান শুধু নয়, প্রথম কালপর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে হ্রাসের হার আরও বেশি। যার অর্থ, সময়ের সঙ্গে শুধু যে মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ভাগ হ্রাস পেয়েছে তাই নয়, প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অনুপাত আরও দ্রুত হারে কমেছে। যেহেতু আমরা এই প্রারম্ভিক অনুমান নিয়ে আমাদের পরিমাপ শুরু করেছিলাম যে, সমগ্র সময়ে এই অনুপাতটি যেভাবে চলেছে তাতে এই চলরাশিটির গতিধারাকে দু'টি সরলরেখা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। দু'টি ক্রম অনুযায়ী ক্রমটিকে ভাগ করে দু'টি সরলরেখায় আমরা যে-চারটি বিন্দুতে বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার দেখেছি, সেগুলি হল: ১৯৯১, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৭। এই নির্দিষ্ট সময়বিন্দুগুলিতে মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অনুপাত হ্রাসের হার হল, যথাক্রমে, –২.৮৬, –৩.৮৩, –৪.২৭, –৪.৮৪। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে রফতানিতে উদ্বৃত্তের অনুপাতটির হ্রাস ঘটেছে ক্রমশ দ্রুততর হারে।



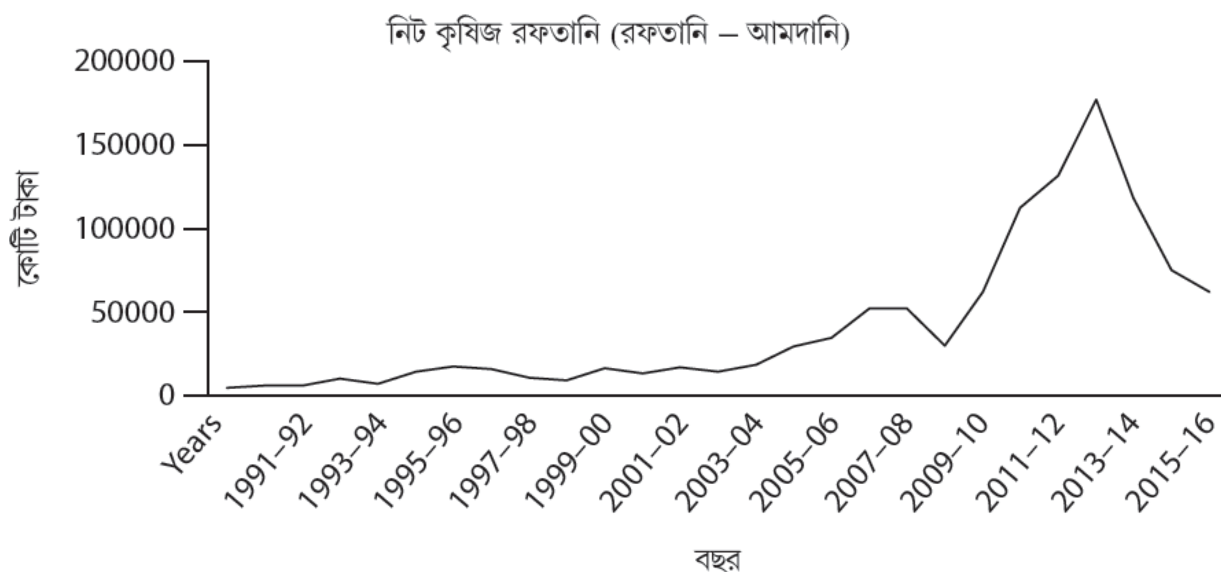
চিত্র ১১.৪ নিট রপ্তানি/মোট রপ্তানি

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI

দু'-একটি বিশেষ বিশেষ ফসলের ক্ষেত্রে আমরা নিট রফতানি-মূল্যের দীর্ঘকালীন প্রবণতা নীচের কয়েকটি লেখচিত্রের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করেছি।

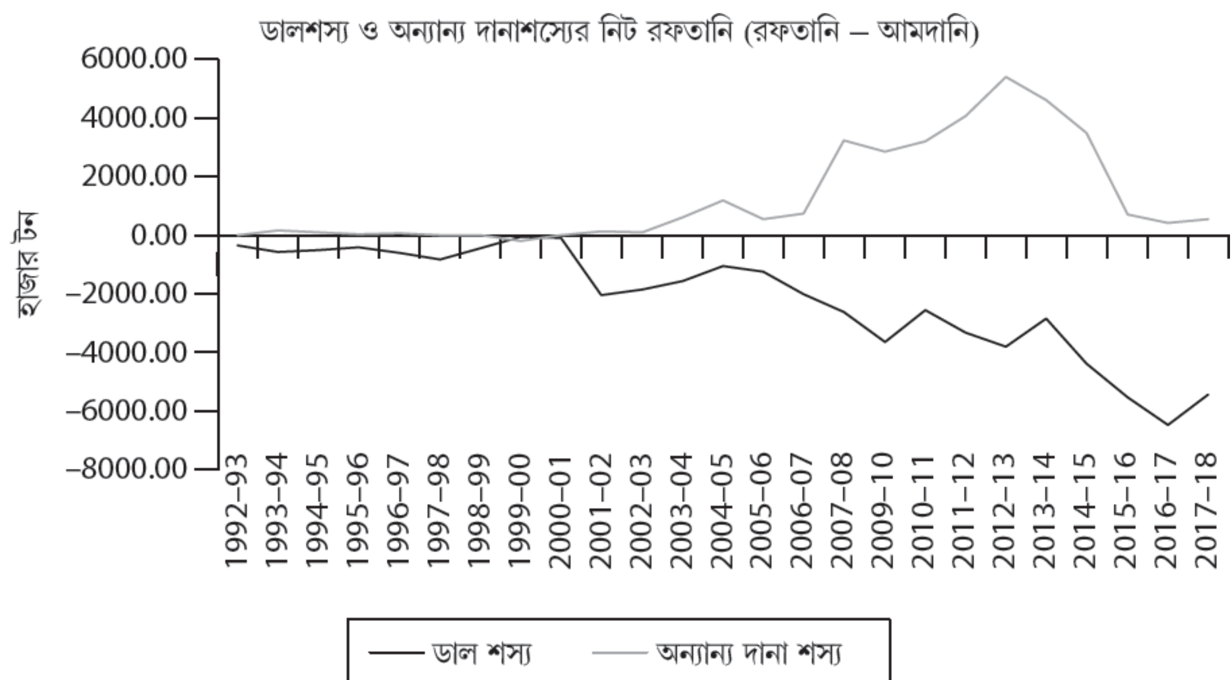
এই লেখচিত্রগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, '৯২ থেকে ২০১৭–১৮-র মধ্যে যেসব পণ্যের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সবসময়েই ধনাত্মক থেকেছে সেগুলি হল সাধারণ চাল, অন্যান্য দানাশস্য ও মশলা। যে পণ্যগুলির ক্ষেত্রে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সবসময় ধনাত্মক নয়, অর্থাৎ হয় রফতানি ও আমদানির পরিমাণ প্রায় সমান অথবা অনেক সময় রফতানির তুলনায় আমদানি যথেষ্ট বেশি, সেগুলি হল ডাল, গম, ও চিনি। এর মধ্যে ডালের ক্ষেত্রে গোটা সময়েই আমদানি, রফতানির তুলনায় বেশি এবং সময়ের সঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে। অন্যান্য দানাশস্যের ক্ষেত্রে ১৯৯২–৯৩ থেকে ২০১৭–১৮ এই পঁচিশ বছরে প্রথম দিকে নিট রফতানির পরিমাণ ছিল

স্বল্প, পরবর্তীতে ২০০৩ সালের পর থেকে অন্যান্য দানাশস্যের নিট রফতানি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ২০০৭–০৮-এর পর থেকে ২০১২–১৩ অবধি এই বৃদ্ধি-হার ছিল দ্রুততম, ২০১২–১৩-র পর ২০১৬–১৭ পর্যন্ত আবার অন্যান্য দানাশস্যের নিট রফতানি-হার অতি দ্রুত হ্রাস পায়। ডালশস্যের ক্ষেত্রে সব বছরই নিট রফতানি ঋণাত্মক এবং সময়ের সঙ্গে নিট রফতানি কমেছে, অর্থাৎ রফতানির তুলনায় আমদানি বেশি থেকেছে ও নিট আমদানি ক্রমশ বেড়েছে। এর ফলে ভারতের নিট বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমশ কমছে।



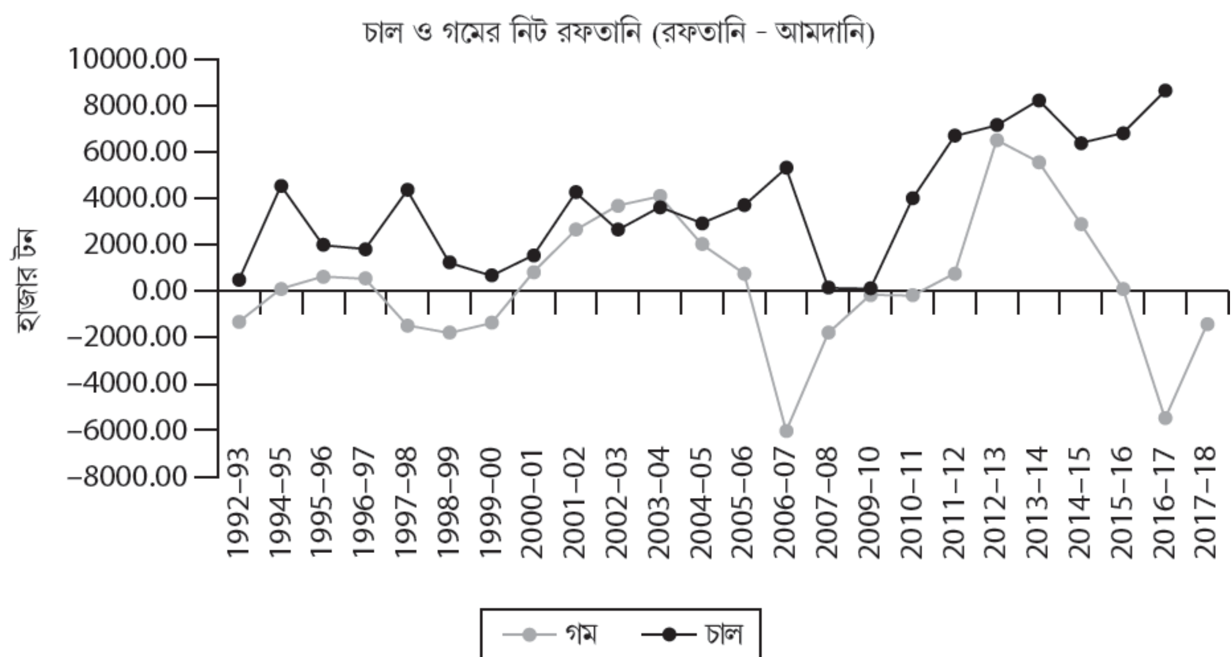
চিত্র ১১.৫ নিট কৃষিজ রফতানি

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017, GOI



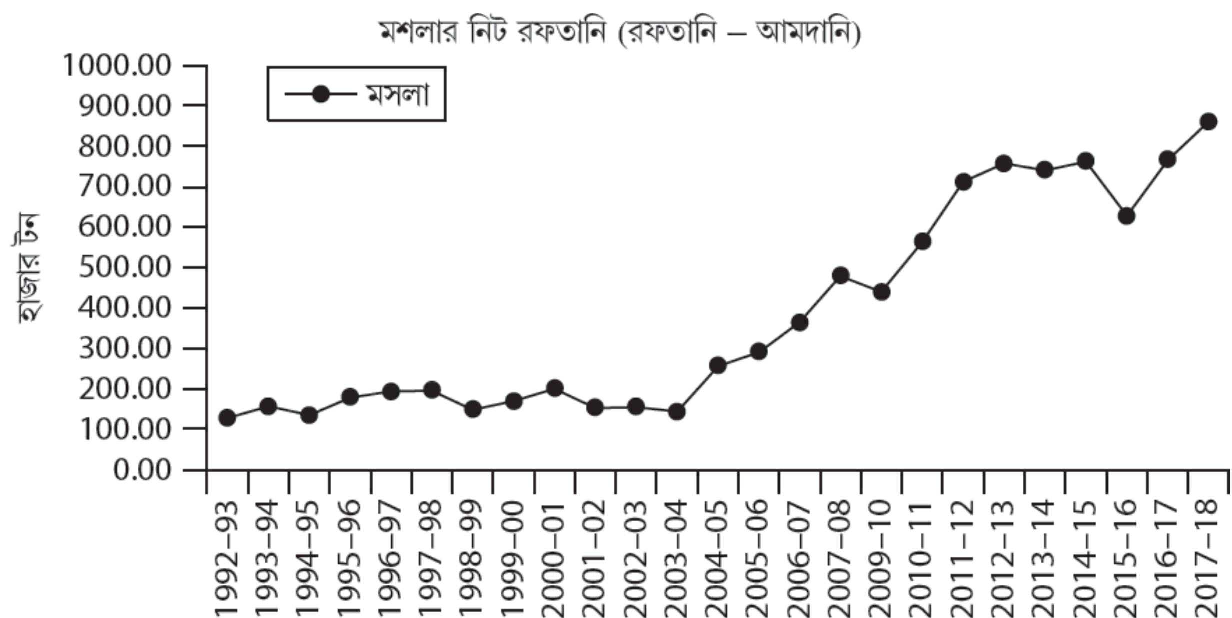
চিত্র ১১.৬ ডাল ও দানাশস্যের নিট রফতানি

Source: Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics



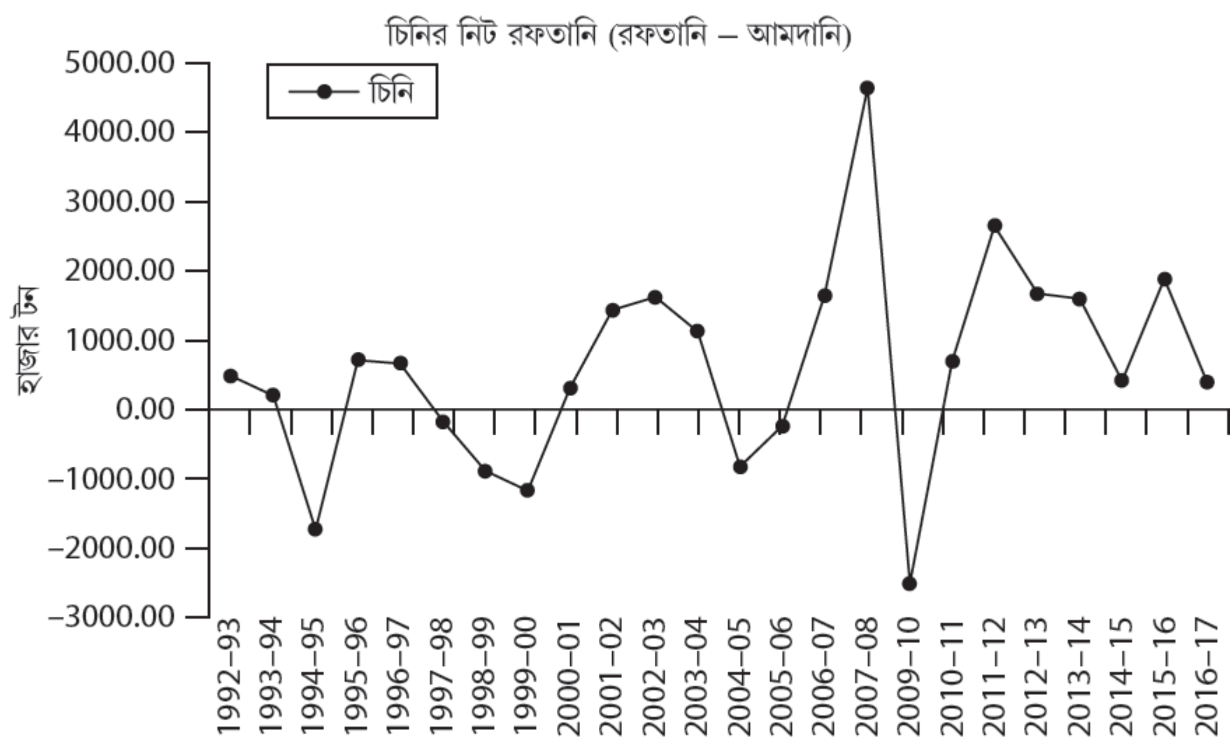
চিত্র ১১.৭ চাল ও গমের নিট রফতানি

Source: Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics



চিত্র ১১.৮ মশলার নিট রফতানি

Source: Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics



চিত্র ১১.৯ চিনির নিট রফতানি

Source: Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিনিষেধগুলি প্রয়োগের ফলে ও আমদানির বাধ্যবাধকতার নিয়মে ভারতীয় কৃষির আমদানি-নির্ভরতা বেড়েছে। যদিও রফতানির বৃদ্ধি ঘটেছে উচ্চহারে, তবু আমদানি-বৃদ্ধির হার রফতানি-বৃদ্ধির তুলনায় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দ্রুত কমে এসেছে। এছাড়া আলাদা করে এক-একটি পণ্যের ক্ষেত্রে নিট রফতানি ঋণাত্মক থেকেছে। দেখা যাচ্ছে, মোট রফতানি-মূল্যে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অংশ ক্রমহ্রাসমান। এই অবস্থা একটি দেশের পক্ষে মোটেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থার সূচক নয়। বরং আমদানি-রফতানির এই প্রবণতার গতিমুখ পরিবর্তিত না হলে দেশের সামনে বাণিজ্যখাতে ঘাটতির সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠবে, যা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে।

তথ্যসূত্র

১. Hoda, A., A. Gulati. 2008. *WTO Negotiations on Agriculture and Developing Countries.* Oxford University Press.

২. Bagchi, A. K. 2005. *Perilous Passage: Mankind and the Global Ascendancy of Capital.* Rowman & Littlefield Publishers.

৩. *World Development Report.* 2001.

সংযোজন

ক। সারের ব্যবহার, উৎপাদন, আমদানি

	সারে দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা (১৯৮১ থেকে ২০১৬)		
	রিগ্রেশন সমীকরণ	$AdjR^2$	বৃদ্ধি হার
সারের ব্যবহার	logy = 4.2644 + 0.0419597 t T = (23.07) (24.99)	0.94	৪.২৮%
সারের উৎপাদন	logy = 4.002865 + 0.0388068 t T = (69.07) (13.81)	0.84	৩.৯৫%
সারের আমদানি	Logy = 2.626429 + 0.0532336 t T = (17.62) (7.37)	0.61	৫.৪৭%
খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা	log y = 6.99144 + 0.0197468 t T = (389.24) (22.69)	0.93	১.৯৯%

খ। দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা

	সারে দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা (১৯৯১ থেকে ২০১৮)		
	সমীকরণ	$AdjR^2$	বৃদ্ধি হার
কৃষি আমদানি সমীকরণ	log y = 7.48 + 0. 16652 t T = (59.94) (21.39)	0.94	১৮.১১%
কৃষি রফতানি সমীকরণ	log y = 8.77 + 0.13914 t T = (106.74) (27.13)	0.94	১৪.৯২%

গ। মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

	১৯৯২ থেকে ২০০৫	$AdjR^2$	২০০৬ থেকে	$AdjR^2$
মোট রফতানিতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	logy = 4.44 –0.049t T = (48.97) (–5.00)	0.63	logy = 5.08 – 0.05t T = (11.07 (–2.50)	0.32

দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কৃষি

কৃষিক্ষেত্রে সংকট ও ভারতীয় কৃষকের আত্মহত্যা

ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের সামগ্রিক প্রভাব বোঝার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির একটি সারসংক্ষেপ এখানে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হিসেবে রাখা হল।

বিগত তিন দশক ধরে ভারতীয় কৃষির মূলগত বৈশিষ্ট্য কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক সংস্কার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিমাফিক লাগু করা বাণিজ্য ও মেধা-স্বত্ব সংক্রান্ত নীতিগুলি ভারতীয় কৃষিতে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে দেশি-বিদেশি কোম্পানি, বহুজাতিক উৎপাদক ও বাণিজ্য কোম্পানিগুলির ভূমিকাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে, ভারতীয় কৃষিকে তা বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। এই নীতিগুলি এবং ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব নিয়ে আমরা সানুপুঙ্খ আলোচনা করেছি। আমরা বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে দেখেছি নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের পর ভারতে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধির হারে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যদিও কৃষিতে নতুন ধরনের অধিক উৎপাদনশীল উপকরণের প্রয়োগ বেড়েছে, ব্যক্তিগতভাবে চাষির উদ্যোগ বেড়েছে, ফলে সরকারের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ কমলেও বেসরকারি উদ্যোগে সেচ ও বীজের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু এই সুফল সবসময় ছোট ও মাঝারি চাষির স্বার্থের অনুকূলে কাজে লেগেছে এমন নয়। কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন দিকে সরকারি সহযোগিতা হ্রাস, বীজ, সার ইত্যাদি কৃষি উপকরণের বাজারে সরকারের ভূমিকা হ্রাস এবং বেসরকারি ভূমিকা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে ঋণের বাজারে ঋণের জোগানের উৎস হিসেবে বড় জমির মালিক ব্যবসায়ী-মহাজনের প্রাধান্য ইত্যাদির কারণে কৃষি-উৎপাদন চালানোর ক্ষেত্রে চাষির ব্যক্তিগত দায় অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। সেচের জলের জোগান অনেকাংশে বড় চাষি, পণ্য ও উপকরণ ব্যবসায়ী এবং ঋণদাতার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। বীজের ক্ষেত্রেও সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার জায়গায় ব্যবসায়ী-মহাজনের ভূমিকা বেড়েছে। শুধু যে প্রতিটি উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, উপযুক্ত সময়ে সেচের জলের মতো চাষের অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কৃষি-উপকরণের বাজারে বিদেশি কোম্পানিগুলির প্রবেশের বাধা অনেকাংশে দূর হওয়ায় সার ও অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এইসব আমদানিকৃত উপকরণ যেহেতু অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তাই চাষের খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুজাতিক সংস্থার জোগান দেওয়া উপকরণের সংমিশ্রণে যে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ চালু হয়েছে, সে সম্বন্ধে চাষির যথেষ্ট

অভিজ্ঞতা না থাকায় তাকে এই উপকরণগুলির যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে জোগানদাতা কোম্পানির এজেন্টদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জমিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কৃষি-উপকরণ ব্যবহার হওয়ার তথ্য সামনে আসছে। এসবের ফলে কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে এবং শস্যবৈচিত্রের প্রসার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে শুধু উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় করেছে, ভূগর্ভস্থ জল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, জল নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা, জলের জোগানের ওপর গ্রামের অধিক ক্ষমতাশালী বড় জমির মালিক-ব্যবসায়ী ঋণদাতার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অনেকসময় জলের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে তুলছে। সেইসঙ্গে বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলিতে সরকারি ব্যয়হ্রাস এই সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

অন্যদিকে কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশীয় বাজারের সরাসরি যোগের পরিণামে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামার সঙ্গে দেশীয় বাজারে শস্যপণ্যের দামের ওঠানামার ফলে কৃষি-উৎপাদন থেকে চাষির আয় অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, কৃষি-উৎপাদনের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। একই সঙ্গে খোলা-বাজার নীতি কৃষিপণ্যের আমদানিকেও অবাধ করেছে। অধিক ব্যয়ে তৈরি দেশি শস্যপণ্য শুধু যে আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নত দেশের ভরতুকি-নির্ভর সস্তার পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে তাই নয়, দেশীয় বাজারেও ভারতীয় পণ্যকে আমদানি-কৃত সস্তার বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এইভাবে বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের আয়ে ও জীবনযাত্রায় অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বেড়ে গেছে। ভারতীয় কৃষিতে এই অনিশ্চয়তার প্রকাশ ঘটেছে ২০০০ সালের আগে ও পরে বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় কৃষকের জীবনে ঘনিয়ে ওঠা তীব্র সংকটের মধ্য দিয়ে। এই অনিশ্চয়তা তাদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল এবং সেই অবস্থা থেকে ভারতীয় কৃষক এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

চাষির দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে জিন-রূপান্তরিত বিটি তুলার ভূমিকা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রস্তাবিত মেধা-স্বত্ব আইনের প্রয়োগ ও বীজের অবাধ আমদানি কৃষিক্ষেত্রে জিনগত সংমিশ্রণে রূপান্তরিত নতুন অধিক ফলনশীল পেটেন্ট করা বীজের ব্যবহার বাড়িয়ে তোলে। বিটি তুলাবীজ একমাত্র জিনগত রূপান্তরের দ্বারা নির্মিত অধিক ফলনশীল তুলাবীজ, যার চাষ এদেশে আইনের অনুমতি পেয়েছে। ভারত সরকারের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ১৯৮৬ সালে এই বিশেষ জিন-পরিবর্তিত বীজটিকে পরিবেশগত অনুমতি দেয়। আমাদের দেশে এখনও অবধি ১১২৮ রকমের বিটি তুলার হাইব্রিড বীজ চাষের জন্য পাওয়া যায়। এই বিটি তুলাবীজ দশটি রাজ্যে চাষ হয়। এগুলি হল: গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং রাজস্থান। বিটি তুলা চাষের অধীন জমির পরিমাণ ২০০২ সালে ২৯০৭৩ হেক্টর থেকে বেড়ে ২০১৬–'১৭ সালে ৮৫.২৯ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিমাণটি মোট তুলাচাষের এলাকার শতকরা ৮১ ভাগ।

আমদানি-রফতানি সম্পর্কিত নির্দেশাবলি এবং চারাগাছ, ফল এবং বীজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংশোধিত ১৯৮৯ সালের নীতির সাপেক্ষে, ২০০২ সালের জাতীয় বীজ নীতি সমস্ত বীজ ও চারাগাছের

উপকরণগুলিকে এদেশে বাধাহীন ভাবে আমদানি করার অনুমতি দেয়। নতুন উদ্ভাবিত বীজের সমস্ত প্রকার ধরনই এই অনুমতি পায়।

এটা প্রমাণিত যে, বিটি তুলা চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বীজ, সার, সেচ এই সমস্ত খাতে বিটি তুলা চাষের ব্যয় সাধারণ উচ্চফলনশীল চাষের তুলনায় অনেক বেশি, একমাত্র কীটনাশক খাতে ব্যয় এ ক্ষেত্রে সামান্য কম। বিটি তুলার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা বিটি তুলার উৎপাদনশীলতা সম্বন্ধে একমত নন। একর-প্রতি বিটি তুলার উৎপাদন-ব্যয় অনেক বেশি, আবার বিটি তুলা চাষে প্রতি একরে উৎপাদনশীলতার মাত্রাও সাধারণ উচ্চফলনশীল বীজের তুলনায় অনেক বেশি। কেউ কেউ আবার দেখেছেন, বিটি তুলা চাষে ব্যয় বেশি কিন্তু উৎপাদনশীলতা কম, ফলে চাষির লাভ হয় না। চাষি ফলন থেকে যে-দাম পায় তাতে চাষের বিপুল খরচ মেটানো যায় না, বিটি তুলা চাষ করলে চাষির বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ২০০৩ সালে সুমন সহায় ও এস রহমান[১] অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ১০০টি জোতের চাষিদের নিয়ে তৃণমূল স্তরে একটি সমীক্ষা করেন। এই চাষিরা সকলেই পাশাপাশি বিটি ও সাধারণ তুলার চাষ করত। জমির মান, সেচের সুবিধা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি অনুযায়ী জোতগুলিকে উচ্চ মানসম্পন্ন, মাঝারি মানসম্পন্ন, ও নিম্ন মানসম্পন্ন— এই তিন প্রকার জোতে ভাগ করে নিয়ে এই দুই প্রকার তুলা চাষের উৎপাদন-ব্যয়, উৎপাদনশীলতা, লাভ ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ চালানো হয়। সাধারণ তুলা পরিণতি পায় ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে, বিটি তুলা পরিণতি পায় ১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে, কিন্তু এদের পাতা এবং ডালের বৃদ্ধি সাধারণ তুলার তুলনায় কম। বিটি তুলার দু'টি ধরন এখানে বিবেচনা করা হয়েছে, বিটি ১৬২ ও বিটি ১৮৪। তাছাড়া বিটি তুলায় সাধারণ তুলার তুলনায় বলের সংখ্যা কম (গড়ে প্রতিটি গাছে ৫০টি, যেখানে সাধারণ তুলার ক্ষেত্রে বলের সংখ্যা গড়ে চারাগাছ-প্রতি ৯০টি)। বিটি তুলার ক্ষেত্রে বল তাড়াতাড়ি পড়ে যায়, বিটি তুলায় সাধারণ তুলার তুলনায় পাতার দৈর্ঘ্যও ছোট।

সুমন সহায় ও এস রহমানের পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বিটি তুলা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে সাধারণত চারা গাছকে সুরক্ষিত রাখতে পারলেও তার বিশেষ একধরনের পোকার (বলওয়ার্ম) শিকার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দেখা যায় বিটি ও সাধারণ বীজের মধ্যে উৎপাদনশীলতার পার্থক্য আছে। নিকৃষ্টতম, মাঝারি ও উৎকৃষ্টতম— এই তিন ধরনের বিটি বীজের উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে প্রতি হেক্টরে ২.৭৫, ৪.৭৫ এবং ৭.৫ কুইন্টাল, সেখানে সাধারণ বীজের ক্ষেত্রে এই মাপগুলি প্রতি হেক্টরে ৩.২৫, ৫.৫০, এবং ৯.০ কুইন্টাল। অথচ বিটি বীজের ক্ষেত্রে এই উৎপাদনশীলতা পাওয়ার জন্য অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে হয়েছে। সহায় ও রহমানের সমীক্ষাভিত্তিক বিশ্লেষণে বিটি বীজের চাষে যেখানে বিনিয়োগ করতে হয়েছে প্রতি হেক্টরে ৫৭১৬ টাকা, সাধারণ বীজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৪৭৩৩ টাকা। খরচের এই পার্থক্যের মূল কারণ, সুমন সহায় ও রহমানের সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ গবেষণায় তৈরি বিটি বীজের খরচ সাধারণ বীজের চার গুণেরও বেশি। কিন্তু দেখা গেছে যে-সাধারণ বীজ ব্যবহার করা হয়েছে সেটিও উচ্চফলনশীল। এই বীজের গুণগত মানের তুলনায় বিটি পদ্ধতিতে তৈরি বীজের মান অত উচ্চস্তরের না হওয়ায় এই বীজ থেকে তৈরি ফসলের বাজার-দাম সাধারণ বীজে তৈরি তুলার দামের তুলনায় অনেক কম। এই সমস্ত কারণের মিলিত ফল হল, চাষি তার অতিরিক্ত ব্যয় অনুযায়ী বিটি বীজে তৈরি ফসলের দাম

পেল না। সহায় ও রহমান দেখিয়েছেন, বিটি বীজের ফসলে চাষির লাভ সাধারণ বীজের ফসলের তুলনায় অনেক কম। নিকৃষ্টতম জমি থেকে বিটি বীজের চাষে চাষির বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে।

সারণি ১২.১ সহায় ও রহমানের সমীক্ষা থেকে[২] বিটি ও সাধারণ উচ্চফলনশীল বীজে তুলনামূলক বিনিয়োগ (টাকা/প্রতি হেক্টরে)

	সাধারণ উচ্চফলনশীল	বিটি তুলা
বীজ	৪০০	১৬০০
সার	২৮০০	২৮০০
কীটনাশক	১৫৩৫	১৩১৬
মোট	৪৭৩৩	৫৭১৬

সহায় এবং রহমানের এই পর্যবেক্ষণ ২০০৪–’০৫ সালে বিটি বীজের তুলা-চাষিদের আত্মহত্যার ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিলেও পরবর্তী বেশ কিছু সমীক্ষানির্ভর বিশ্লেষণে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে।[৩] আসলে সহায় ও রহমান উল্লেখ করেছেন যে, মাহাইও-মনসান্টো কোম্পানির জোগান দেওয়া এই বিশেষ বিটি তুলা-বীজটি গুণগত মানে বাজারে লভ্য বিভিন্ন ধরনের বীজের তুলনায় নিম্ন গুণমান সম্পন্ন। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন বীজের জোগানদাতা বিভিন্ন দেশি বীজ-কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষ বীজটিকে কেন অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নটি তাঁরা তুলেছেন।

এ নারায়ণমূর্তি (২০০৬)[৪] দেখিয়েছেন, বিটি তুলার উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক বেশি ঠিকই, কিন্তু এই বীজের তুলা-চাষে উৎপাদনশীলতাও যথেষ্ট বেশি। ফলে সাধারণ উচ্চফলনশীল বীজের তুলনায় প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় থেকে উৎপাদন হয় অনেক বেশি, অর্থাৎ এই চাষ বিনিয়োগ-দক্ষ। বিটি তুলা চাষে ব্যয়ের তুলনায় লাভও অনেক বেশি থাকে বলে বিটি তুলার চাষ সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের দেশের ছোট ও ক্ষুদ্র চাষির বিটি তুলাচাষের বিপুল প্রারম্ভিক বিনিয়োগভার বহন করা সম্ভব হয় না, ফলে প্রায়শই বিটি তুলার ছোট বা প্রান্তিক চাষি বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে সেই খরচ মিটিয়ে থাকে। তাই চাষ করার পর ফসল বাজারজাত করার সময় চাষি যদি দেখে তুলার বাজার-দাম এত নীচে নেমে গেছে যে ওই দামে ফসল বিক্রি করে সে সুদ সমেত তার বিপুল ঋণ শোধ করতে পারবে না, তখন বিপদে পড়ে। অনেক সময়ে চাষিকে আত্মহত্যার পথ নিতে হয়। গম ও ধানের ক্ষেত্রে যেসব কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সহায়তায় হাইব্রিড জিন-পরিবর্তিত বীজ তৈরি করছিল, তাদের এই শর্তে গম ও ধানের বীজ আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হয় যে, বীজ আমদানির দু’বছরের মধ্যে বিদেশি কোম্পানিটি মূল বীজ বা ব্রিডার বীজ তৈরির প্রকৌশলটি এই কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। এই নতুন জিন-রূপান্তরিত বীজের বহুল ব্যবহার ভারতীয় তুলা, দানাশস্য ও সবজির বাজারে অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি করে। এই অধিক ফলনশীল বীজ দেশের বাজার থেকে দেশি সনাতন বীজ ও চারার ব্যবহার কমিয়ে হাইব্রিড শস্যের ব্যাপক ব্যবহার ঘটায়। কিন্তু এই নতুন বীজ সাধারণভাবে অধিক ফলনশীল হলেও এর থেকে ফলন অনেকসময়েই অনিশ্চিত ও

ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে এই বীজের ব্যবহার অতিরিক্ত ব্যয়বহুল, উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত সার ও জলের প্রয়োগ ছাড়া এই বীজ থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ২০০২ সালে বহুজাতিক বীজ কোম্পানি মনসান্টো ও ভারতীয় বীজ কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ভারতে হাইব্রিড বিটি তুলার উৎপাদন শুরু হয়। এই বীজের ব্যবহার অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয়বহুল কৃষি-উপকরণের ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ ছাড়াও এই বীজের পরিবেশগত ও অন্যান্য নানা কুফল নিয়ে বিভিন্ন বিপরীত পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও এর ব্যবহার সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে ও সনাতন দেশি বীজগুলি বাজার থেকে অপসারিত হয়।

২০০০ সালের প্রথম দশকে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বহুসংখ্যক তুলা-চাষির আত্মহত্যার ঘটনার পিছনে ছিল দেশের বাজারে অতিরিক্ত ব্যয়ে বিটি বীজের সাহায্যে তৈরি তুলা বিক্রি করতে না পারা। একই সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার খোলা-বাজার নীতির অনুসরণে ভারতের বাজারে ভরতুকি-যুক্ত সস্তার তুলা নিয়ে আমেরিকা প্রবেশ করে। বস্তুত ১৯৯৮-২০০৩ এর হিসাবে দেখা গেছে, আমেরিকা তুলার যে-রফতানি মূল্য ধার্য করেছিল তা সে দেশে তুলার উৎপাদন ব্যয়ের থেকে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। ভারত সরকারের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে শস্যসংগ্রহের পরিবর্তিত নীতিটি এক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। ২০০৪–০৫ সালে সরকার যে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছিল তা মহারাষ্ট্রে তুলার উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে কম ছিল। খোলা-বাজার নীতি, জিন-রূপান্তরিত বিটি বীজের বহুল ব্যবহার, চাষের ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি, সরকারি সহযোগিতা হ্রাস ও স্বল্প সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব— এইসমস্ত বিভিন্ন নীতির মিলিত প্রভাবে ভারতীয় কৃষির সংকট বাড়ে, তুলা উৎপাদক ভারতীয় কৃষকের দুর্ভোগ চরমে ওঠে ও বহুসংখ্যক তুলা চাষি আত্মহত্যা করে।

অন্যান্য শস্যের চাষে চাষির ক্ষতি

শুধু উচ্চফলনশীল বিটি তুলাই নয়, গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় কৃষি নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে যে-ধারাবাহিক পরিবর্তনের দিকে চলেছে তার সামগ্রিক ফল কৃষির পক্ষে ও ভারতীয় কৃষকের পক্ষে বিশেষ কোনও সুফল যে ফলাতে পারেনি তা আমরা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের নানা দিক আলোচনা করে দেখতে পাই। প্রথমত, গম, ধান, ইত্যাদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তির দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি-হারে স্থবিরত্ব, দ্বিতীয়ত, নতুন ধরনের সংকর বীজের সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য কৃষি-উপকরণের অত্যধিক খরচ, তৃতীয়ত, নয়া আর্থিক নীতির সামগ্রিক পরিণামে কৃষিতে ভরতুকির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি, যার প্রভাবে সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য-নীতি প্রয়োগের সময় চাষের ব্যয় যথাযথ হিসাবে এনে মূল্য স্থির না করার প্রবণতা, খোলা-বাণিজ্য নীতি ও কৃষি-উপকরণের বাণিজ্যে দেশি ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিদেশি কোম্পানির সহযোগিতায় তৈরি উপকরণ, অথবা বিদেশ থেকে আমদানি-কৃত বিপুল ভরতুকি-যুক্ত প্রযুক্তি ও পণ্যের জন্য নির্ভরতা, বিদেশি উপকরণ-বিক্রেতা কোম্পানির নতুন ভূমিকা – এসবের মিলিত প্রভাবে নতুন প্রযুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্যে চাষির অনেক সময়েই কোনও উদ্বৃত্ত থাকে না, বা ক্ষতি হয়। এইসব নতুন উপকরণের ব্যবহারে চাষে উৎপাদনশীলতা বেশি হলেও তা খরচের তুলনায় কম আয় দেয়। ফলে চাষি অনেক সময়েই তার নিজস্ব পারিবারিক খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট লাভ করতে পারে না, অথবা অনেক

সময়েই চাষে তার ক্ষতি হয়। আমরা নীচের সারণিতে ২০০৪–০৫ থেকে ২০১৬–১৭ সাল অবধি কয়েকটি রাজ্যের চাল, গম, তুলা, ও আখ চাষের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সরকারি হিসাব উপস্থিত করেছি। ভারতের গম উৎপাদক প্রতিটি রাজ্যে দশ বছরে হেক্টর-পিছু উৎপাদন-ব্যয় ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের তফাত হিসাব করে গম চাষির হেক্টর-প্রতি নিট আয় দেখেছি। আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে সরকারের 'কমিশন অন এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন অ্যান্ড কস্ট'-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। উৎপাদন-ব্যয় হিসাবের সময় আমরা কমিশনের দেওয়া C_2 হার অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদনের খরচ হিসাব করেছি। সরকারের C_2 পদ্ধতির হিসাবে কৃষি-উৎপাদনের যাবতীয় প্রকৃত খরচ ছাড়াও পারিবারিক শ্রম বাবদ খরচ বাজার-চলতি মজুরির দামে হিসাব করে মোট ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। এইভাবে উপকরণের খরচ ও চাষির নিজের পরিশ্রমের মূল্য একযোগে বাদ দিয়ে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের ওপর যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাকে চাষির নিট আয় বা লাভ হিসাবে দেখা হয়। নিট আয় বা লাভ ছাড়াও আমরা মোট ১৭টি ধান উৎপাদক রাজ্যের প্রতি টাকা উৎপাদন-মূল্য পিছু কত খরচ পড়ে তার হিসাব করার জন্য মোট উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের অনুপাতটি দেখেছি। আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় প্রতিবছরই ধান চাষ থেকে বিপুল ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য ধানের ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল, অথচ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও আলোচ্য সময়ে প্রতি বছর চাষিকে বিপুল ক্ষতি বহন করতে হয়। যে-রাজ্যগুলিতে এই কালপর্বে ধান চাষ থেকে কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত পাওয়া গেছে সেখানেও প্রায়শই উদ্বৃত্তের পরিমাণ এত কম যে তা চাষির জীবনযাত্রার খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমরা এখানে টেবিলগুলিতে কয়েকটি মাত্র বছরের তথ্য পেশ করেছি, অন্যান্য বছরের তথ্যের জন্য এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজন দেখতে হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে ধানের ক্ষেত্রে ২০১০–১১ বাদে সব বছরেই লাভ ধনাত্মক। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে ধান চাষে কিছু উদ্বৃত্ত পাওয়া গেলেও ২০১০–১১-পর থেকে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দেখা যায় যৎসামান্য। অসমে একমাত্র ২০১১–১২ সাল বাদ দিয়ে প্রতি বছরই ধান চাষ করে চাষি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিহারেও দু'-এক বছর বাদ দিয়ে প্রায় প্রতি বছরই ধান চাষ করে চাষিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে ২০০৪, '০৫, '০৬, '১১, '১৪ ও '১৫ সালে ধান চাষে চাষি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুজরাত, কর্ণাটক, পঞ্জাব ও হরিয়ানা বাদে প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই অধিকাংশ বছর ধান চাষিকে ক্ষতি বহন করতে হয়েছে।

সারণি ১২.২ ধানের উৎপাদন খরচ ও নিট আয়

রাজ্য	২০০৪–৫		২০০৭–০৮		২০১০–১১		২০১৫–১৬	
	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৬৫০.৪	০.৯১	৪৫৫১.২	০.৮৯	–৯৫.৩	১.০০	২০১৫.০	০.৯৭
অসম	–৩৪৩১.৬	১.৩১	–২৭৪.০	১.০১	–৯২৯.৯২	১.০৩	–১৫৩৭৫.৭	১.৪৪
বিহার	–৩১৪৫.৯	১.২৭	৩১১৮.৫	০.৮২	–২২৮০.২	১.১২	–১১৩২৭	১.৩৬
ছত্তীসগঢ়	–১৪১.৪	১.০৯	৩৮২০.৩	০.৮২	১৭৫৭.৯	০.৯৩	–৯৭১০.০	১.২৪
গুজরাত	–	–	৫৫৭৯.৭	০.৭৭	১২৯৩৩.০	০.৭২	৬১৩৮.৬	০.৯০
হরিয়ানা	৪০৮৫.০	০.৮৮	৩০২১৪.৩	০.৫৪	২২৮৪২.৯	০.৬৮	৬৮৮৮.১	০.৯২
ঝাড়খণ্ড	–৪৬৭০.৪	১.৫২	–৫৪৯০.২	১.৪৫	২৭৯১.১৮	০.৮৬	–৮৩৭৫.৫	১.২৭
হিমাচল প্রদেশ	–	–	–২৭৪২.৮	১.২১	–৮৮৭৬.৯	১.৭৪	–১১৬৯৩.৪	১.৪৬
কর্ণাটক	–৩০৮১.৯	১.১১	১০২৯১.৭	০.৭৫	৩৮৩৬.৯	০.৯২	১৩৯৭১.৫	০.৮৪
কেরল	–৫২৫২.৫	১.২৪	২৫৭.৯	০.৯৯	৮৬৯১.১	০.৮৩	৯৩৩৭.৯	০.৮৯
মধ্য প্রদেশ	–৩০২৩.৪	১.৩৩	–২৮৯৪.৩	১.২৬	৩৭০৮.৮	০.৮৬	–১৩০৯২.১	১.৪৩
মহারাষ্ট্র	–	–	–৬২৬৩.২	১.২৫	–১৫৩৩০.৮	১.৪৫	–২৬৭৬৯.৩	১.৫৮
ওডিশা	–৩৫৩৫.৭	১.২৪	–১১৩.৮	১.০০	–৪২৯৪.৫	১.১৬	–১৮৩৯৪.৫	১.৪৭
পঞ্জাব	১০৪৭১.৯	০.৭৫	২১২৫৬.২	০.৬২	১৫০৩৪.১	০.৭৭	২৯৮০৮.২	০.৭১
তামিলনাড়ু	–৫৪১১.৪	১.২১	১৩৭.৪৪	০.৯৯	৮.৩৯	০.৯৯	–৩৩৬৮.২১	১.০৪
উত্তরপ্রদেশ	–২২০৮.৫	১.১২	৩৮০৮.৫	০.৮৫	৪১৫৯.৮	০.৮৮	–১৫৫৭২.৭	১.৩৫
উত্তরাখণ্ড	–১০৮২.৯	১.০৬	৩৮৭৬.৭	০.৮৩	৮৩৫০.৯	০.৭৯	১১৩৩৭.৪১	০.৮০
পশ্চিমবঙ্গ	–৫৩৪৪.৯	১.২৮	–৩১৬৪.২	১.১২	–৬৪১৬.৮	১.১৭	–১৭৬৩৭.৩	১.৩২

এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজন দ্রষ্টব্য

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

গমের ক্ষেত্রে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও রাজস্থান বাদে প্রতিটি রাজ্যেরই জুটেছে ঋণাত্মক কৃষি-আয়। এমনকী গুজরাতেও গম উৎপাদনে ২০১২ সালে ঋণাত্মক কৃষি-আয় চিন্তার কারণ হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে আলোচ্য বছরগুলির প্রতিটিতেই গম উৎপাদন থেকে ঋণাত্মক আয় হয়েছে। ছত্তীসগঢ়ে মাঝে একবছর বাদে প্রতি বছরেই গম উৎপাদন থেকে ঋণাত্মক আয় হয়েছে। ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও একেবারে একইরকম। প্রতিটি রাজ্যেই হয় অধিকাংশ বছর গম চাষে চাষির ক্ষতি হয়েছে অথবা দু'/একটি বছরে যৎসামান্য লাভ হয়েছে। বিভিন্ন বছরের বিস্তৃত তথ্য এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজনে দেওয়া হয়েছে, এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি বছরের তথ্য নীচে দেওয়া হল। আখ চাষের ক্ষেত্রে অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভাল হলেও মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের আখ চাষিরা প্রায়ই আখচাষে ক্ষতির সামনে পড়েছে। ২০০৪, '০৫, '০৭, '১৪, ও '১৫ সাল এই আখ উৎপাদকদের ক্ষতি হয়েছে

কৃষি-উৎপাদনে চাষির নিট আয় ঋণাত্মক বা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে, তুলা চাষের কথা বাদ দেওয়া যায় না। আমরা ২০০৪ থেকে ২০১৪–১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন তুলা উৎপাদক রাজ্যের চাষিদের তুলা চাষে ক্ষতির ওপর তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন বছরের তথ্যের জন্য এই অধ্যায়ের সংযোজন দ্রষ্টব্য। আমরা দেখছি, অন্ধ্রে '০৫, '১২, '১৩, '১৪ ও '১৫ সালে, মহারাষ্ট্রে '০৪, '০৫, '০৬, '১২, '১৪, ও '১৫ সালে, হরিয়ানায় '০৫, '০৬, '১৪, '১৫ সালে, কর্ণাটকে '১৪ ও '১৫ সালে, মধ্যপ্রদেশে '০৪, '০৬, '১৪, '১৫ সালে, তামিলনাড়ুতে '০৪, '০৫, '১১ সালে, ওডিশাতে '১২, '১৪, '১৫ সালে, পঞ্জাবে '১৪, '১৫ সালে, এবং

তামিলনাড়ুতে ’১২ ও ’১১ সালে তুলা চাষে চাষিদের ক্ষতি হয়েছিল। নিট আয় ঋণাত্মক নয়, এমন বছরেও চাষিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ এতই কম থাকে যে, ক্ষতির বছরের লোকসান মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট হয় না। ভারতীয় চাষির আত্মহত্যার ঘটনাগুলিকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না, কারণ এই ঘটনাগুলি নয়া উদারনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত নীতি ভারতীয় কৃষিতে প্রয়োগের ফল। ভারতের অর্থনীতি তথা কৃষি-অর্থনীতি এই পরিবর্তন গ্রহণ করার অবস্থায় ছিল না। ভারতের কৃষি ছোট চাষি-নির্ভর, অসম্পূর্ণ, অনুন্নত বাজার-ব্যবস্থার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। তা এই পরিবর্তনের সামনে দাঁড়াতে পারে না। বাইরে থেকে প্রযুক্ত নীতিগুলির প্রভাবের সঙ্গে তার দুর্বল বৈশিষ্ট্যগুলির সংঘাতে ভারতের কৃষি-অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

সারণি ১২.৩ গম উৎপাদন, খরচ ও নিট আয়

রাজ্য	২০০৪–’০৫		২০০৭–’০৮		২০১০–’১১		২০১৫–’১৬	
	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/উৎপাদন মূল্য)
বিহার	–১১৬১.৮২	১.০৮	৫৬৩৮.৩	০.৭৪	২৬৫৫.০২	০.৯০	–৪৩৬৭.৭	১.১১
ছত্তীসগঢ়	–৩৭৭৯.৯	১.৪৯	–৮৮২.৮	১.০৬	–১৩৭৫.১	১.০৬	১৩৪২৭.৬	০.৭৫
গুজরাত	৪৯০৭.৬	০.৭৮	১৪৫৫৭.৬	০.৫৯	১৫৬৪৮.১	০.৬৩	–৬০৭.৭	১.০০
হরিয়ানা	১১০০.৮	০.৯৫	৯৬০১.৬	০.৭৭	১০৬৩৫.৮	০.৭৯	–১৫২৫৫.৮	১.৭৭
হিমাচল প্রদেশ	–৩২৫২.৯	১.৩১	–৫৫৪১.০	১.৩০	–৪৬৯২.৮	১.৩৫	–৪৪৪৫.৮	১.১৯
ঝাড়খণ্ড	–৬৫১৬.৬	১.৭৬	–৫৮৪২	১.৫৬	–১০১৩৬.৩	১.৭৪	–১০৮২১.৮	১.৫৭
মধ্যপ্রদেশ	৬১.৬৮	০.৯৯	৫৮৯৪.৮	০.৭৮	৮১০৫.৭	০.৭৭	২১৬৯.৪৭	০.৯৫
মহারাষ্ট্র	–	–	–	–	৪০৫১.০	০.৯০	–৫১৯০.৬	১.১১
পঞ্জাব	৩০২৯.৮	০.৮৮	১৩৬৬৯.৯	০.৭০	৭৬৩৭.০	০.৮৪	১৩৯৭৫.৬	০.৮০
রাজস্থান	৪৩৫৯.৩	০.৮১	৮৮৩০.১৮	০.৭৪	১২৯০৪.৮	০.৭১	৩৮৪০.৭	০.৯৩
উত্তরপ্রদেশ	–২৬৪১.৬	১.১৪	৭৭৪৮.৯	০.৭৬	৩৫৪৪.৯	০.৯১	–৮৪৩৭.৩৫	১.১৭
উত্তরাখণ্ড	–৪৩৩৫.৪	১.২৬	১০৫৩.৬	০.৯৫	৬১৩১.৮	০.৮৪	২১১৫.২৯	০.৯৫
পশ্চিমবঙ্গ			–২৮৮৯.৯	১.১২	–৭০৯৯.৫	১.২৩	–১৬১২৬.৯	১.৫২

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

তুলা

সারণি ১২.৪ তুলার উৎপাদন খরচ ও নিট আয়

রাজ্য	২০০৪–’০৫		২০০৭–’০৮		২০১০–’১১		২০১৫–’১৬	
	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৩২.৯	০.৯৭	১১৮৮২.৭	০.৭৭	১২৬৫১.৯	০.৭৯	–১৩৫৮২	১.২২
গুজরাত	৬৫২৯.৫	০.৭৮	১৩৬৫৬.১	০.৬৮	৪৮৪৫৪.১	০.৫২	৭২৪৩.৬	০.৯০
হরিয়ানা	৫৬৩৪.৬	০.৮২	৬১১০.৭	০.৮৫	২৫০৮৫.৬	০.৬৫	–২৭৩৮৮.৪	১.৭৬
কর্ণাটক	১৭৩৬.৭	০.৭৮	৭৪২১.১	০.৭০	২৩৫৫১.৭	০.৬০	–৩৬৬৮.৯৬	১.০৬
মধ্যপ্রদেশ	–৮১৪৫.৪	১.৬৪	২৯৮৮.৩	০.৯০	২৪১২৫.৮	০.৫৮	–২৯৪১৯.৩	১.৫৬
মহারাষ্ট্র	–২৫২৪.০	১.১৩	১৩৫২.৪	০.৯৪	১০১০১.৩	০.৮৩	–৮৬২০.৫	১.১২
ওড়িশা	–	–	–	–	১৫৭২৯.৮	০.৭১	–১২১৩৬.৪	১.২৪
পঞ্জাব	৫৮৭২.০	০.৮৫	৬৪৮৭.৯	০.৮৬	২২৭৮১.৯	০.৭২	–২৮৩৪২.৬	১.৯৪
রাজস্থান	৭৪৫৬.৫	০.৭০	১২৯৭৭.৮৪	০.৬৪	৪৯১৪৬.৫	০.৪৬	১২৫৩০.১১	০.৮৪
	–৬৬৭১.৭	১.৩১	২৫৪৭.৮	০.৯১	২২৯৮৭.৬	০.৭১	৪৪৬.২	০.৯৬

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

আখ

সারণি ১২.৫ আখের উৎপাদন খরচ ও নিট আয়

রাজ্য	২০০৪–০৫		২০০৭–০৮		২০১০–১১		২০১৫–১৬	
	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)	নিট আয় (লাভ) প্রতি হেক্টরে টাকায়	প্রতি টাকা উৎপাদন মূল্যে ব্যয় (ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য)
অন্ধ্রপ্রদেশ	১০৩৪০.৮	০.৮৩	–৩৪২২.৪	১.০৪	৩৯৩১৪.৩	০.৭৬	৩৩৪৯৯.৩	০.৮৪
হরিয়ানা	২৫১৩০.৯	০.৬৫	১০০৯১.৫	০.৮৪	৩৭৫২৭.৭	০.৬৯	–	–
কর্ণাটক	৩৩৫১৪.২	০.৬৩	২৯২৬৬.২	০.৫৯	৮৬০৭৪.৫	০.৫০	২৬৪০৫.২	০.৭৯
মহারাষ্ট্র	২৭৪৪১.২	০.৭২	–৭৫৪৩.৬	১.১১	৪৮৯৪২	০.৭২	–৭৪৭০.৩	১.০৪
তামিলনাড়ু	১৫৫২৫.৭	০.৮০	৩৪৮০৪.৫	০.৭০	৭৭৮৮৯.৪	০.৫৯	৭৬০১৩.২	০.৬৯
উত্তরপ্রদেশ	১৭৫৫০.৭	০.৬৭	১৪৫৫৯.৮	০.৭৩	৩৩৯২৮.২	০.৬৬	৫১৪৫৬.৬	০.৬৬
উত্তরাখণ্ড	২৩৩৬৯.৪	০.৫৫	২৫০৭৪.৯৬	০.৫৬	৪৮৬৬২.৭	০.৬৩	৩২১৮৪.৬	০.৭৪

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজারকে যুক্ত করার ফলে কৃষিপণ্যের দামের ওঠাপড়া ও অনিশ্চয়তা ভারতীয় কৃষকের সামনে সংকটের সূচনা করেছে। বিদেশি প্রযুক্তির উচ্চফলনশীল বীজ ও সারের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং কমিশন এজেন্টদের চাপানো অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা, কমিশন এজেন্ট-ব্যবসায়ীদের পরামর্শে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উপকরণের ব্যবহার চাষিদের ওপর প্রভূত ব্যয়ভার চাপিয়েছে। উদারনীতির সূত্র অনুযায়ী কৃষি-অর্থনীতি প্রয়োজনমাফিক সরকারি ঋণের সাহায্য পেতে পারে না। কৃষির প্রাথমিক ব্যয় বহন করার ক্ষমতা এই কৃষি-অর্থনীতির থাকে না। ফলে বেসরকারি ঋণের জন্য আবার কমিশন এজেন্ট বা মহাজনদের কাছে ধারে উপকরণ ক্রয় করতে হয়। এরপর উপযুক্ত দামে ফসল বিক্রি

করতে পারার ওপরই নির্ভর করে চাষি তার এই ঋণ শোধ করতে পারবে কি না। পণ্যের সরকারি সহায়ক মূল্যের সহযোগিতা যথাযথ না পেলে চাষির পক্ষে উপযুক্ত দামে পণ্য বিক্রি করতে পারার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক সময় পণ্যে শোধ দেওয়ার শর্তে চাষি অসংগঠিত বাজারে কৃষি-ঋণ পেয়ে থাকে, সেখানে কম দামে তাকে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে হয়। ফলে তার পরবর্তী চাষের ব্যয় ও তার নিজস্ব ভোগের ব্যয় মেটানো অনেক সময়েই খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। এইভাবে অপরিশোধিত ঋণ জমা হতে থাকে, শেষপর্যন্ত যা শোধ দেওয়া তার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এর পরবর্তী বিভিন্ন বছরে ভারতের নানা রাজ্যে চাষিদের আত্মহত্যার ঘটনাগুলির পিছনেও অনুরূপ কারণগুলি কাজ করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে তুলা, লঙ্কা, বাদাম ইত্যাদি বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন-ব্যয় ও বিশ্ব-বাজারে দামের ওঠাপড়ার সঙ্গে দেশি বাজারে দামের ওঠাপড়া চাষিদের সামনে অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সারা ভারতের শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে চাল, গম প্রভৃতি জলনির্ভর শস্যগুলির ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন ব্যয়ের কারণে ও বিশেষ করে গমের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিপুল ভরতুকি-নির্ভর সস্তার গমের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার কারণে ছোট ও মাঝারি চাষিদের বাজারে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

শস্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শস্যের উৎপাদনশীলতা ও দামের সেই অনুপাতে বৃদ্ধির অভাব মূলত চাষিদের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষতির কারণ, তবে চাষিদের আত্মহত্যার আশু কারণ হল চাষিদের ঋণগ্রস্ততা ও এই ঋণ শোধে চাষিদের অক্ষমতা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চাষির আত্মহত্যার পিছনে কারণগুলি অনুসন্ধান করে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। সৃজিত মিশ্র (২০০৬)[৫] মহারাষ্ট্রের কৃষিতে ও ঋণের বাজারে কৃষি-উপকরণ ও পণ্য ব্যবসায়ীর একই সঙ্গে ঋণ, পণ্য ও উপকরণ জোগানদারের ভূমিকায় নামার উল্লেখ করেছেন। চাষের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে চাষিকে চাষ শুরুর সময়ে কমিশন এজেন্ট ও পণ্যের ও উপকরণের যুগ্ম বাজারে নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাকা ব্যবসায়ী-মহাজনের ওপর ঋণের ও ব্যয়বহুল কৃষি উপকরণের জন্য নির্ভর করতে হয়। সরকারি সহযোগিতায় সস্তায় উপকরণ পাওয়ার সুবিধা উদারনীতির চাপে সংকুচিত হয়ে উঠেছে বলেই এই সব উপকরণের জোগানে ব্যবসায়ী-মহাজন-কমিশন এজেন্টদের ব্যাপক প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। যখন টাকায় ঋণশোধের শর্ত থাকে তখন অত্যুচ্চ হারে সুদ চাপানো হয়। এর পাশাপাশি অনেক সময়েই কৃষি-উপকরণ জোগানোর বিপরীতে কৃষিপণ্য ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ঋণের অর্থমূল্য হিসাবের সময় উপকরণের দামের ওপর জোগানদাতার একচেটিয়া সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকে। পণ্যের দাম ঠিক করার সময় ফসল ওঠার পরেই ফসলের বাজারে যে কম দাম থাকে সেই দামের হিসাবে ঋণশোধের জন্য ফসলের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ফলে ফসল ওঠার পর চাষি যদি দেখে আশানুরূপ হারে ফসল পাওয়া গেল না, তখনই ঋণগ্রস্ত চাষি সংকটে পড়ে। তার পক্ষে ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জমে থাকা বিপুল ঋণের কারণে তখন চাষির সামনে আত্মহত্যার পথ ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। অনিতা গিল (২০০৪)[৬] পঞ্জাবের কৃষির ওপর একটি জোত-স্তর সমীক্ষার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কৃষি-ঋণের বাজারে অনুরূপ পণ্য ও উপকরণ-বাজারের সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন। পাতিয়ালা ও অমৃতসরের কৃষিতে কৃষক ও জমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর এই অনুসন্ধানটি থেকে দেখা যায়, জমিহীন কৃষি-শ্রমিকরা বছরের যে-সময়ে যথেষ্ট কৃষিকাজ থাকে না সে সময়ে ঋণের জন্য জমির মালিক ও কমিশন এজেন্টদের ওপর নির্ভর করে। জমির

মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ তারা ব্যস্ত মরশুমে কম মজুরিতে শ্রমের বিনিময়ে শোধ করে। জমির মালিকরা ঋণশোধের জন্য অনেক সময়ে জমি বন্ধকি হিসেবে রেখে বড় চাষির কাছে ঋণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে সুদ সমেত ঋণ শোধ করতে না পারার জন্য ছোট চাষির জমি বড় মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হয়। পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাবার্ডের চেয়ার ইউনিটের তরফে পঞ্জাবের তুলা চাষ এলাকার ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল '৯৮–'৯৯ সালে, তা থেকে পঞ্জাবের তুলা-চাষিদের ঋণগ্রস্ততার খবর পাওয়া যায়। পঞ্জাবের তুলা চাষে উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং মুনাফার নিম্নগতি পঞ্জাবের চাষিদের বিপুল ঋণগ্রস্ততার দিকে নিয়ে যায়। ২০০৬ সালের একটি সরকারি সমীক্ষা থেকে বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে পঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে আত্মহত্যার তথ্য সামনে আসে। ২০০০ সালের প্রথম দশকে কৃষক সংগঠন ভারতীয় কিসান ইউনিয়ন জানায় যে, পঞ্জাবে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ১৩০০০ কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে পি নরসিমা রাও ও কে সি সুরি (২০০৬) তাঁদের সমীক্ষায় কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাগুলির দীর্ঘকালীন ও আশু কারণ খুঁজেছেন। ভি শ্রীধর অনুরূপ গ্রাম-সমীক্ষায় একইরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কৃষিতে নয়া আর্থিক নীতিগুচ্ছের প্রয়োগের ফলে শুধু যে কৃষিপণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে কৃষকের আয়ে অনিশ্চয়তা এনেছে তাই নয়, এই নীতি প্রয়োগের অর্থ কৃষিতে সরকারি সহায়তা হ্রাস। কৃষিপণ্যের দামের অস্থিরতা ও কখনও কখনও তার নিম্ন গতি চাষিকে যে-অসহায়তার মধ্যে ফেলে, তা থেকে তাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সরকারি সহায়ক মূল্যের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। কৃষি-উপকরণের ওপর, বিশেষ করে সারের ওপর, ভরতুকি কমানোর ফলে সেসবের বর্ধিত ব্যয়ভার বহনে সরকারি সাহায্যের জরুরি ভূমিকা খাটো হয়েছে।

কেরালার কফি, রাবার, মশলা ইত্যাদির উৎপাদকদেরও একই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এইসব রফতানি পণ্যের উৎপাদকদের আয়ের অনিশ্চয়তাও জুড়ে গেছে বিশ্ব-বাজারের দামের ওঠানামার সঙ্গে। তাদেরও প্রতি বছরই ঝুঁকির সঙ্গে মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে (এস মহাননকুমার ও আর কে শর্মা, ২০০৬), এই অবস্থায় চাষিকে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। চাষিদের আত্মহত্যার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশি ঘটেছে। প্রধানত আলু-চাষিদের এই অবস্থায় পড়তে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত কালীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের সমীক্ষা (২০১৭) দ্রষ্টব্য।[৭]

কৃষির এই সংকটের পরিণামে কৃষিকাজ ছেড়ে কৃষির সঙ্গে যুক্ত বা অ-কৃষি অসংগঠিত কাজকর্মে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কৃষির এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০-পরবর্তী, বিশেষ করে ২০০০ সালের পরবর্তী নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তাবিত নীতিগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। রূপান্তরিত সংকর বীজ ব্যবহারের নানা কুফল নিয়ে অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিদ-গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় কৃষির এই সংকট ভারতীয় অর্থনীতিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সামনে নিয়ে আসে। প্রথমত, পণ্যের উৎপাদনে আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন বিভাজন ও বিশেষীকরণ। চাল, গম, তুলার মতো সনাতন ভারী ও কম মূল্যের খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমানো, শস্যকণা উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে জমিকে ফল, সবজির মতো হালকা ও বেশি মূল্যের পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা। সেইসঙ্গে যোগ করতে হবে

আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি উন্নত রফতানিকারক দেশগুলির দ্বারা চাল-গমের মতো পণ্য উৎপাদনের বিশেষীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবাধে এইসব পণ্য সরবরাহ। এর ফলে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি আরও রফতানি-মুখী ও আরও আমদানি-নির্ভর হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি অসংগঠিত ঋণদাতা ক্ষেত্রগুলির প্রাধান্য (অর্থাৎ গ্রামীণ মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অসংগঠিত ঋণদাতা ক্ষেত্রগুলির প্রাধান্য কমিয়ে) সরকারি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের জায়গায় বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে চুক্তি-চাষ মারফত একই সঙ্গে ঋণের, কৃষি উপকরণের ও কৃষি পণ্যের বাজারের এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ চলে আসা। এবং একইসঙ্গে বিশ্ব-বাজারে ভারতীয় প্রক্রিয়াজাত ফল-সবজির রফতানি-মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। ভারতীয় কৃষিকে উজ্জীবিত করার এটাই বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত পথ, যে-পথ অনুসরণ করে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। তার আগে এই অধ্যায়ে আমরা গত দু'-দশকে চাল, গম, তুলা ইত্যাদি সনাতন অধিক জল-নির্ভর ভারতীয় কৃষি উৎপাদনের সংকট, ভারতীয় চাষিদের আত্মহত্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও এই বিষয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা করে নিলাম।

বিভিন্ন কৃষি-পণ্য উৎপাদনের দীর্ঘকালীন হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্যের (সংযোজন অংশে উপস্থাপিত) ভিত্তিতে বিশ্বায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় কৃষি কতটা তার দীর্ঘকালীন স্থবিরত্ব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষিপণ্যের দামের ও ভারতীয় কৃষকের আয়ের দ্রুত ওঠানামা, কৃষকের কৃষিকাজের জায়গায় অ-কৃষি, অসংগঠিত ছোট সংস্থায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতার বৃদ্ধি, মোট জনসংখ্যায় কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের শতাংশের পরিবর্তন, গ্রামীণ অ-কৃষি অসংগঠিত সংস্থায় মানুষের নিযুক্তির বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ হারের হ্রাস, কৃষিপণ্যের দামের সময়ভিত্তিক প্রবণতা ও আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে তুলনা, বিভিন্ন জোতের চাষি পরিবারের আয় ও ভোগ, দারিদ্র, ঋণগ্রস্ততা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমরা আলোচনা করেছি, কৃষিক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি ভারতীয় কৃষি সংক্রান্ত সরকারি নীতিগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে ও কতটা বাস্তবে প্রযুক্ত হয়েছে। এটি দেখার জন্য প্রথমত আমরা আলোচনা করেছি ভারতীয় অর্থনীতি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে কতটা রফতানি অভিমুখী ও আমদানি-নির্ভর হয়ে উঠেছে। রফতানি ও আমদানি পণ্যগুলির ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এ ক্ষেত্রে শস্যবৈচিত্রের মাত্রাবৃদ্ধির প্রভাব কতটা। দ্বিতীয়ত, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও চুক্তিচাষের কতটা প্রসার ঘটেছে ও চুক্তি-চাষের ফলে ঋণ, কৃষি-উপকরণ ও কৃষিপণ্যের বাজার কতটা প্রভাবিত হয়েছে।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষিতে শস্যবৈচিত্র, এর নানা দিক, কৃষি-আয়ের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. Sahai, S., Shakeelur Rahaman. 2003. “Performance of Bt cotton.” *Economic and Political Weekly*. (26th July).

২. তদেব

৩. A G bai forum

৪. Narayanamoorthy, A. and S S Kalamkar. 2006. “Is Bt Cotton Cultivation Economically Viable for Indian Farmers? An Empirical analysis.” *Economic and Political Weekly*. (30th June, 2006).

৫. Mishra, Srijit. 2006. “Farmers’ Suicides in Maharashtra.” *Economic and Political Weekly* (22nd April, 2006).

৬. Gill, Anita. 2004. “Interlinked Agrarian Credit markets.” *Economic and Political Weekly.* (14th August, 2004).

৭. Chattopadhyay, Kali Shankar. 2017. *Farmer Suicides in West Bengal.* Agro-Economic Research Centre, Visva-Bharati. GOI.

সংযোজন

সারণি এ-১ ধান

রাজ্য	২০১২–১৩		২০১৩–১৪		২০১৪–১৫		২০১৫–১৬	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৮৩০.৫৮	০.৮৮	৫১৩৮.০১	০.৯৩	৫৬৮.৮	০.৯৯	২০১৫.০	০.৯৭
অসম	–১১০৮৮.৩	১.৪৬	–৮৭০০.১	১.২৭	–১৫৬৯৫.১	১.৪৫	–১৫৩৭৫.৭	১.৪৪
বিহার	–৬৯৫২.৬	১.২৯	–৬১৪৪.৯	১.২২	–৪৯৯৬.৬	১.১৪	–১১৩২৭	১.৩৬
ছত্তীসগঢ়	৩৮৫৪.৪	০.৮৯	৫৬৬	০.৯৮	–৪৭৩৭.১	১.১	–৯৭১০.০	১.২৪
গুজরাত	–১৪২১.৫	১.০৩	১০৫৮৯.৯	০.৮২	৫৫০৮.১	০.৯১	৬১৩৮.৬	০.৯০
হরিয়ানা	২৫৫১৭.৬	০.৬৯	৫৪৪৬০.৬	০.৫৫	৩৮৫৮৩.২	০.৬৭	৬৮৮৮.১	০.৯২
ঝাড়খণ্ড	–৩০৯৬.৫	১.১৩	–৪৫৭১.৯	১.১৭	–২৫৮০.৩	১.০৭	–৮৩৭৫.৫	১.২৭
হিমাচল প্রদেশ	–১২৯৫৬	১.৮১	–৭৬২৪.২	১.৩৭	–৪৫১১.৮	১.১৩	–১১৬৯৩.৪	১.৪৬
কর্ণাটক	১২৩০১.৬	০.৮৩	১৮১৫৪.০	০.৭৭	৮১৭৬.৯	০.৮৯	১৩৯৭১.৫	০.৮৪
কেরল	১৫৩৬৪.৮	০.৭৯	১৭৪০১.৪	০.৭৯	৮৮৩৬.৬	০.৮৯	৯৩৩৭.৯	০.৮৯
মধ্য প্রদেশ	৬৬০২.৫	০.৮৪	৯৭৩৬.৯	০.৮০	–৮৬৭৫.৭	১.২৬	–১৩০৯২.১	১.৪৩
মহারাষ্ট্র	–৫৫৯৬.৭	১.১১	–৩৩১৭.৯	১.০৬	–২৬২৮৮.৭	১.৬২	–২৬৭৬৯.৩	১.৫৮
ওড়িশা	–৭৮৯১.৭	১.২২	–১৪৪৫৮	১.৪৫	–১৪২৪৮.৮	১.৩৩	–১৮৩৯৪.৫	১.৪৭
পঞ্জাব	২৬২৯৫.৬	০.৭১	২৯৮৭১.৮২	০.৬৯	৩৩০০১.২২	০.৬৮	২৯৮০৮.২	০.৭১
তামিলনাড়ু	৭১০৮.৭	০.৯০	২৮৯৬	০.৯৬	–২৬৭১.০৭	১.০৩	–৩৩৬৮.২১	১.০৪
উত্তরপ্রদেশ	৪৮৯৬.৭	০.৮৯	১৩৭৯৬.৭	০.৭৬	–১২১৩১.৯	১.২৫	–১৫৫৭২.৭	১.৩৫
উত্তরাখণ্ড	–৫৩৪৯.০	১.১৩	১২৭৩৬.২	০.৭৭	১২৬১০.৮	০.৭৮	১১৩৩৭.৪১	০.৮০
পশ্চিমবঙ্গ	–১৩৩২০	১.৩১	–১০৪১৫.২	১.২০	–২০০২৮.২	১.৩৮	–১৭৬৩৭.৩	১.৩২

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি এ-২(ক) গম

রাজ্য	২০০৮–০৯		২০০৯–১০		২০১০–১১		২০১১–১২	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
বিহার	৩৯০৩.৫	০.৮৩	১৬৭০.৪	০.৯২	২৬৫৫.০২	০.৯০	–১০৩১.২	১.০৪
ছত্তীসগঢ়	–১২২৩.৪	১.০৭	–৪৬৬৪.৬	১.৩৫	–১৩৭৫.১	১.০৬	–২৩২৪.৩	১.১১
গুজরাত	৯৮০৬.৭	০.৬৯	১৬৮৯৯.৪	০.৬১	১৫৬৪৮.১	০.৬৩	১২১৫৭.০	০.৭৩
হরিয়ানা	১১৮৩৮.৭	০.৭৫	৩০৯৭.৪	০.৯৩	১০৬৩৫.৮	০.৭৯	১৪১২২.৪	০.৭৮
হিমাচল প্রদেশ	–৫৩৩৭.৪৩	১.৫৭	–৬১৭৮.৪	১.৬২	–৪৬৯২.৮	১.৩৫	–৭০৪৩.৮	১.৪৭
ঝাড়খণ্ড	–৭০৭৮.০	১.৫৪	–৭১০২.১	১.৪৬	–১০১৩৬.৩	১.৭৪	১৩৩১.৫৬	০.৯৪
মধ্য প্রদেশ	৪৫৬৩.৫	০.৮৩	৬৯৭১.৭	০.৭৭	৮১০৫.৭	০.৭৭	১০৫৭৯.০	০.৭৫
মহারাষ্ট্র	–১৮৫৯.৩	১.০৬	–৩১৫.৬	১.০০	৪০৫১.০	০.৯০	১১২০.২	০.৯৭
পঞ্জাব	৮২২৫.৩	০.৮১	৭০২৬.০	০.৮৪	৭৬৩৭.০	০.৮৪	১৪২৯৩.৭	০.৭৭
রাজস্থান	১১০৭২.৬	০.৭২	৯১৭৭.৪৫	০.৭৭	১২৯০৪.৮	০.৭১	৯৯৫৮.৭৮	০.৮০
উত্তরপ্রদেশ	৩১৯৩.০১	০.৯০	৭৭৩.৮৮	০.৯৭	৩৫৪৪.৯	০.৯১	৪৫৯.৭১	০.৯৮
উত্তরাখণ্ড	১৪২৩২.০৮	০.৬৬	৮৮০.০৫	০.৯৭	৬১৩১.৮	০.৮৪	–৩১১৩.৮	১.১০
পশ্চিমবঙ্গ	–৬৩৩২.৩	১.৩০	–৫১৭৭.৪	১.১৯	–৭০৯৯.৫	১.২৩	–১২০৪১.২	১.৪২

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি এ-২(খ) গম

রাজ্য	২০১২–১৩		২০১৩–১৪		২০১৪–১৫		২০১৫–১৬	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
বিহার	৩৭৯০.৫	০.৮৮	৬৪২১.৫	০.৮৩	–৫১৬৫.৮	১.১৪	–৪৩৬৭.৭	১.১১
ছত্তীসগঢ়	–২৫২১.৩	১.১০	–৭২০৬.৬	১.৩২	৭৯১৯.৪	০.৮৪	১৩৪২৭.৬	০.৭৫
গুজরাত	১১৪৬৭.১	০.৭৭	১৫২৬১.১	০.৭৪	–৩৩৮২.৭	১.০৫	–৬০৭.৭	১.০০
হরিয়ানা	২৪৩৫.১	০.৯৫	৩৫৪৩.৭	০.৯৪	–১৩১৬৪.৩	১.৬৩	–১৫২৫৫.৮	১.৭৭
হিমাচল প্রদেশ	–৭৮১৩.৪	১.৪৩	–৮১৯৪.০	১.৩৬	–৯৭৪৬.১৫	১.৫১	–৪৪৪৫.৮	১.১৯
ঝাড়খণ্ড	৩০১৭.৮	১.৪৩	৩২৯৫.৫	০.৮৯	–১১৬৪৩.৩	১.৭৪	–১০৮২১.৮	১.৫৭
মধ্য প্রদেশ	১০৬৬৬.৩	০.৭৭	৯১২৭.০	০.৮০	২৪৬৮.৭	০.৯৪	২১৬৯.৪৭	০.৯৫
মহারাষ্ট্র	১৪৫৪.৬২	০.৯৬	৯৮৪.১	০.৯৭	–৪৯৪৫.৪	১.১২	–৫১৯০.৬	১.১১
পঞ্জাব	১২৮৭২.৫	০.৭৯	১৫৫৪৪.৫	০.৭৭	৯৬০৯.২	০.৮৪	১৩৯৭৫.৬	০.৮০
রাজস্থান	১৪২০৪.৮	০.৭৬	১০৯০৯.৬	০.৮২	৫৩১.৭৭	০.৯৮	৩৮৪০.৭	০.৯৩
উত্তরপ্রদেশ	৮৯৮.২	০.৯৭	১৮৬৭.৫	০.৯৬	–১৫৬৫৪	১.৪৪	–৮৪৩৭.৩৫	১.১৭
উত্তরাখণ্ড	–১১৫.৯	১.০০	১৮৪০.৯	০.৯৪	–২৮৬৫.৬	১.০৮	২১১৫.২৯	০.৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	–৭৫০৪.৮	১.২১	–৫৪৭০.০	১.১৩	১২৮৪৩.৬	১.৩২	–১৬১২৬.৯	১.৫২

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি এ-৩(ক) তুলা

রাজ্য	২০০৮–০৯		২০০৯–১০		২০১০–১১		২০১১–১২	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৬৭২.৮	০.৯২	৮৯০৯.৫	০.৮২	১২৬৫১.৯	—	৪৪৭৯.৩	০.৯৩
গুজরাত	১৩৪২৬.১	০.৭৫	১৭৯৫৮.৮	০.৭০	৪৮৪৫৪.১	—	১৯৯২৭.০	০.৭৪
হরিয়ানা	১৫৫১৫.৪	০.৭৩	৮৮৪১.৭	০.৮৪	২৫০৮৫.৬	—	১২০৯৩.০	০.৮৩
কর্ণাটক	২৩৬৯.৬	০.৯০	৫১৩৭.৪	০.৮১	২৩৫৫১.৭	—	১২৭৬০.৭	০.৭৭
মধ্য প্রদেশ	৯৫০৫.৭	০.৭৫	৯৯৮৮.৫	০.৭২	২৪১২৫.৮	—	২২৭০১.৬	০.৬৪
মহারাষ্ট্র	১৫৩২.৬	০.৯৫	৩৯৩২.৪	০.৯০	১০১০১.৩	—	–৬৫৩.৫১	১.০১
ওড়িশা	৩১৩১.৬	০.৮৯	৮২০৯.৩	০.৭৮	১৫৭২৯.৮	—	৬৭৮.১৪	০.৯৮
পঞ্জাব	১৬৬৯৭.২	০.৭৫	১০৮০৭.৩	০.৮৩	২২৭৮১.৯	—	১৭২৭.৫	০.৯৭
রাজস্থান	১২৮৯৮.৭	০.৬৬	২৩৯০৫.০	০.৬০	৪৯১৪৬.৫	—	৩৬১১৯.২১	০.৬০
তামিলনাড়ু	৪৯৯১	০.৮৯	৮২৩৭.৩	০.৮৫	২২৯৮৭.৬	—	–৩৯০৪.৫	১.১৭

সারণি এ-৩(খ) তুলা

রাজ্য	২০১২–১৩		২০১৩–১৪		২০১৪–১৫		২০১৫–১৬	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	–৬৮৯৫.৫	১.১০	–১৭৭৬.১	১.০২	–১৩৮৮৭.৪	১.২১	—	—
গুজরাত	–৯৩.৮	১.০১০	৩৪৯৭৯.০	০.৬৬	৫২৫৫.৮	০.৯৩	—	—
হরিয়ানা	৩২৪৮.৮	০.৯৫	১০৬৭২.৩	০.৮৬	–২০৯২২.৪	১.৪৭	—	—
কর্ণাটক	৭৫৪৬.'৮	০.৮৫	২৫০০৯.৫	০.৬৮	–২২৮০.৯৯	১.০৪	—	—
মধ্য প্রদেশ	১৬৮২৭.৫	০.৭১	১২৯২৪.৬	০.৭৭	–২৯৫৩৩.৩	১.৬২	—	—
মহারাষ্ট্র	–২৪৮৫.২	১.০৩	৮৮৭৯.৮	০.৮৯	–১২১৯২.৭	১.২০	—	—
ওড়িশা	–২৯৪২.২	১.০৬	–২৭৬৮.০৩	১.০৫	–১৬৫১২.৩	১.৫৯	—	—
পঞ্জাব	৩০৮৯.৬	০.৯৫	১৩৮৯৭.৫	০.৮৪	–১৬৫৯.৮	১.০২	—	—
রাজস্থান	৩৫৯৭২.২	০.৬১	৩০৫১৮.১	০.৭০	৯৬৭৮.৪	০.৮৭	—	—
তামিলনাড়ু	–৯৩০৪	১.১৮	–২৯৩২.২	১.০৪	৬৪১৪.৩	০.৯৩	—	—

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি এ-৪(ক) আখ

রাজ্য	২০০৮–০৯		২০০৯–১০		২০১০–১১		২০১১–১২	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/ উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩২২৩.৮	০.৮৭	৪২৮৪৮.৬	০.৫০	—	—	১৫৬৬৩.২	০.৮৮
হরিয়ানা	৩০৫৯৯.৯	০.৫৯	৮৬৮৫৬.৭	.৫০	—	—	৩৯৬১৬.৯	০.৭৩
কর্ণাটক	৪৫২৬৬.৫	০.৬৫	১১৩৫৫৩.১	০.৪৪	—	—	৪৯৩৯৩.৭	০.৬৫
মহারাষ্ট্র	৪৫১১.৫	০.৯৫	৮৫১৩৮	০.৫৯	—	—	৪৪৯৬৪.৪	০.৭৬
তামিলনাড়ু	৩১৮২৩.৫	০.৭৩	৬৬১০৩.৭	০.৫৯	—	—	৬৯৩৭৩.৭	০.৬৫
উত্তরপ্রদেশ	১৪১১১.০৯	০.৭৬	৭১৮৭৭.৯	০.৪৩	—	—	৪৭৭০২.৬৯	০.৬২
উত্তরাখণ্ড	২১৫২৭.৪	০.৭১	৮২০৯৪.৭	০.৪৬	—	—	৩৭০০৪.৫	০.৬৪

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি এ-৪(খ) আখ

রাজ্য	২০১২–১৩		২০১৩–১৪		২০১৪–১৫		২০১৫–১৬	
	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য	আয়	ব্যয়/উৎপাদন মূল্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৯৯৮৯.৭৩	০.৬৯	৫৮৬১৫.৬	০.৬৪	১৪৪৬৫.১	০.৯১	–	–
হরিয়ানা	৪৭৭৬৪.৭	০.৬৯	৪৯৯৪২.২	০.৬৯	–	–	–	–
কর্ণাটক	৭৭৫৯১.৭	০.৫৫	৬৪৬৮২.৬	০.৬৩	৪০৫৪৬.৯	০.৭৪	–	–
মহারাষ্ট্র	৮৩৭২৩.৩	০.৬৬	৬৬৫৮৯	০.৭১	–৬০২০.৭	১.০৩	–	–
তামিলনাড়ু	৭৬০২২.২	০.৬৭	৭৯৫৯৩.৪	০.৬৬	৬৪৫৬৯.৮	০.৭১	–	–
উত্তরপ্রদেশ	৫৬৭০৯.৫	০.৬০	৫১৪১২.৩	০.৬২	৫৮৩৯৬.৭	০.৬২	–	–
উত্তরাখণ্ড	৬২০৯৫.২	০.৫২	৪০৯৪২.৩	০.৬৫	৬৭৬৭০.৫	০.৫৭	–	–

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শস্যবৈচিত্র ও চুক্তি-চাষ, খাদ্য অনিশ্চয়তা ও পৌষ্টিক দারিদ্র

সনাতন খাদ্যশস্য-নির্ভরতার সমস্যা

গত প্রায় তিন দশক ধরে ভারতীয় কৃষি একটা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বাধানিষেধগুলি অপসৃত প্রায়। উন্নত দেশগুলি তাদের দেশের বাজারকে উন্নয়নশীল দেশের রফতানি-বাজার হিসেবে উন্মুক্ত করতে উৎসাহী না হলেও উন্নয়নশীল দেশের রফতানি এবং আমদানির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ভরতুকি হ্রাস, কৃষিতে পুঁজিগঠনের কাজে ও কৃষির উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি ব্যয় হ্রাস, ফান্ড-ব্যাংকের নির্দেশে বেসরকারি কোম্পানি ও বহুজাতিক সংস্থার কৃষি-উপকরণ শিল্পে অনুপ্রবেশ, এই সমস্ত পরিবর্তনের সংযোগে কৃষি-উপকরণের দাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি, ভরতুকি হ্রাস ছাড়াও, সার উৎপাদন-শিল্পের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়া, এবং অত্যন্ত দুর্মূল্য বীজ কেনার ওপর নির্ভরতা কৃষি-উপকরণের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়ে তুলেছে। পুঁজিগঠনের সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস যদিও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছে কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ পরস্পরের পরিপূরক। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারি বিনিয়োগের অভাবে বেসরকারি বিনিয়োগের মাত্রা কম থাকে। সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসের ক্ষতিকারক প্রভাব সবচেয়ে বেশি বোঝা যায় স্থির পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে। স্থির পুঁজিগঠনে সরকারি ব্যয় হ্রাসের ফলে বড় সেচ প্রকল্পগুলি শুরু হতে পারে না, বা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ১৯৮১—'৮৫ সালে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিগঠনের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩.১ ভাগ থেকে ১৯৯১—২০০২ সালের মধ্যে শতকরা ১.৬ ভাগে নেমে আসে। এই পর্বে কৃষিতে মোট পুঁজিগঠনের শতকরা অংশ হিসেবে স্থির পুঁজিগঠনের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে নেমে যায়। ফলে এইসময়ে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির হারও কমে। উপরন্তু স্থির পুঁজিগঠনে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসের কারণে বেসরকারি সেচ ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা সেচের জলকে দুর্মূল্য করে তোলে। এর নিট ফল এই হয় যে, অধিক জলনির্ভর সনাতন খাদ্যশস্যকেন্দ্রিক কৃষিব্যবস্থা সংকটের মধ্যে পড়ে। জলনির্ভর সনাতন খাদ্যশস্যকেন্দ্রিক কৃষিতে প্রতি একক বিনিয়োগ থেকে আয় কমে আসে। এবং কখনও কখনও দেখা যায় নিট আয় ঋণাত্মক। একটি ক্ষুদ্র ও ছোট জোত অধ্যুষিত কৃষি-অর্থনীতিতে যেখানে বহুদিন ধরে অধিক সার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে এসেছে এবং প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন অত্যন্ত কম, সেখানে এই ধরনের অতি উচ্চ উৎপাদন-ব্যয় কৃষিকে অর্থনৈতিকভাবে অচল করে দেয়। আমরা দেখেছি এমনকী পঞ্জাবের মতো রাজ্যে, যেখানে সবুজ বিপ্লবের

প্রযুক্তি সবচেয়ে সফলভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানেও উৎপাদন-হার কমেছে, চাষের ব্যয় অতিরিক্ত বেড়েছে, চাষির পক্ষে উৎপাদন অলাভজনক হয়ে উঠেছে, ফলে চাষিকে প্রাথমিক মূলধনের জন্য ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অপ্রতুলতা চাষিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করে, কৃষি উপকরণ-বিক্রেতা বহুজাতিক সংস্থার দেশি এজেন্ট যারা ঋণ, উপকরণ ও পণ্যের বাজারে যুক্ত বাজার-ব্যবস্থা চালু করে এবং উপকরণের বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, চাষিরা তাদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

ভারতের কৃষিকে এই স্থবিরত্বের অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে কৃষিকে অতিরিক্ত মাত্রায় রাসায়নিক সার-নির্ভর প্রযুক্তি থেকে মুক্ত করে সেখানে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর প্রকৌশলের প্রয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, জৈবপ্রযুক্তি-নির্ভর প্রকৌশলের উদ্ভাবনে বহুজাতিক সংস্থাগুলিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ভারতের কৃষি-প্রযুক্তি ও উপকরণের বাজারে এই বহুজাতিক সংস্থার এজেন্টরা পেটেন্টের সাহায্যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। মনসান্টো কোম্পানি এই ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি বিদেশি কোম্পানি যারা নতুন জৈব বীজ বিষয়ে এদেশের জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এদেশে জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণারত বেসরকারি কোম্পানিগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করা আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি জোগানদাতা কোম্পানির সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় নতুন বীজ নির্মাণ করে। এই বীজের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এবং এই বীজের ওপর নির্ভরতা চাষিদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। চাষিদের দুর্দশার দ্বিতীয় কারণ হল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে খোলা-বাজার নীতিটির যথাযথ প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা। এর ফলে সরকারি রেশন ব্যবস্থা ও সরকারের তরফে পারিবারিক শ্রমের দামের ওপর খানিকটা উদ্বৃত্ত বজায় রেখে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করা ও সেই মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহের যে-ব্যবস্থা এতদিন চালু ছিল তা বেশ কিছুটা অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে অধিক ব্যয়ে উৎপাদিত চাল, গম, তুলার বিক্রি এবং দাম অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। চাষিদের দুর্দশার তৃতীয় কারণ হল, বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত বহির্বাণিজ্যে খোলা-বাজার নীতির কারণে ব্যয়বহুল আধুনিক প্রযুক্তিতে তুলা বা গমের মতো যে-সনাতন পণ্যগুলি ভারতে উৎপন্ন হচ্ছে তা আমাদের বাজারেই বিদেশ থেকে আমদানি করা ভরতুকি-যুক্ত সস্তার পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভাবিত নতুন সরকারি নীতি প্রয়োগের পরিণামে সনাতন খাদ্যশস্য যেগুলিতে ভারত এতকাল তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল এখন সেই পণ্যগুলিতেই তারা প্রতিযোগিতায় হটে যায়। চাষিদের পণ্যগুলি অবিক্রীত পড়ে থাকে। চাষের খরচ মেটাবার জন্য নেওয়া ঋণ সুদে-মূলে মেটাতে না পেরে তারা অনেকসময়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। গমের মতো অধিক জলনির্ভর পণ্য উৎপাদকরা বিশেষভাবে দুর্দশায় পড়ে। তার কারণ, দীর্ঘদিন সবুজ বিপ্লব-প্রযুক্তি কাজে লাগাতে গিয়ে ভূগর্ভস্থিত জল পরিমাণে তুলে ফেলা হয়েছে, জলের খরচ বেড়েছে, ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও অতিরিক্ত অত্যধিক বেড়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, ভারতীয় চাষির আত্মহত্যার ঘটনাগুলিকে কয়েকটি স্থানীয়, তাৎক্ষণিক, বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না। এই ঘটনাগুলির মূল রয়েছে নতুন নীতিগুচ্ছের প্রভাবে ভারতীয় কৃষির বর্তমান অবস্থার মধ্যে। প্রথমত কৃষি-উৎপাদনে ও উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে এবং আমদানি ও রফতানিতে পরিমাণগত ও অন্যান্য দিকের পরিবর্তনে সংস্কারের প্রভাব। দ্বিতীয়ত, এইসব উপকরণের দাম ও

উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন, বিভিন্ন মাপের জোতে চাষে যুক্ত চাষিদের ওপর এই দাম বৃদ্ধির প্রভাব, সরকারের তরফে উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস ও বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি। এইসব বিষয়ে সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন গবেষকের পর্যবেক্ষণনির্ভর আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, ভারতীয় কৃষিতে বিভিন্ন নীতির প্রয়োগ তাকে পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুক্ত করতে পারেনি। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটায়, কৃষিপণ্য আরও বেশি রফতানিমুখী হওয়ায় যেমন কৃষি-উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, তেমনই কৃষিপণ্যের দামের অনিশ্চয়তা, অত্যধিক উৎপাদন-ব্যয় দেশের বাজারে আমদানি করা ভরতুকি-যুক্ত পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পড়ছে। সরকার তার সহায়ক মূল্যের নীতিটি উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, কৃষিপণ্য, কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-ঋণের বাজারের যুগ্ম কার্যকারিতার ফলে কৃষি-উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষেত্র থেকে অনুৎপাদক ক্ষেত্রে সরে যাচ্ছে। এইরকম বিভিন্ন পশ্চাদগামী প্রক্রিয়ার সমাবেশ কৃষি-উৎপাদনকে দীর্ঘকালীন স্থবিরত্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিকে তার দীর্ঘস্থায়ী জাড্য থেকে মুক্ত করার উপায় হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদল ভারতের কৃষিকে সনাতন, অধিক জলনির্ভর শস্যগুলির উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে হালকা, অধিক মূল্যের ফল, সবজি ইত্যাদি চাষের মাধ্যমে শস্যবৈচিত্র বাড়ানোর পরামর্শ দেয়। সেই অনুযায়ী এই শতাব্দীর শুরুতে কৃষি-অর্থনীতির কয়েকজন পর্যবেক্ষক দ্বারা প্রস্তাবিত এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সমর্থিত তিনটি বিশেষ পরামর্শ (বিশ্বব্যাংক ২০০৫)[১] সামনে আসে। এই তিনটি প্রস্তাবিত নতুন নীতি হল: প্রথমত, কৃষিতে শস্যবৈচিত্র প্রসারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে, যার অর্থ ভারতীয় কৃষিকে সনাতন খাদ্যশস্যে কেন্দ্রীভূত অবস্থান থেকে সরে ফল-সবজি, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদনে বেশি মনোযোগী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কৃষিকে রাসায়নিক সার-নির্ভর প্রযুক্তি থেকে সরে গিয়ে জৈবপ্রযুক্তি-নির্ভর সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার বাড়াতে হবে। তৃতীয়ত, কৃষিপণ্যের বাজার, কৃষি-ঋণের সমস্যা, ও বাজারের অনিশ্চয়তাজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য চুক্তি-চাষে রাজি হতে চাষিদের উৎসাহ দিতে হবে। বিশ্বব্যাংক সমর্থিত এই তিনটি প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয় কৃষির পরিকাঠামো ও আইনগত নানাদিকে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভারতের কৃষি-অর্থনীতির বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দেশিত এই পরিবর্তনের ছকটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের মানুষের খাদ্য-স্বনির্ভরতার ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই পরিবর্তনের অর্থ আরও বেশি বেশি করে কৃষি-জমি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের খাদ্যশস্য উৎপাদনের জায়গা থেকে ফলমূল, শাক-সবজি উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। এই ছকটি বিশ্বায়িত বাজার-ব্যবস্থায় এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের জন্ম দেবে ও সেটাকে পুষ্ট করবে। উন্নত দেশগুলি খাদ্যশস্য তৈরিতে বেশি জমি ও উপকরণ ব্যবহার করবে ও পিছিয়ে-পড়া প্রাচ্যের দেশগুলি, যাদের মূল আহার-অভ্যাসে খাদ্যশস্যের গুরুত্ব অপরিসীম, তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য এইসব উন্নত দেশের জোগান দেওয়া খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর করবে। এদেশের সাধারণ মানুষের খাদ্য, অর্থাৎ চাল, গম ও নানাপ্রকার মোটা শস্যদানা জোগানের কাজে এদেশের কৃষির গুরুত্ব ক্রমশ কমে আসবে। এদেশের কৃষি-অর্থনীতি দানাশস্যের জায়গায় বিকল্প শাক-সবজি, ফল-মূল, দুধ ও দুধজাত খাদ্য, মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়ে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে ও আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করবে। গত ৩০/৪০ বছর ধরে আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ইত্যাদি কতিপয় উন্নত দেশ

সারা বিশ্বের খাদ্যশস্যের রফতানি বাজারে কর্তৃত্ব করে আসছে, কিছুদিন ধরে জাপানও সেখানে নিজেদের তুলনামূলক প্রাধান্যের জায়গায় নিয়ে গেছে। আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ভরতুকি খাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে। ভারতের মতো তুলনামূলক পিছিয়ে-পড়া দেশ শস্যবৈচিত্রের নীতি প্রয়োগ করলে আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো অতি উন্নত দেশগুলি আমাদের মতো দেশের বাজারে তাদের জোগান দেওয়া খাদ্যশস্যের তৈরি বাজার পেয়ে যাবে। এইসব দেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর থাকলে তা হবে উন্নত দেশের কৃষি-রফতানি প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর, তাই আমরা শস্যবৈচিত্রের নীতিটি যত বেশি সার্থকভাবে প্রয়োগ করব, ততই খাদ্যশস্যের রফতানিকারক উন্নত দেশগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থ পরিপূরণের বাধা দূর হতে থাকবে। এই নীতিটি খাদ্যশস্য রফতানিকারক উন্নত দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকূল। একই সঙ্গে চুক্তি-চাষ ও চুক্তি-চাষের কাঠামোতে কৃষি-উপকরণের বেসরকারি ব্যবসার প্রসার হবে। শুধুমাত্র এই কৃষি-উপকরণ বাজারেই নয়, একই সঙ্গে কৃষি-ঋণ ও কৃষিপণ্যের যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার প্রধান পরিচালক হিসেবেও বহাল থাকবে বহুজাতিক সার ও বীজ কোম্পানিগুলি। সেইসঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসার ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের উৎপাদন ও রফতানিতে বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলি প্রাধান্য বিস্তার করবে। এই ধরনের একটি কৃষি-কাঠামোর প্রসারই ফান্ড-ব্যাংক নির্দেশিত এই নতুন কৃষিনীতির লক্ষ্য।

অর্থনীতির এই বিশেষ ছকটিকে সামনে রেখে আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতিগুলিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ধান, গম, মোটা শস্যদানার উৎপাদনে ব্যবহৃত কর্ষণযোগ্য জমির বেশি-বেশি অংশ হালকা ও উচ্চ মূল্যসম্পন্ন সবজি-ফলের চাষের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে চাষিদের আয়ের সঙ্গে বিশেষ উৎসাহভাতা এবং এই ধরনের অন্যান্য কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়েছে। রফতানি-নীতিতেও নতুন, হালকা, অধিক মূল্যযুক্ত এই পণ্যগুলির রফতানি বাড়ানোয় উৎসাহ দিতে গিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সার, বীজ ইত্যাদি চাষের উপকরণের বেসরকারি ব্যবসার ওপর থেকে বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে।

চুক্তি-চাষ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগকে সমর্থন জোগানোর জন্য চুক্তি-চাষকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে উৎসাহ দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী বেসরকারি বিনিয়োগ সংস্থা চুক্তি-নির্ধারিত পরিমাণে এবং দামে জিন-পরিবর্তিত আধুনিক উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও ঋণ চাষিকে সরবরাহ করবে। তেমনই চাষির কাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য পাবে পূর্বনির্ধারিত পরিমাণে ও দামে। ভাবা হচ্ছে এই ব্যবস্থা কৃষি-ঋণ ও কৃষিপণ্যের দামকে চাষির অনুকূলে রাখতে পারবে এবং সেইসঙ্গে তার কৃষিপণ্যকে বাজার-জাত করার সমস্যারও সমাধান করবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসংস্থাগুলির কাজ হবে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ-চাহিদা অনুমান করা এবং সেই হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন-পরিকল্পনার মাধ্যমে চুক্তির শর্ত গঠন করে চাষিদের কাছ থেকে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপকরণ অর্থাৎ শস্য সংগ্রহ করা। চুক্তি-চাষ পদ্ধতিতে চাষিদের পক্ষে যেমন ফল-সবজির বাজার

সন্ধান করতে অসুবিধা হবে না, তেমনই প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলিও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল চুক্তির মাধ্যমে সহজেই পাবে।

কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক আদানপ্রদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই রফতানিমুখী কৃষি-ব্যবস্থাটি গড়া হয়েছে বিশ্বব্যাংক আর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো আন্তর্জাতিক স্তরের পরামর্শদাতা সংস্থার নির্দেশমাফিক। এর অর্থনৈতিক মডেলটার বর্ণনা দেওয়া হল নীচে।

কৃষি অর্থনীতি এখানে দু'ভাগে বিভক্ত। একটি কৃষি উৎপাদন বিভাগ, অন্যটি কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভাগ। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বিভাগ নির্দিষ্ট পরিমাণ সবজি ও ফল ইত্যাদি উচ্চমূল্যের হালকা কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকে। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভাগটি কৃষি-উৎপাদন বিভাগ থেকে কাঁচামাল হিসেবে ওই পরিমাণ কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তাতে নতুন অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে এবং সেই মোট মূল্যে এই পণ্য তারা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে, আন্তর্জাতিক মূল্যে। চাষির কাছ থেকে কাঁচামাল হিসেবে কৃষিপণ্য কিনতে গিয়ে চাষির সঙ্গে দামের রফা করার সময় দু'টি বিষয় তাকে মনে রাখতে হয়। প্রথমত, কৃষিপণ্যটির বাজার-দাম, এবং বাজার-দামের সঙ্গে যুক্ত করা একটি উৎসাহ-মূল্য, যাতে চাষি পণ্যটি বাজারে বিক্রি না করে তার কাছেই বিক্রি করে। ধরে নিচ্ছি বাজার-দামটি সরকারের সহায়ক মূল্যের চেয়ে কম নয় এবং সহায়ক মূল্য স্থির হয় মোট উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে একটি বাড়তি মূল্য যোগ করে, যাতে করে উৎপাদন-ব্যয় মিটিয়ে চাষির হাতে খানিকটা উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ বাজার-দাম হল উৎপাদন-ব্যয় এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে উৎপাদন-ব্যয়ের ওপর যে-বাড়তি মূল্য যুক্ত করা হয় তার যোগফলের সমান। আমরা আরও মনে করি, প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা চাষিকে যে-দাম দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার সঙ্গে আবার বাজার-দামের ওপর খানিকটা বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য যোগ করা হয় [অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার প্রতিশ্রুত চুক্তিতে নির্ধারিত দামেও উৎপাদন-ব্যয়ের ওপর কিছুটা উদ্বৃত্ত মূল্য যোগ করা হয়, কিন্তু এই বাড়তি মূল্যটি সরকারের দেওয়া বাড়তি মূল্যের চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশি]।

প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মোট শস্য সংগ্রহের খরচ ও প্রক্রিয়াকরণের খরচ মেলালে পাওয়া যায় তার মোট বিনিয়োগ বা মোট ব্যয়। এছাড়াও প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতির উন্নতির জন্য একটি ব্যয় হয়। এসবের যোগফল তার মোট বিনিয়োগ বা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে খরচের মোট পরিমাণ। প্রতি একক প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় মোট কী পরিমাণ শস্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে। এই কাঁচামালের পরিমাণ যত বেশি হয়, একটা সীমা পর্যন্ত প্রতি একক শস্যের প্রক্রিয়াকরণের ব্যয় ততই কমে। প্রক্রিয়াকরণ থেকে একটি নূতন মূল্য সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়াকরণের মোট পরিমাণ যত বাড়ে, প্রতি একক প্রক্রিয়াকরণ থেকে সৃষ্ট নতুন মূল্যের পরিমাণ তত বাড়ে, একটা সময় আসে যখন এক একক প্রক্রিয়াকরণ বাড়ার জন্য যে-নতুন মূল্য সৃষ্টি হয় তা ওই শেষ একক প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে-বাড়তি ব্যয় হয় তার সমান। অর্থাৎ এই পরিমাণ শস্য প্রক্রিয়াকরণই তার কাছে সবচেয়ে লাভজনক। এইভাবে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কতটা শস্য ব্যবহার করা তার পক্ষে লাভজনক সেটা সে স্থির করে। এই পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণের মোট ব্যয় হল তার প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে মোট বিনিয়োগ। তার লাভ নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রক্রিয়াজাত নতুন মূল্য-যুক্ত শস্যের দাম কত, তার ওপর। দেশের বাজারে শস্যের বাজার-দাম যদি খুব কম থাকে এবং কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, যদি নতুন মূল্য-যুক্ত প্রক্রিয়াকৃত শস্যের দামও তুলনামূলক ভাবে কম থাকে,

তাহলেও তার কাছে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু সে যদি দেখে বিকল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে দেশের অসংগঠিত বাজারে বিনিয়োগ করলে সুদ হিসেবে যে-আয় সে করতে পারত সেটা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সমপরিমাণ বিনিয়োগ থেকে আসা লাভের তুলনায় অনেক বেশি, তাহলে সে আদৌ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে না। সামান্য দামে বাজার থেকে শস্য কিনতে পারলে তার শস্য প্রক্রিয়াকরণের মোট ব্যয় হয়তো সে কম রাখতে পারত, কিন্তু অসংগঠিত ঋণের বাজারে সুদের হার যদি খুব বেশি থাকে, তবে ঋণ-ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগই তার কাছে কম ঝুঁকিপূর্ণ ও বেশি লাভজনক।

একজন দেশি ব্যবসায়ী— কৃষিপণ্য, কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-ঋণের যুক্ত বাজারে ঋণদাতা ব্যবসায়ী হিসেবে যে কাজ করছে, সে যখন বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগের কথা ভাবে, সে অবশ্যই চায় কৃষিপণ্যের বাজার-দাম কম থাকুক। কৃষি-বাজারে উদ্বৃত্ত কম থাকলে বিদেশি বহুজাতিক সার-বীজের জোগানদাতা সংস্থা দু'টি ভিন্ন উপায়ে তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাতে পারে। সে সরাসরি আমাদের কৃষি-অর্থনীতির ওপর তার ব্যবসায়িক কাজ চালানোর জন্য দেশি এজেন্ট মারফত ঋণ, পণ্য ও উপকরণের যুক্ত বাজারে ঋণদাতা পণ্যবিক্রেতা ও উপকরণের জোগানদার ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করতে পারে— যাতে পণ্যের দামের ও উপকরণের দামের হেরফের ঘটিয়ে, অন্যদিকে চড়া সুদের মাধ্যমেও বিপুল লাভ করা সম্ভব — আবার, এর বিকল্প হিসেবে একই কাজ সে আরও একটি বাড়তি ক্রিয়া, অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেও করতে পারে। প্রথম কাজে তুলনায় ঝুঁকি খুব কম। প্রথম ধরনের বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম যেহেতু সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন বা আইনের চৌহদ্দির বাইরে ঘটে, তাই দাম ও সুদের ওপর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের কাজটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় চালাতে হয়।

আমাদের কৃষি-অর্থনীতি দুর্বল হলে কৃষিপণ্যের— অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাঁচামালের, দাম কম থাকবে। অন্যদিকে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন-ব্যয় তুলনায় বেশি হলে অসংগঠিত বাজারে সুদের হার সংগঠিত বাজারের তুলনায় বেশি হলেও বিনিয়োজিত টাকার প্রতি এককে অন্য ক্ষেত্রে লভ্য উদ্বৃত্তের তুলনায় কম হবে। তাই বিনিয়োগকারী সে ক্ষেত্রে কৃষি-বাণিজ্যের যুক্ত বাজারে বিনিয়োগের তুলনায় প্রক্রিয়াকরণের মতো শিল্পে বিনিয়োগ করা বেশি লাভজনক মনে করবে। উপরন্তু কৃষি থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালের দাম কম থাকলে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে লাভের পরিমাণ বেশি থাকবে, যা কৃষিপণ্যের দেশি ব্যবসায়ীকে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবে। তারা বিদেশি উপকরণ জোগানদার কোম্পানির কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করার চেয়েও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিদেশি সার-বীজের জোগানদাতা বিনিয়োগকারীর দেশি সহযোগী হিসেবে কাজ করা বেশি লাভজনক মনে করবে। অপর পক্ষে দেশের কৃষি-বাজারে পণ্যের দাম তুলনায় বেশি থাকলে ও উৎপাদন-ব্যয় তার তুলনায় কম থাকলে অসংগঠিত ঋণের বাজারে ঋণের চাহিদা বাড়ে। এর কারণ হল, এর ফলে সম্পন্ন চাষি চাষে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়ানোয় উৎসাহিত হয়, ফলে তার ঋণের চাহিদা বাড়ে। অন্যদিকে প্রান্তিক ও অতি প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের দুর্দশা বাড়ে কারণ তাদের খাদ্যের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। দাম বাড়লে এদের ভোগের জন্য ঋণ নিতে হয়। ঋণের চাহিদা বাড়লে সুদ বাড়ে। সেক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ফল-সবজির ব্যবসা অথবা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা চুক্তি-চাষে বিনিয়োগের চেয়ে সরাসরি কৃষিপণ্য, কৃষি-উপকরণ, কৃষি-ঋণের যৌথ বাজারের কার্যক্রমে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক। তখন এইসব বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় নেমে

কৃষি উদ্বৃত্তের বড় অংশ আত্মসাৎ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রক্রিয়াকৃত পণ্যের দাম যথেষ্ট বেশি না থাকলে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পভিত্তিক চুক্তি-চাষ অলাভজনক হয়ে পড়ে।

ফল-সবজি চাষ বিশেষভাবে বাজারের অনিশ্চয়তার শিকার। বড় সমস্যা হল এগুলো পচনশীল, বেশিদিন টাটকা রাখা শক্ত। যথাযথ সংরক্ষণ করা না গেলে প্রচুর পরিমাণে পচে নষ্ট হতে পারে। বাজারজাত করার যথেষ্ট উন্নত পদ্ধতি না থাকলে এই চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশি। এই চাষ সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ। উপরন্তু ভারতের কৃষি-জমির মালিকানা-কাঠামো ও জোতের বিন্যাস বিচার করলে এখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির প্রাধান্য। তাদের পক্ষে লাভজনকভাবে এই ধরনের চাষ চালানো সম্ভব হয় না। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব আছে, কৃষিতে স্থির মূলধনি কাঠামোর স্তরও যথেষ্ট উন্নত নয়। কাজেই এরকম একটি ক্ষুদ্র ও ছোট চাষের প্রাধান্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কৃষি-অর্থনীতিতে চুক্তি-চাষের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এইরকম ক্ষেত্রে চুক্তি-চাষে নিযুক্ত সার-বীজের জোগানদার বহুজাতিক সংস্থাকে অনেক বেশি সংখ্যায় ছোট ও ক্ষুদ্র চাষির কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়। প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি সময় ও ব্যয়সাধ্য। ব্যবসায়ী সংস্থার পক্ষে প্রতিটি ক্ষুদ্র ও ছোট চাষির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে চুক্তিসংক্রান্ত বিরোধ মেটানো সহজ নয়; তাই ছোট জোত অধ্যুষিত কৃষি-অর্থনীতিতে চুক্তি-চাষ প্রক্রিয়াকে কতটা সার্থকভাবে রূপায়িত করা সম্ভব, বিশেষ করে চুক্তি-ব্যবসায়ীর পক্ষে সেটি কতটা গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সারণি ১৩.১ নথিভুক্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট

রাজ্য	১৯৯৭	২০০০	২০১৩	২০১৭	বার্ষিক গড় শতাংশ পরিবর্তন (১৯৯৭ থেকে ২০০০)	বার্ষিক গড় শতাংশ পরিবর্তন (২০০০ থেকে ২০১৩)	বার্ষিক গড় শতাংশ পরিবর্তন (২০১৩ থেকে ২০১৭)
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩০০	৩৬৭	৫৭৩৫	৫৮৬১	৭.৪৪	১১২.৫১	০.৫৪
অসম	২৫	২৯	১২৫৬	১৪০৯	৫.৩৩	৩২৫.৪৬	৩.০৪
বিহার	৫৮	৬৩	৭৩৬	৮৮১	৫.৩৩	৮২.১৭	৪.৯২
চণ্ডীগড়	৬৪	৫৭	১৪	১৯	–৩.৬৪	–৫.৮০	৮.৯২
দিল্লি	৩০২	৩২০	১৫৯	১৬৬	১.৯৮	–৩.৮৭	১.১০
গোয়া	১৬০	১৬৮	৯০	৯৮	১.৬৬	–৩.৫৭	২.২২
গুজরাত	২৬০	৩৩৩	১৯২৩	২২৪০	৩.৩৬	৩৬.৭২	৪.১২
হরিয়ানা	১৫১	১৭২	৬০৮	৯১৮	৪.৬৩	১৯.৪৯	১২.৭৪
হিমাচল প্রদেশ	৯০	১০৬	১৬৩	১৯৩	৫.৯২	৪.১৩	৪.৬০
জম্মু ও কাশ্মীর	৮৩	৮৮	১৫৬	১৭৬	২.০১	৫.৯৪	৩.২০
কর্ণাটক	২৫৩	৩২২	২০৩৮	২২৫১	৯.০৯	৪০.৯৯	২.৬১
কেরালা	৩৮৭	৪৪৮	১৫০১	১৬২৯	৫.২৫	১৮.০৮	২.১৩
মহারাষ্ট্র	৯৩৪	১০৪৭	৩০৭৭	২৮০৮	৪.০৩	১৪.৯১	–২.১৮
মধ্যপ্রদেশ	১০৪	১১২	৭৩৮	৮৭৬	২.৫৬	৪২.৯৯	৪.৬৭
ওডিশা	৪৩	৪৮	৯৩১	১১২৭	৩.৮৭	১৪১.৫০	৫.২৬
পঞ্জাব	৩০৯	৩৬৩	২৭৯২	২৯০৬	৫.৮২	৫১.৪৭	১.০২
রাজস্থান	১১০	১২২	৭৯৫০	৮৮৩	৩.৬৩	৪২.৪৩	২.৭৬
তামিলনাড়ু	৪৫২	১৮২	৫১৬১	৫০৭৭	–১৯.৯১	২১০.৪৩	–০.৪০
উত্তরপ্রদেশ	৪৯৪	৫৪১	২০৯৭	২০৬৮	৩.১৭	২২.১২	–০.৩৪
পশ্চিমবঙ্গ	২৯৮	৩৩৪	১৬২৪	১৯৬০	৪.০২	২৯.৭০	৫.১৭

উৎস : Annual Survey of Industries. Various reports

পঞ্জাবে ও অন্ধ্রপ্রদেশে যে-সমস্ত শস্যবৈচিত্র ঘটানোর উদ্যোগ ও চুক্তি-চাষের চেষ্টা শুরু হয়েছে, তার ফলাফল মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। ২০০৪ সালের একটি সমীক্ষানির্ভর পর্যবেক্ষণ[২] থেকে দেখা যায়, নানা

সমস্যার কারণে পঞ্জাব এবং অন্ধ্রে এইধরনের প্রচেষ্টা বেশি দিন চালানো যায়নি। পঞ্জাবে ১৯৯৮ সালে টম্যাটো ও লংকার চুক্তি-চাষ চালু হয়, পেপসি ও ইউনিলিভারের মতো বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের দেশি এজেন্ট (হিন্দুস্তান লিভার) হাইব্রিড বীজ নিয়ে খুব বড় আকারে মঞ্চে অবতরণ করে। এরা চুক্তি-ভিত্তিতে বীজ জোগান দেওয়া, টম্যাটো কিনে নেওয়া, প্রক্রিয়াকরণের পর তা বাজারজাত করা শুরু করে। দেখা যায় বড় চাষি, যারা গমের জমি টম্যাটো উৎপাদনে সরিয়ে এনেছিল, তাদের পক্ষে চুক্তি অনুযায়ী সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোম্পানির পক্ষে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ছোট চাষির সঙ্গে কারবার চালানো অসুবিধাজনক হওয়ায় তারা কয়েকজন মুষ্টিমেয় বড় চাষির সঙ্গেই কারবার করতে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু বড় চাষিরা চুক্তিতে আসার পরেও চুক্তি অনুযায়ী বীজ ও প্রয়োজনীয় আগাম নেওয়ার পর উৎপাদিত সবজি চুক্তি-নির্ধারিত দামে কোম্পানিকে বিক্রি না করে বেশি দামে খোলা বাজারে বিক্রি করছে। বাজার-দাম যখন চুক্তি-ধার্য দামের তুলনায় বেশি থাকছে, তখনই তারা কোম্পানিকে ধার্য পরিমাণ বিক্রি না করে বাজারে বিক্রি করছে ও সে অর্থের অংশ ব্যবহার করে কোম্পানির ঋণ সুদ-সহ শোধ করছে। কখন কখনও উৎপাদনের পর কোম্পানি তাদের চুক্তি-নির্ধারিত দামে মোট চুক্তি-নির্ধারিত পরিমাণ কিনতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তারা চুক্তি-চাষের বাইরে অন্য চাষিকেও নগদে বেশি দামে বীজ বিক্রি করছে। ফলে চুক্তি-চাষ পদ্ধতি অচিরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, পঞ্জাবের চুক্তি-চাষিরা ফিরে যাচ্ছে তাদের চিরায়ত গম উৎপাদনে। কোম্পানির লিজ নেওয়া জমিতেও টম্যাটোর বদলে আবার গম উৎপন্ন হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পঞ্জাবে শস্য বৈচিত্রকরণের মাত্রা কমেছে এবং পঞ্জাব আবার তার সনাতন প্রধান ফসল গম উৎপাদনেই বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে।

আমরা সিম্পসনের শস্যবৈচিত্র সূচকটি ব্যবহার করে সি এম আই-এর (সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০২ সাল অবধি সারা ভারতে শস্যের বৈচিত্রমাত্রার যে পরিমাপ করেছি সেটি নীচে দেওয়া হল।

সারণি ১৩.২ সারা ভারতে শস্যবৈচিত্র সূচকের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধির প্রবণতা

বছর	শস্যবৈচিত্র
১৯৮৬	০.৪২
১৯৮৭	০.৪২
১৯৮৮	০.৪৪
১৯৮৯	০.৪৪
১৯৯০	০.৪৫
১৯৯১	০.৪৭
১৯৯২	০.৪৯
১৯৯৩	০.৪৮
১৯৯৪	০.৪৯

১৯৯৫	০.৪৯
১৯৯৬	০.৫১
১৯৯৭	০.৫১
১৯৯৮	০.৫০
১৯৯৯	০.৫০
২০০০	০.৫১
২০০১	০.৫১
২০০২	০.৫১

Source: Directorate of Economics and Statistics

সারা ভারতের এই গড়ের তুলনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শস্যবৈচিত্রের মান ছিল: গুজরাত ০.৭১ (২০০১ সাল), তামিলনাড়ু ০.৬১ (২০০২ সাল), অন্ধ্রপ্রদেশ ০.৬১ (২০০০ সাল)। পঞ্জাবের শস্যবৈচিত্রের মাত্রা ছিল ০.২৫-এর মতো। পরবর্তীতে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা যথেষ্ট বাড়লেও তুলনামূলকভাবে পঞ্জাব এ বিষয়ে পিছিয়ে-পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে একটি।

আমরা যে-সূচকটি ব্যবহার করেছি (সিম্পসন শস্যবৈচিত্র সূচক) সেটি হল:

শস্যবৈচিত্র সূচক (CDI) = $1 - \Sigma (P_i/\Sigma P_i)^2$ যেখানে P_i = i তম শস্য এবং i এর মান ১, ২, ৩, ৪, ... মোট শস্যের সংখ্যা।

শস্যবৈচিত্র: ভারতীয় কৃষির গঠনগত পরিবর্তন

শস্যবৈচিত্র সম্বন্ধে যেসব আলোচনা কৃষি-অর্থনীতির গবেষকরা করেছেন তার একটি বড় অংশ ভারতীয় কৃষিতে এই নতুন গঠনগত পরিবর্তনের পিছনে মূল চালিকাশক্তির সন্ধানেই নিয়োজিত হয়েছে। সহজেই বলা যায়, শস্যবৈচিত্র বিস্তারের পিছনে ছিল প্রথমত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ উৎসাহ, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছিল দেশের সরকারের শস্যবৈচিত্র প্রসারের অনুকূলে নানা উপাদান ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শর্ত, উচ্চফলনশীল সার ও বীজের উদ্ভাবন ও লভ্যতা বৃদ্ধি, রফতানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সরকারি অবস্থান। তাছাড়া, সনাতন শস্যগুলির উৎপাদনের হারে দীর্ঘকালীন হ্রাসের প্রবণতা ও চাষিদের নানা দুর্দশাও পরোক্ষভাবে শস্যবৈচিত্রের অনুকূলে কাজ করেছে। শস্যবৈচিত্রের বিস্তারের পিছনে এইসব উৎসাহ সঞ্চারকারী নানা বিষয়ের প্রভাব থাকলেও যে-প্রশ্নটি বিচারের অপেক্ষা রাখে তা হল, কোন কোন অবস্থা শস্যবৈচিত্রের প্রক্রিয়াকে চাহিদার দিক থেকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

রাজ্যওয়ারি বিশ্লেষণ করার আগে আমরা এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব। পি কে যোশি, অশোক গুলাতি এবং অন্যান্যরা (২০০৪)[৩] ভারতের ১৯টি রাজ্যে

উচ্চমূল্যের হালকা পণ্য, যেমন শাকসবজি ইত্যাদির মোট উৎপাদনের সূচকের তফাতে কোন কোন উপাদান নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং বিভিন্ন উপাদানের নির্ণায়ক হিসেবে গুরুত্বের পরিসংখ্যানগত মান পরিমাপ করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রথমত সেচের অভাব শস্যবৈচিত্রের একটি প্রধান নির্ণায়ক উপাদান। কম খরচে সেচের জলের যথেষ্ট জোগান থাকলে চাষি শাকসবজি ইত্যাদি উচ্চমূল্যের হালকা ফসল উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হয় না। তারা সনাতন জলনির্ভর খাদ্যশস্যই চাষ করে। যেসব অঞ্চলে জলের জোগান যথেষ্ট নয়, সেখানেই চাষি হালকা উচ্চমূল্যের বাগান-ফসল, যেমন শাকসবজি, ফলমূল চাষ করে। একই কারণে নিয়মিত ও যথাযথ পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হলে সনাতন খাদ্যশস্য চাষ করতে চাষির অসুবিধা হয় এবং তারা শস্যবৈচিত্রের দিকে ঝোঁকে। দ্বিতীয়ত, বাজার এবং বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থা এই শাকসবজি, ফলমূল চাষের জন্য বিশেষ জরুরি। এইসব পরিকাঠামোগত উপাদান যথেষ্ট না থাকলে এইসব উচ্চমূল্যের পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারজাত করা অসুবিধাজনক, পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই এই ধরনের চাষের জন্য যথাযথ পরিকাঠামো একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, যেখানে তা উপস্থিত সেখানে ফলমূল-সবজি চাষ বেশি হয়। এখানে লাভজনক দামের নিশ্চয়তা ও বিক্রির নিশ্চয়তা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। চুক্তি-চাষকে এই কারণেই শস্যবৈচিত্রের স্বার্থে একটি সুবিধাজনক উপাদান বলে ধরা হয়। এই সব উপাদান ছাড়াও শস্যবৈচিত্রের পক্ষে আর-একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল, ছোট জোতের মালিকের উপস্থিতি। দেখা যাচ্ছে, ছোট জোতেই এই সব হালকা বাগান-পণ্যগুলির উৎপাদন বেশি হয়, তাই যে-অঞ্চলে ছোট জোতের প্রাধান্য যত বেশি, সে-অঞ্চলে হালকা বাগান-ফসল উৎপাদনেরও তত বেশি প্রাধান্য। ছোট চাষি ভালভাবে, সচ্ছলতার সঙ্গে বেঁচে থাকার স্বার্থে শস্যবৈচিত্র ঘটায়। ছোট জোত-অর্থনীতিতে বাজারের ও পরিকাঠামোর যথেষ্ট সুবিধা যদি থাকে, ওদিকে সেচের জল যদি অপ্রতুল হয়, তবে শস্য বৈচিত্রকরণের মাধ্যমে ছোট চাষি তার আয়ের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারে। চাহিদার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরও দু'টি উপাদানের গুরুত্ব তাঁরা বিবেচনা করেছেন। এই উপাদান দু'টি হল নগরায়ণের মাত্রা এবং মাথাপিছু আয়। এই দু'টি উপাদানই শস্যবৈচিত্রের মাত্রা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, কারণ এদের প্রভাবে মানুষের প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটে, খাদ্যতালিকায় দানাশস্যের জায়গায় বেশি করে ফল-সবজি-মাছমাংসের প্রাধান্য বাড়ে, ফলে দেশের বাজারে এসবের চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে এই দু'টি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, শস্যবৈচিত্রের মাত্রাবৃদ্ধিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

বেশির ভাগ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, শস্যবৈচিত্র বেশি করে প্রসারিত হয়েছে যে-অঞ্চলে, সেখানে ছোট চাষির উপস্থিতি অনেক বেশি এবং সেচের জলের সমস্যা তীব্র (যোশি এবং অন্যান্য, ২০০৪; সিং ও সিধু, ২০০৪; রাও এবং অন্যান্য, ২০০৬)[৪]। কোনও কোনও গবেষক (যোশি এবং অন্যান্য ২০০৪) আরও দেখেছেন, সনাতন কৃষি-উৎপাদনের কাঠামোতে ছোট চাষিরা, বিশেষ করে যেখানে জলের অভাব তীব্র সেইসব অঞ্চলে, মুনাফা বাড়ানোর জন্য নয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপযোগী ন্যূনতম আয় সুনিশ্চিত করার তাগিদ থেকেই শস্যবৈচিত্রের পথ নিয়েছে। রাও এবং অন্যান্যরা (২০০৬) জেলা স্তরের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখিয়েছেন, যদিও বাজারের চাহিদা উচ্চমূল্যের শস্য উৎপাদনের প্রসারে একটি বড় নির্ধারক উপাদান, তবুও যেসব জেলা ছোট চাষি-অধ্যুষিত, সেইসব জেলাতেই শস্যবৈচিত্রের মাত্রাধিক্য ঘটেছে। পঞ্জাবে শস্যবৈচিত্রের

অবনতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিং এবং সিধু দেখেছেন, পঞ্জাবে সেচের জলের জোগান বৃদ্ধিই শস্যবৈচিত্রের অবনতির কারণ। তাঁদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, যেসব অঞ্চলে সেচের জল যথেষ্ট পরিমাণে লভ্য, সেখানে চাষিরা সাধারণত দু'-একটি সনাতন শস্যের ওপর নির্ভর করে। যেখানে সেচের জলের অভাব রয়েছে সেখানেই চাষি শস্যবৈচিত্রের সাহায্যে কৃষি-আয়ের অনিশ্চয়তা কাটানোর চেষ্টা করে। এইসব বিশ্লেষণ থেকে শস্যবৈচিত্রের প্রসারের পিছনে উৎপাদনের তাগিদ বা বাজারের উপস্থিতি অর্থাৎ চাহিদার ভূমিকা ততটা প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে না, এ থেকে বরং প্রমাণ মিলছে যে, শস্যবৈচিত্র আমাদের দেশে পর্যাপ্ত সেচরহিত অঞ্চলে ছোট চাষির বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম কৃষি-আয় নিশ্চিত করার উপায়।

অপরপক্ষে ২০০৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক নিয়োজিত একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে, ভারতের কৃষিতে, বিশেষ করে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্রকরণের মাত্রা বৃদ্ধির পিছনে, ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা নেই, বরং এখানে মুখ্য ভূমিকায় আছে বাজার প্রসারিত হওয়ার ফলে আয় বাড়ানোর যে-সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা ব্যবহার করে সর্বোচ্চ লাভের তাগিদ।

অন্যদিকে গুলাটি এবং বাতিলা (২০০১ সালে) দেখিয়েছেন, কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস এবং বেসরকারি বা ব্যক্তিগত স্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। সরকারি স্তরে বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে বড় সেচপ্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ কমেছে। ফলে সনাতন অধিক জলনির্ভর খাদ্যশস্যের চাষ কমেছে, ওদিকে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ বৃদ্ধির ফলে লাভজনক শস্য চাষের দিকে আগ্রহ বেড়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সর্বোচ্চ লাভের দিকে তাকিয়ে উৎপাদনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে চাষি সনাতন শস্য থেকে সরে গিয়ে উচ্চমূল্যের হালকা ও লাভদায়ক ফসল তৈরিতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

সি এইচ রাও (২০০০)[৫] বিষয়টির বিশ্লেষণে অন্য একটি মাত্রা যুক্ত করেছেন। অনেকে লক্ষ করেছেন, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। মানুষ এখন শুধুমাত্র, বা প্রধানত, সনাতন খাদ্যশস্য গ্রহণ করে না। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন খাদ্যশস্যের জায়গায় অন্যান্য উচ্চমূল্যের শস্য, যেমন শাক-সবজি-ফলমূল বেশি করে গ্রহণ করতে আগ্রহী। চাষি যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ করছে, তখন এই নতুন ভোগের কাঠামো তাকে ফল ও সবজি চাষে আগ্রহী করছে। রাজুলাদেবি (২০০১)[৬] ২০০ জন ভূমিহীন কৃষকের ভোগের ধরন লক্ষ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দরিদ্র পরিবারগুলিতে সনাতন খাদ্যশস্যের চাহিদার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এন এস এস ও-র ৫৯তম সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, আয়ের বিন্যাসে সর্বনিম্নে অবস্থিত শ্রেণিটির ভোগ বাদ দিলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের ভোগের ধরনে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, চাল-গমের মতো খাদ্যশস্যের জায়গায় ফল-সবজির মতো উচ্চমূল্যের হালকা শস্যের দিকে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। চাহিদা এবং বাজারের প্রসার এইভাবে কৃষির উৎপাদন-কাঠামোকে ধান-গমের মতো খাদ্যশস্য থেকে সরিয়ে ক্রমশ এইসব উচ্চমূল্যের খাদ্যশস্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজনে জোত স্তরে সমীক্ষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি।

শস্যবৈচিত্র: একটি জোতস্তর বিশ্লেষণ

ধান-গমের জায়গায় ফল-সবজির মতো উচ্চমূল্যের পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির পিছনে কার্যকর উপাদানগুলি সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা একটি জোতস্তর সমীক্ষা[৭] করেছিলাম। দেশের সবচেয়ে কম বৈচিত্রপূর্ণ চাষের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যের তিনটি জেলা, হুগলি, বর্ধমান ও উত্তর চব্বিশ পরগনার ছয়টি গ্রামের মোট ৩৬০টি কৃষক পরিবারকে বেছে নিয়ে আমরা সমীক্ষা চালাই।

এই তিনটি জেলা পরিকাঠামো আর সেচ ব্যবস্থার নিরিখে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্ধমান জেলার শতকরা ৯০ ভাগ সেচ-যুক্ত জমিতে সরকারি খাল-সেচের সুবিধা আছে। এবং এখানে জমির উর্বরতাও বিশেষ উচ্চমাত্রার। হুগলি জেলার সেচসেবিত অঞ্চলের শতকরা ৩০ ভাগেরও কম জমি সরকারি খাল অথবা গভীর নলকূপের দ্বারা সেচের সুবিধা পায়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় কোনও সরকারি সেচের ব্যবস্থা নেই, উপরন্তু এই জেলার অধিকাংশ অঞ্চল, বিশেষ করে দক্ষিণ অংশের চাষের মাটি লবণাক্ত। তিনটি জেলায় শস্য উৎপাদনের ধরন বিভিন্ন। বর্ধমান মূলত সনাতন খাদ্যশস্য ধান উৎপাদক অঞ্চল। হুগলি ধান ও আলুচাষের জন্য পরিচিত, যদিও এর কোনও কোনও অংশে যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাটি নানাধরনের সবজি ও ফলের চাষের জন্য বিখ্যাত, এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা নগরী ও তার উপকণ্ঠের বিস্তীর্ণ শহরাঞ্চলে সবজি ও ফলের জোগান দিয়ে থাকে। কলকাতা আবার বিদেশের বাজারে কৃষিজাত পণ্য জোগান দেওয়ার অন্যতম দ্বার। আমরা প্রত্যেক জেলা থেকে দু'টি করে ব্লক বেছে নিয়েছি— একটি ব্লক সেচ ও পরিকাঠামোর দিক থেকে অধিক সুবিধাযুক্ত, অন্য ব্লকটি তুলনায় অনেকটা বঞ্চিত। প্রত্যেকটি ব্লকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন এক-একটি গ্রাম বেছে নিয়ে প্রত্যেক ব্লক থেকে 'স্ট্রাটিফায়েড রান্ডম' পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমনভাবে ৬০টি করে কৃষক পরিবার নির্বাচন করা হয়েছিল, যাতে করে <০.৫ হেক্টর (খুব প্রান্তিক), ০.৫ থেকে <১ (প্রান্তিক), ১ থেকে <২ (ছোট) এবং ২ থেকে <৪ (মাঝারি) জোতের এই চারটি মাপের অন্তর্গত কৃষকদের সংখ্যার প্রকৃত অনুপাতটি আমাদের বাছাই করা কৃষকদলেও যথাযথভাবে ভাবে বজায় থাকে। এইভাবে বাছাই করা ৩৬০টি কৃষক পরিবারের চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, সেচ ও পরিকাঠামো, এমনকী চাষি পরিবারগুলির প্রাত্যহিক খাদ্যের তালিকা সমেত বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করি। আমরা তিনটি শস্য বিশেষ বিশ্লেষণের জন্য বেছে নিই: আউস এবং আমন ধান, বোরো ধান, এবং সবজি। নীচের দু'টি সারণিতে প্রথমত আমরা আমাদের বাছাই করা ৩৬০টি কৃষক পরিবারের চাষে অংশগ্রহণের ধরন সংক্রান্ত তথ্য এবং দ্বিতীয়ত শস্যবৈচিত্রের মাত্রার ওপর বিভিন্ন সূচকের প্রভাব দেখেছি টবিট রিগ্রেশন বিশ্লেষণ করে। যে-ছয়টি ব্লক বিভিন্ন ধরনের সেচ ও পরিকাঠামোগত নানা বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করেছে তাদের জন্য পাঁচটি ডামি ব্যবহার করে শস্যবৈচিত্রের মাত্রার ওপর সেসবের প্রভাব দেখা হয়েছে। মেমারি ও পাণ্ডুয়া এই দু'টি ব্লক যথাক্রমে বর্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত। দু'টি ব্লকই একই ধরনের সেচের সুবিধাযুক্ত, দু'টি ব্লকই সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিগত সেচের জল পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে বর্ধমান সরকারি খাল-সেচের সুবিধা বেশি পায়। পরিকাঠামোর দিক থেকেও এরা সবচেয়ে এগিয়ে থাকা, অবশ্য তুলনায় পাণ্ডুয়াই বেশি এগিয়ে। বলাগড় ও গলসি সেচের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও বলাগড় পরিকাঠামোর দিক থেকে গলসির তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে

রয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার দু'টি ব্লক, হাসনাবাদ ও বনগাঁ, সেচ ও পরিকাঠামো উভয় দিক থেকেই সবচেয়ে পশ্চাদবর্তী। আমরা পরিকাঠামো ও সেচের নানা সুযোগসুবিধার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুযায়ী যে-কোড ব্যবহার করেছি তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্লকের ক্রমসংখ্যা নীচে দেওয়া হল

সারণি ১৩.৩ পরিকাঠামো কোডের ক্রমসংখ্যা

পরিকাঠামো কোডের ক্রমসংখ্যা	১	২	২	৫	৩	৬
ব্লক	পাণ্ডুয়া	মেমারি	বলাগড়	বনগাঁ	হাসনাবাদ	গলসি
সেচকোডের ক্রম সংখ্যা	১	১	২	৩	৬	২

আলোচিত ব্লকগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি ব্লক সেচ ও পরিকাঠামো সবদিক থেকেই বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। শেষ তিনটি ব্লক বিশেষ করে পরিকাঠামোয় যথেষ্ট পিছিয়ে-পড়া, সেচের দিক থেকে বনগাঁ ও হাসনাবাদ পিছনে থাকলেও গলসির অবস্থা তুলনায় ভাল। নীচের সারণিতে আমরা দেখছি প্রথম তিনটি ব্লকেই শস্যবৈচিত্রের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম, শেষ তিনটি ব্লকে তা অনেকটাই বেশি। বেশি শস্যবৈচিত্রের অঞ্চলগুলিতে প্রান্তিক ও অতি প্রান্তিক চাষির অনুপাতও বেশি। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে, জোত-স্তর বিশ্লেষণে যে-স্থানে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা অধিক, সেখানে ছোট চাষিদের উপস্থিতি বেশি অনুপাতে দেখা যাচ্ছে, ফলে জোতের গড় মাপ অপেক্ষাকৃত কম। প্রতি হেক্টরে পারিবারিক শ্রমদিবসের সংখ্যা বেশি এবং মোট শ্রমে পারিবারিক শ্রমের অনুপাতও— বিশেষ করে সবজি চাষের ক্ষেত্রে, লক্ষণীয়ভাবে বেশি। আর একটি লক্ষ করার মতো বিষয় হল, যে-অঞ্চলে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা তুলনায় বেশি, সেখানে চাষি পরিবারের প্রতিটি সদস্য গড়ে অনেক বেশি সময় ধরে জমিতে শ্রম দিয়ে থাকে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সরকারি সেচের সুবিধা যেসব অঞ্চলে তুলনায় যথেষ্ট কম, সেসব অঞ্চলে পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত না হলেও ছোট চাষির অনুপাত বেশি এবং ছোট চাষি অধিক পরিমাণে শ্রম দিয়ে সবজি, ফল ইত্যাদির চাষ করে থাকে। লক্ষণীয়, বলাগড় অঞ্চলে সরকারি সেচ না থাকলেও এখানে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা যথেষ্ট বেশি। এখানে ছোট চাষি সর্বাধিক মাত্রায় পারিবারিক শ্রম দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে নির্মিত সেচ-ব্যবস্থা্র সুযোগ নিয়ে ফল-সবজি চাষ করে থাকে, এখানকার অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিকাঠামোকে কাজে লাগায়।

এই বিশেষ পরিস্থিতিতে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা বৃদ্ধিতে কোন কোন উপাদানগুলি কার্যকর ভূমিকা নেয় তা বোঝার জন্য আমরা শস্যবৈচিত্রের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে পারিবারিক শ্রম, গড় জোতের মাপ, সেচের পরিমাণ ও সারের ব্যবহারের প্রভাব দেখতে চেয়েছি। এই উদ্দেশ্যে আমাদের নমুনার ৩৬০টি চাষি পরিবারকে বিবেচনায় রেখে টবিট রিগ্রেশন মডেল (ডামি সহ) গঠন করার পরিসংখ্যান-গণিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। সেচ পরিকাঠামোর গুরুত্ব দেখার জন্য একই সঙ্গে যে-ছয়টি ব্লক ছয় ধরনের সেচ-পরিকাঠামো ধরনকে বোঝায়, তাদের জন্য পাঁচটি ডামি ব্যবহার করেছি। ছেদকটিকে সবচেয়ে কম শস্যবৈচিত্রের ব্লক পাণ্ডুয়ার জন্য ব্যবহার করেছি। এই রিগ্রেশন সমীকরণটির হিসাব থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণের গাণিতিক মূল্য নীচের সারণিতে

দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শস্যবৈচিত্রের মাত্রার তফাতে পারিবারিক শ্রম ধনাত্মক প্রভাব ফেলে, অর্থাৎ পারিবারিক শ্রমের ব্যবহারের সঙ্গে শস্যবৈচিত্রের সরাসরি সম্পর্ক আছে। শস্যবৈচিত্রের মাত্রা সেখানেই বেশি, যেখানে পারিবারিক শ্রম বেশি ব্যবহার হয়। এর কারণ হয়তো এই যে, ফলমূল-সবজি চাষ সনাতন শস্যের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমঘন; ছোট চাষি সহজে ও সস্তায় জল না পেলে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে সবজি চাষকেই বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করে। আমরা সেচের উৎস সম্পর্কে কোনও তথ্য ব্যবহার করিনি, কেবল সেচসেবিত অঞ্চলের পরিমাণের তথ্যটি ব্যবহার করেছি। ফলে সস্তায় ও সহজে সরকারের জোগান দেওয়া সেচের জল বেশি থাকলে চাষি অধিক জলনির্ভর সনাতন শস্য চাষ করে, এই অনুমানের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এই বিশ্লেষণ থেকে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে, আমরা দেখেছি, সহজে ও সস্তায় সরকারি খাল-সেচের পর্যাপ্ত সুবিধাযুক্ত পাণ্ডুয়া বা মেমারিতে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা সবচেয়ে কম। আমাদের ব্যবহৃত ডামিগুলির সহগের মাপের বৃদ্ধির ধরন থেকে সেই অনুমানটির সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে। পাণ্ডুয়া সরকারি সেচের জোগানের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা ব্লকগুলির একটি। তারপরই মেমারির স্থান। এই অঞ্চলদু'টিতে পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও শস্যবৈচিত্রের মাত্রা খুবই কম, এরা সনাতন খাদ্যশস্যের উৎপাদনেই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়। অপরপক্ষে হাসনাবাদ ও বনগাঁতে সেচের সুবিধা একেবারেই কম, এইসব অঞ্চল পরিকাঠামোতেও অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া, কিন্তু এরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার ও একইসঙ্গে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের সিংহদুয়ার কলকাতার কাছাকাছি থাকায় অবশ্যই বাণিজ্যিক যোগাযোগের যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করে। এই অঞ্চলে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। অপরপক্ষে বলাগড় অঞ্চলে সরকারি সেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ায় সনাতন জলনির্ভর শস্য উৎপাদন সেখানে কম সুবিধাজনক। বলাগড়ের পরিকাঠামো উন্নত, ফলে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা এখানে শুধু পাণ্ডুয়ার তুলনায় নয়, মেমারি ও গলসির তুলনায়ও বেশি। এখানে চাষি অধিক পরিশ্রম করে ও নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করে সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তুলে ফল-সবজির চাষ করে।

সারণি ১৩.৪ পারিবারিক শ্রম ও শস্য

	কম বৈচিত্রপূর্ণ	কম বৈচিত্রপূর্ণ	কম বৈচিত্রপূর্ণ	বেশি বৈচিত্রপূর্ণ	বেশি বৈচিত্রপূর্ণ	বেশি বৈচিত্রপূর্ণ
	মেমারি	পাণ্ডুয়া	গলসি	বলাগড়	বনগাঁ	হাসনাবাদ
শস্যবৈচিত্র সূচক	০.৪৯	০.৪৫	০.৫৫	০.৬৪	০.৬৭	০.৬৮
জোতের গড় মাপ	০.৯৮	০.৮৬	১.০১	০.৬৯	০.৭৯	০.৮৩
হেক্টরে গড় পারিবারিক শ্রমদিবস	১৩৪.৮২	১৩৮.২২	৪৫.৩৮	২৫২.৬৮	১৭৯.৪৮	২৩৬.৫৯
পারিবারিক শ্রম দিবসের অনুপাত						
আউস ও আমন	৩৬.৬৬	১৯.৬৪	২.৫৫	৩৬.৮৩	৩৩.৬২	৩৯.৪২
বোরো	২২.২৩	২৯.৯৯	৮.৫৯	৩২.১৩	২৬.৬৪	৫০.৬৯
সবজি	৮.৬৯	১৯.৬২	৫৪.৬৮	৬৫.৮৯	৫৪.০৮	৮৫.৬১
অতি ক্ষুদ্র চাষিদের অনুপাত (<০.৫ হে)	৩০.৮৯	২৭.৪২	৩০.৯১	৩৯.০৬	৪১.৮৮	৪৫.৪৫
ক্ষুদ্র চাষিদের অনুপাত (<১ হে)	৬১.৫৬	৬৭.৪৭	৬৩.৬৪	৮৪.৩৭	৭৪.৭১	৬৮.২৮
পরিবারের সদস্যপিছু চাষে নিয়োজিত শ্রমদিবসের সংখ্যা	৫১.৭৪	২৮.৩৩	৯৫.২৬	১৭২.৯৪	১২০.২৩	১৩৯.৪২

সারণি ১৩.৫ টবিট রিগ্রেশন মডেল

	ছেদক	পারিবারিক শ্রম	জোতের পরিমাণ	সেচ অঞ্চল	সার প্রতি হেক্টর	ডি১ বলাগড়	ডি২ বনগাঁ	ডি৩ হাসনাবাদ	ডি৪ গলসি	ডি৫ মেমারি
সহগ	০.৩৭৩	০.০০০১১	–০.০৩৮	০.০২৪	৬.০৩৭৯	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৫	০.২৭	০.২৬
	(১৭.২৭)	(৩.২৯)	(–২.১৭)	(২.৪৫)	(০.৩৭)	(১৪.৪৫)	(১৩.৬৫)	(১২.৬২)	(১০.৫৪)	(১০.২৪)

তৃণমূল স্তরে সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে নিজস্ব পরিমাপ।

সনাতন খাদ্যশস্য ও ফল-সবজি চাষে নিট আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তিনটি জেলার বাছাই-করা গ্রামের এবং বাছাই-করা চাষি পরিবারের উৎপাদিত খাদ্যশস্য, আলু ও সবজির মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করে আমরা বিভিন্ন শস্যের চাষে আলোচ্য চাষি-পরিবারের মাথাপিছু নিট আয়ের হিসাব করেছি। এই হিসাবটি জোতের মাপ অনুযায়ী নীচের সারণিতে উপস্থিত করা হল।

সারণি ১৩.৬ বিভিন্ন মাপের জোতে চাষি পরিবারের মাথাপিছু নিট আয় (হেক্টর-পিছু)

জোতের মাপ (হেক্টর)	মেমারি (সিডিআই)	গলসি (সিডিআই)	পান্ডুয়া (সিডিআই)	বলাগড় (সিডিআই)	বনগাঁ (সিডিআই)	হাসনাবাদ (সিডিআই)
০<০.৫	২৩২৫.২০	১৫৪১.২৩	৩৭৪২.৫৯	২০৮০.৮৩	১৪৫৮.২০	১২৫৩.৪৫
	০.৪৮	০.৫৫	০.৪৪	০.৬৫	০.৬০	০.৭৩
০.৫<১	৩৮০২.৬৬	৪৫৬৫.৬৪	৫৭৩১.৮৭	৩৮১৯.৯১	৩৩৫২.৭২	১২০৬.২৬
	৫১	০.৫৫	০.৪৪	০.৬৭	০.৭২	০.৬৯
১<২	৫৪০৪.৪১	৫১২১.৪৯	৭৪৬২.০১	৫১২০.৮০	১১৫৬.৫৭	২৯৪০.১২
	০.৪৬	০.৫৭	০.৪৮	০.৫৪	০.৭৩	১০.৫৫
২<৪	৫৬২৩.৩৬	৯১৩১.৪০	৫২৬৭.৬৯	২৬৩৬.৬৩	৮০৯.৭১	৪২৭০.৩৯
	০.৫৫	০.৫৭	০.৪৪	০.৫২	০.৭২	০.৬৪
গড়	৪০১০.৭৭	৪৪৮৯.১১	৫৮ ৪১.১৮	৩২২৭.৪০	১৯৪৯.৫৪	১৯৬০.৩৯
	০.৪৯	০.৫৫	০.৪৫	০.৬৪	০.৬৭	০.৬৮

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রথমত, চাষি পরিবারের মাথাপিছু আয় জোতের মাপ বাড়ার সঙ্গে ক্রমশ বেড়েছে। অর্থাৎ ছোট ও প্রান্তিক জোতের চাষি পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু আয় বড়দের তুলনায় কম এবং জোতের মাপ বাড়ার সঙ্গে আয় বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, শস্যবৈচিত্রের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে মাথাপিছু আয় কমেছে। যেসব চাষি-পরিবার মূলত সনাতন খাদ্যশস্যের উৎপাদনে তাদের জমির বেশি অংশ নিয়োজিত করে,

তাদের আয় সাধারণ খাদ্যশস্যের সঙ্গে ফল-সবজি চাষে যারা জমি নিয়োগ করে তাদের তুলনায় বেশি। অবশ্য সবধরনের চাষির মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম, দারিদ্রসীমার আয়ের থেকেও কম। শস্যবৈচিত্র বাড়লে সনাতন খাদ্যশস্যের ওপর কম জোর দেওয়ার ফলে মাথাপিছু আয় কমে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গেলে চাষি ফল-সবজি চাষ করে তাদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করে। আমরা 'অ্যানালিসিস অফ ভ্যারিয়ান্স' পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে এই পর্যবেক্ষণে উপস্থিত হয়েছি যে, আয়ের অসাম্য জোতের মাপের তফাতের তুলনায় স্থানগত তফাতের দ্বারা বেশি প্রভাবিত। জোতের মাপ যত ছোট, ততই প্রধান খাদ্যশস্য থেকে আয় অপ্রতুল হয় এবং ছোট চাষিকে ন্যূনতম আয় সুনিশ্চিত করার জন্য শস্যবৈচিত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এই প্রয়োজন আরও তীব্র হয় বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলগুলিতে, যেখানে সরকারি সেচের কোনও সুবিধা নেই। এই পর্যবেক্ষণ সাধারণভাবে সত্যি হলেও কোনও কোনও অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলাগড় ব্লকের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলাগড় অঞ্চলে সরকারি সেচের তত সুবিধা না থাকলেও এখানে চাষি ব্যক্তিগতভাবে বেসরকারি সেচের সাহায্য নেয়। তারা শ্রম ও অর্থবিনিয়োগ করে খাদ্যশস্য ছাড়াও হালকা ধরনের উচ্চমূল্যের ফল-সবজি ইত্যাদির চাষ করে, এবং তার মাধ্যমে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করে। ফলে এই অঞ্চলে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা যথেষ্ট বেশি।

আমরা সনাতন আউস, আমন ও বোরো ধান এবং সবজি চাষ থেকে ব্যবসায়িক আয় ও মুনাফার পরিমাণ ও প্রতি-টাকা বিনিয়োগের ওপর এই লাভের হার তুলনা করে দেখার চেষ্টা করেছি। দেখা যাচ্ছে সনাতন শস্য উৎপাদনের জায়গাগুলি, যেমন বর্ধমান ও হুগলি জেলার মেমারি, গলসি ও পান্ডুয়ার তুলনায় অধিক শস্যবৈচিত্রের অঞ্চল বলাগড়, হাসনাবাদ ও বনগাঁতে আউস ও আমন ধানে ব্যবসায়িক আয়ের পরিমাণ অনেক কম। অবশ্য বোরো ধানের ক্ষেত্রে চিত্রটি একরকম নয়। অধিক শস্যবৈচিত্রের দু'টি অঞ্চল বলাগড় ও বনগাঁয় অপেক্ষাকৃত কম শস্যবৈচিত্রের অঞ্চলগুলির তুলনায় ব্যবসায়িক আয় বেশি। ওদিকে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্রের অঞ্চলগুলির একটি, হাসনাবাদে অনুপাতে অনেক বেশি জমি সবজি চাষে নিয়োজিত, কিন্তু সবজি চাষ থেকে আয় ঋণাত্মক। অর্থাৎ সবজি চাষ করে চাষিদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বলাগড় সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। চাষ থেকে প্রকৃত উদ্বৃত্তের হার সংক্রান্ত ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা প্রতি-টাকা বিনিয়োগের ওপর লাভের পরিমাণ মাপার চেষ্টা করেছি। এটা মাপা হয়েছে ফসলের প্রকৃত মূল্য ও প্রকৃত উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করে (অর্থাৎ এখানে পরিবারের মানুষের নিজস্ব শ্রমের মূল্য উৎপাদন-ব্যয় থেকে বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে)। লাভের হারের ক্ষেত্রে যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হল, বিনিয়োগের ওপর মুনাফার হার একমাত্র সেই অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বেশি, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সেচের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিকাঠামোর সহাবস্থান ঘটেছে। প্রকৃত লাভের জন্য চাষির পক্ষে যথাযথ বাজারের নাগাল পাওয়া এবং যথাযথ দাম পাওয়া বিশেষ জরুরি, বিশেষ করে সবজি চাষের ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে, সনাতন শস্য চাষে নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে অধিক শস্যবৈচিত্রসম্পন্ন অঞ্চলের তুলনায় প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই আয় অনেক বেশি। সবজি চাষ এতই ব্যয়সাধ্য যে, পিছিয়ে-পড়া পরিকাঠামো আছে এমন অঞ্চলে বাজারের সুবিধা যথেষ্ট না থাকায় সবজি চাষে ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়। ফলে এইসব অঞ্চলে সবজি চাষে লাভের হার বজায় রাখা শক্ত।

সারণি ১৩.৭ বিভিন্ন শস্য চাষ থেকে আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান: সনাতন চাষ বনাম শস্যবৈচিত্র

		সনাতন চাষ এলাকা	সনাতন চাষ এলাকা	সনাতন চাষ এলাকা	শস্যবৈচিত্র অঞ্চল	শস্যবৈচিত্র অঞ্চল	শস্যবৈচিত্র অঞ্চল
		মেমারি	গলসি	পান্ডুয়া	বলাগড়	বনগাঁ	হাসনাবাদ
ব্যবসায়িক আয়	আউস ও আমন	২৯৪৩৬.১০	৩৯৩০৫.৬৮	২৮৩৩৭।৮৬	১৯৮২৮.১	২০৪৮৯.৩০	১৭১৫৭.১৪
	বোরো	৩৪৮১৯।৯৮	৩৩২২৯.০৮	২৩৬৬০.১৯	২৪৩৩০.৪২	২৩৩৫০.৫০	৩৮৫১৫.০০
	সবজি	২০৫২৪.১৪	১২৯৪১২.৯১	১৮৬০৬।৭১	২৯৪৪৯.০২	৩৮৮২২.৩৮	–৩৬০৮৬।৫৪
প্রতি টাকা বিনিয়োগে লাভ	আউস ও আমন	১.৪১	০.২৫	০.৭১	১.০৮	০.৯৬	২.০২
	বোরো	১.৯৫	১.৫৮	০.৮০	০.৮২	০.৯৮	৪.৩৫
	সবজি	১.৩৯	০.৩৩	১.২৪	০.৭১	০.৩৭	০.৩৫
মাথাপিছু নিট আয় টাকা		৪ ০১০.৭৭	৪৪৮৯.১১	৫৮৪১.১৮	৩২২৭.৪০	১৯৪৯.৫৪	১০৬০.৭৯

তৃণমূল স্তরে সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে নিজস্ব পরিমাপ।

সারণি ১৩.৮ শস্যবৈচিত্র ও খাদ্য সুনিশ্চয়তা, প্রতিদিনের গড় মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)

ব্লকের নাম	দানাশস্য	ডাল	সবজি	আলু	মাছ-মাংস
মেমারি	০.৫৬	০.০৩	০.১৩	০.১২	০.০৩
গলসি	০.৫৬	০.০৩	০.৩৭	০.২৮	০.০৬
পান্ডুয়া	০.৫৮	০.০২	০.১৮	০.৪০	০.১০
বলাগড়	০.৫৭	০.০৩	০.১৭	০.২১	—
হাসনাবাদ	০.৪৩	০.০৩	০.৩১	০.১৮	০.০৩
বনগাঁ	০.৫৭	০.০৩	০.১৩	০.১৪	০.০৪

উৎস: নিজস্ব সমীক্ষানির্ভর পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে নির্মিত।

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে কম শস্যবৈচিত্রের অঞ্চল পান্ডুয়াতে চাষি প্রতিদিন গড়ে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি পরিমাণ দানাশস্য, আলু ও মাছ-মাংস খেয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি শস্যবৈচিত্রের অঞ্চল হাসনাবাদের চাষির প্রতিদিনের গড় দানাশস্য বা মাছ-মাংস খাওয়ার পরিমাণ যৎসামান্য। তবে এই সবজি উৎপাদক অঞ্চলের চাষিরা প্রতিদিন গড়ে সবজি খায় অনেক বেশি। অন্য দু'টি বেশি শস্যবৈচিত্রের অঞ্চল বলাগড় ও বনগাঁ, সনাতন শস্যনির্ভর মেমারির তুলনায় কিছুটা বেশি পরিমাণে দানাশস্য, মাছ-মাংস ও সবজি খেয়ে থাকে। সেচের জল ও পরিকাঠামোর নিতান্ত অপ্রতুলতা হাসনাবাদে সনাতন দানাশস্যের চাষ থেকে আয় যেমন কমিয়ে রাখে, তেমনই তার দৈনিক গড় খাদ্যগ্রহণের পরিমাণও কমায়। ওই অঞ্চলে সবজি সংরক্ষণ ও বিক্রির মতো উন্নত পরিকাঠামো যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় চাষি সরাসরি সবজি খেয়ে তার অন্যান্য খাদ্যের অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারলেও সামগ্রিকভাবে তার পুষ্টির অভাব থেকেই যায়।

সারণি ১৩.৯ ফ্যাট, প্রোটিন ও ক্যালোরির মাথাপিছু ভোগ ও শস্যবৈচিত্র্য সূচক

	কম শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল	কম শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল	কম শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল	বেশি শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল	বেশি শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল	বেশি শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল
	মেমারি	পাণ্ডুয়া	গলসি	বলাগড়	বনগাঁ	হাসনাবাদ
কিলো ক্যালোরি	২২৪৭.৪৪	২৬৫৫.৩১	২৫৩৫.৯৯	২৩৯৭.৩৯	২৩১৩.১০	১৯২৯.৬১
প্রোটিন	৫৮.০৪	৭৩.৭৮	৭৩.৭৮	৬২.৫৩	৬০.৭২	৫২.৩৯
ফ্যাট	৪.৮৭	৭.৪৩	৭.৪৩	৫.৩৩	৫.২৬	৪.৭৪
শস্যবৈচিত্র্য সূচক	০.৪৯	০.৪৫	০.৫৫	০.৬৪	০.৬৭	০.৬৮

NSSO Report no ৪৭১(৫৫/১.০/৯), সংযোজন-বি থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের হার ব্যবহার করে আমাদের সংগৃহীত খাদ্য ভোগের তথ্য থেকে পুষ্টি ভোগের হিসেবটি নির্ণয় করা হয়েছে।

এই সমীক্ষাটিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপের জোতের অন্তর্গত চাষিরা খাদ্য থেকে প্রতিদিন গড়ে যে পুষ্টি[৯] পেয়ে থাকে তার হিসাব করা হয়েছে। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মেমারি থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে ব্যতিক্রম ধরে নিলে, কম বৈচিত্র্যের অঞ্চল থেকে যতই আমরা বেশি বৈচিত্র্যের অঞ্চলে যাচ্ছি, ততই চাষির বিভিন্ন পুষ্টি-উপাদান ভোগের পরিমাণ কমছে। কম শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল, যাদের আয় তুলনায় বেশি, তাদের মধ্যে পাণ্ডুয়া ও গলসির চাষিরা দারিদ্রসীমার ওপরে আছে এবং সে কারণে ন্যূনতম যতটা ক্যালোরি ও প্রোটিন আহার স্বাস্থ্যসম্মত তারা তার অধিক ভোগ করে। সবচেয়ে বেশি শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল হাসনাবাদের চাষিদের মাথাপিছু গড় পুষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম। এরা দারিদ্রসীমার অনেকটা নীচে আছে। অবশ্য বাকি দু'টি অধিক শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চল বলাগড় ও বনগাঁর অবস্থা হাসনাবাদের মতো অত খারাপ নয়। শস্যবৈচিত্র্য সত্ত্বেও হাসনাবাদের সেচ ও পরিকাঠামোগত অনুন্নয়নের অপপ্রভাব পড়েছে তাদের দৈনিক গড় পুষ্টিগ্রহণের মাত্রার ওপর। কিন্তু বলাগড় ও বনগাঁর চাষিরা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সাহায্যে সেচ ও পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার প্রভাব কাটিয়েছে। এদের পুষ্টির মাত্রা কম শস্যবৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল পাণ্ডুয়া বা গলসির তুল্য না হলেও এরা সেচের কাজে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ এবং পরিবারের সদস্যদের কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রায় ন্যূনতম নির্ধারিত পুষ্টি-সীমার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। হাসনাবাদের চাষিদের পরিবারের সদস্যরা আরও বেশি কঠিন পরিশ্রম করেও এই সীমার অনেক নীচে থেকে গেছে। [বেশি শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চলগুলিতে চাষিদের হেক্টর-প্রতি পারিবারিক শ্রমের পরিমাণ শুধু যে বেশি তাই নয়, পারিবারিক শ্রমদাতারা কম শস্যবৈচিত্র্যের অঞ্চলের তুলনায় বছরে গড়ে অনেক বেশি দিন জমিতে খাটে।] উপরের সারণি থেকে মনে হচ্ছে ক্যালোরি ও পুষ্টির পরিমাণের সঙ্গে শস্যবৈচিত্র্যের একটি বিপরীতগামী সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে-তথ্যটি বেরিয়ে আসছে তা হল, যে সব অঞ্চলে সরকারের জোগান দেওয়া সস্তা সেচের জল অপ্রতুল, সেখানে চাষিদের পক্ষে একটি-দু'টি সনাতন জলনির্ভর শস্য চাষ করে জীবন ধারণ অসম্ভব, এবং তাই তারা বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে শস্যবৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁকে। অপরপক্ষে বলাগড় ও বনগাঁর মতো অঞ্চল, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে সেচ-ব্যবস্থায় উন্নতি আনার উপায় আছে, সেইসব অঞ্চলে যদি পরিকাঠামো তুলনামূলকভাবে উন্নত হয় তাহলে চাষি আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে সেচের অসুবিধা কাটিয়ে শস্যবৈচিত্র্য আনে।

রাজ্যওয়ারি বিশ্লেষণ

রাজ্যওয়ারি বিশ্লেষণ পঞ্জাব দিয়ে শুরু করব। কারণ পঞ্জাবে শস্যবৈচিত্রকরণের অভিজ্ঞতা অনেক পুরনো, আবার সারা দেশের মধ্যে পঞ্জাবেই শস্যবৈচিত্রায়ণের প্রক্রিয়া থেকে আবার সনাতন চাল-গম-নির্ভর খাদ্যশস্যে বিশেষীকরণের দিকে ফিরে যাওয়ার নজির আছে। তাই ভারতের কৃষি অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থা শস্যবৈচিত্রের জন্য আবশ্যিক শর্তগুলিকে তৈরি করে এবং কোন অবস্থায় শস্যবৈচিত্রকরণের তুলনায় শস্য-বিশেষীকরণ বেশি সুবিধাজনক তা বুঝতে পঞ্জাবের উদাহরণটিই বেশি সহায়ক হবে।

পঞ্জাব সবুজ বিপ্লব এলাকা হিসেবে ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সবুজ বিপ্লবের কৃৎকৌশল পঞ্জাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব যে-বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল তা প্রধানত পঞ্জাবে গম উৎপাদনের অভাবনীয় উন্নতির কারণে। অন্যান্য ফসলের চাষ হলেও পঞ্জাব প্রধানত চাল-গম এই সনাতন জলনির্ভর শস্য চাষেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। চাল-গম ভিন্ন অন্য যে-পণ্যটি উৎপাদনে পঞ্জাব উল্লেখ্য, সেটি হল তুলা। ১৯৯৮–’৯৯ সালে পঞ্জাবের শতকরা ৭৪.৫ ভাগ জমিতে চাল-গমের চাষ হত, তুলার চাষ হত শতকরা ৯.২ ভাগ জমিতে। বাকি জমিতে অন্যান্য নানাপ্রকার পণ্য উৎপাদন হত। ভারতের সবুজ বিপ্লব অঞ্চলগুলি— উত্তর ভারতের পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, অন্ধ্র, ও মহারাষ্ট্র— গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি কৃষি-অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। পরিণামে বিপুল সংখ্যক ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহননের পথে যায়।

এই সংকটময় অবস্থার একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এর কারণ লুকিয়ে আছে সবুজ বিপ্লবের কৃৎকৌশলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। সবুজ বিপ্লবের কৃৎকৌশলের মূল কথা ছিল উপযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত জলের সহযোগে নতুন ধরনের বীজ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ। এই নতুন হাইব্রিড বীজ যেমন একদিকে উচ্চ উৎপাদনশীল, অন্যদিকে এই বীজের সঙ্গে আনুষঙ্গিক যেসব উপকরণ আবশ্যিক সেগুলি সবই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিশেষত এই আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে অতিরিক্ত যন্ত্র ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একদিকে দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমতে থাকে, অন্যদিকে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে চাষে স্থির পুঁজির ঘনত্ব বাড়ে। অর্থাৎ জমির একক-পিছু স্থির পুঁজির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদিত পণ্যের একক-পিছু উৎপাদন ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা ছোট ও প্রান্তিক চাষিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলে। একটি ট্রাক্টর যতক্ষণ ব্যবহার করলে তার ব্যবহার আর্থিক দিক থেকে পুষিয়ে যায়, জমির আয়তন ছোট হওয়ার ফলে ততটা মেটে না। ফলে উৎপাদনের একক-প্রতি ব্যয় বা প্রতি হেক্টর জমি চাষের ব্যয় যথাযথ অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি হয়। নয়া অর্থনীতির খোলা-বাজার নীতির কারণে কৃষিজ পণ্য দেশের বাজারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও অসম প্রতিযোগিতার শিকার হয়। চাল-গমের মতো কৃষিজ পণ্য দেশের বাজারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এর উপর জলের খরচ অত্যধিক বাড়ে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার চাষে অতিরিক্ত জলের ব্যবহারকে আবশ্যিক করে তোলে। ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার জল-স্তর নামিয়ে দেয় এবং জল তোলার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ’৯০-এর দশকের পঞ্জাবে জমির উৎপাদনশীলতা কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র

ইত্যাদি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কমে আসে, উৎপাদন-ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। চাষ অতিরিক্ত মূলধন-নির্ভর হয়ে ওঠার কারণে নিয়োগের মাত্রা কমে। চাল ও গম উৎপাদনে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমের নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতা শতকরা ০.২-এ নেমে আসে। এই বিশেষ অবস্থায় পঞ্জাবে জোল কমিটি ২০০২ সালে দ্বিতীয়বার যে শস্যবৈচিত্রকরণের পরামর্শ দেয় (প্রথমবার এই কমিটি ১৯৮৬ সালে একই পরামর্শ দিয়েছিল), তার মূল বক্তব্য, চাল ও গমের আওতায় থাকা ১০ লাখ হেক্টর জমি তৈলবীজ ও ডালের মতো উচ্চ মূল্যের হালকা ফসলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাষিদের কাছে এই পরামর্শ অনুযায়ী ডাল বা তৈলবীজের চাষ মোটেই লাভজনক মনে হয়নি। অধিকাংশ চাষি ধান-গম থেকে চাষ সরিয়ে নিয়ে যেতে রাজি ছিল না। ফলে প্রথমে সূর্যমুখী চাষে তাদের উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কোনও নতুন ফসল নিয়ে পরীক্ষাই চাষিদের শস্যবৈচিত্রে উৎসাহিত করতে পারে না। তাদের মধ্যে কয়েকজন বরং তুলা, ভুট্টা, ও আখ চাষে উৎসাহী ছিল। অবশেষে চুক্তি-চাষের মাধ্যমে শস্যবৈচিত্রে উৎসাহ দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে পেপসি কোম্পানি ভলটাস ও পঞ্জাব অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে পঞ্জাব কৃষিকে ধান-গমের মতো সনাতন শস্য থেকে সরিয়ে ফল-সবজির মতো বাগান-ফসলের চাষে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রকল্প পেশ করে, যা ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করেছিল। ১৯৮৬ সালেই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রথম যে-বিশেষজ্ঞ কমিটি পঞ্জাবে শস্যবৈচিত্রের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে, সেই কমিটির পরামর্শ ছিল, পঞ্জাবে ফল-সবজির আওতায় থাকা জমি শতকরা ২ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ভাগে নিয়ে যেতে হবে। তখন থেকে পঞ্জাবে ধীরে ধীরে পেপসি কোম্পানির একাধিক সহযোগী দেশি কোম্পানি শস্যবৈচিত্রকরণ, বিশেষ করে ফল-সবজি চাষের প্রসারে চেষ্টা চালায়। টম্যাটো, লংকা ও আলুতে চুক্তি-চাষ বিস্তৃত হয়। বহুজাতিক সংস্থা পেপসির সহযোগী হয়ে কয়েকটি দেশি কোম্পানি কাজ করতে থাকে। বিশাল টম্যাটো প্রক্রিয়াকরণ বহুজাতিক সংস্থা ইউনিলিভার-এর দেশি সহযোগী হিন্দুস্থান লিভার, ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা। তারাও পেপসির সঙ্গে সহযোগিতায় চুক্তি-চাষে অবতীর্ণ হয়। হিন্দুস্থান লিভার-এর পাশাপাশি নাইজের অ্যাগ্রো ফুড কোম্পানি টম্যাটো প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগ করে। এছাড়াও বহু বেসরকারি সংস্থা ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করার কাজ করে।

বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার ও সমবায়, বীজ সংরক্ষণ ও বীজ উৎপাদন সংস্থা, কৃষক ও সংগ্রাহক-প্রক্রিয়াকারক কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থকারীর ভূমিকা নেয়।

যদিও চুক্তি-চাষের মাধ্যমে শস্যবৈচিত্রকরণের প্রসার ঘটেছে এমন ভাবা হয়, আসলে শস্যবৈচিত্রকরণের ফলেই চুক্তি-চাষ প্রসার পায়। সনাতন শস্যের চাষ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে খাদ্যশস্যের জায়গায় ফল-সবজি চাষকেই চাষি নির্ভরযোগ্য মনে করে। কিন্তু ফল বা সবজির সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও তা বাজারজাত করার যথেষ্ট ভাল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত না হলে ওরকম পচনশীল ও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পণ্যকে লাভজনক করার জন্য জরুরি প্রক্রিয়াগুলোর সবটা মেটানো যায় না। এ থেকেই চুক্তি-চাষ ফল-সবজি চাষের পাশাপাশি একটি আবশ্যিক প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে প্রসার লাভ করে। কিন্তু পঞ্জাবের কৃষিতে আবার সেচের উন্নতি ও প্রকৌশলগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হলে চাল-গম নির্ভর কৃষি তার অলাভজনক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। দেখা যায়, চাল-গম নির্ভর চাষ অন্য পণ্যের তুলনায় অনেক কম ব্যয়বহুল শুধু নয়, এই চাষ কম ঝুঁকিপূর্ণ, সংরক্ষণের সুযোগ বা গুণমানে তফাত কম, ফলে নানা দিক থেকে কম

ব্যয়বহুল। অর্থাৎ চাষির পক্ষে কম অসুবিধাজনক হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বেশি। এ সবের মিলিত পরিণতিতে পঞ্জাবে শস্যবৈচিত্রকরণের মাত্রা কমতে থাকে। সারা পঞ্জাবে শস্যবৈচিত্রকরণের মাত্রা ১৯৭০–'৭১–এর মান ০.৭০৭ থেকে ২০০১–'০২ সালে ০.৫৯১-এ এসে দাঁড়ায়। ধান এবং গমের চাষ একদিকে ক্রমাগত আরও বেশি অঞ্চলে প্রসারিত হতে থাকে, অন্যদিকে উৎপাদনের দিক থেকে শস্যগুলির, অথবা বলা যায় খাদ্যশস্যেরই প্রাধান্য বাড়তে থাকে, তুলনায় কমতে থাকে অন্যান্য ফসলের গুরুত্ব। পঞ্জাবের সব অঞ্চলেই শস্যবৈচিত্রের মাত্রা কমে, তবে মধ্য পঞ্জাবের জেলাগুলিতে তা কমতে থাকে দ্রুততর গতিতে। এর ফলে পঞ্জাবে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়েকটি অঞ্চল বিশেষীকরণের দিকে অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলে বৈচিত্রকরণের মাত্রা ১৯৭০–৭১ সালে ০.৬২৫ থেকে ২০০১–০২ তে ০.৫০৮-এ নেমে আসে। পঞ্জাবের মতো কৃষি উৎপাদনে অত্যন্ত অগ্রসর একটি রাজ্যে শস্যবৈচিত্রায়ণে এই তথাকথিত পশ্চাদপদতা আরও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা দেখেছি, পঞ্জাবে জমির একক-পিছু বিনিয়োগের মাত্রা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। এখানে চাষ-ব্যবস্থা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতার নিরিখে ক্ষুদ্রচাষির উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। জোতের গড় মাপ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। অথচ এখানে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা তুলনায় যথেষ্ট কম। পঞ্জাব মূলত একটি গম ও চাল উৎপাদনকারী রাজ্য। সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি প্রয়োগের সার্থক উদাহরণ হিসেবে পঞ্জাবের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই প্রযুক্তির কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত যেমন ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োগ এখানে জলের অভাব ডেকে এনেছে ও জমির উৎপাদিকা শক্তিকে ক্রমশ কমিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের অতি ব্যবহারের সূত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বেড়েছে, স্থির পুঁজির ব্যবহার উচ্চ গতি পেয়েছে, ফলে প্রতি একক উৎপাদনে স্থির মূলধনের ব্যবহার অত্যধিক হওয়ায় একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় বাড়তেই থেকেছে। পঞ্জাবে স্বাভাবিক সেচের ব্যয়ও অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়ার প্রবণতা আরও তীব্র হয়েছে। এসবের ফলে '৮০-র দশকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গম-চালের মতো অধিক জলনির্ভর খাদ্যশস্যের বদলে উচ্চমূল্যের হালকা শাকসবজি-ফলমূল চাষের ওপর অধিক জোর দেওয়ার যে-পরামর্শ এসেছিল, ২০০২ সালেও সেই একই পরামর্শ আসে।

পঞ্জাব কৃষির এই বিশেষ উদাহরণটি রাজ্য স্তরে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সামনে আনে। চাষির কাছে কোন কোন কারণে ফল-সবজির মতো চাষ বেশি লাভজনক মনে হতে পারে এবং ভারতীয় কৃষিকে এই নতুন চাষ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করলে সামগ্রিকভাবে কৃষির ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ওপর তার প্রভাব কী এটি আলোচনার দাবি রাখে। আমরা রাজ্যওয়ারি তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করব।

আমরা যে তথ্যভিত্তিক পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ করেছি তার ফলাফল দিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে।

অনেক ক'টি রাজ্যেই মোটা দানাশস্য এবং মোট দানাশস্যে নিয়োজিত জমির অনুপাতের হ্রাস চোখে পড়ার মতো। খাদ্যশস্যেও এই হ্রাসের প্রবণতা কোনও কোনও রাজ্যে বেশ প্রকট। মোটা দানাশস্য সাধারণত বাজারে ধান-গমের মতো অন্য খাদ্যশস্যের তুলনায় কম দামে পাওয়া যায়। এই ধরনের শস্যের পুষ্টিগুণ বেশি হলেও এগুলি সাধারণত আর্থিকভাবে সম্পন্ন ভোক্তারা পরিহার করে চলে। এইসব শস্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র

মানুষের খাদ্য হিসেবেই পরিচিত। ১৯৮৮–৮৯ থেকে ২০১৬–১৭ এই চার দশকের মধ্যে এই শস্যগুলির উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির অনুপাত যতটা কমেছে তা অবশ্যই গরিব মানুষের খাদ্যনিশ্চয়তায় ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা বাদে প্রায় সব রাজ্যেই এই চার দশকে, বিশেষ করে শেষ দশকে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির শতকরা ভাগ নেমে গেছে। বেশি করে নেমেছে গুজরাত, মহারাষ্ট্রের মতো এগিয়ে থাকা রাজ্যে।

আমরা শস্যবৈচিত্র সূচকটি ব্যবহার করে ভারতের প্রধান ১২টি রাজ্যে চার দশকের শস্যবৈচিত্রের সূচক মেপেছি, যা নীচের সারণিতে দেওয়া হল। সূচকগুলিকে সারণিতে চারভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে: ক) >০.৮; খ) ০.৭ থেকে <০.৮; গ) >০.৬থেকে <০.৭; এবং ঘ) <০.৬। ’৮০ সাল থেকে ২০১৭ সাল অবধি গড় সূচকগুলিকে নীচে উপস্থিত করেছি।

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, কর্ণাটকে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা সবচেয়ে বেশি, তারপরই গুজরাত ও তামিলনাডুর স্থান। শস্যবৈচিত্রের মাত্রার দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাবের স্থান তার ঠিক ওপরেই, কিন্তু ’৮০ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা গড়ে ০.৩৭ থেকে ০.৫৫-এ উঠেছে। বিহার আর-একটি রাজ্য, যা শস্যবৈচিত্রের দিক থেকে পিছিয়ে। কিন্তু বিহারে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা আলোচ্য সময়ের মধ্যে যেখানে ০.৬০ থেকে বেড়ে ০.৭২-এ এসে দাঁড়িয়েছে, পঞ্জাবের শস্যবৈচিত্রের মাত্রা ০.৬৬ থেকে ০.৬০-তে নেমে এসেছে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের গড় শস্যবৈচিত্রের সঙ্গে জোতের গড় মাপের তুলনা করলে দেখা যায় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে মোটামুটি একটা ঋণাত্মক সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এই ঋণাত্মক সম্পর্কটি খুব বেশি স্পষ্ট নয়। যেসব রাজ্যে গড় জোতের মাপ কম, তুলনামূলকভাবে এই শেষ সাত বছরের গড় শস্যবৈচিত্রের মাত্রা সেখানে কম। রাজ্য-স্তরের এই পর্যবেক্ষণটি আমাদের জোত-স্তর সমীক্ষার সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করছে। জোত-স্তর সমীক্ষায়ও দেখা যায়, জোতের মাপের সঙ্গে শস্যবৈচিত্রের মাত্রার বিপরীতগামী সম্পর্ক। ছোট জোতগুলিই মূলত বেশি মাত্রায় শস্যবৈচিত্রের দিকে ঝোঁকে।

সারণি ১৩.১০ খাদ্যশস্য উৎপাদনে জমির শতকরা ভাগ ১৯৭৯–২০১৭ সালের মধ্যে (বিভিন্ন দশকের বাৎসরিক গড়)

রাজ্য	মোট কমদামের মোটা দানাশস্য				মোট খাদ্যশস্য				মোট দানাশস্য			
	১৯৭৯–৮০ থেকে ১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০ থেকে ১৯৯৮–৯৯	১৯৯৯–২০০০ থেকে ২০০৮–০৯	২০০৯–১০ থেকে ২০১৬–১৭	১৯৭৯–৮০ থেকে ১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০ থেকে ১৯৯৮–৯৯	১৯৯৯–২০০০ থেকে ২০০৮–০৯	২০০৯–১০ থেকে ২০১৬–১৭	১৯৭৯–৮০ থেকে ১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০ থেকে ১৯৯৮–৯৯	১৯৯৯–২০০০ থেকে ২০০৮–০৯	২০০৯–১০ থেকে ২০১৬১৭
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩.৯৭	৭.৯৩	৭.১৯	৫.০৩	৩৬.৯৫	৩৯.৬১	৩৯.৪০	৩৬.৭৮	২৯.৫২	২৫.৭২	২৬.৪৪	২৪.৪১
বিহার	৫.৬৩	৮.৪৭	৪.৫৭	৪.৬৫	৪৬.৩৭	৪৬.৮০	৪৬.৬৪	৪২.৭৪	৩৯.৩৪	৩৯.১৯	৪২.২১	৩৯.২৬
গুজরাত	১২.৫৪	১৩.৪৬	১১.৩২	৮.০২	৩৪.৭৫	২৮.৯৩	২৬.৬৭	২৫.০৬	৩১.০০	২১.৪৩	২১.২২	২০.১৩
হরিয়ানা	১০.৬৯	৭.৬৮	৬.৯৮	৫.২২	৪০.৬৮	৩৯.৭৪	৪০.৫২	৪০.১৬	৩৩.৫১	৩৪.৭৯	৩৮.৯২	৩৮.৯৮
কর্ণাটক	২০.৩০	১৭.৪১	১৭.৩২	১৫.৭৮	৩৩.৪৪	৩৩.৫৯	৩৪.৪২	৩৪.৪৭	২৪.৯৯	২৪.১৪	২৪.৮৪	২২.৭৭
মধ্য প্রদেশ	১০.৩৫	৭.১৯	৬.৫৫	৪.৫৬	৪১.৩৯	৪০.৩৪	৩৬.৯৯	৩৬.৬৫	২৯.২৭	২৬.৯৯	২৪.০৬	২২.৬৫
মহারাষ্ট্র	২০.৩৫	১৮.৫৬	১৭.৩৮	১৩.৬৮	৩৩.৮৫	৩৪.০২	৩২.৬১	২৯.৪৭	২৬.১৪	২৩.৭৫	২৩.৬১	২০.২২
ওডিশা	৪.০৮	২.০৪	১.৫৫	১.৪৮	৪৪.৯১	৪৬.৬৭	৪৭.৫৬	৪৩.৪৯	৩১.০৮	৩৪.৫৮	৪১.২১	৩৬.৫১
পঞ্জাব	৩.৪৩	১.৭৭	১.৩৮	০.৯৯	৪৪.৩৫	৪৫.৩২	৪৬.৬৩	৪৬.৪৮	৪২.১৫	৪৪.১২	৪৬.৩১	৪৬.২২
রাজস্থান	২০.৪৫	১৭.০৭	১৮.৭৭	১৬.৫৫	৩৬.৮৬	৩৬.০২	৩৪.৫২	৩৪.৭৪	২৬.২৩	২১.১৮	২৫.৬৫	২৪.৩৪
তামিলনাড়ু	১২.৪২	৮.৮৩	৯.০৬	৮.৫৫	৩৭.৫৯	৩৭.৭০	৩৮.৬২	৩৭.৩৯	৩০.৯০	২৮.৫৬	৩১.৩৪	২৯.১২

Source: Directorate of Economics and Statistics DAC&FW Website

সারণি ১৩.১১ বিভিন্ন রাজ্যে ’৮০ সাল থেকে ২০১৭ অবধি সূচকের দশকওয়ারি গড়

	১৯৮০–৯০	’৯০–২০০০	২০০০–১০	২০১০–১৭	জোতের গড় মাপ	সেচ–সেবিত অঞ্চলের ভাগ%
শস্যবৈচিত্র্য সূচক						
>০.৮						
গুজরাত	০.৮৫	০.৮৬	০.৮৫	০.৮৬	২.০৩	৪৭.০৮
কর্ণাটক	০.৮৭	০.৮৮	০.৮৯	০.৯১	১.৫৫	৩৪.১৮
মধ্যপ্রদেশ	০.৮৫	০.৮৪	০.৮২	০.৮৩	১.৭৮	৪৩.২৬
মহারাষ্ট্র	০.৭৯	০.৮১	০.৮০	০.৮৩	১.৪৪	১৮.২৩
তামিলনাড়ু	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৭	০.৮০	৫৬.৬২
>০.৭–< ০.৮						
হরিয়ানা	০.৭৯	০.৭৮	০.৭৪	০.৬৯	২.২৫	৮৯.১১
উত্তরপ্রদেশ	০.৮০	০.৭৬	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৬	৪৯.৪৫
রাজস্থান	০.৭৬	০.৭২	০.৬৯	০.৭৬	৩.০৭	৪১.৯৬
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৭৯	০.৭৮	০.৭৯	০.৮২	১.০৮	৫০.৫৩
>০.৬–<০.৭						
বিহার	০.৬০	০.৬০	০.৬৪	০.৭২	০.৩৯	৬৮.৬৫
পঞ্জাব	০.৬৬	০.৬৩	০.৬০	০.৬০	৩.৭৭	৯৮.৭২
<০.৬						
পশ্চিমবঙ্গ	০.৩৭	০.৩৬	০.৪২	০.৫৫	০.৭৭	৫৮.৮২

Source: Directorate of Econommics and Statistics

জেলা-স্তর বিশ্লেষণেও জোতের মাপের সঙ্গে শস্যবৈচিত্রের মাত্রার বিপরীতগামী সম্পর্ক দেখা গেছে। ফলে আমাদের এই রাজ্য-স্তর বিশ্লেষণকে আরও পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্ববর্তী বিভাগে আমাদের জোত-স্তর সমীক্ষার ফল এবং বিভিন্ন গবেষকের জেলা-নির্ভর বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যগুলির ভিত্তিতে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। এই বিভাগে আমরা রাজ্য-স্তর আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে ২০১০–১৭ এই সাত বছরের গড় শস্যবৈচিত্রের মাত্রাকে নির্ভরকারী উপাদান ধরে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই মাত্রার সাপেক্ষে সেচ, পরিকাঠামো, কৃষি-জোতের মাপ ও পারিবারিক শ্রম ইত্যাদি নির্ধারক উপাদানগুলির ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেছি। রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট কালপর্বে এই সূচকের

মানের তফাত নির্ণয়ে এই বিভিন্ন উপাদানের পরিসংখ্যানগত গুরুত্ব মাপার জন্য টবিট রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি ১৩.১২ শস্যবৈচিত্রের নির্ণায়ক উপাদান

	ছেদক	সেচ	পারিবারিক শ্রম	জোতের পরিমাণ	বাজার	জাতীয় সড়ক
সহগ	০.৭৫৩০	–০.০০০০১৫	–০.০০০২৪	–০.০১৪১১	–০.০০০০৯২	০.০০০০২৮
টি–ভ্যালু	৭.০৮	–৩.৭৮	–০.৯২	–০.৭২	–১.০৪	৫.১২

উৎস: নিজস্ব গবেষণা

দেখা যাচ্ছে, শস্য বৈচিত্রের ওপর সেচের ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে। যার অর্থ, সরকারি সস্তা সেচের ব্যবস্থা ভাল থাকলে সনাতন জলনির্ভর শস্যের ওপরই চাষি নির্ভর করে। এই ধরনের সেচের জল কম সুলভ হলে, সনাতন জলনির্ভর শস্যের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে চাষির পক্ষে চাষ থেকে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে চাষি শস্যবৈচিত্রের মাত্রা বাড়িয়ে সবজি ইত্যাদি চাষ মারফত লাভের হার বজায় রাখার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে পরিকাঠামোর গুরুত্ব মাপার জন্য আমরা নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ও রাজ্যের আয়তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য, এই দুটি উপাদান সংক্রান্ত তথ্য বিবেচনা করেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শস্যবৈচিত্রের সূচকটির মানের তফাত সৃষ্টিতে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্যের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জোত-স্তর আলোচনায় দেখেছি শস্যবৈচিত্রের গুরুত্ব যেসব অঞ্চলে বেশি, সে সব অঞ্চলে চাষি তার ন্যূনতম পুষ্টির পাওয়ার মতো খাদ্যও জোগাড় করতে পারে না। আমরা আমাদের রাজ্য-স্তর আলোচনা থেকে দেখার চেষ্টা করব এই হালকা উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু খাদ্যের লভনীয়তা কতটা কমেছে।

নীচের সারণিতে আমরা ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৭ সাল অবধি, প্রতি পাঁচ বছরে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি হার, প্রতি পাঁচ বছরের বাৎসরিক গড় সুলভতা এবং এই গড় সুলভতা হ্রাস-বৃদ্ধির হার উপস্থিত করেছি।

খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় সুলভতা ১৯৯৫-এর পর থেকে ক্রমাগত কমেছে। ২০০৫–১০-এর গড় সুলভতা ছিল ১৯৬১–৬৬ সালের গড় সুলভতার থেকেও কম। ’৮০-র দশকে কৃষি-উৎপাদনের হার কিছুটা বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের সুলভতার ওপর এর প্রভাব ’৯০-এর দশকের প্রথম পাঁচ বছর অবধি স্থায়ী হলেও ১৯৯৫-এর পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি কমতে থাকে, ফলে খাদ্যশস্যের সুলভতার প্রতি পাঁচ বছরের গড় কমতে দেখা যায়। ওই সময়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা বিশেষভাবে কমে আসে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বিভিন্ন রাউন্ডে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী (ডেটোন এবং দ্রেজ ২০০৯)[১০] ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ পরিবারের মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা ছিল ২২৪০, ১৯৮৭–৮৮ সালে কমে

দাঁড়ায় ২২৩৩ এবং ২০০৪–০৫-এ তা নেমে আসে ২০৪৭-এ। অর্থাৎ ১৯৮৩ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে গ্রামীণ পরিবারের মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা শতকরা ৮.৬ ভাগ কমেছে। শহরের মানুষের মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রাও কমে, কিন্তু গ্রামের তুলনায় অনেক কম, শতকরা ২.৪ ভাগ। ওই একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের মাত্রাও কমে শতকরা ১২.১ ভাগ, শহরে কমে শতকরা ৪.৬ ভাগ। কিন্তু ওই একই সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয় গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ হারে বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রতি ১০০০ ক্যালোরি পিছু প্রকৃত ব্যয়ের মাত্রা বাড়ে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার দেওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ডেটন ও দ্রেজ-এর এই পর্যবেক্ষণটি যদিও দারিদ্রসীমা নির্ণয়ে ও সুস্থতার বিচারে ক্যালোরির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে নানা বিরুদ্ধ-মতামতের অবতারণা করেছিল, তবুও আমাদের মতে ন্যূনতম ক্যালোরির সংস্থান না থাকাটা দুঃস্থতার লক্ষণ। উচ্চ আয়-বিশিষ্ট অনেক মানুষই আজকাল ইচ্ছাকৃত ভাবে খাদ্যে ক্যালোরির মাত্রা কম রাখতে চেষ্টা করে ও সেই অনুযায়ী আহারের অভ্যাস পালটে দানাশস্যের পরিবর্তে বেশি করে ফল-সবজি খেয়ে থাকেন। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ, যেমন গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক চাষি বা কৃষি-শ্রমিকের পক্ষে খাদ্যসামগ্রী বাছাইয়ের সময় কম দামি খাদ্য থেকে বেশি দামি খাদ্যসামগ্রীর দিকে যাওয়া হয়তো ইচ্ছাকৃত না-ও হতে পারে। আমাদের জোত-স্তর আলোচনায় ধরা পড়েছে যে, ছোট জোতের চাষিরা যে-খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, ফলে তাদের ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প। গ্রামীণ মানুষ কেন তার সাধ্যের মধ্যে দৈনিক আহার থেকে যথেষ্ট পুষ্টি পাচ্ছে না তার নানাবিধ কারণের কয়েকটি হল: গ্রামীণ মানুষের বেকারত্ব, কৃষি-শ্রমিকের নিয়মিত যথেষ্ট কাজ না পাওয়া, খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি, মোটা দানাশস্যের উৎপাদন হ্রাস, ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রতুলতা, এবং তার জায়গায় ফল-সবজির মতো হালকা উচ্চমূল্যের খাদ্যের প্রসার, নতুন নানা শিল্পজাত খাদ্য ও ভোগ্যসামগ্রীর আবির্ভাব ও গণমাধ্যমে সেসবের বিজ্ঞাপন ও প্রচার, সাধারণভাবে গ্রামে মেলে এবং সস্তা এমন খাদ্যের সুলভতা কমে আসা, ইত্যাদি।

সারণি ১৩.১৩ খাদ্যশস্যের সুলভতা

	খাদ্যশস্যে পাঁচ বছরের গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি হার %	বাৎসরিক গড় সুলভতা (মাথাপিছু) (কেজিতে)	আগের পাঁচ বছরের তুলনায় গড় বাৎসরিক সুলভতার বৃদ্ধি/হ্রাস %
১৯৫১–'৫৬	১.৮৭	১৫০.৮৫	–
১৯৫৬–'৬১	১.৭১	১৬৪.৮৫	৯.২৮
১৯৬১–'৬৬	–২.৫৮	১৬০.০০	–২.৯৪
১৯৬৬–'৭১	২.৯৬	১৬০.০৫	০.০৩
১৯৭১–'৭৬	–১.৮৪	১৬৩.২০	১.৯৬
১৯৭৬–'৮১	১.৩৭	১৬০.৬৫	–১.৫৬
১৯৮১–'৮৫	–০.০৬	১৬৫.৭৫	৩.১৭
১৯৮৫–'৯০	০.৮৪	১৬৯.০০	১.৯৬
১৯৯০–'৯৫	০.৯৬	১৭৫.৩৩	৩.১৫
১৯৯৫–'০০	–১.৬৪	১৭২.৮৩	–১.৪২
২০০০–'০৬	–১.৪১	১৬৩.৫০	–২.২৩
২০০৫–'১০	০.৬৮	১৫৯.৮৫	–৫.৪০
২০১০–'১৫	১.২৯	১৭১.২৬	৭.১৪
২০১৫–'১৭	৪.৩৮	১৬৮.৬৬	–১.৫২

Source: Directorate of Economics and Statistics

মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে দারিদ্রসীমা-নির্ধারিত ন্যূনতম ক্যালোরিরও নীচে পুষ্টি পাওয়া গ্রাম ও শহরবাসী পরিবারগুলির শতকরা অনুপাত উপস্থিত করেছি নীচের সারণিতে। এখানে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে ডেটন ও দ্রেজের (২০০৯)[১১] হিসাব ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, ১৯০৫ থেকে ২০০৪–০৫-এর মধ্যে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পৌষ্টিক দীনতার মধ্যে বাস করত। ১৯৮৩-র পর, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এই অনুপাতটির মান বেড়েছে, যদিও তাঁদের হিসাব অনুযায়ী শহরাঞ্চলের জনসংখ্যায় তা সেভাবে বাড়েনি। আমরা ডেটোন ও দ্রেজ-এর হিসাবটি নীচের সারণিতে উপস্থিত করেছি।

সারণি ১৩.১৪ মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে মাথাপিছু ২১০০ ক্যালোরি ও গ্রামে ২৪০০ ক্যালোরি ভোগ করতে অপারগ মানুষের শতকরা অনুপাত

বছর	(এন এস এস ও) রাউন্ড	গ্রামীণ	শহরের	সারা ভারতে
১৯৮৩	৩৮	৬৬.১	৬০.৫	৬৪.৮
১৯৮৭—'৮৮	৪৩	৬৫.৯	৫৭.১	৬৩.৯
১৯৯৩—'৯৪	৫০	৭১.১	৫৮.১	৬৭.৮
১৯৯৯—২০০০	৫৫	৭৪.২	৫৮.২	৭০.১
২০০৪—'০৫	৬১	৭৯.৮	৬৩.৯	৭৫.৮

(একজন মানুষের দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্যালোরির পরিমাণের ভিত্তিতে দারিদ্র্যরেখার হিসেব করা হয়। ধরা হয় শহরের মানুষের দৈনিক প্রয়োজন ন্যূনতম ২১০০ ক্যালোরি এবং গ্রামের মানুষের জন্য ২৪০০ ক্যালোরি)

Source: NSSO Report

আমাদের জোত-স্তর সমীক্ষায় আমরা এই ইঙ্গিত পেয়েছি, যে-সব ক্ষুদ্র চাষি সেচের সুবিধা না থাকায় একটি/দু'টি শস্যের ওপর নির্ভর না করে শস্য-ফল-সবজি সহ নানাধরনের হালকা ও উচ্চমূল্যের ফসল তৈরি করে, তারা চাষের কাজে যথেষ্ট পারিবারিক শ্রম দিয়েও ন্যূনতম পুষ্টি পাওয়ার মতো খাদ্যসামগ্রী ভোগ করতে পারে না।

তথ্যসূত্র

১. *World Bank Report*. 2005.

২. Sing, S. 2004. "Crisis and Diversification in Punjab Agriculture." *EPW*. (25th December, 2004).

৩. Joshi, P. K., A. Gulati, P. S. Birthal, L. Tewari. 2004. "Agriculture Diversification In South Asia: Patterns, determinates and policy implications." *Economic and Political Weekly*. (12th June 2004).

৪. তদেব, এছাড়াও

Singh, Joginder and R. S. Sidhu. 2004. "Factors In Declining Crop Diversification: Case Study of Punjab." *Economic and Political Weekly*. vol 39, no 52.

Rao, P. P., P. S, Birthal, P. K. Joshi. 2006. "Diversification towards high value agriculture." *Economic and Political weekly*. vol 41, no 26.

৫. Rao, C. H. H. 2000. "Decline in demand for Foodgrains in Rural India." *Economic and Political Weekly*.

৬. Rajuladevi, A. K. 2001. "Food Poverty and Consumption among Landless labour households." *Economic and Political Weekly*. (22nd January, 2001)

৭. *A Study on Transformation of Indian Agriculture in the Post Doha* (2001) Scenario by Aparajita Mukherjee and Saumya Chakrabarti, under the research project sponsored by South Asia Network of Economic Research Institutes, World Bank GDN, 2001.

৮. বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলির মান মাপার উদ্দেশ্যে আমরা খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানে পরিবর্তন করার জন্য এন এস এস ও (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা)-র দেওয়া নির্দিষ্ট পরিবর্তনের হারগুলি ব্যবহার করেছি।

৯. তদেব

১০. Deaton, Angus and Jean Drèze. 2009. "Food and Nutrition in India: Facts and Interpretation." *Economic and Political Weekly*. (14th Februray, 2009)

১১. তদেব

১২. তদেব

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতীয় কৃষির তুলনামূলক অবস্থান

বিশ্বের মোট কৃষিজমির শতকরা ১১ ভাগ রয়েছে ভারতে। এইদিক থেকে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পিছনে। আর গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের স্থান প্রথম, বিশ্বের মোট গ্রামবাসী জনগণের শতকরা ২৫.৬ ভাগের বাস ভারতে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা ১০.২ ভাগ উৎপাদিত হয় ভারতে এবং গম ও ধানের ক্ষেত্রে হিসাবটি যথাক্রমে শতকরা ১১.৭ ভাগ ও শতকরা ২১.১৫ ভাগ। মোট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়, চিন ও আমেরিকার ঠিক পরেই। গম ও ধান উৎপাদনে ভারত আছে দ্বিতীয় স্থানে, চিনের ঠিক পরে। শুধুমাত্র ডাল উৎপাদনেই ভারতের স্থান বিশ্বে প্রথম, বিশ্বের শতকরা ২২.৫ ভাগ এ দেশে উৎপাদিত হয়। তেমনই চিনাবাদাম ও আখ উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, কিন্তু পাট ও পাটের মতো দড়ির উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। ভারত একাই বিশ্বের মোট পাটের শতকরা ৫৪ ভাগ উৎপাদন করে থাকে। যদিও ভারত তুলাচাষে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে আছে, চিনের স্থান ভারতের ঠিক আগে, ভারত একাই মোট উৎপাদিত তুলার শতকরা ২৬.২ ভাগ উৎপাদন করে। চা উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয়, কফি উৎপাদনে ষষ্ঠ। অর্থাৎ কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর অগ্রণী দেশ। এমনকী শাকসবজি, ফলমূল, আলু-পিঁয়াজ উৎপাদনেও ভারত আছে দ্বিতীয় স্থানে, চিনের ঠিক পরেই। ভারতের এই অবস্থানের পিছনে রয়েছে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বের মোট কৃষিজমির বড় অংশ রয়েছে ভারতে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এইসব বিভিন্ন ফসলের আওতায় থাকা কর্ষণযোগ্য মোট কৃষি-জমির বিশাল অংশ ভারতে থাকলেও জমির উৎপাদিকা শক্তির বিচারে ভারত বিভিন্ন দেশের থেকে অনেকটাই পিছনে রয়েছে। চিন যেখানে প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদন করে ৬৮৯১ কেজি, ভারত প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদন করে মাত্র ৩৬০৮ কেজি। যদিও ডাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান প্রথম, কিন্তু ভারতে প্রতি হেক্টর জমিতে ডাল উৎপাদনের হার চিন, মিয়ানমার, ইথিওপিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা— এই প্রতিটি দেশের অর্ধেকেরও কম। সব ফসলের ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। অথচ সার ব্যবহারের তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান করে আমরা দেখব, ভারতে প্রতি হেক্টর চাষের জমিতে সার ব্যবহারের গড় অনেক দেশের থেকে যথেষ্ট বেশি। নীচের সারণি থেকে বিভিন্ন দেশের কৃষি-জমিতে হেক্টর-পিছু সারের ব্যবহার ও বিভিন্ন ফসল চাষে নিযুক্ত হেক্টর-প্রতি জমিতে ভারত অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বেশি সার প্রয়োগ করে। অথচ ভারতে বিভিন্ন শস্যে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ ভারতে সম্ভবত প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সার ব্যবহার হয়ে থাকে।

সারণি ১৪.১ হেক্টর-পিছু সারের ব্যবহার ও হেক্টর-প্রতি উৎপাদনশীলতা (সার: কেজি। উৎপাদনশীলতা: কেজি/হেক্টর)

	সারের ব্যবহার	বিভিন্ন শস্যে বিভিন্ন দেশে উৎপাদনশীলতা কেজি/হেক্টর					
	কেজি/হেক্টর	ধান	গম	চিনাবাদাম	ডাল	আখ	ভুট্টা
বিশ্বে মোট	৩৭.৫	৪৬০৪	৩৩১৭	১৬৮২	৯৫০	৭০৭৬৪	৫৫৩৮
ভারত	১৪৯.০	৩৬০৮	২৭৫০	১৪৮৫	৬৪৭	৭১৪৬৬	২৫৯৭
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫২.১		২৯৩০	৪৪৫২	১৮১৩		১০৫৭২
কানাডা	৬০.৪		২৮৮১		১৮৬৭		১০৩৩৭
ব্রিটেন	৮৬.৮						
স্পেন	৬৫.৭						
ফ্রান্স	১০৬.১		৭৮০১				
জার্মানি	১৪৩.৩		৮০৮৮				
অস্ট্রেলিয়া	৬.০		১৯১৭				
চিন	৯৯.৩	৬৮৯১	৫৩৯৩	৩৫৬২	১৭৪১	৭৩১২১	৫৮৯৩
জাপান	২০৭.১						
ব্রাজিল	৪৬.৩				১০৭৪	৭৪২০৩	৫৫৩৬
মেক্সিকো	১৮.৬					৭৩০২৩	৩৪৭৮

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

দেখা যাচ্ছে, ভারতে হেক্টর-পিছু সারের ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি, অথচ ভারতে কোনও একটি শস্যের ক্ষেত্রেও জমির হেক্টর-পিছু উৎপাদন অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভারত এখানে উল্লিখিত সব দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, বিভিন্ন ফসল চাষের আওতায় থাকা মোট জমি বা মোট উৎপাদনের দিক থেকে ভারত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় দ্বিতীয় অথবা প্রথম স্থানে রয়েছে। আমরা যে-দেশগুলির সঙ্গে ভারতের উৎপাদনশীলতার তুলনা করেছি তারা মোট উৎপাদনের দিক থেকে অথবা বিশ্বের মোট উৎপাদনে তাদের অংশের দিক থেকে ভারতের কাছাকাছি আছে। এইসব দেশে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা ভারতের তুলনায় অনেক বেশি, যদিও বিশ্বের মোট উৎপাদনে অবদানের নিরিখে এদের অধিকাংশই ভারতের থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। আমরা দেখেছি, সার বা জমির উৎপাদিকা শক্তিবর্ধক উপকরণ প্রয়োগে ভারত মোটেই পিছিয়ে নেই। চাষের জমির উৎপাদিকা শক্তির

হ্রাস-বৃদ্ধি আরও যে-দু'টি উপাদানের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেগুলি হল মাটির স্বাভাবিক গুণ ও নিয়মিত সেচের সুবিধা। কৃষিতে হেক্টর-পিছু বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ও এই বিষয়ে পৃথিবীর কৃষিতে উন্নত রফতানিকারী দেশগুলির তুলনায় ভারতের অবস্থান সম্পর্কে পরে আলোচনা করব, তার আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের তুলনামূলক অবস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

ভারত বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি ব্রিক[১] জোটের অন্তর্বর্তী দেশ এবং বিশ্বের প্রধান 'উদীয়মান জাতীয় অর্থনীতি'গুলির একটি। রফতানকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে বিশ্বে ভারতের অবস্থান ১৮তম স্থানে। ভারতের মোট রফতানির মূল্য তার অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৩.৭ ভাগ। ভারতে গত ১৫ বছরে বহির্বাণিজ্যে অনেকটা বাণিজ্য-ঘাটতি জমা হয়েছে। ২০০৩–'০৪ সালে বাণিজ্যে ৩৪০ মিলিয়ন ডলার বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে বাণিজ্য-ঘাটতি দেখা যায় ও তা বাড়তে থাকে। ফলে ভারত এখন ৮৮.১ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য-ঘাটতির দেশ। অবশ্য কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ এই বাণিজ্য ঘাটতিকে উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করেন। বর্তমানে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৬৫৭০ ডলার, বিশ্বের ৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৭২তম।

সারণি ১৪.২ ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কৃষিক্ষেত্রের তুলনা

দেশ	জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ	উৎপাদনকারী কর্মীদের মধ্যে কৃষি কর্মীর অংশ (শতাংশ)	মাথাপিছু কর্ষিত জমি (হেক্টর)	কর্ষিত জমি মোট জমির শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
ভারত	১৫.৪	৪২.৭৪	০.১২	৫২.৬
ব্রিটেন	০.৬	১.১১	০.০৯	২৪.৯
উত্তর আমেরিকা	০.৯	১.৬৬	০.৪৭	১৬.৬
জাপান	১.৯২	৩.৪৯	০.০৩	১১.৫
ফ্রান্স	১.৫১	২.৮৭	০.২৭	৩৩.৫
চিন	৭.৯২	১৭.৫১	০.০৯	১২.৭
ইন্দোনেশিয়া	১৩.১৪	৩১.১৭	০.০৯	১৩.০
মেক্সিকো	৩.৪২	১৩.১১	০.১৮	১১.৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.২৯	৫.৫৫	০.২২	১০.৩
আর্জেন্টিনা	৫.৬১	০.৫৪	০.৯০	১৪.৩

সারি ২ ও ৩-এর সংখ্যাগুলি ২০১৭ সালের।

উৎস: World Development Indicators, World bank
সারি ৩ ও ৪-এর সংখ্যাগুলি ২০১৬ সালের।
উৎস: World Bank

ভারতের প্রধান পাঁচটি রফতানি পণ্যের মধ্যে চাল ও কাঁচা চিনির স্থান যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম। বিশ্বে চালের বাৎসরিক মোট রফতানির শতকরা ২৬.৭ ভাগ রফতানি করে ভারত। বিশ্বে চাল রফতানির বাজারে ভারতের সবচেয়ে কাছের প্রতিযোগী হল তাইল্যান্ড, বিশ্বের চালের বাজারে সে দেশের অবদান শতকরা ২১.৯ ভাগ। সম্প্রতি ইরান বাসমতি চাল আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ফলে চালের রফতানিক্ষেত্রে ভারত আরও সুবিধাজনক অবস্থায় চলে যাবে, কারণ ইরান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় চাল আমদানিকারি দেশ। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম চিনি রফতানিকারী দেশ। বিশ্বের বাৎসরিক ২৫ বিলিয়ন ডলার চিনির বাজারে ভারতের অবদান শতকরা ৫.৯ ভাগ। ব্রাজিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চিনি রফতানিকারী দেশ। বিশ্বের চিনির বাজারে ব্রাজিলের অবদান শতকরা ৪২.৪ ভাগ।

সারণি ১৪.৩ বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের ভূমিকা

বছর	দ্রব্য রফতানিতে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অবস্থান (শতকরা)	বাণিজ্যিক সেবা রফতানিতে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অবস্থান (শতকরা)	দ্রব্য রফতানি + বাণিজ্যিক সেবা রফতানিতে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অবস্থান (শতকরা)
২০১১	১.৭	৩.২	১.৯
২০১২	১.৬	৩.২	১.৯
২০১৩	১.৭	৩.১	২.০
২০১৪	১.৭	৩.১	২.০
২০১৫	১.৬	৩.৩	২.০

তথ্যসূত্র: World Bank

২০১৩ সালের পর বিশ্বের মোট রফতানি পণ্যে ভারতের অংশ বেড়েছিল এবং ২০১৩ থেকেই সেবা ও পণ্য উভয় মিলিয়ে ভারতের অংশ বেড়েছে।

১৯১৭ সালে পৃথিবীর মোট রফতানিতে ভারতের অংশ ছিল শতকরা ১.৬৮ ভাগ। এবং মোট আমদানিতে ভারতের অংশ ছিল শতকরা ২.৪৮ ভাগ। ২০১৬ সালে ভারতের মোট রফতানির শতকরা ১২ ভাগ ছিল কৃষিজাত পণ্য, এবং শতকরা ৭০.৫ ভাগ ছিল অ-কৃষিজাত পণ্য। আমদানির ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্যের ভাগ ছিল শতকরা ৮.১ ভাগ ও অ-কৃষিজাত পণ্যের ভাগ ছিল ৫১.৭ ভাগ। ভারতের রফতানির প্রধান গন্তব্য ছিল ইউরোপীয় দেশগুলি, চিন ও সংযুক্ত আরবশাহির দেশ এবং ভারতের আমদানির প্রধান

উৎস ছিল চিন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব। ২০১০ সাল থেকে ’১৭ সালের মধ্যে ভারতের রফতানি ও আমদানি উভয়ই প্রতি বছর গড়ে শতকরা ১৫ ও ১৬ ভাগ হারে হ্রাস পায়।

নীচের সারণিতে আমদানি ও রফতানি পণ্যের বিশ্ববাজারে কয়েকটি প্রধান দেশের উল্লেখ করা হয়েছে ও এদের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ জানানো হয়েছে। আমরা ২০০৫–২০০৯ পর্যন্ত আমদানি/রফতানির গড় মূল্য ও পরিমাণের উল্লেখ করেছি। দেখা যাচ্ছে, ২০০৫–২০০৯ অবধি ভারতের রফতানি বাণিজ্যের প্রধান গন্তব্য ছিল সৌদি আরব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম। আমদানি বাণিজ্যের প্রধান উৎস ছিল মিয়ানমার, আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা।

সারণি ১৪.৪ বহির্বাণিজ্যে ভারতের স্থান

রফতানি	গড় বাণিজ্যমূল্য ’০৫–’০৯ (মি ডলার)	গড় বাণিজ্যমূল্য ’১০–’১৮ (মি ডলার)	গড় বাণিজ্য পরিমাণ (হাজার টন) ’০৫–’০৯	গড় বাণিজ্য পরিমাণ (হাজার টন) ’১০–’১৮	বৃহত্তম রফতানি/আমদানি সহযোগী ’০৫–’০৯	বৃহত্তম সহযোগী ’১০–’১৮	সহযোগীর অংশ ’০৫–’০৯ (শতকরা)	সহযোগীর অংশ ’১০–’১৮
চাল	২১৩৭		৪২৮৭		সৌদি আরব		২৪.৬	
পশুখাদ্য	১৬৩৬		৬১৮৮		ভিয়েতনাম		২৩.৪	
ক্রাস্টিন মোলাসেস	১০৯৩		২৩৭		আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র		২১.৬	
ফলও বাদাম	৯৪৩		৬৮৬		যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা		২২.৯	
মাংস	৮২৬		৪৬৪		ভিয়েতনাম		১৫.৩	
আমদানি								
সবজি	১২৫৭		২৬৫০		মিয়ানমার		৩৯.৩	
ফল ও বাদাম	৯৩৫		১০৬৬		আমেরিকা		১৯.০	
গম	৩৭৪		১৪৪০		রাশিয়া		৪০.৩	
চিনি, গুড়, মধু	২৫৮		৭১৩		ব্রাজিল		৭৪.০	
মশলা	১৫০		১০৬		শ্রীলঙ্কা		২৫.১	

A. Caglianin and A.Rush,Economic Development and Agriculture n India, Reserve Bank of Australia, Bulletin June Quarter, 2011

তথ্যসূত্র

১. BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় কৃষির সংকট

জমি অধিগ্রহণ ও অ-কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ, বেকারত্ব, অ-কৃষি গ্রামীণ অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে থাকা অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে। আমরা দেখেছি, ভারতের কৃষির উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক, উভয়ের বিকাশেই পুঁজিবাদী গতিশীলতার অভাব রয়েছে। প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকার সময় ভারতে ভূমিসম্পর্কের কাঠামোয় কোনও বড় মাপের বিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার সময়েও দেশি পুঁজিপতি শ্রেণির দিক থেকে কোনও নেতৃত্বব্যঞ্জক ভূমিকা ছিল না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, এবং তার ফলে সবচেয়ে উপরের স্তরের বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটির অবসান ঘটলেও, তার পরবর্তী স্তর, অর্থাৎ ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থের সহযোগে গড়ে ওঠা নতুন ব্যবসায়ী জোতদার শ্রেণিটি থেকে উদ্ভূত দ্বিতীয় স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটির প্রাধান্য থেকে যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এদের হাতেই সবচেয়ে বড় জোতগুলির মালিকানা থাকে, কখনও কখনও এরা অনুপস্থিত জোতদার হিসেবে বর্গায় বা স্থির পণ্য-খাজনা বা অর্থ-খাজনায় চাষির হাতে জমি দিয়ে নিজেরা নানা ধরনের ব্যবসা বা অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত থাকে। কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতাপুষ্ট পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। এই শ্রেণিটি স্বাধীনতার আগে জন্ম হওয়া ব্রিটিশ বৃহৎ পুঁজির সহযোগিতাকামী ও সহযোগিতাপুষ্ট দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে একত্রে দেশের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে ও অ-প্রকাশ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে প্রভাব খাটাতে থাকে। এদের একটি অপেক্ষাকৃত কমজোরি ছোট অংশ গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণের বাজারে একাধারে জমির মালিক জোতদার-ব্যবসায়ী-মহাজন হিসেবে উপস্থিত থাকে। আমরা দেখেছি, ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে কৃষিপণ্য, কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণের মুক্ত বাজার প্রক্রিয়া গড়ে তোলার মতো কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়নি। পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোনও বিশেষ একধরনের ভূমিসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমূল ভূমিসংস্কার করার কোনও দৃঢ় প্রচেষ্টা এখানে ছিল না। অন্যদিকে অপর কোনও বিশেষ লক্ষ্যের উপযোগী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার ও তাকে পরিচালিত করার চেষ্টাও দেখা যায়নি, বা অর্থনীতির অন্যান্য দিকগুলি, যেমন প্রকৌশলগত উন্নয়ন বা কৃষি-ঋণ, কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-পণ্যের মুক্ত বাজার গড়ে তোলার একমুখী দৃঢ় চেষ্টাও দেখা যায়নি। প্রকৌশলগত উন্নয়ন

হয়েছে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পরামর্শে নতুন বীজ, সার-জলের নির্দিষ্ট অনুপাতের একটি প্যাকেজ ব্যবহারের মাধ্যমে। এই প্যাকেজ আমাদের দেশের কৃষিতে উপস্থিত জমি, জল, শ্রম, স্থির পুঁজি ইত্যাদি উপকরণের অনুপাত অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় না, বা এই উপকরণগুলি যে যথাযথ ও উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় এমনও নয়। প্রযুক্তিটি এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এদেশের বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে যথাযথ বিচার বিবেচনা না করেই প্রযুক্ত হয়েছে। কৃষি-উপকরণের বাজারে বিভিন্ন অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্ষমতার প্রভাব দেখা যায়। ঋণ, উপকরণ ও পণ্যের বাজার সংযুক্ত হওয়ায় এই বাজারগুলির মুক্তক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই বাজারগুলিতে একত্রে নানান রূপধারী ব্যবসায়ী মহাজনরা কর্তৃত্ব করে। বাজারের একটি বড় অংশে পণ্যের দাম, উপকরণের জোগান-চাহিদা ও দাম ইত্যাদি বাজারের নিয়মে নির্ধারিত হতে পারে না। কৃষি-শ্রমের বাজারটিও খণ্ডিত, ফলে জোগান-চাহিদার ওঠা-নামা ছাড়াও অন্যান্য নানা শর্তে কৃষি-শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ বাজার-বহির্ভূত কারণে মজুরিও বিশেষ বিশেষ রূপ নেয়। অবশ্যই এই চিত্রটি ভারতীয় কৃষির উৎপাদন-সম্পর্কের পূর্ণ চরিত্রকে প্রকাশ করে না। ভারতীয় কৃষি এবং সমগ্র অর্থনীতির একটি অংশে পুঁজিবাদী চলমানতা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই পুঁজিবাদী ক্রিয়াশীলতার প্রভাব যথেষ্ট গভীর ও বিস্তৃত হলে তার শক্তিতেই প্রাক-পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্মূল হয়ে যেতে পারত, যেমনটা ঘটেছে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী উন্নত দেশের পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। ভারতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী সাত দশকের ইতিহাসে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদন-সম্পর্কে প্রাধান্য বিস্তার করেছে প্রাক-পুঁজিবাদী স্থবিরত্ব, সেটাই গোটা অর্থনীতির বিকাশের পথকে কন্টকিত করে রেখেছে। প্রাক-পুঁজিবাদী জাড্য টিকিয়ে রেখে এই দেশে নিজেদের লাভ সর্বাধিক করতে পারে যে-শ্রেণিটি, তারা চরিত্রের দিক থেকে বহুজাতিক কৃষি উপকরণের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের দেশি এজেন্ট, ব্যবসায়ী-মহাজন, গ্রামীণ বড় চাষি এবং মুষ্টিমেয় শিল্পপতি শ্রেণি।

দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর কোনও দেশকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে পুরোপুরি অন্য কোনও দেশের উপনিবেশে পরিণত করে রেখে তার সম্পদ শোষণ করার পুরনো প্রক্রিয়াটি পরিত্যক্ত হয়। সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলিকে সাধারণভাবে বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রভাবে ধরে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজির নেতৃত্বে কয়েকটা উদ্যোগ শুরু হয়, আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আদিরূপ 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি' নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে (কারণ ওই সময়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিশালী উপস্থিতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমেত সমগ্র আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামনে একটি প্রকৃত বিপদ সূচিত করেছিল)। ওদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন প্রজাতন্ত্র এবং তার সঙ্গে আর দু'-একটি রাষ্ট্র দু'টি প্রধান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীত মেরুতে নিজেদের দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করেছিল।[১] স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম তিন দশকে, এই দু'টি ব্লকের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই যখন চলছে, তখন ভারত অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়া অর্থনৈতিক কাঠামোয় উচ্চ বৃদ্ধিহার অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজি-নির্ভর ভারী শিল্প-কাঠামো গড়ে তোলার নীতি নেয়। এই নীতির যথাযথ প্রয়োগের জন্য তখন যদিও বৃহৎ মুলধনি কাঠামো আমদানি করতে হয়, এবং সে কারণে একদিকে যেমন সোভিয়েত সরকারের সহায়তা অন্যদিকে ব্রিটেন ও বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয়, সাধারণ

ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নে রুদ্ধদ্বার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম তিনদশক ভারতে সরকারি উদ্যোগের আওতায় একটি ছোট কিন্তু বৈচিত্রপূর্ণ শিল্প-কাঠামো গড়ে ওঠে। এই পর্বে বিশ্বব্যাংকের নানা উন্নয়নমূলক আর্থিক সহায়তা আসে। এদেশে মূল ভারী শিল্পের সঙ্গে সহায়ক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইত্যাদি গঠনের কাজে আমেরিকা পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান নামে পরামর্শদাতার ভূমিকায় এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পি এল ৪৮০-র মাধ্যমে খাদ্য-সহায়তা দেশি বাজারে খাদ্যের জোগান বজায় রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। '৬০-এর দশকের খাদ্যসংকটের মোকাবিলা করার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পরামর্শ অনুযায়ী সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজির নির্দেশ মেনে তখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয়নি। '৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে গম ও চালের রফতানি-বাণিজ্যে নিজ নিজ প্রভাবের প্রাধান্য বজায় রাখার লক্ষ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই বাণিজ্য-যুদ্ধ ছিল আসলে দুই দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও রফতানিকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজার দখলের লড়াই। নিজ নিজ দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এই বাণিজ্য-যুদ্ধে মদত দেওয়ার লক্ষ্যে দুই রাষ্ট্রই উৎপাদন ও বাণিজ্য ভরতুকির পরিমাণ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে এদের দাম কমিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করে। এই দুই দেশের সরকারের মধ্যে খাদ্যশস্যের ভরতুকি বাড়ানোর ও দাম কমানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে তা ভারতের মতো দেশকে খাদ্যশস্যের রফতানি-বাজারে অসুবিধায় ফেলে দেয়। ভারতে তৈরি খাদ্যশস্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় শুধু যে হটে যায় তাই নয়, দেশের বাজারেও আমদানি করা শস্যের কাছে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা হারায়। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়েতে 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সম্মতি' নামক সংস্থার পরিচালক আর্থার ডাংকেল বাণিজ্য ও শুল্কসংক্রান্ত এমন একগুচ্ছ নীতি ঘোষণা করে, যা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে সমস্ত সভ্য দেশকে। এই নীতিগুচ্ছ মানতে গিয়ে ভারতের মতো দেশ এদেশের বাজারে ভরতুকিযুক্ত সস্তা পণ্যের অনুপ্রবেশের ওপর শুল্কের বাধা কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়, ফলে এদেশের পণ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মারাত্মক ক্ষতির সামনে পড়ে। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে ভারত সহ অন্যান্য সভ্য দেশগুলিকে এমন নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল যা সেসব দেশের স্বার্থের অনুকূল রইল না।

আমরা দেখেছি, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। আমাদের দেশকে বিদেশি পুঁজির ও বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করতে গেলে দেশের আইনকানুন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশি সহযোগিতায় শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতিগুলিতে যেসব পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে সেসব ঘটানো হয়। দেশের মধ্যেও সবক্ষেত্রে মুক্ত প্রতিযোগিতার আবহাওয়া আনার জন্য এতকাল চালু বিভিন্ন বিধিনিষেধ, যা আদতে দেশের স্বার্থের অনুকূল, সেগুলিকে বরবাদ করা হয়। সমস্ত রকম সরকারি সহযোগিতা ও সরকারের তরফে উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলিকে সীমিত করে এনে সেসব ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের উদ্যোগের পথকে মসৃণ ও প্রশস্ত করে তোলা হয়। আমরা দেখেছি, এই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজারে বিদেশের ভরতুকি-যুক্ত সস্তার পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে, ভারতীয় চাষিরা আত্মহননের পথে যায়। আমাদের কৃষিপণ্য কৃষি-ঋণ ও কৃষি-উপকরণের যুক্ত-বাজার প্রক্রিয়ায় উন্নত বীজ, কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী বিদেশি কোম্পানির দেশি

কমিশন এজেন্ট ও উপকরণের ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব শুরু হয়। বিদেশি একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানির মুখপাত্র, যারা বীজ, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণের জোগানদার ব্যবসায়ী, তাদের দেশি এজেন্টরা বাণিজ্য ও মহাজনি পুঁজি ব্যবহার করে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ে। অনেক সময়েই কৃষি-উপকরণের বর্ধিত চাহিদা উপকরণ জোগানদাতার বিচারবোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাষের খরচের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, চাষির কমিশন এজেন্ট বা উপকরণ সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর কাছে চড়া সুদে ধার তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসকেই কৃষির এই সংকটের কারণ বলে অনেক অর্থনীতিবিদ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সরকারি স্তরে বিনিয়োগের লক্ষণীয় হ্রাস ঘটলেও বেসরকারি স্তরে বিনিয়োগ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২–১৩ সালের পর থেকে পর পর বছরগুলিতে কৃষিপণ্যের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়-হার কৃষিপণ্যের পক্ষে যেতে শুরু করে, যা হয়তো চাষিদের ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগে উৎসাহী করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাষিদের পক্ষে সুবিধাজনক এই বিনিময়-হার ও চাষিদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির সুফল চিরাচরিত খাদ্যশস্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি-হারে প্রতিফলিত হয়নি। আলোচ্য সময়ে (১৯৯১–৯২ থেকে ২০১৬–১৭) সব খাদ্যশস্যেরই বৃদ্ধি-হার কমেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কৃষিতে উৎপাদন-ব্যয়ের যে-বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, তা মেটাতেই চাষিকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াতে হচ্ছে। এবং এই বর্ধিত ব্যক্তিগত স্তরের বিনিয়োগ চাষিকে বিপুল ঋণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অসংগঠিত উৎস থেকে পাওয়া ঋণ চাষির কাঁধে বিপুল সুদের বোঝা চাপাচ্ছে, ফলে চাষি উৎপাদন ব্যয় ও ঋণের একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যেসব চাষি শস্যবৈচিত্রের দিকে যেতে পারছে, তাদেরও এই দুষ্টচক্র থেকে বাঁচার উপায় থাকছে না। তার কারণ, উচ্চ মূল্যের হালকা সবজি ও ফল উৎপাদন শুধু যে আরও ব্যয়বহুল তাই নয়, এই চাষ আমাদের দেশের পরিকাঠামোতে অত্যন্ত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, যেসব অঞ্চলে বিশেষভাবে সেচের জল সুলভ নয়, মূলত সেসব অঞ্চলেই ছোট চাষি এই চাষ করে, এজন্য তাকে অধিকতর পারিবারিক শ্রম নিয়োগ করতে হয়, পারিবারিক শ্রমিকের শ্রমের নিবিড়তাও তাকে অনেক বাড়াতে হয়। বড় আকারে এই চাষ হয় সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি-চাষের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, চুক্তি-চাষ আমাদের দেশে পণ্য বাজারজাত করার মাধ্যম হিসেবে এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয় বা বহুল-ব্যবহৃত মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। বাজার-ব্যবস্থার পুরনো পরিকাঠামো বজায় রেখেই মূলত ফল-সবজি চাষ কিছুটা প্রসার পেয়েছে। ফল-সবজি ও অন্যান্য চাষে নানাপ্রকার অনিশ্চয়তা, শস্যহানি, শস্য পচে নষ্ট হওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই এর ব্যয়ও বিপুল, তাই যেসব অঞ্চলে জলের সুবিধা আছে সেখানে শস্যবৈচিত্রের মাত্রা কমার প্রবণতা যথেষ্ট স্পষ্ট। এই অবস্থায় কয়েকটি পদক্ষেপ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসা। দরকার ছিল ঋণ, পণ্য ও কৃষি-উপকরণের বাজার-ব্যবস্থাকে ব্যবসায়ী, ঋণদাতা ও উপকরণের জোগানদার কমিশন এজেন্টদের মিলিত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনায় রাখা, সস্তায় কৃষি-উপকরণের জোগান সুনিশ্চিত করা ও বিদেশের অপ্রয়োজনীয় ভরতুকি যুক্ত পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখা। কিন্তু এই সমস্ত সমাধান সূত্রের সবক'টিই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা খোলা-বাজার অর্থনীতি, তথা বিশ্বায়ন তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য

উল্লিখিত কার্যকর নীতিগুলির বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণিটির পক্ষে বিশ্ব-পুঁজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, বরং এই নীতিটির সঙ্গে তার নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গতি রেখে, কিছুটা বোঝাপড়া করে সে চলতে চায়। এই বোঝাপড়ার পরিণামেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা সমস্ত ধরনের নীতি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়, এই নীতির প্রতিটি তাদের স্বার্থের পুরোপুরি অনুকূল ছিল এমনও নয়। আমরা দেখেছি খোলামেলা আমদানি নীতি ও আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব আইন ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে ভারতীয় কৃষিতে ব্যয়বহুল অধিক ফলনশীল নতুন ধরনের হাইব্রিড বীজের ব্যবহার বাড়ছে। সেইসঙ্গে অন্যান্য উপকরণের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় কৃষি-উৎপাদনের ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে। এই ব্যয়বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা বিদেশের ভরতুকি যুক্ত কম দামের শস্যের সঙ্গে শুধু বিদেশের বাজারে নয়, স্বদেশের বাজারেও প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জারি করা নীতি ভারতীয় কৃষিতে কল্যাণকর প্রভাব ফেলেছে এটা বলা যাচ্ছে না। এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার উপায় হিসেবে ভারতীয় ছোট ও ক্ষুদ্র চাষি, কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে কৃষির বাইরে অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা সংস্থা গড়ে তুলে জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজতে চায়।

খাদ্যশস্য, তুলা ইত্যাদি সনাতন শস্যগুলির চাষ কোনও আয় সৃষ্টি করতে পারছে না। ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাধাহীন বিকাশের ফলে ব্যাপক পরিমাণ কৃষি-জমি অ-কৃষি জমিতে পরিণত হতে চলেছে। কেনা/বিক্রি, অধিগ্রহণ, দখলদারির মাধ্যমে এইসব কৃষি-জমি অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র, গৃহ নির্মাণ বা সেবা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথমত, মুনাফাই যখন সমস্ত উৎপাদন-কাজের শেষ কথা, তখন জমি ও অন্যান্য উপকরণকে সবচেয়ে বেশি লাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাই ফসলি কৃষি-জমিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে বেশি লাভজনক ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে। খোলা-বাজার অর্থনীতিতে কৃষি-জমির এই অন্যত্র গমন আইনের দ্বারা সমর্থিত। এতে ভারতীয় অর্থনীতির ও এই দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের চিন্তাকে আদর্শগত ভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে।

নীচের সারণিতে ১৯৫০ থেকে ২০১২–১৩ সাল অবধি কৃষি-জমির কৃষি থেকে অন্যত্র যাওয়ার তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মোট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যত জমি আছে তার মধ্যে কৃষি-জমির অংশ ষাট, সত্তর ও আশির দশকে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, কিন্তু ’৯০-এর দশক থেকে কমতে শুরু করেছে। আমরা জানি, ’৯০-এর দশক থেকেই নয়া আর্থিক নীতি প্রয়োগের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে একদিকে বিদেশি পণ্যের বাধাহীন প্রবেশ, অন্যদিকে কৃষি-উপকরণের ব্যবসায় কমিশন এজেন্ট ও পণ্য ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছে। নয়া অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অবাধ বাণিজ্যের নীতির মিলিত প্রভাবই কৃষি-জমির অ-কৃষি ক্ষেত্রে বহির্গমনের শর্ত তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানের মতো দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা এবং সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক দেশগুলির ভরতুকির সহায়তা এই লড়াইকে তীব্র করে তোলে। ভারতের মতো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর হলে তা এইসব উন্নত দেশগুলির চাল-গম ব্যবসায়ী বহুজাতিক অলিগোপলি সংস্থার পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। ওই বহুজাতিক সংস্থাগুলি এদেশের বাজারে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য এদেশের ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের জোগান সীমিত রাখতে চায় এবং তাদের অসম প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দেয়। আমরা আগেই দেখেছি, চাষের জমি খাদ্যশস্যের উৎপাদন থেকে সরে

গিয়ে অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফল-সবজি বা তৈলবীজের মতো শস্যে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সমর্থন রয়েছে বিশ্বব্যাংকের কৃষি-উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শের (২০০৫) মধ্যেও।[২] খাদ্যশস্যনির্ভর কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনযাত্রায় এই সংকটের অবস্থা একদিকে ঋণগ্রস্ত চাষিকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে কৃষি-জমিকে কৃষির বাইরে কাজে লাগানোর এবং সেই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষকে কৃষি ছেড়ে অন্য কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করছে। এরই পরিণামে নিজস্ব উদ্যোগে অর্থকরী ছোট উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা পরিষেবা মূলক সংস্থা গড়ে তুলে স্বনিযুক্তি অথবা ছোট অ-কৃষি সংস্থায় নিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে।

আমরা দেখেছি, জমির উৎপাদনশীলতার নিম্নগতি, উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দীর্ঘকালীন জড়ত্ব, মূল খাদ্যশস্যগুলির লাভজনক দাম না থাকা, উপকরণের দামের ঊর্ধ্বগতি, ভারতীয় কৃষিতে গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই সংকট পঞ্জাব, কর্ণাটকের মতো বড় জোত-নির্ভর রাজ্যগুলি বা উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো ছোট জোতনির্ভর রাজ্য, সর্বত্র ভারতীয় কৃষির প্রকৃত দুর্বলতাকে সামনে এনে ফেলছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকী কর্ণাটকের মতো রাজ্যেও ছোট চাষিকে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম নিট আয় সুনিশ্চিত করার জন্য বিশাল ব্যয় বহন করে চাষ করতে হচ্ছে। ছোট চাষিরা বীজ সার যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য বড় চাষি, কমিশন এজেন্টদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। এরাই কৃষি উপকরণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ওপর আছে বিশ্বের সর্বোন্নত দেশগুলির বহুজাতিক গম, তুলা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদেশের বাজারে ও বিশ্ব-বাজারে অসম প্রতিযোগিতা, ভরতুকি-যুক্ত সস্তার খাদ্যশস্যের সঙ্গে বিশাল ব্যয়ে উৎপন্ন এদেশের শস্যের প্রতিযোগিতা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে শুধু ছোট চাষিরা নয়, বড় চাষিরাও এই সংকট থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির যুগ্ম প্রভাব আঞ্চলিক স্তরে আধুনিক উপকরণের বাজারকেও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে ফেলছে। কৃষি উপকরণের, পণ্যের ও ঋণের যুগ্ম বাজারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা বাণিজ্যিক মহাজনি পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার ব্যবসায় সহায়ক কমিশন এজেন্টরা। আমাদের সমীক্ষায়* আমরা দেখেছি, এসব সত্ত্বেও একটি বড় জোতের শ্রেণিকে চিহ্নিত করা যায়, যারা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী। ব্যবসায়িক মহাজনি কাজে লিপ্ত অথবা কমিশন এজেন্টের গ্রামীণ এজেন্ট হিসেবে একটি বড় জোতের মালিক-শ্রেণিকে চিহ্নিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু তার পাশাপাশি উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ইচ্ছুক এই শ্রেণিটির অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কৃষির সঙ্গে যুক্ত কোনও উপকরণ বা পণ্যের বাজারই মুক্ত বা স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল নয়। উৎপাদনে পুঁজিবাদী গতি সৃষ্টি হওয়ার পথে এটিই সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা।

কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাব আছে আরও একটি বিষয়ের, তা হল জমি অধিগ্রহণ ও কৃষি-জমির অ-কৃষি ক্ষেত্রে বহির্গমন। এই প্রবণতা বরাবরই কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। বার বার বিভিন্ন আইন ও তার সংস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত অধিকারের জমি ও অন্যান্য ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ও সরকার অধিগ্রহণ করে আসছে। করপোরেট পুঁজি তার অগ্রগতির পথকে বাধামুক্ত রাখার জন্য দেশের জল, জঙ্গল, জমির ওপর আগ্রাসন বাড়িয়েছে। ব্রিটিশ যুগে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা মসৃণ রাখার জন্যই শুধু নয়, শাসনব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে

যাতায়াত-ব্যবস্থা বিস্তৃত করা, ও নগরায়ণে গতি আনার প্রয়োজনেও জমি অধিগ্রহণ করা হত, কৃষি জমিকে অ-কৃষি কাজে ব্যবহার করা হত। জমি অধিগ্রহণ করা হত রেলপথ, রাস্তা, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্কুল এবং নগরায়ণ কর্মসূচি রূপায়ণ, ইলেকট্রিক পোস্ট বসানো, ইত্যাদি নানা কাজের জন্য। অধিগ্রহণের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা হত, সুবিধেমতো আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন চলত।

১৮২৪ সালে প্রথম বেঙ্গল জমি অধিগ্রহণ রেগুলেশনটি গৃহীত হয়। এই বিলের সাহায্যে জমি অধিগৃহীত হলে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৮৫৩ সালে। পরে এই রেগুলেশনটি ১৮৫০ সালের রেগুলেশন দিয়ে বাতিল করা হলে, জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম কলকাতা নগরী অবধি বিস্তৃত করা হয়। ১৮৫৭ সালে এ সব বিভিন্ন রেগুলেশন যুক্ত করে প্রণীত ১৮৫৭-এর নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন সারা ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রযোজ্য হল। এই আইন কিছুদিন পরে ১৮৭০-এর আইন দিয়ে পরিবর্তিত হলেও ১৮৭০-এর আইনটিও অচিরে অকার্যকর বলে ঘোষিত হল। তার বদলে প্রণীত ও রূপায়িত হল ১৮৯৪ সালের আইনটি। এই আইনের বলে ব্যক্তিগত অধিকারে থাকা জমিও জনস্বার্থে অধিগ্রহণের ক্ষমতা পায় সরকার। কিন্তু যার জমি অধিগ্রহণ করা হল, সেই জমির মালিকের এ বিষয়ে আপত্তি জানানোর কোনও সুযোগ ছিল না এই ১৮৯৪ সালের আইনটিতে। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ তার ছিল। এই অধিগ্রহণ বিষয়ে কোনও আপত্তি না তুলতে পারা নিয়ে জমির মালিকদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ সালের নতুন আইনে পুরনো আইনের সঙ্গে একটি নতুন ধারা যুক্ত হল। এই ধারায় জনস্বার্থে অথবা কোনও বেসরকারি কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণের নোটিস পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই আপত্তি জানাতে হবে। ২০১৪ পর্যন্ত ১৮৯৪ সালের আইনটিই জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কার্যকর ছিল। জমি অধিগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের সমস্ত বিষয় এই আইন দ্বারাই নির্ধারিত হত। এই আইনে জমির মালিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিগ্রহণের পরিণামে জমিহারা বা বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন বা জীবিকার সুনিশ্চিত ব্যবস্থার কোনও সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ আমলের অবসান ঘটার বহুদিন পরে এই আইন ঘিরে দীর্ঘ অসন্তোষ, দেশের আদালতে বিভিন্ন সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগ এই আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা জনস্বার্থ বলতে কী বোঝায় এই বিষয়ে শীর্ষ আদালত আরও ব্যাখ্যা ও স্বচ্ছতা দাবি করে। এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হল ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন। এতে ১৮৯৪ সালের আইনটির সঙ্গে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনরায় জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট ও সঠিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ও স্বচ্ছতার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩-র আইনটি জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমত, এই নতুন আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো হয়। আগে এই পরিমাণটি ছিল জমির বাজার দামের ১.৩ গুণ। এখন এই পরিমাণ বাড়িয়ে শহরাঞ্চলের জমির দামের ২ গুণ, এবং গ্রামাঞ্চলের জমির দামের ২.৪ গুণ করা হল। তাছাড়া, দ্বিতীয়ত, এই আইনে জমির মালিকদের জন্য পুনর্বাসন ও জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা ছাড়াও যে সব পরিবার জমির মালিক ছিল না কিন্তু এই জমির ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত তাদের জন্যও যথোপযুক্ত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টিতে বাধ্যবাধকতা আনা হল। এছাড়া রাজ্যগুলিকে ইচ্ছা করলে আরও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। তৃতীয়ত, এই আইনে জমি অধিগ্রহণ করার আগে যে-প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার সামাজিক মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হল, এবং এর

সঙ্গে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জমি অধিগ্রহণ করা যাচ্ছে কিনা সেটিও জমি অধিগ্রহণের শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হল। প্রকল্পটি কীভাবে জনস্বার্থে কাজে লাগবে, বা আদৌ জনস্বার্থে কোনও কাজে লাগবে কি না তার বিচার-বিবেচনা বাধ্যতামূলক। চতুর্থত, প্রকল্পটি যদি বেসরকারি কোনও উদ্যোগ হয় তাহলে সব জমির মালিকের অন্তত শতকরা ৮০ ভাগের সম্মতি, এবং প্রকল্পটি যদি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে হয়, তাহলে অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ মালিকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। অবশ্য, প্রকল্পটি যদি পুরোপুরি সরকারি প্রকল্প হয় সেক্ষেত্রে সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকল না। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সেচ যুক্ত বহু-ফসলি জমি অধিগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। অধিগৃহীত জমি অব্যবহৃত থাকলে সেটি পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা তার পরে (যদি তেমন শর্ত অধিগ্রহণের সময় লেখা হয়ে থাকে, তাহলে পাঁচ বছরের পরে) ফেরত দেওয়া আবশ্যিক।

ব্রিটিশ আমলে সরকার জমি অধিগ্রহণ করত তাদের বাণিজ্যিক অথবা শিল্প-পুঁজির স্বার্থে। এ বিষয়ে সমস্ত নিয়মকানুন, রীতিনীতি তাদের সুবিধামতো তারা তৈরি করে নিত। অবশ্য বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৮৯৪ সালে যে-আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরেও বহুদিন আইন অনুসারেই অধিগ্রহণের কাজ চলত।

২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার সিঙ্গুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গ্রামের চাষিদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন, বিশেষভাবে সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তৎকালীন বাম সরকারের পতনের পিছনে একটি বড় কারণ হয়ে দেখা দেয়। সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানির মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা নির্মাণের জন্য এক হাজার একর কৃষি-জমি সরকার অধিগ্রহণ করে। এই কৃষি-জমি ছিল অতি উর্বর, বহু-ফসলি সেচ-যুক্ত জমি। বেশিরভাগ কৃষক এই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় ও শেষপর্যন্ত বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। ইতিমধ্যে নন্দীগ্রামেও সরকার পরিচালিত হলদিয়া উন্নয়ন পরিষদ কারখানা নির্মাণের জন্য হাজার একরেরও বেশি জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করলে কৃষকরা বিক্ষোভ জানায়, এবং উন্নয়ন পরিষদ অধিগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের আগেও অধিগ্রহণ-বিরোধী ছোটখাটো অসন্তোষের ঘটনা আগে থেকেই ঘটে আসছিল। বহুল পরিমাণ চাষ-যোগ্য কৃষি-জমি অ-কৃষি ব্যবহারের জন্য হস্তান্তরিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে চাষব্যবস্থায় ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করছিল। ক্রমে এই উচ্ছেদ মূলত ঘটতে থাকে সরকারি উদ্যোগে কিন্তু করপোরেট পুঁজি বিস্তারের স্বার্থে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা এইসব ছোটখাটো অজস্র অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অসন্তোষের চরম রূপ হিসেবে দেখা দিল।

কিন্তু শুধু কৃষি-জমি হিসেবে চিহ্নিত জমিই নয়, বেশ কয়েকবছর শুষ্কতার কারণে চাষ হয়নি, কিন্তু কিছুটা সেচের ব্যবস্থা করলে যে-জমিগুলিকে কম জলনির্ভর কোনও শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুনরায় চাষযোগ্য করে তোলা যায়, তেমন জমিকেও চাষযোগ্য বাতিল জমি হিসাবে চিহ্নিত করে অধিগ্রহণের আওতায় নিয়ে আসার একটি উদ্যোগ চলছে, যা নানা ভাবে কৃষকের জীবনে আনছে অনিশ্চয়তা। জেনিফার বাকা[১ক] দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাডুতে অধিগ্রহণের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কোম্পানির দ্বারা বিনিয়োগ বিস্তারের প্রয়োজনে উন্নয়ন এবং বিকল্প অধিক উৎপাদনশীল কোনও

ক্ষেত্রে নিয়োগ করার সরকারি কর্মসূচিকে সামনে রেখে চাষযোগ্য বাতিল জমিকে ব্যাপক অধিগ্রহণ কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে।

এই শতাব্দীর শুরুতেই ভারত সরকার 'বাতিল' জমি পুনরুদ্ধার করে সেই জমিতে জৈব জ্বালানি প্রস্তুত ও শিল্পোদ্যোগের মতো 'আরও উৎপাদনশীল' কাজে লাগানোর কর্মসূচি নেয়। কোন জমিকে বাতিল বলা হচ্ছে এবং সেই বাতিল জমিকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করার কী উপায় বা পুনরুদ্ধারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সেই জমিকে উপযুক্ত সেচের সাহায্যে চাষযোগ্য করা যায় কি না এ সব কথা ভাবা হয়নি। এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ যেসব জায়গায় ঘটেছে তার মধ্যে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর সাত্তুর অন্যতম।

সাধারণভাবে বিশ্ব জুড়ে সব দেশেই সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় এরকম 'বাতিল' জমি অধিগ্রহণ ঘটে চলেছে করপোরেট সেক্টরের উদ্যোগে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাতিল জমি পুনরুন্নয়নের মাধ্যমে জৈব জ্বালানি প্রস্তুত করার কর্মসূচিটি আসলে এই কর্মসূচিরই অঙ্গ। ২০০৫–০৬ সালে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর সাত্তুরে কয়েকজন জমি-দালালের উদ্ভব হয় যারা এই কর্মসূচির কথা বলে তথাকথিত বাতিল জমি কেনা শুরু করে। আসলে বাতিল জমির নাম করে এরা সুযোগমতো যে-কোনও জমি সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক কম দামে জৈব জ্বালানি চাষের কথা বলে কিনতে থাকে, এবং সেই জমি শেষ পর্যন্ত বাস্তুজমিতে পরিণত করে বিপুল লাভে বিক্রি করে।

২০০৩ সালে ভারত সরকার সারা দেশে ৩৩ মিলিয়ন একর 'বাতিল' জমিতে জাত্রফা নামক জৈব জ্বালানি (বায়োডিজেল) উৎপাদক গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছিল, এই পরিমাণ জমি দেশের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের শতকরা ৪ ভাগের সমান। তামিলনাড়ু এই চাষের মূল কেন্দ্র। এই উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ু সরকার সারা রাজ্য জুড়ে এই বাতিল জমি কোম্পানিকে লিজ় দিতে থাকে। বাছাই করা কৃষি-পরিবারকে দুই হেক্টর করে জমি দিয়ে চুক্তি-চাষের মাধ্যমে জাত্রফা চাষে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য চাষের খরচের ওপর নানা প্রকার ভরতুকিও দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের শিল্প-সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারত, এবং বিশেষ করে তামিলনাড়ু, জৈব জ্বালানি তৈরিতে বিশ্বের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। জাত্রফার প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার, উভয়েই কোম্পানিগুলিকে নানাপ্রকার ভরতুকি ছাড়াও ন্যূনতম দামের সহায়তা, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ, জমির ওপর ভরতুকি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক কর্মসূচি চালু করে। একই সঙ্গে তামিলনাড়ু সরকার 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (SEZ) কর্মসূচি নেয়, যার বিকল্প নাম 'তামিলনাড়ু শিল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ' আইন। ২০০৭ সালে রাজ্য সরকারের শিল্পনীতিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, শিল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে। সেই অনুযায়ী কর্ষণযোগ্য বাতিল জমি অধিগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং শুষ্ক জমি যাতে সরাসরি শিল্পের জন্য জমিতে পরিবর্তিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তনের কথা বলা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে কত জমি এইভাবে কৃষিক্ষেত্র থেকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তিত হয়েছে তার হিসাব ঠিকমতো পাওয়া যায় না। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি ২০০৮–০৯ অবধি অধিগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র অল্প কিছু ক্ষেত্রেই অধিগৃহীত জমিটি ঘোষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমি জৈব জ্বালানি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকসময় বাস্তুজমি হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছে বা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি নির্মাণ করে বিক্রি করা হয়েছে যথেষ্ট লাভজনক দামে।

ভারত সরকারের কৃষি পরিসংখ্যান দফতর দেশের সমস্ত জমির নয়টি বিভাগ সাব্যস্ত করেছে। তার মধ্যে কর্ষণযোগ্য বাতিল জমি ও কর্ষণের অযোগ্য বাতিল জমি পড়েছে দু'টি ভিন্ন বিভাগে। ২০০৭—০৮ সালে সারা ভারতের প্রায় শতকরা ৪.৩ ভাগ জমি ছিল চাষযোগ্য বাতিল জমি, অর্থাৎ এই জমিগুলি কয়েকবছর আগে পর্যন্ত চাষ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে শুষ্কতার কারণে চাষ করা হচ্ছে না। এই ধরনের বাতিল জমি তামিলনাড়ুতে ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ।

কিন্তু জমি অধিগ্রহণের এই কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রেই ব্রোকার এবং জমি উন্নয়ন কোম্পানির যৌথ চক্রান্তে ব্রোকার বা কোম্পানির নিজস্ব সম্পত্তি ক্রয়ের কর্মসূচিতে পর্যবসিত হয়েছে এবং এইভাবে সংগৃহীত জমি তারা ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্রে বিক্রি করে দিচ্ছে। এইভাবে বিপুল পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং এই বিষয়ে পরোক্ষে সরকারি সহায়তা এবং সরকারি কর্মসূচি সামনে রেখে বেআইনি দখলদারি চলেছে।

২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও জীবন পুনর্গঠন আইনটি অবশ্যই ১৮৯৪ সালের কৃষক ও জমির মালিকের স্বার্থবিরোধী জমি অধিগ্রহণ আইনের তুলনায় অনেকটাই কৃষিকল্যাণের সহায়ক। কিন্তু এই আইনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠে গেছে। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নগরায়ণ কর্মসূচির রূপায়ণ ও শিল্পায়ন— এই তিনটি বিষয়ের ওপর এই নতুন পরিবর্তিত আইনের প্রভাব নিয়ে নানা আলোচনায় আইনটিতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়ছে।

বিশ্বব্যাংক নগরায়ণ কর্মসূচির ওপর এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে, ও বিভিন্ন শহর ও নগরের মধ্যে, রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে। উপরন্তু বিশেষ জোর দিচ্ছে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে বাসগৃহ নির্মাণের ওপর। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশমতো অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি অবশ্যই জমি অধিগ্রহণ ছাড়া রূপায়িত হতে পারবে না। ১৯৬২ সালে দিল্লি উন্নয়নের লক্ষ্যে আবাস প্রকল্প, বাণিজ্যিক প্রয়োজন, ও পার্ক তৈরির জন্য ৬০০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ হল, বেশি আয়ের মানুষের জন্য আবাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের কর্মসূচিটি বেসরকারি প্রোমোটারের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার শুধুমাত্র বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দিতে পারে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে আবাস নির্মাণের ভরতুকি-ভিত্তিক প্রকল্পের জন্য সরকারকেই জমি অধিগ্রহণের কর্মসূচি নিতে হবে। জমির মালিকরা যাতে বিনা প্রতিবাদে জমি অধিগ্রহণে সম্মত হয়, তার জন্য প্রথমত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, অধিগৃহীত জমির উন্নয়ন করা হলে শতকরা ২০ ভাগ জমির মালিকদের জন্য জমা রেখে দিতে হবে। পূর্বতন জমির মালিকরা জমি অধিগ্রহণ ও জমি উন্নয়নের খরচ দিয়ে এই জমি নিতে পারবেন।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সালে যেখানে নগরাঞ্চলের জমির পরিমাণ ২৩.৭ মিলিয়ন হেক্টর ছিল, সেখানে ২০৫০ সালে এই পরিমাণটিকে ৫৪.৮ মিলিয়ন হেক্টরে নিয়ে যেতে হবে (অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ৭.৭ ভাগ থেকে বেড়ে নগরাঞ্চলের জমি ২০৫০ সালে দাঁড়াবে শতকরা ১৭.৭৮ ভাগে)। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া এই অনুপাতে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই দেশের শস্য উৎপাদনের জমিকে নগরাঞ্চলে পরিবর্তিত করার প্রয়োজনীতা ও সেই কারণে জমি অধিগ্রহণের আবশ্যিকতাকে সামনে আনে। বলা হল, শস্য

উৎপাদনের জমি নগরায়ণের কাজে লাগালে উৎপাদন যতটুকু কমে, তা চাষের নিবিড়তা আরও বাড়িয়ে পূরণ করতে হবে।

একইভাবে খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, শিল্পায়নের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের জন্য ২০১৩ সালের আইন যে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে, তা জমির দাম অত্যধিক বাড়িয়ে তুলছে। ফলে শিল্পায়ন কর্মসূচি খুব ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন শিল্পে উৎপাদিত পণ্য অত্যধিক উৎপাদন খরচের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কমজোরি হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের পরামর্শ হিসেবে বলা হল, জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ দায় শিল্পগুলির ওপর না চাপিয়ে সরকারকে ভরতুকি বহন করতে হবে। এছাড়া জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতিতে সামাজিক মূল্যায়নের বাধ্যবাধকতা, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ জমির মালিকের সম্মতি পাওয়ার বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি নিয়ম অযথা শিল্পায়নকে জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে তোলে। এই বিষয়গুলি নিয়ে তাই বিরূপ মতামত উঠে আসছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও জীবনযাত্রার পুনর্গঠন আইনটি সংশোধন করে ভারত সরকার ২০১৫ সালের জমি অধিগ্রহণ বিল পেশ করে। এটির মূল উদ্দেশ্য, জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি মূল আবশ্যিক শর্ত— যেমন, বেশিরভাগ মালিকের সম্মতি পাওয়া এবং অধিকৃত জমিতে যে-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে তার সামাজিক প্রভাব খতিয়ে দেখা— ইত্যাদি জটিলতা আনা ও সময়সাপেক্ষ শর্ত থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে মুক্ত করা। সেইসঙ্গে কৃষি-জমি বা সেচযুক্ত কৃষি-জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে যেসব বাধানিষেধ আছে, সেগুলির অবসান ঘটানো, কারণ কৃষি-জমিতে হাত না দিয়ে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণের মতো পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ এককথায়, ২০১৫ সালে পেশ করা নতুন বিলটিতে ২০১৩ সালের অর্জিত অধিকারগুলি উন্নয়নের প্রয়োজনে বিসর্জন দেওয়ার নীতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের নতুন সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টের অনুমতির জন্য পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও ছয়টি রাজ্য জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছে। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাত, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা। এই পরিবর্তন কার্যকর হলে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের জীবন আবার গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। এ যাবৎ অনুসৃত নানা নীতি ভারতীয় কৃষিকে যে-সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এই নতুন নীতিতে জমি অধিগ্রহণ আরও সহজ ও বাধাহীন হয়ে উঠলে তা আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠবে।[২ক]

কৃষি-জমি অ-কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি থেকে কর্মরত মানুষদেরও অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। বাজার অর্থনীতিতে মানুষ এবং জমির কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে যে, কৃষি থেকে আয়ের তুলনায় অন্যত্র নিয়োজিত মানুষের আয় বেশি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের কর্পোরেট-বান্ধব আইন এই বহির্গমন প্রক্রিয়ায় দ্রুত গতি সঞ্চার করছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার শুধু নেমে এসেছে তাই নয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে অতি সম্প্রতি শিল্পে নিয়োগ কমেছে। সুতরাং মানুষ সম্ভবত অন্যান্য অসংগঠিত অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ও সেবাক্ষেত্র গড়ে তুলে ন্যূনতম বেঁচে থাকার মতো আয়ের পথ খুঁজছে।

১৯৯০ সালের পর থেকে এদেশে করপোরেট পুঁজির স্বাধীন বিস্তারের পর্যায় শুরু হলে কৃষি-জমির ব্যাপক বহির্গমন ও অন্য কোনও লাভজনক ক্ষেত্রে ব্যবহার বাড়তে থাকে। আদিবাসী, জঙ্গলের বাসিন্দা ইত্যাদি জনসংখ্যার দুর্বল অংশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলেও সাধারণ গ্রামবাসী চাষিরাও এর শিকার হয়েছেন। ২০০৬ সালের সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ প্রচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের আন্দোলন প্রাথমিকভাবে এই অধিগ্রহণ বিরোধী আইন প্রণয়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সিঙ্গুরে অতি উর্বর, সেচের সবরকম সুবিধাযুক্ত, দু'-ফসলি তিন-ফসলি হাজার একর জমিতে টাটা কোম্পানির উদ্যোগে একটি মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ওই জমির মালিক স্থানীয় চাষিদের আদি বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের জন্য নোটিশ জারি করে। বেছে বেছে রাস্তা ও জলের সুবিধা যুক্ত হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখানো হয়। এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন মানে কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনধারণের মানোন্নয়ন নয়, উচ্চ আয়ের মানুষের জন্য একটি প্রমোদ-উপকরণ তৈরি করা, দীর্ঘকালীন উন্নয়নের দিক থেকে যার গুরুত্ব অল্পই। এমনকী শ্রমের নিয়োগের দিক থেকেও যার গুরুত্ব খুব কম। আসলে, ২০১৫ সালের নতুন সংশোধনী বিলটি সেই দিক থেকে একটি পিছিয়ে-পড়া পদক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নয়। আসলে সমস্ত প্রচেষ্টাটিই উন্নয়ন সম্পর্কিত এমন এক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা উন্নয়ন বলতে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার, ন্যূনতম খাদ্য সুনিশ্চয়তার উন্নতি বোঝায় না, যা শুধুমাত্র বড় শিল্পের উন্নতিই বোঝায়। বড় বড় পুঁজিনির্ভর শিল্পগুলি দেশের আপামর জনগণের অবস্থার উন্নয়নের বদলে দেশের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের অসম বণ্টনের ভিত্তি তৈরি করে তার বিকাশকেই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরে। শিল্পনীতি সংক্রান্ত এই বিশেষ নীতি নয়া উদারনীতির অন্তর্নিহিত দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই নীতি অনুসরণের ফল যে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের পক্ষে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা অস্বীকার করার কোনও পথ নেই।

গ্রামাঞ্চলের উৎপাদিত জাতীয় আয় ও শ্রমের নিয়োগে কৃষির অবদান

ভারতের মোট ভৌগোলিক জমির অংশ হিসেবে কৃষি-জমির ভাগ '৯০-এর দশক থেকে হ্রাস পেয়েছে। ওই সময় থেকেই প্রতি দশকের গড় বাৎসরিক কৃষি-জমির পরিমাণ তার আগের দশকের তুলনায় কমেছে। কৃষি-জমির পরিমাণ হ্রাস কৃষি-জমির বহির্গমনের প্রবণতাকে তুলে ধরে। এর সামগ্রিক ফল কৃষিতে ও কৃষকের জীবনযাত্রায় কোনও সুফল আনতে পারে না। শিল্প গত কয়েকবছর ধরে নিয়োগহীন বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থায় কৃষি-জমির বহির্গমন শুধু কৃষি-উৎপাদনের হারের ওপরই যে কুপ্রভাব আনবে তা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশে নিয়োগ হ্রাসের প্রবণতা বাড়াবে।

সারণি ১৫.১ কৃষি জমির বহির্গমন

	মোট ভৌগোলিক জমিতে কৃষি-জমির শতকরা অংশ % (দশকওয়ারি গড় বাৎসরিক)	শতকরা অংশের হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমাণ	দশকওয়ারি গড় বাৎসরিক কৃষি-জমি (মিলিয়ন হেক্টর)	গড় কৃষি-জমির বৃদ্ধি/হ্রাস (মিলিয়ন হেক্টর)
১৯৫৯–৬০	৫২.৯৯		১৭৪.২১২৭	
১৯৬০–৬১ – ১৯৬৯–৭০	৫৩.৫৩	০.৫৩	১৭৫.৯৬১২	১.৭৪৮৫
১৯৭০–৭১ – ১৯৭৯–৮০	৫৪.৮০	১.২৭	১৮০.১৪২০	৪.১৮০৮
১৯৮০–৮১ – ১৯৮৯–৯০	৫৫.২১	০.৪১	১৮১.৫০৮২	১.৩৬৬২
১৯৯০–৯১ – ১৯৯৯–২০০০	৫৪.৯৫	–০.২৬	১৮০.৬৫২৫	–০.৮৫৫৭
২০০০–০১ – ২০০৯–১০	৫৪.৬০	–০.৩৫	১৭৯.৫০১৫	–১.১৫১০
২০১০–১১ – ২০১২–১৩	৫৪.৩৯	–০.২১	১৭৮.৭৯৭৫	–০.৭০৪০

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বেকারত্ব ও অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিস্তার

আমরা দেখেছি, মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল, এই ষাট বছরে শতকরা ৮২.৭০ ভাগ থেকে নেমে এসেছে শতকরা ৬৮ ভাগে, কিন্তু মোট জনসখ্যায় কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত, ১৯৫১ সালে যা ছিল শতকরা ২৬.৯১ ভাগ, তা ২০০১ সালে দাঁড়ায় শতকরা ২২.৭৫ ভাগ, এবং সেখান থেকে ২০১১য় তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৬.৯০। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যায় সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতটি বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একই অনুপাত রক্ষা করেছে, এবং এই অনুপাতটি মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের সামান্য বেশি মাত্র। সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতটি সেই ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি মোটামুটি একই রকম অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। সরাসরি কৃষিতে নিযুক্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার ভাগ বরাবরই এক-তৃতীয়াংশেরও কম। ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এই ভাগটি শতকরা ৩২.৫ ভাগ থেকে বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে শতকরা ৩১.৫৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অবশ্যই গ্রামীণ অ-কৃষি কাজকর্ম থেকে তাদের জীবিকা অর্জন করে, অথবা তারা কর্মহীন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার নিয়োগ ও বেকারত্ব সম্পর্কিত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও বিভিন্ন ধরনের অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োগের যে-চিত্র[৩] পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যাচ্ছে এইসময়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭০–৭১ সাল থেকে ২০১১–১২ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদিত নিট অভ্যন্তরস্থ উৎপাদনে কৃষির ভাগ ক্রমশ নেমে এসেছে। এর জায়গায় অ-কৃষি ক্ষেত্র— যার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণ শিল্প ও সেবামূলক শিল্প – বিশেষ প্রসারিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মোট নিট উৎপাদনে কৃষির ভাগ ১৯৭১ সালে শতকরা ৭২.৪ থেকে ২০১১-'১২য় শতকরা ৩৯.২ ভাগে নেমে এসেছে ও সে জায়গায় অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ শতকরা ২৬.৫ থেকে বেড়ে ২০১১–১২ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৫.৯ ভাগে। অর্থাৎ ২০১১–১২ সালে গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষির চেয়ে অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের গুরুত্ব শতকরা ১৬.৭ ভাগ বেশি। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিযুক্তি-কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যে-অনুপাতে উৎপাদনে কৃষির ভাগ কমেছে, মোট নিযুক্তিতে

কৃষির ভাগ কমেছে তার তুলনায় কম। মোট নিযুক্তিতে কৃষির ভাগ যেখানে ১৯৭০–৭১ সালে ৮৫.৫ ভাগ থেকে ২০১১–১২ সালে নেমেছে শতকরা ৬৪.১ ভাগে, অ-কৃষি ক্ষেত্রের ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ থেকে শতকরা ৩৪.৮ ভাগে। কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন ও নিযুক্তির ভাগের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন-কাঠামো ও নিযুক্তি-কাঠামোতে যে-পরিবর্তন হয়েছে, নীচের সারণি থেকে তার একটা ধারণা আমরা পেতে পারি।

সারণি ১৫.২ গ্রামাঞ্চলের মোট উৎপাদনে কৃষি ও অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ* (শতকরা)
(প্রতি বছরের মূল্য স্তর অনুযায়ী)

	কৃষি	শিল্পোৎপাদন	নির্মাণ শিল্প	সেবা	মোট অ-কৃষি
১৯৭০–৭১	৭২.৪	৫.৯	৩.৫	১৭.১	২৬.৫
২০১১–১২	৩৯.২	১৮.৪	১০.৫	২৭.০	৫৫.৯

সারণি ১৫.৩ মোট নিযুক্তিতে কৃষি ও অ-কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের ভাগ* (শতকরা)

	কৃষি	শিল্পোৎপাদন	নির্মাণ শিল্প	সেবা	মোট অ-কৃষি
১৯৭২–৭৩	৮৫.৫	৫.৩	১.৪	৭.৩	১৪.০
২০১১–১২	৬৪.১	৮.৬	১০.৭	১৫.৫	৩৪.৮

Source: Chand, R., S. Srivastava,. J. Singh. (2017). "Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth." *Economic and Political Weekly*. 52(52). NSSO based Data

রমেশ চাঁদ ও অন্যান্যরা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য কাজে লাগিয়ে নিম্নতম একক স্তরের যে-তথ্য জোগাড় করেছেন[8] সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্তি (সাধারণভাবে নিয়মিত পূর্ণ নিযুক্তি বলতে যা বোঝায়) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা –২.০৪ অর্থাৎ ওই সময়ে নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে শতকরা ২.০৪ হারে, যদিও ওই সময়ের মধ্যে কৃষি-উৎপাদন শতকরা বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২৭ এবং অ-কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ও নিযুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৯.২১ ও ৩.৬৫ হারে। কৃষিতে ২০০৫ সাল ও ২০১২ সালের মধ্যে মোট নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমেছে ২৪৯ মিলিয়ন থেকে ২১৫ মিলিয়নে, যদিও ওই সময়ের মধ্যে শহরাঞ্চলের অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তির সংখ্যা বেড়েছে ৯৪ মিলিয়ন থেকে ১২১ মিলিয়নে। এর ফলে ২০০৫ থেকে '১২ সালের মধ্যে সারা দেশের মোট নিযুক্তিহার দাঁড়িয়েছে শতকরা –০.২৮, অর্থাৎ মোট নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে শতকরা ০.২৮ হারে। নীচের সারণি থেকে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে নিযুক্তি হ্রাসের চিত্রটি পাই।

সারণি ১৫.৪ গ্রামাঞ্চলে নিযুক্তি বৃদ্ধির হার (শতকরা)

(সাধারণভাবে সারাদিনের মূল সময়ের জন্য নিযুক্তি)

	কৃষি	শিল্পোৎপাদন	নির্মাণ শিল্প	সেবা	মোট অ-কৃষি	মোট নিযুক্তি
'৭৩–'৯৪	১.৭২	৩.৫৫	৪.৮২	৪.৫১	৪.২২	২.১৬
'৯৪–'০৫	.৭২	২.৭৯	৮.৩২	৩.২৫	৩.৭০	১.৪৫
'০৫–'১২	–২.০৪	০.৬৭	১২.০৯	১.৩৩	৩.৬৫	–০.২৮

Source: Chand, R., S. Srivastava,. J. Singh. (2017). "Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth." *Economic and Political Weekly*. 52(52). NSSO

এখানে দেখা যাচ্ছে মোট নিযুক্তিতে যেহেতু কৃষির অংশ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় যথেষ্ট বেশি (২০১২ সালে শতকরা ৬৪.১ ভাগ) তাই কৃষিতে নিযুক্তির ঋণাত্মক হার সারা দেশের মোট নিযুক্তি-হারকে প্রভাবিত করেছে। ফলে অ-কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট নিযুক্তির হারে ঋণাত্মক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, অর্থাৎ মোট নিযুক্তি কমেছে। ৩৪৩ মিলিয়ন থেকে নিযুক্তি হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৩৬ মিলিয়ন। এর একটি কারণ, একমাত্র নির্মাণশিল্প বাদে অন্যান্য বিভাগ, যেমন শিল্পোৎপাদন ও সেবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অতি শ্লথ।

ভিনোজ আব্রাহাম[৫] নিযুক্তি ও বেকারত্ব সম্পর্কে লেবার ব্যুরোর উপস্থাপিত পরিসংখ্যান থেকে যে-বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে আমরা দেখি, পরবর্তী '১১–'১২ সাল থেকে '১৫–'১৬ সাল পর্যন্ত নিযুক্তির ক্ষেত্রে মোট হ্রাস কমেনি, বরং হ্রাসের পরিমাণ বাড়তেই থেকেছে। এই বিষয়ে আমরা লেবার ব্যুরোর দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেছি। এই তথ্যগুলি ভিনোজ আব্রাহামের গবেষণাপত্র থেকে সংগ্রহ করেছি।

সারণি ১৫.৫ বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্তির পরিবর্তন (ভিনোজ আব্রাহাম কৃত হিসাব অনুযায়ী)

(শহর ও গ্রাম মিলিয়ে) ২০১৩–১৬ সালে (লাখে)

	মোট নিযুক্তির পরিবর্তন(লাখ)
১) মোট প্রাথমিক	**–৮৯.৩**
ক) কৃষি, জঙ্গল, মাছ চাষ	–৮৪.৬
খ) খনি ও অনুসন্ধান	–৪.৭
২) মোট শিল্প ইত্যাদি	**–২৮.১**
ক) উৎপাদন শিল্প	–১৫.৮
খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি	–১.৬
গ) জল সরবরাহ, নিকাশি	–১.৬
ঘ) নির্মাণ শিল্প	–৯.১

৩) মোট সেবা	**৬৬.৫**
৪) অন্যান্য (অবশিষ্ট)	**–২.১**
মোট (১ + ২ + ৩ + ৪)	–৫৩

Source: Labour Bureau, Abraham, Vinoj. 2017. "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly*. (Sept. 23, 2017).

লেবার ব্যুরোর '১৩–'১৪ ও '১৫–'১৬-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী '১৩–'১৪ থেকে '১৫–'১৬ সালের মধ্যে মোট নিযুক্তি হ্রাস পেয়েছে ৫৩ লাখ। এর মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে হ্রাস পেয়েছে ৮৯.৩ লাখ, যার মধ্যে আবার শুধু কৃষিক্ষেত্র থেকেই নিযুক্তি হ্রাস ঘটেছে ৮৪.৬ লাখ। এমনকী শিল্প থেকেও হ্রাস ঘটেছে ২৮.১ লাখ। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের শিল্পে নিযুক্তি বেড়েছে ৫.৬ লাখ ও শহরাঞ্চলের শিল্পে নিয়োগ কমেছে ৩৩.৭ লাখ— এই হিসাবের ভেতর আছে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাস ১৫.৮ লাখ ও নির্মাণশিল্পে হ্রাস ৯.১ লাখ। শহর-গ্রাম সব ক্ষেত্রেই হ্রাস ঘটেছে। একমাত্র সেবামূলক ক্ষেত্র বাদে সারা অর্থনীতি জুড়ে নিযুক্তি কমেছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ এত বেশি ও যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে বৃদ্ধির পরিমাণ এত কম যে, সব মিলিয়ে মোট নিযুক্তিতে হ্রাস ঘটেছে। এর আগের পর্বে গ্রামাঞ্চলে নিযুক্তি হ্রাসের সঙ্গে শহরাঞ্চলে নিযুক্তির অতি নিম্ন হার মোট নিযুক্তি নামিয়ে এনেছিল। পরবর্তী পর্বে, অর্থাৎ '১৩–'১৪ থেকে '১৫–'১৬ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয়ক্ষেত্রেই নিযুক্তি বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক, বা চূড়ান্ত হ্রাস ঘটে গেছে।

নীচের সারণি ১৫.৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯–২০০০ সাল থেকে ২০১০–'১১ এই এগারো বছরে শহরের ও গ্রামের অসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ও নিজ সংস্থায় নিযুক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। ওই সময়ে অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, তার ভেতর অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অসংগঠিত গ্রামীণ নিজ সংস্থায় নিযুক্তির সংখ্যা বেশি। কৃষি বাদে গ্রাম-শহরের সমস্ত অসংগঠিত সংস্থার মধ্যে অসংগঠিত স্বনিযুক্ত সংস্থায় নিযুক্তি সবচেয়ে বেশি। এমনকী সংগঠিত শিল্পোৎপাদন প্রতিষ্ঠানের থেকেও অসংগঠিত নানা সংস্থা, বিশেষ করে গ্রামীণ অসংগঠিত স্বনিযুক্ত সংস্থায় নিযুক্তির পরিমাণ কৃষির পরই সবচেয়ে বেশি। সারণি ১৫.৬ দেখলে এই তথ্যটি পরিষ্কার হবে।

সারণি ১৫.৬ মোট নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে বিভিন্ন অসংগঠিত সংস্থায় শ্রমিকের নিযুক্তির ভাগ (শতকরা)

[বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত শ্রমিক/মোট শ্রমিক]

	অসংগঠিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/মোট শ্রমিক	শহরের অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে* শ্রমিক/মোট শ্রমিক	শহরের অসংগঠিত নিজ সংস্থায়** শ্রমিক/ মোট শ্রমিক	গ্রামীণ অসংগঠিত নিজ সংস্থায় শ্রমিক/ মোট শ্রমিক
১৯৯৯—২০০০	১.৩৪	৫.৩	৪.০	৮.৪
২০১০—১১	২.৫১	৫.৯৯	৫.৪	৯.১
বৃদ্ধি-হার	২৭.১০	১২.৮২	৩৪.৭২	৯.০৫

* অসংগঠিত প্রতিষ্ঠান: ছোট অসংগঠিত সংস্থা, যেখানে অন্তত একজন মজুরি শ্রমিক কাজ করে

** অসংগঠিত নিজ সংস্থা: যেখানে একমাত্র মালিক ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি কাজ করে না, অর্থাৎ স্বনিযুক্ত সংস্থা

Data source: NSSO different rounds and Annual Survey of Industries

Source: Chakraborty, S. and K. Sadhu. *Neo-dualism: Formal-Informal-agriculture Interaction in India*. Advance Sage publication[৬]

সারণি ১৫.৭ মোট নিযুক্তির মধ্যে অসংগঠিত সংস্থা, কৃষি, সংগঠিত শিল্পোৎপাদন ও অন্যান্য অ-কৃষি সংস্থায় নিযুক্তির ভাগ (শতকরা)

	মোট (শহর ও গ্রাম) অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক/মোট শ্রমিক	কৃষি-শ্রমিক/ মোট শ্রমিক	সংগঠিত শিল্পোৎপাদনে শ্রমিক/মোট শ্রমিক	অন্যান্য শ্রমিক*/ মোট শ্রমিক
’৯৯—২০০০	১৯.০২	৬১.০১	২.০	১৭.৮৮
২০১০—১১	২১.৯৬	৫১.৯৩	২.৭	২২.২৭
বৃদ্ধি-হার	১৫.৪৫	—১৪.৮৮	৩৫.০০	২৪.৫৫

উৎস: সারণি ১৫.৯-এর অনুরূপ।

সারণি ১৫.৮ ও সারণি ১৫.৯-এর তুলনা করলে দেখা যাবে, একদিকে কৃষি থেকে কর্মরত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মানুষের নিযুক্তি বাড়ছে - যদিও এখনও অবধি কৃষিই সর্বাধিক নিযুক্তির সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত অতিরিক্ত মুল্যের দিক থেকে বিষয়টি অন্যরকম। একমাত্র গ্রামীণ অসংগঠিত সংগঠন ছাড়া কৃষি সমেত অন্য সব অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে (সারণি ৫.১০)। আবার প্রতি একক নিযুক্ত শ্রমিকের গড় উৎপাদনশীলতার কথা ভাবলে দেখা যায় (সারণি

১৫.১১) একমাত্র গ্রামীণ নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্র বাদে বাকি সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কৃষির তুলনায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি।

সারণি ১৫.৮ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্য

	কৃষিতে অতিরিক্ত মূল্য/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন %	সংগঠিত শিল্পে অতিরিক্ত মূল্য/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন %	অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন %	অসংগঠিত গ্রামীণ সংগঠনে অতিরিক্ত মূল্য/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন %	মোট অসংগঠিত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন/মোট অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত উৎপাদন %
'৯৯–২০০০	২৮.০৫	১৪.৮১	৪৫.৩০	.৯১	১১.১৮
২০১০–২০১১	১৮.২০	১৯.১৭	৫২.৮৯	১.২৯	৯.৮৩
বৃদ্ধি-হারের হার	–৩৫.১১	২৯.৪৪	১৬.৭৫	৪১.৭৬	–১৭.০২৮

দেখা যাচ্ছে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অসংগঠিত গ্রামীণ সংগঠনে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্যের ভাগ কৃষিতে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্যের ভাগের তুলনায় কম। মোট অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই ভাগটিও কৃষির তুলনায় কম এবং ১৯৯৯–২০০০ সাল এবং ২০১০–১১ সালের মধ্যে এই ভাগটি কৃষির এই ভাগের মতোই আরও কমেছে। নীচের সারণিতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের একক-পিছু উৎপাদনশীলতা দেখতে পাব। একমাত্র গ্রামীণ অসংগঠিত স্বনিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সমস্ত অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রেই কৃষির তুলনায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম, যদিও সংগঠিত শিল্প এবং নির্মাণশিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। এখানে এই ভাবনার অবকাশ থাকতে পারে যে, কৃষি-উৎপাদন অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ায় কৃষিতে নিযুক্ত মানুষ, কৃষি থেকে অসংগঠিত সংস্থায় নিযুক্তিকেই বেশি লাভজনক মনে করছে। এবং হয়তো এই কারণেই তারা অনুৎপাদনশীল কৃষিক্ষেত্র থেকে তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে, অথবা স্বনিযুক্ত সংস্থা গড়ে তুলে তাদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিষয়টিকে আদৌ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ, কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা তুলনা করলে দেখা যাবে, কৃষির উৎপাদনশীলতা অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির উৎপাদনশীলতার তুলনায় বেশি। এই অবস্থায় অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষ করে অসংগঠিত স্বনিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অবয়বের বিস্তার থেকে, এটাই মনে হয় যে, কৃষি থেকে যখন শ্রমিক উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা স্ব-ইচ্ছায় নয়, বরং বাধ্য হয়ে জীবিকার তাড়নায় একটি নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্র তৈরি করে স্বনিযুক্তিকেই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ বলে মনে করছে। অথবা তারা নির্মাণশিল্পে যুক্ত হচ্ছে। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র এইসময়ে কিছুটা বিস্তৃত হলেও এই ক্ষেত্রের

শ্রমিক-নিযুক্তি বাড়ানোর ক্ষমতা এতই কম যে, কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন হওয়া বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে সংগঠিত শিল্প স্থান দিতে পারে না। তারা স্বনিযুক্তির আশ্রয় নেয়; যদিও স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে কৃষির তুলনায় উৎপাদনশীলতা কম।

পূর্ববর্তী পর্ব, অর্থাৎ ২০০৫—২০১২ সালের মধ্যে কৃষি থেকে কর্মচ্যুত মানুষ গ্রামাঞ্চলের অসংগঠিত নির্মাণশিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য নির্ভর করেছে, কিন্তু উপরের সারণি ১৫.৫ থেকে আমরা দেখেছি, পরবর্তী ২০১৩—'১৪ থেকে '১৫—'১৬ সালে অসংগঠিত নির্মাণশিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়োগবৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ার আগে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বনিযুক্ত সংস্থা গঠন করে কোনওভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, নিযুক্তি-হ্রাস শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ২০১২-র পর থেকে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্তির হারে চূড়ান্ত হ্রাস ঘটেছে। তার অর্থ, কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে না। পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যায়ে কৃষি থেকে ও ছোট শিল্পক্ষেত্র থেকে মানুষ উচ্ছিন্ন হয়ে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। প্রাথমিক উৎপাদন-ক্ষেত্র কৃষিতে এই ব্যাপক কর্মহীনতাকে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রকাশ বলে ধরা যাচ্ছে না। কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ শিল্পক্ষেত্রেও নিযুক্ত হতে পারছে না, কারণ ২০০৫ সালের পর থেকে নিযুক্তির হারে যে-মন্দা দেখা যাচ্ছিল, ২০১২-র পর থেকে অসংগঠিত শিল্পের পাশাপাশি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে, বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রবণতা বেড়ে চলেছে। কৃষি থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ বেকার মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে। ভিনোজ আব্রাহাম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, লেবার ব্যুরো ও লেবার ব্যুরোর দ্রুত হিসাব — এই তিন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে এই সামগ্রিক নিযুক্তি-হ্রাসের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ভারতে বেকারত্বের হারের যে-পরিসংখ্যান তিনি উপস্থিত করেছেন তা আমরা নীচের সারণিতে উল্লেখ করেছি। দেখা যাচ্ছে, ২০১১—১২ সালের পর বেকারত্বের হার বেড়েছে এবং পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার আরও বেশি বাড়ছে।

সারণি ১৫.৯ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা [প্রতি ক্ষেত্রে উৎপাদিত সঞ্চিত মূল্য/ প্রতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক] (টাকায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের মূল্য স্তর অনুযায়ী)

	কৃষিতে উৎপাদনশীলতা	গ্রামীণ অসংগঠিত নিজ উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা	মোট অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা গ্রাম ও শহর মিলিয়ে	সংগঠিত উৎপাদন-শিল্পে উৎপাদনশীলতা	অন্যান্য শিল্পে/ উৎপাদনশীলতা
'৯৯—২০০০	১০৪৬৩	৮২৪৮	১৪১৩৭	১৬৫৮৭১	৫৭৬৬৮
২০১০—১২	১৪৫৮৮	১০২৭১	১৮০৫১	২৯৯৫৯৩	১০০৯৬২
বৃদ্ধি-হার % (১০ বছরে)	৩৯.৪২৪	২৪.৫১৬	২৭.৬৮৫	৮০.৬১৮৭	৭৫.০৭৪৫

NSSO Of different rounds and ASI reports. S Chakraborti and K Sadhu. ibid.

কৃষি-ক্ষেত্রে এই নিযুক্তি-হ্রাস বিকাশমান অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গঠনগত পরিবর্তনের ফল নয়। কৃষিতে মোট উৎপাদন কমার জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কম পরিমাণ শস্য নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, ফলে কৃষি-

উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মানুষের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচিত সময়ের মধ্যে ২০১৩–১৪য় কৃষি থেকে উৎপাদিত মোট মূল্য বছরে শতকরা ৫.৫৭ হারে বেড়েছিল, ২০১৪–১৫ সালে এই হার কমে –০.১৯-এ দাড়ায়। অর্থাৎ শস্যোৎপাদনের মোট পরিমাণের হ্রাস ঘটে। আবার '১৫–'১৬ সালে এই হ্রাস পাওয়া শস্যের পরিমাণ সামান্য বাড়ে, (বছরে শতকরা .৬৯ হারে)। '১৬–'১৭ সালে শস্যোৎপাদনের হার শতকরা ৪.৮৮ হারে বাড়লেও কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৭–১৮-র প্রথম তিন মাসে এই হার কমে শতকরা ২.৩-এ দাঁড়িয়েছিল। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মন্দা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্তির পরিমাণ যতটা কমিয়েছে, অর্থনীতির অন্য বিভাগে নিযুক্তি বৃদ্ধি সেটি পূরণ করতে পারছে না।

সারণি ১৫.১০ প্রতি হাজারে বেকারত্বের হার (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা)

(১৫ বছরের ঊর্ধ্ব-বয়স্ক মানুষের মধ্যে)

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা	গ্রামাঞ্চল পুরুষ	গ্রামাঞ্চল মহিলা	গ্রামাঞ্চল মোট	শহর পুরুষ	শহর মহিলা	শহর মোট	সব পুরুষ	সব মহিলা	সব মোট
১৯৯৯–২০০০	১৮	৫	১২	৩৮	১৩	২৬	–	–	–
২০০৪–০৫	১৮	১২	১৫	৩৪	১৯	২৭	২২	১৪	১৮
২০১১–১২	২১	২৯	২৩	৩২	৬৬	৩৮	২৪	৩৬	২৭

Source: Abraham, V. 2017. "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly*. vol 52, no 38.

সারণি ১৫.১১ প্রতি হাজারে ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব-বয়স্ক মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার

[লেবার ব্যুরো নিযুক্তি ও বেকারত্ব সমীক্ষা]

	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	শহর	শহর	শহর	সব মিলিয়ে	সব মিলিয়ে	সব মিলিয়ে
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০১১–'১২	২৭	৫৬	৩৪	৩৪	১২৫	৫০	২৯	৬৯	৩৮
২০১২–'১৩	৪০	৫৮	৪৪	৪২	১২৮	৫৭	৪০	৭২	৪৭
২০১৩–'১৪	৪২	৬৪	৪৭	৩৯	১২৪	৫৫	৪১	৭৭	৪৯
২০১৪–'১৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২০১৫–'১৬	৪২	৭৮	৫১	৩৩	১২১	৪৯	৪০	৮৭	৫০

Source: Abraham, V. (2017). "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly*. 52(38) labour bureau

উদ্বৃত্ত শ্রম ও ছদ্ম-বেকারত্ব: আমরা একদিকে কৃষিতে বেকারত্ব, নিযুক্তি, উদ্বৃত্ত শ্রম ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ধারণা ও সেসব মাপার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মতামতগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বগুলির মূল যুক্তিগুলিকেও আমরা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। অন্যদিকে আমরা কৃষি-শ্রমের বাজার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসারী আলোচনা করেছি। কৃষি-শ্রমিকের মজুরি, ঋতু অনুযায়ী মজুরির ওঠানামা ও দীর্ঘকালীন প্রবণতা, কৃষি-শ্রমিকের ঋণগ্রস্ততা, কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ ও কৃষি-শ্রমিকের বেকারত্ব, সময়ের সঙ্গে কৃষি-শ্রমের চরিত্রে ও মজুরির বিন্যাসে যে-পরিবর্তন এসেছে এবং কৃষি-উৎপাদনের ওপর এই পরিবর্তনগুলির যে-প্রভাব পড়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারতীয় কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম বা ছদ্ম-বেকারত্বের উপস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্কটি যথেষ্ট পুরনো। তাত্ত্বিক দিক থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা ও উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ মাপার পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক চলেছে। বলা হয়, কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ একই স্তরে রেখেও শ্রমিকদের একটা

অংশকে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। অর্থাৎ কৃষিতে নিযুক্ত মানুষরা সবাই যদি পুরো শ্রম-সময় যথাযথ কৃষিকাজে নিয়োগ করত, তাহলে কৃষিতে যত লোক নিযুক্ত আছে তার মধ্যে একটি অংশ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ত। উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপর স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণায় আসতে হলে 'পুরো শ্রম-সময়' বা 'যথাযথ কাজ' ইত্যাদি বিষয়গুলি ঠিক কীভাবে স্থির হবে তা বোঝা দরকার। তাই ধারণার ক্ষেত্রে এবং মাপার পদ্ধতির ক্ষেত্রে একাধিক সূত্র সৃষ্টি হয়েছে। যথাযথ পরিমাণ শ্রমে নিযুক্ত থাকার অর্থ, শ্রমিকের একক-পিছু উৎপাদনের মাত্রা অন্ততপক্ষে শ্রমিক ও তার পরিবারের কর্মক্ষমতা সৃষ্টির পক্ষে শুধু যথেষ্টই নয়, তার থেকে আরও বেশি। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার সংখ্যাগত মানের তুলনায় কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্য অবশ্যই কম হবে। ভারতের কৃষিতে অতিরিক্ত শ্রমের উপস্থিতি সম্বন্ধে তথ্যসম্মত ধারণা পাওয়ার জন্য ভারতের কৃষিতে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্যের সঙ্গে অ-কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন মূল্যের তুলনা করা যেতে পারে। কৃষিতে বেকারত্ব সর্বব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের একক-পিছু শ্রমিকের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। কৃষি উৎপাদনের অতি নিম্ন হার এর জন্য দায়ী। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী একটি স্তর অবধি শ্রমের নিয়োগবৃদ্ধি মোট উৎপাদন বাড়ায়। কিন্তু অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ একই রেখে প্রতি একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে ও ক্রমাগত শ্রমের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে একসময়ে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যে নেমে আসে। এরপরেও নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন আর বাড়ে না। এই স্তরে পৌঁছে কিছু পরিমাণ শ্রম উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলেও মোট উৎপাদন একই থাকে। এই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে অন্য কোনও উৎপাদন-ক্ষেত্রে কাজে লাগালে সাধারণভাবে মোট কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটানো যায়। অথবা কৃষিতে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলে প্রতি একক শ্রম নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদনের মাত্রা আগের তুলনায় বেশি হতে পারে। ফলে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলেও অনেক দূর অবধি প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি একক-পিছু শ্রমের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে পারে। গ্রাম ও শহরের শ্রমের উৎপাদনশীলতার তুলনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামগ্রিকভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি অন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় কম উৎপাদনশীল।

সারণি ১৫.১২ ২০০৪–'০৫-এর দামে কর্মরত মানুষের উৎপাদনশীলতার মূল্য

(উৎপাদনের মূল্য/শ্রমিকের সংখ্যা)

	গ্রাম (শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্য) উৎপাদনশীলতা	শহর (শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনের মূল্য) উৎপাদনশীলতা	শহরের উৎপাদনশীলতা/ গ্রামের উৎপাদনশীলতা
’৭০–’৭১	১৬,৭৭৯	৫৩,৪১৫	৩.২
’৮০–’৮১	১৭,৯৩৫	৫২,৭০২	২.৯
’৯৩–’৯৪	২৫,৫৩১	৭৬,২৩৪	৩.০
’৯৯–২০০০	৩০,৭৬৩	১,০৮,০৯৪	৩.৫
২০০৪–০৫	৩৭,২৭৩	১,২০,৪১৯	৩.২
২০১১–১২	৬২,৮৫৯	১,৭৪,৫২৫	২.৮

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2017

শহরের তুলনায় গ্রামের উৎপাদনশীলতার এই তফাতের কারণ সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার উপস্থিতি। কৃষির পুনর্গঠনের মাধ্যমে, অতি ক্ষুদ্র জোতগুলিকে একত্রিত করে সমবায় ব্যবস্থায় চাষ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলে যেমন একদিকে জোতের প্রান্তিকীকরণ-জনিত সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়া যেতে পারে, তেমনই গ্রামীণ উদ্বৃত্ত জনসখ্যাকে উৎপাদনশীলভাবে কাজে লাগানোর উপায় সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কৃষি-উৎপাদনের সহায়ক বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ, যেমন গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ছোটভাবে স্থানীয় জলসম্পদ ব্যবহার করে সেচের উন্নতি, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিপুল জল, জঙ্গল ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারলে এবং অবস্থা অনুযায়ী সার ও বীজের জন্য দেশীয় প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়ালে একদিকে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ব্যবহার হবে, অন্যদিকে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান সম্বলিত উপকরণের অতিমাত্রায় ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত পুঁজিনির্ভর অধিক উৎপাদনশীল অতিরিক্ত ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আবশ্যিকতা কমাতে হলে ক্ষুদ্র ও ছোট জোতের সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত বড় জোতে চাষ করা দরকার। পাশাপাশি দরকার গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহার করে অধিক শ্রম-নির্ভর কিন্তু উচ্চ উৎপাদনশীল প্রযুক্তি গড়ে তুলে কৃষিতে বেকারত্ব ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা সমস্যার সমাধান করা, সে জন্য দেশে প্রাপ্ত শ্রমশক্তি ও সম্পদের সদ্ব্যবহার হতে পারে।

কৃষিতে প্রান্তিকীকরণের প্রবণতাজনিত সমস্যা সমাধানের কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু কৃষি-অর্থনীতির এই অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করতে গেলে স্বাধীনভাবে যে-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, তা এই লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে দায়বদ্ধ পরিচালকবর্গের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে। কিন্তু তার পক্ষে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রসাদপুষ্ট দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবিরোধী আর্থিক নীতি গ্রহণ করা কতটা সম্ভব হবে সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যায়। চলতি প্রযুক্তি স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় যথেষ্ট বেশি। কৃষি-কাজে যুক্ত দেশের আপামর মানুষকে এর যে-

প্রকৃত ব্যয় বহন করতে হয়েছে তার মূল্যও যথেষ্ট। জোতের মাপের তুলনায় অনুপযুক্ত, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কৃৎকৌশল ও উপযুক্ত সেচের অভাব বিস্তীর্ণ কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে রেখেছে। সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে একাধিক বিকল্প উপায়ের মধ্যে কোন পদ্ধতিটি যে আমাদের দেশের পক্ষে সঠিক তা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। এ জন্য মাথায় রাখতে হবে আমাদের দেশের কৃষির ক্ষুদ্র জোত-নির্ভর গঠনগত অবস্থা, উদ্বৃত্ত শ্রমের বিপুল উপস্থিতি। লক্ষ রাখতে হবে দেশে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ উৎপাদনশীল ব্যবহারের দিকে। এবং ব্যবহার করতে হবে পরিবেশের পক্ষে সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক প্রযুক্তি। কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি-গবেষণাগুলিকে পরিচালিত করতে হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়লে কৃষিতে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে, কৃষি-উৎপাদনের একক-পিছু শ্রমের উৎপাদনশীল নিয়োগ-ক্ষমতা বাড়বে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে কৃষিতে উপস্থিত পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে কৃষিকে মুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে দরকার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ব্যয়বহুল অধিক মূলধনি উপকরণ-নির্ভর প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমানো। এর একটি উপায় হল, সমবায় প্রথায় চাষ ও সেই উদ্দেশ্যে জমি ও অতিরিক্ত শ্রমশক্তির সমন্বিত উৎপাদনশীল ব্যবহার, পাশাপাশি অতিরিক্ত শ্রমশক্তি ও অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত কৃষি-উপকরণ তৈরি করা ও দেশব্যাপী স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত জলসম্পদ কাজে লাগিয়ে বিস্তৃত সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কৃষি থেকে মানুষের অন্যত্র বহির্গমনের নিরিখে এটি জরুরি। এর সাহায্যে অ-কৃষি ক্ষেত্রের চাহিদা ও কৃষিক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির জোগানের সমন্বয়সাধন সম্ভব হতে পারে। কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অ-কৃষি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে এই অতিরিক্ত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ব্যবহার করা গেলে অর্থনীতিতে অভিপ্রেত কাঠামোগত বিবর্তন সূচিত হবে। গ্রামের অভ্যন্তরে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার করতে চাইলে কৃষির সহায়ক অ-কৃষি ক্ষেত্রের আরও প্রসার ঘটানো দরকার, তাতে অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তির হার বাড়বে ও একইসঙ্গে পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কম মূলধনি ব্যয়ে উৎপাদনশীল শ্রম-ঘন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষি-সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে। এই উপায়টি নিয়ে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের আরও গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু দেশের সামগ্রিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান না হলে আলাদাভাবে কৃষি-সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়তো সম্ভব নয়। সমস্যাও নানাবিধ— দেশ জুড়ে বেকারত্ব, অধিকাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ায় তাদের অত্যল্প ও অনিয়মিত আয়ের কারণে চাহিদার অপ্রতুলতা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে গঠনগত অসংগতি ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অতিরিক্ত পুঁজিনির্ভর উৎপাদন-পদ্ধতি, যা এ দেশের অর্থনীতিতে সর্বদাই চাহিদার সমস্যা, বেকারত্ব, নিম্ন ও অনিয়মিত আয়ের সমস্যা তৈরি করে চলেছে। আন্তর্জাতিক পুঁজির মদতপুষ্ট কর্পোরেট শিল্প-পুঁজি ও দেশীয় কৃষি-অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনশীল পুঁজির মিলিত শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ছোট একটি কৃষি-বুর্জোয়া শ্রেণি কতটা স্থানীয়ভাবে লভ্য নিজস্ব গ্রামীণ সম্পদ, জল-জঙ্গল ও উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার করে কৃষি-উন্নয়নের এই ধরনের মডেল অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। কারণ, এই মডেল অনুসরণ করার অর্থ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত কৃষিসম্পর্কিত নীতিটির বিরোধিতা করা। এদেশেও বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে প্রকৌশলগত সহযোগিতায় পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক,

অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বীজের উৎপাদন চালু হয়েছে। আমরা দেখেছি, এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার যে সবসময় কৃষকের পক্ষে সুফলদায়ক হয়েছে এমন নয়। অনেক সময়েই মারাত্মক ক্ষতি করেছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক মেধা-স্বত্ব আইন প্রয়োগের ফলে আমাদের কৃষি-কাঠামো, জোতের বিন্যাস, মাটির গুণগত মান ইত্যাদির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ প্রকৌশল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার রাস্তায় বাধা সৃষ্টি হয়। দেশীয় উপকরণের উপর নির্ভর করে নির্মিত শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের নীতিটি বাস্তবে বিশ্ব-পুঁজির স্বার্থবাহী কৃষি-সম্পর্কিত নীতিটির বিরুদ্ধেই যায়। এদেশের নীতি-নির্ধারকরা কতটা এই বিরোধিতার রাস্তায় যেতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তথ্যসূত্র

১. অবশ্য এই ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি, নানা কারণে দু'টি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক পথে বেশ কিছুটা অর্থনৈতিক প্রগতি ও শক্তি অর্জন করার পর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী নানা বৈশিষ্ট্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক মহলে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

১ক. Baka, Jennifer. 2013. "The political construction of Wasteland: Governmentality, Land Acquisition and Social Inequality in South India." *Development and Change.* The Hague: The Institute of Social Studies.

২. *World Bank Report* 2005.

২ক. Goswami, A., "Land Acquisition, Rehabilitation and Resettelement: Law and Politics." A Background Paper for *Land Acquisition, Land Markets and Regulations.* India Urban Conference, Mysore. 17th November 2011.

৩. Chand, Ramesh, S. K. Srivastava, Jaspal Singh. 2017. "Changes in Rural Economy of India 1971 to 2012 Lessons for Job-led Growth." *Economic and Political Weekly.* vol 52, no, 52.

৪. তদেব

৫. Abraham, Vinoj, 2017. "Stagnant Employment Growth." *Economic and Political Weekly* (Sept. 23, 2017).

৬. Chakraborty, Saumya and Kasturi Sadhu. 2018. *Neo-dualism: Formal-Informal-agriculture Interaction in India*, Advance Sage Publication.

পরিশিষ্ট

অতি সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০) কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তিনটি বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। এই তিনটি বিল কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত নতুন আইন এনেছে এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে পুরনো বাজার-ব্যবস্থায়। খাদ্যশস্যের মতো বিভিন্ন কৃষিপণ্যের কেনা-বেচা, চলাচল, মজুত-জমা ইত্যাদির ওপর এতদিন সরকারি যেসব বিধিনিষেধ ছিল তা নির্মূল করে বাজার-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উদারীকরণ করা হয়েছে, ফলে মনে করা হচ্ছে এই ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষিকে পুরোপুরি বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার অধীনে নিয়ে আসবে। কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করার ব্যাপারে যে-সরকারি কমিটি (APMC) ছিল, তার কার্যকারিতাকে বস্তুত সীমায়িত করে দিল এই কৃষি আইনগুলি। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন এই আইনগুলো ন্যূনতম লাভজনক দাম ও সেই দামে কৃষিপণ্যের সরকারি সংগ্রহ-ব্যবস্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। অন্যদিকে অত্যাবশ্যক পণ্যের বেসরকারি মজুতদারির ওপর সরকারি বাধানিষেধের কার্যকারিতাকে শর্তাধীন করে তোলা হয়েছে ও কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে পুরোপুরি বেসরকারি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনগুলি ভারতীয় চাষির জীবনে ও সামগ্রিক কৃষি-ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সারা দেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। বিভিন্ন কৃষক সংগঠন এই বিলের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এই বিলগুলি তাই বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, 'কৃষিপণ্য কেনা-বেচা ও বাণিজ্য (উৎসাহ ও সুবিধাদান)' সংক্রান্ত আইন, যেটি 'কৃষিপণ্যের বাজারজাত করণ সংক্রান্ত সরকারি কমিটি-কে পাশ কাটানোর আইন' বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই আইনের বলে কৃষিপণ্যের কেনা-বেচা/ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত যে-কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই (যাদের আয়কর বিভাগ অনুমোদিত প্যান কার্ড বা আয়কর বিভাগ অনুমোদিত কোনও প্রমাণপত্র আছে) চাষিদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে পারে এবং স্থানীয়ভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরে, রাজ্যের বাইরে, অন্য রাজ্যের কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বা অন্য দেশের সঙ্গেও বহির্বাণিজ্যে যুক্ত হতে পারে। তারা যে-কোনও স্থানে এই পণ্য বাজারজাত করতে পারবে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাহায্যে শস্য কেনাবেচা বা তার দাম সংক্রান্ত যে-কোনও বিষয় ঘোষণা করতে ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবে। কিন্তু সরকারি কৃষিপণ্যের বাণিজ্য কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত মান্ডিতে তা বিক্রি করার বাধ্যবাধকতা বা মান্ডিগুলিকে বিক্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধার্য মূল্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাদের ওপর থাকবে না। এই ভাবে মান্ডি ব্যবহারের জন্য ধার্য মূল্য না দেওয়ার

সুবিধা ক্রমশ সরকারি কমিটির সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকর্মের সুবাদে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করতে চাইবে, ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারি কমিটি-টি ক্রমশ কার্যকারিতা হারাবে।

অন্যদিকে এই আইনে কৃষিপণ্যের মজুত ও চলাচল বিষয়ে কোনও বাধানিষেধ থাকবে না। এখন পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবসায়ীরা সরকারের ধার্য ন্যূনতম দামকে কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেয় ও সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম দামকে ধার্য দামের নিম্ন সীমা হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়। নতুন ব্যবস্থায় তেমন কোনও নিম্ন সীমা ছাড়াই কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারিত হবে বেসরকারি বাজারে। তাই এখন থেকে চাষিদের আয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধার্য দাম ও অন্যান্য শর্তাবলি স্থির করার সময় দর কষাকষি করতে পারার তুলনামূলক ক্ষমতার ওপর। অথচ দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ছোট চাষিদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা বড় ব্যবসায়ীর তুলনায় নগণ্য, একই সঙ্গে দাম নির্ধারণে সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম দামের কোনও তাৎপর্য থাকবে না। সব মিলিয়ে ছোট চাষির অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠবে। তা ছাড়া এই নতুন ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থায় ন্যূনতম মূল্যে সরকারি শস্য সংগ্রহ ও স্বল্প মূল্যে বিতরণ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে এই আইনে কৃষিপণ্যের বিক্রয় বিষয়ে বেসরকারি বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিশাল বাজার ব্যবস্থা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ সরকারি ন্যূনতম সীমা যেখানে থাকছে না, সেখানে দাম নির্ধারণের সময় কোন বিকল্প ব্যবস্থা মানা হবে তার কোনও উল্লেখও নেই এই আইনে। ফলে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম নির্ধারণ, যা চাষিদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি, তা সম্পূর্ণত ব্যবসায়ীর সদিচ্ছার ও উদার মনোভাবের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট চাষির আয় এইভাবে অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে উঠবে।

এই আইনে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমানোর স্বার্থে কোনও কার্যকর পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ফসল ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চাষিরা কীভাবে পণ্যের বাজার ও ঋণের বাজারের যুক্ত কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে শোষিত হয়। কৃষি-উপকরণের জোগানদার কীভাবে এই সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় শোষণের বড় মাধ্যম হিসেবে দেখা দেয় তা ভারতীয় চাষির আত্মহত্যা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। আলোচ্য আইনগুলিতে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থার এই পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থায় সংস্কার আনার কথা বলা হয়েছে। ফলে বড় ব্যবসায়ীদের প্রভূত সহায়তা দেওয়ার কথা বলা থাকলেও তৃণমূল স্তরের সমীক্ষায় যে-ধরনের মহাজন-ব্যবসায়ী চালিত যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়— চাষিদের আত্মহত্যার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে একাধিক অর্থনীতিবিদ যার সন্ধান পেয়েছেন— সেই যুক্ত বাজার-প্রক্রিয়ার উপস্থিতি ও তার সক্রিয়তাজনিত সমস্যার সমাধানে কৃষিপণ্যের ব্যবসাবাণিজ্যে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার উপযোগী কোনও ব্যবস্থার উল্লেখ এই বিলে নেই। আমরা দেখেছি, গ্রাম-স্তরে এই যুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ীরাই প্রায়শ প্রধান পরিচালকের ভূমিকায় থাকে। তারা ফসল ওঠার আগে চাষিকে ঋণ হিসেবে কৃষি উপকরণ জুগিয়ে চাষির ভবিষ্যৎ-পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। তারা চাষিকে কৃষিপণ্যের দাম কম দেয়, উপকরণের দাম বেশি নেয়। এইভাবে একই সঙ্গে কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্য ও ঋণের বাজারে সম্মিলিত কার্যক্রমে লিপ্ত থেকে তারা কার্যত চাষিদের ওপর চড়া সুদের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার

সুবাদে ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা চড়া সুদ আদায় করে এবং চাষির উৎপাদিত উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে কৃষিতে চাষির বিনিয়োগের ক্ষমতা কমে। এই ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও সুযোগ আলোচ্য আইন দেয়নি।

এই আইন অনুযায়ী পণ্য হস্তান্তরের সময় কেনা-বেচার পরিমাণ, দাম ও অন্যান্য শর্তাবলি নথিভুক্ত করা ও উপযুক্ত স্তরে সেই তথ্য জানানো ও রক্ষা করার কোনও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা তাদের কেনা-বেচার কাজ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সরকারি স্তরে নথিভুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল হয়ে উঠবে ও সরকারি স্তরে তথ্যের যথাযথ সুরক্ষার বিষয়টিও বেশ কঠিন ও অস্বচ্ছতার শিকার হয়ে উঠবে। তাছাড়া গ্রামের অশিক্ষিত ছোট চাষি বা ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া কতটা সম্ভব হবে তা বলা যাচ্ছে না। তাকে অবশ্যই মধ্যবর্তী কোনও গ্রামীণ ব্যবসায়ীর ওপর এ বিষয়ে নির্ভর করতে হবে। ছোট, পিছিয়ে-পড়া ব্যবসায়ী ও ছোট চাষির ভূমিকা এই নতুন ব্যবস্থায় ক্রমশ অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে; গ্রামীণ সমাজে অসংখ্য ছোট চাষি ও বড় ব্যবসায়ীর মধ্যে কেনা-বেচা বিষয়ে সংযোগ রক্ষা করবে এই সব মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। তারা অনেক ছোট ও মাঝারি চাষির পণ্য একত্রিত করে বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেনা-বেচা করতে পারবে। এই সুযোগে ঋণ, পণ্য ও কৃষি উপকরণের সংযুক্ত বাজার-ব্যবস্থা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ী ও বড় চাষির ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠবে। কৃষি-উপকরণের ব্যবসায়ী সংস্থাও আগের মতোই ফসল ওঠার আগে চাষিকে ধারে কৃষি উপকরণ বিক্রি করে একই সঙ্গে ঋণদাতা ও পণ্য ব্যবসায়ী হিসেবে যৌথ ভূমিকা পালনের সুযোগ বজায় রাখতে পারবে। ফলে একই সঙ্গে ঋণ, পণ্য ও উপকরণ, এই তিনটি বাজারের মুক্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এই কাজে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কোনও বাধানিষেধের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। কারণ কৃষিপণ্যের দাম একতরফা স্থির করা ও কেনা-বেচা বা মজুত করার ওপর এখন আর কোনও আইনগত বাধা রইল না। কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত এই নতুন আইনটি আপাতভাবে কৃষি বাজার-ব্যবস্থাকে অবাধ করে তুললেও এই বাজারের যে-সব পুরনো, পিছিয়ে-পড়া বৈশিষ্ট্যের কারণে এতদিন উৎপাদকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মহাজনি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চাষির হাত থেকে অনুৎপাদক বাণিজ্যক্ষেত্রে জমা হচ্ছিল, সেই প্রক্রিয়ায় তা কার্যত কোনও পরিবর্তন আনেনি।

দ্বিতীয় যে-বিলটি আইন হিসাবে অনুমোদন পেয়েছে সেটি হল ‘কৃষকের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) পণ্যমূল্য সুনিশ্চিতকরণ ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কৃষি পরিষেবার জোগান নিশ্চিতকরণ’ বিল। এই বিলটি আসলে চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত। আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চুক্তি-চাষ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটি হল কৃষক ও পণ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে করা একটি চুক্তি। এর মাধ্যমে চাষি চাষ চলাকালীন বা তার আগে স্থির করা দামে ওই সংস্থাটিকে কোনও বিশেষ কৃষিপণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে জোগান দেবে এবং একই সঙ্গে শর্তাধীন প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাটি তাকে কয়েকটি কৃষি-উপকরণ (যেমন বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির) জোগান দেবে। এতদিন আমাদের দেশে শুধুমাত্র ফল-সবজির ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল, নতুন আইনে এই ব্যবস্থাকে খাদ্যশস্য সমেত অন্যান্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথাও বলা হচ্ছে।

এই নতুন আইন অনুযায়ী দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হওয়া চুক্তির শর্তগুলি বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে একটি লিখিত বয়ান তৈরি করা হবে। এই বয়ানে একদিকে কৃষক যে-পণ্য জোগান দেবে সেই পণ্যের গুণ, মান ও স্তর সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে লিখিত বিবরণ দিতে হবে। এ ছাড়া এই পণ্য কোন সময়ে জোগান দেওয়া হবে ও কোথায় হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়েও সহমতের ভিত্তিতে স্থির করা শর্তাবলি লিখিত থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য সংগ্রহ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির ওপর। এছাড়া পারস্পরিক সম্মতিতে চলতি দামের ভিত্তিতে পণ্যের গুণ, মান, স্তর অনুযায়ী দাম স্থির করে সেই দাম সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ চুক্তিতে লিখিত থাকতে হবে। অন্যদিকে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির দিক থেকে জোগানো কৃষি-উপকরণগুলি সম্বন্ধে এবং সেসবের দাম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যও পরিষ্কার ভাবে চুক্তিতে লিখিত থাকবে।

কৃষিপণ্য ওঠার পর কৃষিপণ্যের ঘোষিত দামের তুলনায় বাজার-দাম কম বা বেশি থাকতে পারে। সে জন্য চুক্তিতে একটি ন্যূনতম দামের নিশ্চয়তা থাকবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহারের জন্য ঘোষিত দামের সঙ্গে বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

এই চুক্তির নিরপেক্ষতা বিচার করার জন্য একটি সরকারি প্রশাসনিক বা অন্য কোনও উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে থাকা ব্যক্তিকে দিয়ে চুক্তিটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে ও এই বিষয়ে লিখিত অনুমোদনপত্র থাকতে হবে।

চুক্তি-চাষের বিভিন্ন শর্ত যথাযথ না-মানার জন্য কৃষক ও প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষের অভিযোগ থাকতে পারে। সেই সব অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে মেটানোর জন্য দুই পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে একটি বিবাদ নিষ্পত্তি কমিটি তৈরি হবে। এই কমিটির বিবরণ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত হবে। প্রথমে বিবাদ নিষ্পত্তি কমিটি বিবাদ সমাধানের চেষ্টা করবে। তারা তিরিশ দিনের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে না পারলে যে-কোনও পক্ষ স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিসে আবেদন করতে পারে। যে-কোনও ধরনের বিবাদে দুই পক্ষকে স্থানীয় মহকুমা শাসকের অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে ও তিরিশ দিনের মধ্যে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করা হবে। দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির ক্ষেত্রে নিয়মটি এরকম: যদি কৃষকের বিরুদ্ধে কোম্পানি তার দেওয়া অগ্রিম ফেরত নেওয়ার দাবি করে তবে অভিযুক্ত কৃষক কোম্পানির ব্যয় করা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশটুকুই শুধু ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু কোনও চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কোম্পানিটি চাষিকে দেয় অনাদায়ী টাকার দেড় গুণ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত এই নতুন আইনটি সারের দিক থেকে পুরনো চুক্তি-চাষ সংক্রান্ত আইনের তুলনায় আলাদা কিছু নয়। নতুন আইনে এই চাষের শর্তগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে আইনি ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছে। চুক্তি-চাষকে অনেক বেশি প্রকার কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হয়েছে ও চুক্তি-চাষির ঝুঁকি কিছুটা চুক্তি-কোম্পানির ওপরেও ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর পর তৃতীয় যে-আইনটি ওই একই সঙ্গে গৃহীত হয়েছে সেটি হল অত্যাবশ্যক পণ্য (সংশোধনী) আইন, ২০২০। এর আওতায় যে সব পণ্যকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়, সেগুলি হল খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, ডাল, চিনি, আলু, পিঁয়াজ, পশুখাদ্য, কোনও কোনও বাণিজ্যিক ফসল যেমন কাঁচা তুলা ও তুলা বীজ,

ইত্যাদি। ১৯৫৫ সালে আমাদের দেশে একটি অত্যাবশ্যক পণ্য আইন গৃহীত হয়েছিল ও এতদিন পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির উৎপাদন, জমা ও জোগান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ন্যূনতম সহায়ক দাম নির্ধারণ করত ও ওই দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে পণ্যগুলির দামের অত্যধিক নিম্নগতি রোধ করা হত। এর ফলে চাষি ক্ষতি এড়িয়ে ন্যূনতম লাভে পণ্যগুলি বিক্রয়ের সুযোগ পেত, অন্যদিকে সরকারও রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্য বিক্রি করে উপভোক্তার ন্যূনতম ভোগের চাহিদা মেটাতে পারত। একই সঙ্গে এই সব পণ্য মজুত করার বিরুদ্ধে বাধানিষেধ জারি ছিল, আইন ভাঙলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল অত্যাবশ্যক পণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধ করার উদ্দেশ্যে।

নতুন ২০২০ সংশোধনী আইনটি পুরনো ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চায়। পূর্ববর্তী আইনে অত্যাবশ্যক পণ্যের যে-তালিকা ছিল তা থেকে এখন খাদ্যশস্য, ডাল, তৈলবীজ, ভোজ্য তেল, আলু ও পিঁয়াজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ এখন থেকে এইসব পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন, মজুত, পণ্য চলাচল, জোগান ও বিতরণ ব্যবস্থার ওপর কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই সব পণ্যের ওপর সরকারি যে-নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল সাধারণভাবে সেই নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে এই সমস্ত ক্ষেত্রে চলতি বাধানিষেধের অবসান ঘটিয়ে এই আইন মুক্ত প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করতে চায়। অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদন, মজুত, কেনা-বেচা, চলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে এই ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ ও লাভজনক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ আসবে বেশি, যা ক্রমশ খাদ্যের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপরেও কর্পোরেট ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণকে বাধাহীন করে দেবে। অন্যদিকে মজুতদারি ও কালোবাজারির ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হবে ও এই সব সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাড়বে।

অবশ্য এই নতুন আইনটিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারির অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে। এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলি হল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বলতে বোঝানো হচ্ছে বাণিজ্যিক ফল, সবজি ইত্যাদি হালকা অধিক মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি, এবং খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধির হিসাব করা হবে পূর্ববর্তী দশ বছরের মূল্যস্তর অনুযায়ী অথবা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের বাজার-চলতি খুচরো দরের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে। এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে, অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটলেই কেবলমাত্র সরকার এই সমস্ত পণ্যের জোগান ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারবে। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের অতি আবশ্যিক খাদ্যের জোগানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে শুধুমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সুতরাং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাদ্যে মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধের কোনও উপায় থাকছে না। ফলে সহজ মূল্যে খাদ্যপণ্যের মতো অত্যাবশ্যক পণ্য পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে ও তার দর সর্বদা ওঠা-নামার মধ্যে থাকবে। অবশ্য এই আইন অনুযায়ী কোনও পরিস্থিতিতেই ফল-সবজির প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা বিদেশে রফতানির ক্ষেত্রে জোগান বা জমা সংক্রান্ত কোনও বাধানিষেধ কার্যকর হবে না— যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জমা বা মজুতের পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির কারখানায় প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার সীমা অথবা বিদেশের বাজারে (রফতানির) চাহিদার পরিমাণ অতিক্রম করে।

কৃষিপণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত এই পরিবর্তনগুলি কৃষি-বাজারে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে এনে বেসরকারি ও দেশি-বিদেশি কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের উপযুক্ত আইনি পরিকাঠামো তৈরিতে অগ্রণী পদক্ষেপ সূচিত করেছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বাধানিষেধের অবশেষগুলি নির্মূল করা হয়েছে, ফলে কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি ও বিদেশি মূলধনের প্রভাব আরও বাড়ানোর পথে বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা আছে এতে। কিন্তু কৃষিপণ্যের বাজারে ওপর থেকে কিছু পরিবর্তন আনা হলেও নিয়ন্ত্রণকারী পিছিয়ে-পড়া ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যে-শক্তিটি কৃষি-উৎপাদকের উদ্বৃত্তকে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল, এই বাজারে তা একইভাবে সক্রিয় থাকবে। বাণিজ্য-মহাজনি যুক্ত ক্রিয়ার চাপ থেকে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার কোনও আইনি পদক্ষেপ এতে নেওয়া হয়নি।

এই সব নতুন আইন আমাদের কৃষিপণ্যের বাজার-ব্যবস্থায় সমস্ত প্রকার সরকারি সহযোগিতার রাস্তা বন্ধ করে আরও উদারীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। এটাই বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত নীতি। আমরা দেখেছি আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান রফতানিকারী দেশ। এই সব দেশ বিশ্ব-বাজারে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য কৃষিপণ্যের উপর নানা প্রকার ভরতুকির সাহায্যে দাম কমিয়ে রাখে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একের পর এক বৈঠকে তারা, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছে। এই অবস্থায় আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্যের ওপর থেকে সরকারি সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলে এই সব পণ্যের দাম বাড়বে, আমেরিকার মতো খাদ্যপণ্য রফতানিকারী দেশগুলির পক্ষে তখন তাদের দেশে ভরতুকির সাহায্যে উৎপাদিত, দাম কমানো, খাদ্যশস্যগুলিকে আমাদের দেশের বাজারে রফতানির আরও সুবিধা হবে। আমাদের খাদ্যপণ্য বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে বাধ্য হবে। এ কথাও ঠিক যে, আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রধান রফতানিকারী দেশগুলি ভরতুকি কমিয়ে তাদের কৃষিক্ষেত্রের আরও উদারীকরণ করলে বিশ্বের বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে, ফলে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের মতো দেশগুলির পক্ষে তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু বাস্তবে খাদ্যশস্য রফতানিকারী উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ওপর নানা প্রকার ভরতুকির সাহায্যে দাম কমিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনামূলক অবস্থানকে দুর্বল করে রাখছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা বিশ্বব্যাংকের তরফে উন্নয়নশীল দেশের ওপর কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় ভরতুকির পরিমাণ কমানোর চাপ যুক্তিযুক্ত নয়, বিশ্বের রফতানিকারী উন্নত দেশগুলি ভরতুকির পরিমাণ না কমালে আমাদের দেশের পক্ষে এই নীতি ক্ষতিকারক হবে।

নির্দেশিকা

ভারতের কৃষি • অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়



|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

